400628

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়
আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর

400628

Dhaka University Library
400628

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জানুয়ারী ২০০৩

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়
আবু তাহের মুহাম্মদ মানযুর

তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান

400628

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জানুয়ারী ২০০৩

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন
পিএইচ. ডি (ঢা.বি), এম.এ, বি.এ অনার্স (ঢা.বি)
ডি. এইচ (ঢাকা), ডি. টি (মুলতান)

অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : অফিস ৯৬৬১৯২০-৫৯
এক্স. ৪৩১০, ৪৩১৭

DR. A H M MUJTABA HOSSAIN
Ph. D (D.U), M. A. B. A Hons. (D.U)
D. H (Dhaka), D. T (Multan)

PROFESSOR & CHAIRMAN
Department of Islamic Studies
University of Dhaka, Bangladesh.
Phone : Off. 9661920-59
Ext. 4310, 4317

Ref. .... Date ....

প্রত্যয়নপত্র

জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা* শীর্ষক থিসিস সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি :

১. এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত।
২. এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম।
৩. এটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে এই শিরোনামে এম ফিল ডিগ্রীর জন্য কোন গবেষণা সন্দর্ভ লিখিত হয় নি।

এ গবেষণা সন্দর্ভটি এম ফিল ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখেছি এবং এম ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

মুজতবা
6/12/06

ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

১৯৯৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ ১৯৯৩-এ অংশগ্রহণের বিরল সুযোগ লাভ করি। এ সুবাধে ৩টি কলেজ, ৯টি মাদরাসা এবং ১৮টি বয়েজ-গার্লস হাই স্কুল পরিদর্শন করি। তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই নি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় কাজ করি। মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা আমাকে এদেশের শিক্ষা দর্শন, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে ভাবাতে শুরু করে। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্সসহ এমএ অধ্যয়ন করি। সঙ্গত কারণে 'বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার চর্চা' বিষয়টিও আমার শিক্ষা চিন্তায় যুক্ত হয়। ইসলামী শিক্ষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদামণ্ডিত পাঠক্রমের অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে না দেখে ভারাক্রান্ত হই। বাস্তবতার নিরিখে ভাবনার বিবর্তন হতে থাকে। *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা* আমার সে ভাবনারই বাস্তবতা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ এলে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর কাজ করার মানসিকতা প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু গবেষণার শিরোনাম নির্বাচনে অস্থিরতায় পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৩ সালের অভিজ্ঞতার দিকে তাকিয়ে 'প্রাসঙ্গিক ভাবনা' শব্দ দুটো সংযোজন করেছি। শিরোনামে 'বাংলাদেশ' উল্লেখ থাকায় যদিও ১৯৭১ পরবর্তী সময়কে বুঝায় 'ইসলামী শিক্ষা' বিষয়টি মূল প্রতিপাদ্য হওয়ায় আমাকে ফিরে যেতে হয়েছে মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কালে।

ইসলামী শিক্ষার ধারাক্রম তুলে ধরা ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিসরের কাজ। মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার অবস্থান সন্তোষজনক নয়। অথচ এদেশে ইসলামের আগমন ও ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস খুলাফায়ে রাশেদার আমলেই সূচিত হয়েছে। অবশ্য-বিস্তৃতি লাভ করেছে তারও অনেক পরে। স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার্য সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের মানুষ ইসলামের সাথে ঘনিষ্ঠ। অথচ সরকারীভাবে ইসলামী শিক্ষা আজও 'প্রয়োজনীয়' বিবেচনায় উন্নীত হয় নি। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস ও এর উন্নয়ন চিন্তায় সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা সমৃদ্ধ গ্রন্থ খুব একটা নেই। এ অভিসন্দর্ভ এই অভাব পূরণার্থে রচিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত আমার এ অভিসন্দর্ভ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখতে সক্ষম হলে যাবতীয় পরিশ্রম সুখের অনুষঙ্গ হবে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম সুগ্রোথিত হোক। জাতির মেধা-মননে ইসলামী চেতনা চির জাগরুক হোক আল্লাহ তা'আলার কাছে এটাই আন্তরিক উচ্চারণ। আমীন।

আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
৩১ জানুয়ারী ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে বিশেষভাবে এ গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইনের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, সযত্ন তাকিদ, অনুপ্রেরণা সর্বোপরি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তাঁর এই উদার মনোভাব ও স্নেহ-ঋণ চিরস্মরণীয়। তাঁর সমৃদ্ধ পবিত্র জীবন দীর্ঘতর হোক–আল্লাহ তা'আলার কাছে এটাই অবনত ফরিয়াদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, বিভাগীয় প্রফেসর ড. এ বি এম হাবীবুর রহমান চৌধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সাবেক গবেষণা কর্মকর্তা আমার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব জনাব আবদুল মুকীত চৌধুরী, ঢা বি'র উর্দূ ও ফারসী বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ এ গবেষণাকর্ম সহজ ও সাবলীল করতে বিষয় নির্ধারণের সময় থেকেই প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করে প্রভূত সহায়তা করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়ন প্রয়াসী ও অকৃত্রিম বন্ধু আমার সদা কল্যাণকামী ড. আবদুল ওয়াহিদ, তাঁর জ্ঞান ও সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা এ অভিসন্দর্ভ রচনার সঞ্জীবনী শক্তি। মিসেস ওয়াহিদসহ তাঁর পরিবারের সকলেই আমার জন্য বিভিন্নভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত কম্পিউটার ও লাইব্রেরী ব্যবহার আমার কষ্ট লাঘব করেছে। তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অকৃত্রিম ভালোবাসা-ঋণ অপরিশোধ্য।

শ্রদ্ধাস্পদ মাসিক চিন্তা-ভাবনার সম্পাদক ড. আইম নেছার উদ্দিন, বন্ধু প্রতিম মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রিয় বন্ধু মোহাম্মদ নুরুল আমিন ও একেএম ফজলুল হক প্রায়শ এ গবেষণাকর্মের খোঁজ-খবর নিয়ে উৎসাহ ও কাজকে ত্বরান্বিত করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। বিশেষত ড. নেছার উদ্দিনের উপাত্ত সরবরাহের ভূমিকা আমাকে কৃতার্থ করেছে।

ডিইউজের নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম প্রধান প্রুফ দেখাসহ বিভিন্নভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন। প্রিয়ভাজন শামসুল হুদা সোহেল কম্পোজ করাসহ দ্রুত পরবর্তী পাণ্ডুলিপি প্রদানের ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করে এ অভিসন্দর্ভ দ্রুত সমাপ্তিতে বিশেষ অবদান রেখেছে। থিসিসের কাজের ব্যাপারে তার অন্তপ্রাণ মনোভাব আমাকে অভিভূত করেছে। মোহাঃ আবু বকর ছিদ্দিকও মাঝে মধ্যে কম্পিউটারে প্রুফ দেখে দিয়ে উপকৃত করেছেন। এলজিইডির কম্পিউটার অপারেটর মোঃ রেজাউল করিম লিটন চূড়ান্ত সংশোধনী ও মেকআপ করার জন্য রাত জেগে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা স্মৃতিপট থেকে কখনো মুছবে না। আমি তাঁদের মর্যাদামণ্ডিত জীবন কামনা করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ব্যানবেইস গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, বিভাগীয় সেমিনার ও বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারসহ বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের নিজস্ব লাইব্রেরী থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার শিক্ষার অগ্রযাত্রায় শ্রদ্ধেয়া 'মা' হাজিয়াহ বেগম জাহেদা পারভীনের অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে। আমার পিতা আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলাউদ্দীন ও মাতার নেক দু'আর ফসল এ অভিসন্দর্ভ। আল্লাহ তাঁদের পবিত্র জীবনকে দীর্ঘায়িত করুন। শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আলহাজ্ব মাহবুব আলাউদ্দীন, তাঁর আর্থিক অবদানে এ থিসিস জমাদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর ইহ ও পারজাগতিক কল্যাণ কামনা করছি। এছাড়াও নানাবিধ অন্তরায় ও প্রতিকূল অবস্থায় গবেষণা কাজ চালিয়ে যেতে যাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তাঁদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুভাশীষ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়ন পত্র/৪
মুখবন্ধ/৫
কৃতজ্ঞতা স্বীকার/৬
সংকেত সূচী/১০
প্রতিবর্ণায়ন/১১
ভূমিকা/১২

অধ্যায় : এক
ইসলামী শিক্ষা : স্বরূপ ও বিকাশ

পরিচ্ছেদ : এক
ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ ১৮-৩৭
[ইসলামী শিক্ষা : ব্যাখ্যামূলক সংজ্ঞা; ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি; ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য; ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য; ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য; ইসলামী শিক্ষার পরিধি; ইসলামী শিক্ষা কাঠামো; ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ; ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।]

পরিচ্ছেদ : দুই
হযরত মুহাম্মদ সা.-এর যুগে ইসলামী শিক্ষা ৩৮-৫৪
[ইসলামী শিক্ষার সূচনা; মহানবী সা.-এর যুগে শিক্ষা; বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক; নবুওয়াত-পূর্ব সময়ে 'আরবদের শিক্ষা; মহানবী সা.-এর যুগে 'আরবী ভাষার উন্নয়ন; মক্কায় শিক্ষা বিস্তার; মদীনায় শিক্ষা বিস্তার; শিক্ষা-সূচী; প্রথম আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; মসজিদ ভিত্তিক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; যুদ্ধবন্দী কর্তৃক মদীনায় শিশুদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা; সরকারী ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পরিদর্শক; অমুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা; নও-মুসলিমদের শিক্ষা ব্যবস্থা, নারী শিক্ষা, কারিগরী ও অন্যান্য শিক্ষা, শিক্ষকদের বেতন, প্রত্যয়ন]

পরিচ্ছেদ : তিন
সাহাবা ও পরবর্তী যুগে ইসলামী শিক্ষা ৫৫-৬০
[খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা; উমাইয়া আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা; শিক্ষাকেন্দ্র; প্রাথমিক শিক্ষা; উমাইয়া যুগের ইসলামী শিক্ষা; 'আব্বাসীয় যুগে ইসলামী শিক্ষা; শিক্ষা পদ্ধতি; সার্বজনীন শিক্ষা; শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা; শিক্ষকদের বেতন; শিক্ষা পদ্ধতি ও বিষয় নির্বাচনে শিক্ষকদের স্বাধীনতা; প্রকৃত শিক্ষা প্রদানই শিক্ষকদের উদ্দেশ্য; উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; বায়তুল হিকমাহ; নিযামিয়া প্রতিষ্ঠা]

পরিচ্ছেদ : চার
উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ৬১-৭৮
[হযরত মুহাম্মদ সা. ও সাহাবা যুগ; ইসলাম প্রচারক ও মুসলিম ব্যবসায়ী; বাংলাদেশে ইসলামের আগমন; সূফী 'আলিম ও মুজাহিদগণের ইসলাম প্রচার; বিজয় অভিযানোত্তর : প্রশাসনিক পর্যায়]

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : দুই

বাংলাদেশ অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা [৮০০-১৯৭১ খ্রী.]

পরিচ্ছেদ : এক

মুসলিম শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা [১৭৬৫ খ্রী. পর্যন্ত] ৭৯-৯৭

[ইসলামী শিক্ষার সূচনাপর্ব [৮০০-১২০০ খ্রী.]; মুসলিম সমাজ ও শিক্ষার বিকাশ; ইসলামী শিক্ষার প্রসারে শাসকদের অবদান; শিক্ষা কাঠামো; শিক্ষার সিলেবাস; শিক্ষা ও শিক্ষকের মান; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ]

পরিচ্ছেদ : দুই

বৃটিশ শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা [১৭৬৫-১৯৪৭ খ্রী.] ৯৮-১২৫

[কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজদের ইসলামী শিক্ষানীতি; ইংরেজীর প্রচলন, মুসলমানদের বিরোধিতা এবং ইসলামী শিক্ষার দুরবস্থা; ইংরেজী বিরোধিতার উত্তরণ; **বৃটিশ শাসনামলে ইসলামী শিক্ষার অবস্থা**: বঙ্গে দরসে নিযামী মাদরাসা; দরসে নিযামী-এর সূচনা; দেওবন্দ মাদরাসার সূচনা; দেওবন্দ মাদরাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; 'আলীয়া মাদরাসা ও এর ক্রমবিকাশ; মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড; শিক্ষা সংস্কার কমিটি ও সুপারিশ; রিপোর্ট বাস্তবায়ন; পাকিস্তানের অভ্যুদয় ও কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তর]

পরিচ্ছেদ : তিন

পাকিস্তান শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা [১৯৪৭-১৯৭১ খ্রী.] ১২৬-১৪৩

[ওল্ড ও নিউ স্কীম মাদরাসা; সরকারী 'আলীয়া মাদরাসা; পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড; **জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টসমূহে ইসলামী শিক্ষা [১৯৪৭-১৯৭০] :** মওলানা আকরম খাঁ শিক্ষা কমিটি [১৯৪৯-৫১]; পূর্ব বঙ্গ মাদরাসা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি রিপোর্ট ১৯৫৬; পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন ১৯৫৭; জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৫৯; ইসলামী 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি [১৯৬৩-৬৪]; ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কীয় হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট ১৯৬৬; পাকিস্তানের নতুন শিক্ষানীতি ১৯৬৯; পাকিস্তান সরকারের নতুন শিক্ষানীতি ১৯৭০]

অধ্যায় : তিন

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা [১৯৭১-২০০০ খ্রী.]

পরিচ্ছেদ : এক

ইসলামী শিক্ষার প্রসার ১৪৪-১৫৫

[ক. মসজিদ ভিত্তিক ফোরকানিয়া মাদরাসা; খ. 'আলীয়া মাদরাসা শিক্ষা; গ. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড; ঘ. কাওমী মাদরাসা শিক্ষা]

পরিচ্ছেদ : দুই

শিক্ষা কমিশন ও কমিটিসমূহে ইসলামী শিক্ষা [১৯৭১-১৯৯৭ খ্রী.] ১৫৬-১৮২

[কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট ১৯৭৬; ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্কীম [ড. এম এ বারী কমিটি ১৯৭৭]; অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি ১৯৭৯ [জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি]; বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম বেতনক্রম প্রণয়ন ও প্রবর্তন সম্পর্কিত কমিটির রিপোর্ট ১৯৭৯; বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৮৮ [মফিজ উদ্দিন কমিশন]; মাদরাসা শিক্ষা [ড. এম এ বারী] কমিটি ১৯৮৯; জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭; মাদরাসা শিক্ষার কারিকুলাম সম্পর্কিত কমিটিসমূহ]

পরিচ্ছেদ : তিন

পাঠক্রমে ইসলামী শিক্ষা [১৯৭১-১৯৯০ খ্রী.] ১৮৩-২৭৭

[**এক. প্রাথমিক স্তর :** ১. মসজিদ ভিত্তিক মক্তব; ২. ফোরকানিয়া মাদরাসা; ৩. হাফিজিয়া মাদরাসা; ৪. ইবতিদায়ী মাদরাসা; ৫. দরসে নিযামী ইবতিদায়ী মাদরাসা; ৬. সরকারী প্রাইমারী স্কুল।

দুই. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর : ১. 'আলীয়া মাদরাসার দাখিল ও আলিম স্তর; ২. দরসে নিযামী মাদরাসার মারহালাতুস সানুবিয়্যাহ ও আল উলইয়া; ৩. সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর :

Dhaka University Institutional Repository

ক. নিম্ন মাধ্যমিক স্তর : ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী; খ. মাধ্যমিক স্তর : নবম ও দশম শ্রেণী; গ. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী।

তিন. উচ্চ স্তর : ১. 'আলীয়া মাদরাসার ফাযিল ও কামিল স্তর : ক. ফাযিল স্তর; খ. কামিল স্তর; ২. দরসে নিযামী মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ স্তর; ৩. **বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় :** ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; খ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; গ. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া; ঘ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; ঙ. মহাবিদ্যালয় [পাস ও সাবসিডিয়ারী]; চ. **বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় :** ১. দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি; ২. আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম]

অধ্যায় : চার
প্রাসঙ্গিক ভাবনা

পরিচ্ছেদ : এক

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা : মৌলিক সমস্যা ও প্রতিকার ২৭৮-২৮৯

[আদর্শিক শূন্যতা; অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা; দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা; শিক্ষা অবকাঠামোর অপ্রতুলতা; শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য; শিক্ষার পরিবেশের অভাব; শিক্ষকদের ব্যক্তিগত কর্মব্যস্ততা; কর্মবিমুখ শিক্ষা; আধুনিকতা বর্জিত শিক্ষা; শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস]

পরিচ্ছেদ : দুই

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : সমস্যা ও সম্ভাবনা ২৯০-৩০০

[ক. **'আলীয়া মাদরাসা** : ব্যবস্থাপনা কাঠামো : মাদরাসা বোর্ড; সিলেবাস ও পাঠক্রম সমস্যা; প্রশিক্ষণের সমস্যা; পরিচালনা কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব; ছাত্র সংখ্যার স্বল্পতার কারণ ও এর প্রতিকার; বিজ্ঞান ও কর্মমুখী শিক্ষার অনুপস্থিতি; উচ্চস্তরে সমতার অভাব; ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : প্রত্যাশা ও বাস্তবতা; সরকারী মাদরাসার স্বল্পতা। খ. **কাওমী মাদরাসা** : প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার নিয়মনীতির সমস্যা; আধুনিক ও বিজ্ঞান শিক্ষার অনুপস্থিতি; কর্মমুখী শিক্ষার অভাব; গ. **সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়** : বিশ্ববিদ্যালসমূহে ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণের অভাব; ঘ. **প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর**; ইসলামী শিক্ষায় নারীদের সম্পৃক্ততা]

পরিচ্ছেদ : তিন

ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রস্তাবনা.. ৩০১-৩২৪

[ক. **জ্ঞানের ইসলামীকরণ ও প্রায়োগিক পদ্ধতি :** আধুনিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি-শ্রেণীবিন্যাস; জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জরিপ; ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি-সংকলন; ইসলামী জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ; বর্তমান জ্ঞান শাখাগুলোর সাথে ইসলামের সুনির্দিষ্ট সাযুজ্য স্থাপন; আধুনিক জ্ঞানের বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা; ইসলামের জ্ঞানের উৎস পর্যালোচনা-উৎকর্ষ; উম্মাহর প্রধান সমস্যাবলী জরিপ করা; মানব জাতির সমস্যা জরিপ; সৃজনশীল বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ; ইসলামী কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ের পুনর্বিন্যাস-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক; ইসলামী জ্ঞানের প্রসার; জ্ঞানের ইসলামীকরণে অন্যান্য সহায়ক উপায়; বাস্তবায়নের আরো নিয়ম।

খ. **ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সম্ভাব্য কাঠামো :** শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস; প্রাক-প্রাথমিক স্তর; প্রাথমিক স্তর; মাধ্যমিক স্তর; উচ্চ স্তর; নারী শিক্ষা; গণশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ; ক্রীড়া ও সামরিক শিক্ষা; বৃত্তিমূলক শিক্ষা; অমুসলিমদের জন্য স্ব-স্ব ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা; উচ্চতর গবেষণা; গ্রন্থ রচনা।

গ. **বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার উন্নয়ন : প্রস্তাবনা :** শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে করণীয়; শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা : প্রস্তাবনা; ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনায় প্রাথমিক পদক্ষেপ; মাদরাসার পাঠক্রম সংস্কার প্রসঙ্গ; শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি : প্রেক্ষিত ধর্ম ও মূল্যবোধ; ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন : সমস্যা ও উত্তরণ]

উপসংহার/৩২৫-৩৩০

গ্রন্থপঞ্জি/৩৩১-৩৫৯

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

সা.	:	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
'আ.	:	'আলাইহিস সালাম
রা.	:	রাযী আল্লাহু আনহু
রহ.	:	রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
হি.	:	হিজরী
খ্রী.	:	খ্রীস্টাব্দ
ব.	:	বঙ্গাব্দ
জ	:	জন্ম
মৃ	:	মৃত্যু
ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বাএ	:	বাংলা একাডেমী
ঢাবি	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
চবি	:	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
রাবি	:	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
তাবি	:	তারিখ বিহীন
লি.	:	লিমিটেড
খ	:	খণ্ড
সং	:	সংস্করণ
পৃ	:	পৃষ্ঠা
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
Ed.	:	Edition
p	:	Page
pp	:	Pages
Nd	:	Nil dated
Vol	:	Volume

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

'আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

ا – অ	ش – শ	و – ও, ব	اى – ঈ, য়ী	ى – য়্
ب – ব	ص – স	ه – হ	ا – উ	يو – ইউ
ت – ত	ض – দ, য	ۂ – ৎ	او – ঊ	ع – 'আ
ث – স	ط – ত	ى – য়	و – ওয়া	عا – 'আ
ج – জ	ظ – য	أ – া	وا – ওয়া	ع – 'ই
ح – হ	ع – '	إ – ি	و – বি, ভি	عى – 'ঈ
خ – খ	غ – গ	اُ – ু	وى – বী, ভী	ع – 'উ
د – দ	ف – ফ	او – ‹	و – উ	عو – 'ঊ
ذ – য	ق – ক	اى – ‹	وو – ঊ	
ر – র	ل – ল	ا – আ	يِ – য়্যা	
ز – য	م – ম	ا – আ	يا – ইয়া	
س – স	ن – ন	ا – ই	يى – য়ী	

ء আলিফের ন্যায়। তবে সাকিন হলে ' চিহ্ন ব্যবহৃত হয় ; যথা تأويل = তা'বীল এবং = ع আর সাকিন হলে ' চিহ্ন ব্যবহৃত হয় ; যথা نعت = না'ত।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা একটি ব্যাপক ও সমন্বিত বিষয়। ইসলাম মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত চিরন্তন শাশ্বত ভারসাম্যমূলক পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলামী শিক্ষা শুধু বুনিয়াদী 'ইবাদত ও ব্যক্তি জীবনের সীমিত কতিপয় মাস'আলা-মাসায়িল শিক্ষার মধ্যেই সীমিত নয়। মানুষের সামষ্টিক জীবন যত ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ, ইসলামী শিক্ষাও তত ব্যাপক ও পরিপূর্ণ। আল্লাহ প্রদত্ত ওহীভিত্তিক জ্ঞানই ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উৎস। মানুষের আত্মিক জগত, পৃথিবীর জগত, আখিরাতের অনন্ত জীবন ও জগতের সাফল্য এবং মুক্তির সঠিক জ্ঞান ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে লাভ করা যায়। মানুষের সমগ্র জীবন তিনটি স্তরে বিভক্ত। ১. মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক, ২. মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, ৩. মানুষের সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক। এ ত্রিবিধ সম্পর্ককে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করতে শেখায় ইসলামী শিক্ষা। এ শিক্ষা মানুষের মধ্যে উচ্চ স্তরের নৈতিকতা ও মানসিক গুণাবলীর উন্মেষ এবং পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনসহ মানুষকে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে প্রণীত, এটি বস্তুগত দর্শনের ভিত্তিতে জীবনকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। আধুনিক পার্থিব শিক্ষা ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে জোর দেয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত ও সমাজের জাগতিক মঙ্গলের দিকে। বৈষয়িক বিষয়াদির প্রতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে আরো ধারালো করে তাকে জড়বাদী এই পৃথিবীতে ভয়ংকর প্রতিযোগিতায় নামায়। প্রশ্ন করার সীমাহীন স্বাধীনতা ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতি সংশয়াপন্নতা হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার অপরিহার্য শর্ত। আর ইসলামী শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জাগ্রত হয় সর্বদর্শী স্রষ্টার উপর বিশ্বাস, দায়-দায়িত্ব, হিসাব দেয়ার ইচ্ছা, নীতি, সততা ও শিষ্টতার-বিচার বোধ। ইসলামী শিক্ষার বিশিষ্টতা, গ্রহণযোগ্যতা–এ নিরিখেই বিচার্য।

ইসলাম গতিশীল (Dynamic) সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তক। শিক্ষার সকল ব্যাপারে কুর'আন, হাদীস যথেষ্ট নাও হতে পারে। সামাজিক, মানবিক কল্যাণ ও জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে অনেক নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামী শিক্ষায় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিয়ে গঠিত কমিটি বা শিক্ষা কমিশন শিক্ষার উৎস ও নিদের্শনার কাজ করবে। এ ব্যাপারে প্রথমেই বিবেচনায় আসে ইজতিহাদ। ইজতিহাদ হলো কোন সমস্যা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির সর্বোচ্চ মানসিক দক্ষতা প্রয়োগ এবং চিন্তা বা গবেষণা করে কুর'আন ও হাদীস অনুযায়ী সমাধান বের করা। আল্লামা ইকবাল ইজতিহাদকে বলেছেন গতিশীলতার নীতি। শিক্ষার উৎস হিসেবে কুর'আন ও সুন্নাহর পরই এর স্থান হতে পারে। যেসব বিষয়ে কুর'আন-হাদীসে কোন নির্দেশনা নেই সেসব বিষয়ে রাসূল সা. নিজেই ব্যক্তিগত বিচার ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। মুয়ায ইবন জাবালকে ইয়ামেনের গভর্নর নিয়োগের সময় রাসূল সা. তাঁকে জিজ্ঞেস করেন কোন সমস্যা আসলে কিভাবে সমাধান করবে? মুয়ায এর উত্তরে বলেন প্রথমে কুর'আন, পরে সুন্নাহ এবং শেষে নিজের বিবেচনায়। এই উত্তরে রাসূল সা. খুবই খুশী হন। তাছাড়া জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যে কোন সমস্যার সমাধান কুর'আন ও হাদীসে না পেলে কিয়াস (কুর'আন সুন্নাহর সদৃশ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত), ইজমা' (জ্ঞানীদের সম্মিলিত মতামত), ইসতিহ্সান (কোন জিনিস ভালো বিবেচনা করে) প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে সমাধান দেবেন। কাজেই জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমাজ, জাতি এবং সময়ের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনায় কুর'আন ও হাদীসে নির্দেশনা না পেলে কিয়াস, ইজমা', ইজতিহাদ প্রভৃতির সহায়তায় অগ্রসর হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

মানব জীবনের সকল শাখার জ্ঞানই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত। ঈমান-'আকীদা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, মার্জিত আচরণ, নীতি-নৈতিকতা, 'ইবাদাত-বন্দেগী, তাওহীদ-রিসালাত, কুফর-শিরক, কৃষ্টি, সভ্যতা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, সৌজন্য-শালীনতা, ব্যবসায় বাণিজ্য, রাষ্ট্রদর্শন, সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, প্রশাসন, শিষ্টাচার, মানবাধিকার, নারীর অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, গণতন্ত্র, আইন-বিচার, শাসন সকল কিছুই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাস্তবায়ন ও তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠাই হলো একজন মুসলিমের গুরু দায়িত্ব। ইসলাম শব্দের অর্থই হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছার সম্মুখে সম্পূর্ণ আনুগত্যের শির নত করে দেয়া। আল্লাহর প্রত্যেকটি আদেশ পালনীয় আর প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ কাজ বর্জনীয়। ইসলামী শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য হলো মানুষের ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ। তার সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে সহায়তা দান, অর্থাৎ, প্রকৃত মুসলিমরূপে জীবন-যাপন ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা, যাতে মানুষের জীবনের সব দিক ও বিভাগের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়। সর্বোপরি ইসলামী শিক্ষা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধান এবং রাসূল সা.-এর জীবনাদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে ইহলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে। ইসলামী শিক্ষা মানুষের মধ্যে কল্যাণকর চেতনা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করে।

ইসলামে শিক্ষার অবস্থান সর্বোচ্চে। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি আল্লাহর প্রথম বার্তাও শিক্ষা কেন্দ্রিক। রাসূল সা. শিক্ষার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করেছেন। তাই, মানব জীবনের সবদিকে ব্যাপ্তিশীল সর্বস্পর্শী এ শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়া অপরিহার্য। দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এর বাস্তবায়ন খুবই প্রাসঙ্গিক ও জরুরী।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার চর্চা হয়ে আসছে খুলাফায়ে রাশেদার আমল থেকে। কাল প্রবাহের বিভিন্ন ধারা পরিক্রমণের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌছেছে। ইসলামী শিক্ষা ও শিক্ষিতদের ইংরেজ শাসকদের অসহনীয় আচরণ প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে দু'শ বছর। এ সময়ে ইসলামী শিক্ষা গতিচ্যুত হয়। ইংরেজরা ক্ষমতা গ্রহণ করেছে মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে। তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতেও রয়েছে মুসলমানদের তথা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদের সীমাহীন আত্মত্যাগের সুমহান অবদান। এদেশের গণমানুষের অস্তিত্বের সাথে ইসলামী শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে । ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে এদেশের মানুষের ঘনিষ্ঠতা এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন কাল থেকেই।

মুসলিম শাসনাধীন সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে যাপিত জাতিকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উন্মেষ ঘটাতে ইংরেজ নেতৃত্ব কূটকৌশলের মাধ্যমে শিক্ষায় বিভিন্ন ধারা প্রবর্তন করে জতিকে বিভক্ত করে তোলে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা পৃষ্ঠপোষকতাহীন অবস্থায় তখন থেকে এক পেশে শিক্ষায় পরিণত হয়। এর যে সার্বজনীন চেহারা তা হারিয়ে যায়। আজ অবধি ইসলামী শিক্ষা তার মৌলিক চেহারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ১৯৭১-এর পূর্ব ও পরবর্তীতে এ দেশের ইসলামী শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে অনেক শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে কোনো সুপারিশই পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয় নি।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ধারাক্রম এবং এর বাস্তবায়নকল্পে সুচিন্তিত প্রস্তাবনা সমৃদ্ধ তেমন কোন গবেষণা গ্রন্থ রচিত হয় নি। ইসলামী শিক্ষার সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি জাতিকে অবহিত করা দরকার। এ লক্ষ্যেই এ অভিসন্দর্ভের অবতারণা। *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা* শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে উক্ত লক্ষ্য সমাপণে অভিসন্দর্ভকে ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে মোট ১৩টি পরিচ্ছেদে আলোচনা বিন্যাস করা হয়েছে। শুরুতে ভূমিকায় অভিসন্দর্ভ রচনার উদ্দেশ্য ও মূল বিষয়বস্তুর আলোকপাতধর্মী বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা : স্বরূপ ও বিকাশ শীর্ষক শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে ৪টি পরিচ্ছেদ। ১ম পরিচ্ছেদ হলো : *ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ*। এ অংশে ইসলামী শিক্ষা : ব্যাখ্যামূলক সংজ্ঞা; ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি; ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য; ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য; ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য; ইসলামী শিক্ষার পরিধি; ইসলামী শিক্ষার কাঠামো; ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ এবং ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি শিরোনামে ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

২য় পরিচ্ছেদ *হযরত মুহাম্মদ সা.-এর যুগে ইসলামী শিক্ষা*। ইসলামী শিক্ষার সূচনা; মহানবী সা.-এর যুগে শিক্ষা; বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক; নবুওয়াত-পূর্ব সময়ে 'আরবদের শিক্ষা; মহানবী সা.-এর যুগে 'আরবী ভাষার উন্নয়ন; মক্কায় শিক্ষা বিস্তার; মদীনায় শিক্ষা বিস্তার; শিক্ষা-সূচী; প্রথম আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; মসজিদ ভিত্তিক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; যুদ্ধবন্দী কর্তৃক মদীনায় শিশুদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা; সরকারী ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পরিদর্শক; অমুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা; নও-মুসলিমদের শিক্ষা ব্যবস্থা; নারী শিক্ষা; কারিগরী ও অন্যান্য শিক্ষা; শিক্ষকদের বেতন এবং প্রত্যয়ন শীর্ষক শিরোনামে এ পরিচ্ছেদে মূলত ইসলামী শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমধারা আলোচনা করা হয়েছে।

৩য় পরিচ্ছেদ : *সাহাবা ও পরবর্তী যুগে ইসলামী শিক্ষা*। এ অংশে রয়েছে উল্লিখিত সময়ে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারতার সংক্ষিপ্ত আলোকপাত। এ পরিচ্ছেদের শিরোনামসমূহ হচ্ছে : খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা; উমাইয়া আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা; শিক্ষাকেন্দ্র; প্রাথমিক শিক্ষা; উমাইয়া যুগের ইসলামী শিক্ষা; 'আব্বাসীয় যুগে ইসলামী শিক্ষা; শিক্ষা পদ্ধতি; সার্বজনীন শিক্ষা; শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা; শিক্ষকদের বেতন; শিক্ষা পদ্ধতি ও বিষয় নির্বাচনে শিক্ষকদের স্বাধীনতা; প্রকৃত শিক্ষা প্রদানই শিক্ষকদের উদ্দেশ্য; উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; বায়তুল হিকমাহ; নিযামিয়া প্রতিষ্ঠা।

উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা শীর্ষক ৪র্থ পরিচ্ছেদে কেন্দ্রিয়ভাবে বাংলাদেশ অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ও ইসলামী শিক্ষার সূচনাকালের বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ সা. ও সাহাবা যুগ; ইসলাম প্রচারক ও মুসলিম ব্যবসায়ী; বাংলাদেশে ইসলামের আগমন; সূফী 'আলিম ও মুজাহিদগণের ইসলাম প্রচার; বিজয় অভিযানোত্তর : প্রশাসনিক পর্যায় ইত্যাদি শিরোনামে এ আলোচনা করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : **বাংলাদেশ অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা [৮০০-১৯৭১ খ্রী.**। এ অধ্যায়ের আলোচনা তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যাস করা হয়েছে। ১ম পরিচ্ছেদ হলো : *মুসলিম শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা [১৭৬৫ খ্রী. পর্যন্ত]*। ইসলামী শিক্ষার সূচনাপর্ব [৮০০-১২০০ খ্রী.]; মুসলিম সমাজ ও শিক্ষার বিকাশ; ইসলামী শিক্ষার প্রসারে শাসকদের অবদান; শিক্ষা কাঠামো; শিক্ষার সিলেবাস; শিক্ষা ও শিক্ষকের মান; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ শিরোনামে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

বৃটিশ শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা [১৭৬৫-১৯৪৭ খ্রী.] শীর্ষক ২য় পরিচ্ছেদে কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজদের ইসলামী শিক্ষানীতি; ইংরেজীর প্রচলন, মুসলমানদের বিরোধিতা এবং ইসলামী শিক্ষার দুরবস্থা; ইংরেজী বিরোধিতার উত্তরণ; বৃটিশ শাসনামলে ইসলামী শিক্ষার অবস্থা: বঙ্গে দরসে নিযামী মাদরাসা; দরসে নিযামী-এর সূচনা; দেওবন্দ মাদরাসার সূচনা; দেওবন্দ মাদরাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; 'আলীয়া মাদরাসা ও এর ক্রমবিকাশ; মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড; শিক্ষা সংস্কার কমিটি ও সুপারিশ; রিপোর্ট বাস্তবায়ন; পাকিস্তানের অভ্যুদয় ও কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তর ইত্যাদি শিরোনামে বৃটিশ শাসনকালে ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা উপস্থাপনা করা হয়েছে।

৩য় পরিচ্ছেদ : *পাকিস্তান শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা [১৯৪৭-১৯৭১ খ্রী.]*। এ অংশের উল্লেখযোগ্য শিরোনামগুলো হচ্ছে : ওল্ড ও নিউ স্কীম মাদরাসা; সরকারী 'আলীয়া মাদরাসা; পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা বোর্ড; জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টসমূহে ইসলামী শিক্ষা [১৯৪৭-১৯৭০] : মাওলানা আকরম খাঁ শিক্ষা কমিটি [১৯৪৯-৫১]; পূর্ব বঙ্গ মাদরাসা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি রিপোর্ট ১৯৫৬; পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন ১৯৫৭; জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৫৯; ইসলামী 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি [১৯৬৩-৬৪]; ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কীয় হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট ১৯৬৬; পাকিস্তানের নতুন শিক্ষানীতি ১৯৬৯; পাকিস্তান সরকারের নতুন শিক্ষানীতি ১৯৭০। এসব শিরোনামের আলোচনায় পাকিস্তান শাসনামলে ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ এবং সরকারী প্রয়াস উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা [১৯৭১-২০০০ খ্রী.] শীর্ষক মূল অধ্যায়েও রয়েছে ৩টি পরিচ্ছেদ। এর ১ম পরিচ্ছেদ হলো : *ইসলামী শিক্ষার প্রসার*। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রসারে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক পর্যায়ে যেসব প্রতিষ্ঠান ভূমিকা পালন করছে, এ অংশে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে উল্লিখিত শিরোনামে : ক. মসজিদ ভিত্তিক ফোরকানিয়া মাদ্রাসা; খ. 'আলীয়া মাদরাসা শিক্ষা; গ. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড; ঘ. কাওমী মাদরাসা শিক্ষা।

শিক্ষা কমিশন ও কমিটিসমূহে ইসলামী শিক্ষা [১৯৭১-১৯৯৭ খ্রী.] শীর্ষক ২য় পরিচ্ছেদে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে। এ থেকে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারের সরকারী মনোভাব সুস্পষ্ট হয়। কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট ১৯৭৬; ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্কীম [ড. এম এ বারী কমিটি ১৯৭৭]; অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি ১৯৭৯ [জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি]; বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম বেতনক্রম প্রণয়ন ও প্রবর্তন সম্পর্কিত কমিটির রিপোর্ট ১৯৭৯; বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৮৮ [মফিজ উদ্দিন কমিশন]; মাদরাসা শিক্ষা [ড. এম এ বারী] কমিটি ১৯৮৯; জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭; মাদরাসা শিক্ষার কারিকুলাম সম্পর্কিত কমিটিসমূহ ইত্যাদি শিরোনামে এ পরিচ্ছেদের আলোচনা সীমিত করা হয়েছে।

৩য় পরিচ্ছেদ হলো : *পাঠক্রমে ইসলামী শিক্ষা [১৯৭১-১৯৯০ খ্রী.]*। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মৌলিক ৩টি স্তরে বিভাজন করে তার অধীনে বিভিন্ন উপশিরোনামে প্রতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামী শিক্ষার ধারাক্রম পূর্ণঙ্গভাবে উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন সালের সিলেবাস ও সিলেবাসের উপর মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদের আলোচ্যসূচী হলো : **এক.** প্রাথমিক স্তর : ১. মসজিদ ভিত্তিক মক্তব; ২. ফোরকানিয়া মাদরাসা; ৩. হাফিজিয়া মাদরাসা; ৪. ইবতিদায়ী মাদরাসা; ৫. দরসে নিযামী ইবতিদায়ী মাদরাসা; ৬. সরকারী প্রাইমারী স্কুল। **দুই.** মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর : ১. 'আলীয়া মাদরাসার দাখিল ও আলিম স্তর; ২. দরসে নিযামী মাদরাসার মারহালাতুস সানুবিয়্যাহ ও আল উলইয়া; ৩. সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর : ক. নিম্ন মাধ্যমিক স্তর : ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী; খ. মাধ্যমিক স্তর : নবম ও দশম শ্রেণী; গ. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী। **তিন.** উচ্চ স্তর : ১. 'আলীয়া মাদরাসার ফাযিল ও কামিল স্তর : ক. ফাযিল স্তর; খ. কামিল স্তর; ২. দরসে নিযামী মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ স্তর; ৩. বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় : ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; খ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; গ. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া; ঘ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; ঙ. মহাবিদ্যালয় [পাস ও সাবসিডিয়ারী]; চ. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় : ১. দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি; ২. আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

প্রাসঙ্গিক ভাবনা শীর্ষক ৪র্থ অধ্যায় ৩টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে। *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা : মৌলিক সমস্যা ও প্রতিকার* শীর্ষক ১ম পরিচ্ছেদে আদর্শিক শূন্যতা; অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা; দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা; শিক্ষা অবকাঠামোর অপ্রতুলতা; শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য; শিক্ষার পরিবেশের অভাব; শিক্ষকদের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত কর্মব্যস্ততা; কর্মবিমুখ শিক্ষা; আধুনিকতা বর্জিত শিক্ষা; শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ইত্যাদি শিরোনামে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক কিছু সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় বিধৃত হয়েছে।

২য় পরিচ্ছেদ : *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : সমস্যা ও সম্ভাবনা*। এতে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি মূল শিরোনামের আওতায় ইসলামী শিক্ষার বর্তমান অবস্থাকে সুচারুরূপে পরিচালনার নিমিত্তে কতিপয় বিষয়ভিত্তিক মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচনার শিরোনাম হচ্ছে : ক. 'আলীয়া মাদরাসা : ব্যবস্থাপনা কাঠামো: মাদরাসা বোর্ড; সিলেবাস ও পাঠক্রম সমস্যা; প্রশিক্ষণের সমস্যা; পরিচালনা কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব; ছাত্র সংখ্যার স্বল্পতার কারণ ও এর প্রতিকার; বিজ্ঞান ও কর্মমুখী শিক্ষার অনুপস্থিতি; উচ্চস্তরে সমতার অভাব; ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : প্রত্যাশা ও বাস্তবতা; সরকারী মাদরাসার স্বল্পতা। খ. কাওমী মাদরাসা : প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার নিয়মনীতির সমস্যা; আধুনিক ও বিজ্ঞান শিক্ষার অনুপস্থিতি; কর্মমুখী শিক্ষার অভাব; গ. সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় : বিশ্ববিদ্যালসমূহে ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণের অভাব; ঘ. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর, ইসলামী শিক্ষায় নারীদের সম্পৃক্ততা।

ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রস্তাবনা শীর্ষক এ পরিচ্ছেদে *জ্ঞানের ইসলামীকরণ ও প্রায়োগিক পদ্ধতি, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সম্ভাব্য কাঠামো* এবং *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার উন্নয়ন : প্রস্তাবনা* শীর্ষক ৩টি মূল শিরোনামের আওতায় কতগুলো উপশিরোনামে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের নিমিত্তে মৌলিক কতিপয় দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হয়েছে। শিরোনামগুলো হচ্ছে : ক. জ্ঞানের ইসলামীকরণ ও প্রায়োগিক পদ্ধতি : আধুনিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি-শ্রেণীবিন্যাস; জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জরিপ; ইসলামী জ্ঞান ব্যুৎপত্তি-সংকলন; ইসলামী জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ; বর্তমান জ্ঞান শাখাগুলোর সাথে ইসলামের সুনির্দিষ্ট সাযুজ্য স্থাপন; আধুনিক জ্ঞানের বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা; ইসলামের জ্ঞানের উৎস পর্যালোচনা-উৎকর্ষ; উম্মাহর প্রধান সমস্যাবলী জরিপ করা; মানব জাতির সমস্যা জরিপ; সৃজনশীল বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ; ইসলামী কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ের পুনর্বিন্যাস-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক; ইসলামী জ্ঞানের প্রসার; জ্ঞানের ইসলামীকরণে অন্যান্য সহায়ক উপায়; বাস্তবায়নের আরো নিয়ম। খ. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সম্ভাব্য কাঠামো : শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস; প্রাক-প্রাথমিক স্তর; প্রাথমিক স্তর; মাধ্যমিক স্তর; উচ্চ স্তর; নারী শিক্ষা; গণশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ; ক্রীড়া ও সামরিক শিক্ষা; বৃত্তিমূলক শিক্ষা; অমুসলিমদের জন্য স্ব-স্ব ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা; উচ্চতর গবেষণা; গ্রন্থ রচনা। গ. বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার উন্নয়ন : প্রস্তাবনা : শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে করণীয়; শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা : প্রস্তাবনা; ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনায় প্রাথমিক পদক্ষেপ; মাদরাসার পাঠক্রম সংস্কার প্রসঙ্গ; শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি : প্রেক্ষিত ধর্ম ও মূল্যবোধ; ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন : সমস্যা ও উত্তরণ।

অভিসন্দর্ভের শেষাংশে রয়েছে **উপসংহার** ও **গ্রন্থপঞ্জি**। উপসংহারে এ অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস তুলে ধরা হয়েছে এবং অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যবহৃত গ্রন্থ, রিপোর্ট, প্রতিবেদন ও পত্র-পত্রিকার পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থপঞ্জি উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : এক

ইসলামী শিক্ষা : স্বরূপ ও বিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : এক
ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ

পৃথিবীতে মানুষ হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফাতুল্লাহ)।[১] প্রতিনিধিগণ প্রকৃতিগতভাবেই স্রষ্টার ইচ্ছানুযায়ী সঠিকভাবে আচরণ করবে-এটাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এজন্য প্রতিনিধিরা আবশ্যিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে কিভাবে এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে হয়। আল্লাহ নিজেই এ দায়দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর প্রতিনিধিদের শিখিয়েছেন কিভাবে তারা পৃথিবীতে তাদের কাজ করে যাবে। আদম, যিনি সৃষ্টির প্রথম মানব ও আল্লাহর একজন নবী এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে আল্লাহ নিজেই জ্ঞান শিক্ষা দানে প্রশংসিত করেছিলেন।[২] বলা যায়, মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথেই শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। 'পড়'[৩] [ইকরা] হচ্ছে কুর'আন-এর প্রথম শব্দ, যা মানব জাতির প্রতি আল্লাহর চূড়ান্ত নির্দেশ। রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর হাদীস অনুসারে প্রত্যেক নর ও নারীর জ্ঞান সাধনা করা বাধ্যতামূলক। কুর'আন হাদীসের এসব নির্দেশনার উপরই শিক্ষার চূড়ান্ত গুরুত্ব স্থাপিত।

ইসলামী শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, আত্মা, বৈষয়িক ও নৈতিক বিষয়াদিসহ সর্বদিকে বিস্তৃত। ইসলাম মানুষকে দেহ, মস্তিষ্ক ও আত্মার সমন্বিত এক পূর্ণ অবয়ব মনে করে। তাই আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী সঠিক পথে মানুষ পরিচালিত হওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম। এই শিক্ষার গুরুত্ব প্রমাণিত হয় এ থেকে যে, সর্বপ্রথম মানুষ ও নবী হযরত আদম 'আ.-কে মহান রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম জ্ঞানদানে ধন্য করেন। ঘোষণা করা হয়েছে :

> জিন ও ইনসানকে একমাত্র ইবাদাত করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪]

সঠিক পন্থায় এই 'ইবাদাত করার একমাত্র উপায় হলো দ্বীনি শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষা অর্জন না করলে মানবজীবনের সবকিছুই ভণ্ডুল হয়ে যায়। মানুষ হিসেবে যাবতীয় দায়িত্ব যথাযথরূপে পালনের যোগ্য হতে হলে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে যে জ্ঞান ও গুণাবলী প্রয়োজন তা অর্জনার্থে শৈশব থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, তা-ই হলো শিক্ষা।

ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, আদেশ-নিষেধ, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. নির্দেশিত পথে জীবনাচারের শিক্ষা অর্জিত হয়। এককথায়, কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে যে জ্ঞানার্জন করা হবে তা-ই ইসলামী শিক্ষা। ইহলৌকিক সুখ ও পারলৌকিক শান্তির জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ইসলামী শিক্ষা : ব্যাখ্যামূলক সংজ্ঞা

তত্ত্বগত ও বাস্তবদিক থেকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা একটি ব্যাপক ও সমন্বিত বিষয়। ইসলাম মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত চিরন্তন শাশ্বত ভারসাম্যমূলক পরিপূর্ণ জীবন বিধান। তাই ইসলামী শিক্ষা বলতে শুধু বুনিয়াদী 'ইবাদত ও ব্যক্তি জীবনের গণ্ডীতে সীমিত কতিপয় মাস'আলা মাসায়িল শিক্ষার মধ্যেই সীমিত নয়। মানুষের সামষ্টিক জীবন যত ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ, ইসলামী শিক্ষাও তত ব্যাপক ও পরিপূর্ণ। অসীম আল্লাহ প্রদত্ত ওহী ভিত্তিক জ্ঞানই ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উৎস। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়।

---

১. কুর'আন, ২ : ৩০।

২. কুর'আন, ২ : ৩১।

৩. কুর'আন, ৯৬ : ১।

৪. কুর'আন, ৫১ : ৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলামী ভাবধারার ভিত্তিতে মানব জাতির ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবন ও বৃত্তির বিকাশ এবং ইহলৌলিক ও পরলৌকিক কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা। তাওহীদ ভিত্তিক যে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক, দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক, ব্যষ্টিক কল্যাণ নিশ্চিত হয় তা-ই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। যে শিক্ষা লাভ করলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে, আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক সুস্থ মানব প্রকৃতিকে সর্বপ্রকারের অনাচার ও পাশবিক-শয়তানী প্রবৃত্তি থেকে পবিত্র রাখতে পারে, মূলত তা-ই ইসলামী শিক্ষা। এই শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলিম সাঠিক বিশ্ব-দৃষ্টির সাথে সমন্বিত করতে পারে তার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ।[৫]

মানুষের আত্মিক জগত, বস্তু বা পৃথিবীর জগত, পরকাল বা আখিরাতের অনন্ত জীবন ও জগতের সাফল্য এবং মুক্তির সঠিক জ্ঞান যে শিক্ষা দ্বারা লাভ করা যায় তাই ইসলামী শিক্ষা। মানুষের সমগ্র জীবন তিনটি স্তরে বিভক্ত। ১. মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক, ২. মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, ৩. মানুষের সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক। যে প্রক্রিয়ায় এ ত্রিবিধ সম্পর্ককে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করতে পারে তা-ই ইসলামী শিক্ষা।

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তার 'ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যে জ্ঞান ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের পরিপূর্ণ জীবন ধারাকে আল্লাহর গোলামী ও দাসত্বের বুনিয়াদে পরিচালনা করতে পারে তাই ইসলামী শিক্ষা।

এক সঙ্গে যে শিক্ষা ও প্রক্রিয়া জড় ও আত্মার সমন্বয় সাধন করে সমগ্র সৃষ্টি জগতকে মানব কল্যাণের নিমিত্তে ব্যবহারের উপযোগী দেহ ও আত্মার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে উপলব্ধি ও বাস্তবায়নের সঠিক প্রক্রিয়া ও জ্ঞানদান করে তাই ইসলামী শিক্ষা। ইসলামের জাগতিক বিষয়সমূহ, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র এবং আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য। এভাবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে পৃথিবীতে ও মৃত্যুর পর উভয় জীবনের জন্যই প্রস্তুত করে গড়ে তোলে। এককথায়, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের উপলব্ধি এবং সে আলোকে জীবনধারণ ও বিকাশের মাধ্যম যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা।

পক্ষান্তরে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে প্রণীত, এটি জীবনকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে শুধুমাত্র জীবনের বস্তুগত দর্শনের ভিত্তিতে। এটি শিশুদেরকে পার্থিব সাফল্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে তোলে। এই শিক্ষা কেবল মাত্র জাগতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত, যা বেহেশত-দোযখ এবং মৃত্যুর পরের জীবন দর্শনকে অগ্রাহ্য করে। এই ব্যবস্থায় স্রষ্টা যিনি বেহেশত দ্বারা পুরস্কৃত করেন ও দোযখ দ্বারা শাস্তি দেন তার নিকট মানুষের কাজের জন্য জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতাকে আলোচনা করা হয় অনিশ্চয়তা, দ্বিধা, অপ্রতিভবতা ও উদ্দেশ্যহীনতা রূপে।

মুসলিম শিক্ষার প্রথম বিশ্ব কনফারেন্স যা ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত হয় তাতে বলা হয়েছিল :

> Education should aim at the balanced growth at the total personality of man through the training of Man's spirit, intellect, the rational self, felings and badly senses. Education should therefore eater for the growth of man in all its aspects: spiritual, intellectual, imatinative, physical, scientific, linguistic, both individually and collectively, and motivate all these aspects towards goodness and the allainment of perfection, the ultimate aim of Muslim Education lies in the realisation of complete Sulamision to Allah on the lavel of the individual, the community and humanity at large[৬]

'মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সুষম বৃদ্ধি' ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আধুনিক এই পার্থিব শিক্ষা ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে জোর দেয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত ও সমাজের জাগতিক মঙ্গলের দিকে। শিশুদের কাছে আশা করা হয় তারা যাতে বড় হলে নিজেদের অবস্থান খুঁজে পেতে

---

৫. শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইসহাক, *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, চট্টগ্রাম : ইসলামী সংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০, পৃ ৭।

৬. The world Conference on Muslim Education, Macca 1977-এর সুপারিশ থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

পারে। সেই লক্ষ্যেই তারা নিজেদেরকে উৎসাহিত, প্রস্তুত ও প্রশিক্ষিত করে তোলে। তাদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা, শিক্ষা, নৈতিক উৎকর্ষ লাভ, শালীনতা, সত্যবাদীতা, ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায্য ব্যবহার, ত্যাগ, যত্নশীলতা, নিঃস্ব ও অসহায় অরক্ষিতদের জন্য উদ্বেগ এবং সামাজিক দায়িত্বের জন্য প্ররোচিত ও উৎসাহিত করা হয় না। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বৈষয়িক বিষয়াদির প্রতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে আরো ধারালো করে তাকে জড়বাদী এই পৃথিবীতে ভয়ংকর প্রতিযোগিতায় নামায়। নৈতিকতা, আর্থিক উন্নতি এবং অন্যান্য শ্রেয়তর জীবনের মূল্যবোধ অপেক্ষা 'পৃথিবী যোগ্যতাময়' এটাই একমাত্র আদর্শ হিসেবে এখানে প্রতীয়মান। প্রশ্ন করার সীমাহীন স্বাধীনতা ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতি সংশয়াপন্নতা হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার অপরিহার্য শর্ত। মানুষ হিসেবে তার উপযুক্ততা ও দায়বদ্ধতার সাথে সাথে সততা, সাধুতা এবং উচ্চ এক জীবনের জন্য সচেতনতার চেয়ে তাকে নীতিগতভাবেই বৈষয়িক বিজ্ঞ এক জীবন তৈরীর লক্ষ্য তার সামনে তুলে ধরা হয়। মানব জাতির চরিত্র ও ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে 'অবস্থাগত নীতিতন্ত্রের' সার সংক্ষেপে দেখা যায় যে পরম মূল্যের প্রতি বিশ্বাসের চেয়ে অপেক্ষবাদের চর্চার প্রতিই যেন তাদের ঝোঁক বেশী। প্রায় সর্বত্র ব্যপ্তিশীল এই অপেক্ষাবাদ উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধ ও সার্বজনীনতাকে ধ্বংস করছে। সর্বদর্শী স্রষ্টার উপর বিশ্বাস নিয়ে আসে দায়দায়িত্ব, হিসাবে দেয়ার ইচ্ছা, নীতি, সততা ও শিষ্টতার বিচার বোধ-এ ব্যাপারগুলো শুধুমাত্র ইসলামী শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমেই জাগ্রত হয়। ইসলামী শিক্ষার বিশিষ্টতা, গ্রহণযোগ্যতা-এ নিরিখেই বিচার্য।

ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি

জ্ঞানের মৌল মাধ্যম হচ্ছেন স্রষ্টা নিজেই, যিনি তাঁর বাণী (ওহী) নির্বাচিত বাহকদের মাধ্যমে তাঁর প্রতিনিধিদের কাছে প্রেরণ করেন। ফিরিশতা জিবরাঈল আল্লাহর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর কাছে মৌলিক বিশুদ্ধতা সহকারে এসব বাণী বয়ে আনতেন। সর্বোচ্চ এবং সঠিক জ্ঞান ('ইলম) আহরণের ভিত্তিই হচ্ছে ওহী।[৭]

মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতা জ্ঞান অর্জনের একটি মাধ্যম। তবে এ ধরনের অভিজ্ঞতা সর্বদা আস্থা যোগ্য নয়। মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং ওহী ভিত্তিক জ্ঞানের মাঝে কোন রকম অসঙ্গতি দেখা দিলে অবশ্যই পূর্বোক্তটির উপর আস্থা স্থাপনে দ্বিধাগ্রস্ত হতে হবে। যতক্ষণ এটা প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিপরীতে গবেষণা ও পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত না হয়।

ইসলাম বক্তব্য, জিজ্ঞাসা, চিন্তা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করে[৮] তবে তা হতে হবে দায়গ্রহণ ও হিসাব দানের সীমাবদ্ধতার ভেতরেই। কোন সভ্যতাই উন্নতি সাধন করতে পারে না যদি তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের অপব্যবহার ও ভুল নির্দেশিত পথে অশ্লীলতা, মিথ্যাবাদ ও উত্তেজনাকর ধারণার মাধ্যমে অন্যদেরকে মানসিকভাবে আঘাত করে। মানুষের উচিত আল্লাহ যে সীমাবদ্ধতা বেঁধে দিয়েছেন তার মধ্যে থেকেই সকল শালীনতাপূর্ণ ও উপকারী বিষয়সমূহের রক্ষা করা। এখানে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১. **আল কুর'আন** : কুর'আন ইসলামী শিক্ষার স্পর্শমণি এবং একটি অসাধারণ ও অনন্য উৎস। বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং এর মাধ্যমে মানুষের শিক্ষা ও জীবন বিধানের মৌলিক কাঠামো তুলে ধরেছেন। তাছাড়া মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় সকল বিষয়ও শিক্ষার নির্দেশ রয়েছে কুর'আনে। কুর'আনের মৌলিক বিধানের পরিপন্থী কোন শিক্ষানীতি বা শিক্ষামূলক ক্রিয়াকর্ম কোনক্রমেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কুর'আনে ঘোষিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। মানুষের জীবন বিধানের একটি আদি ও অকৃত্রিম উৎস হিসেবে সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করবে আল কুর'আন।

---

৭. *কুর'আন*, ১৮: ১১০।

৮. *কুর'আন*, ২ : ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

২. **আল হাদীস** : রাসূল সা.-এর বাণী, আদেশ ও নিয়ম-নীতি ইসলামী শিক্ষার ভিত রচনা করবে। হাদীসের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী কোন শিক্ষা হবে না। হাদীসে শিক্ষা সম্পর্কে অনেক সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, যা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষানীতি ও আদর্শ স্থাপনে শেষ নবী ও খুলাফায়ে রাশেদীনগণ অনেক পদক্ষেপ রেখে গেছেন। মুসলিম সমাজের শিক্ষা কাঠামো সংগঠনে এসব অশেষ নির্দেশনা ও প্রেরণা যোগাতে পারে।

৩. **রাসূলুল্লাহ সা.-এর ক্রিয়া কর্ম**

ক. **ব্যক্তিগত জীবন বিধান ও কাজ** : রাসূল সা.-এর জীবনের আদর্শ ছিল কুর'আনের আল্লাহ নির্দেশিত প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা। তাই তাঁর পূতপবিত্র চারিত্রিক গুণ ও নৈতিকতাকে শিক্ষা জীবনের আদর্শ হিসেবে ধরে নিতে হবে। তাঁর ক্রিয়াকর্ম অতীতে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সংগঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতে তা পথ নির্দেশনা দেবে।

খ. **পারিবারিক সম্পর্ক এবং ক্রিয়াকর্ম** : তাঁর পরিবারের মহান সদস্যগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের প্রতি নির্দেশনা মুসলিম পরিবারের নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। জীবনের আদর্শগত শিক্ষার এবং দায়িত্ববোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাসূল সা.-এর ও সাহাবীদের কাজ শিক্ষার মৌলিক নির্দেশনা যোগাবে।

গ. **সামাজিক শিক্ষা** : মহানবীর সামাজিক নির্দেশনা ও ক্রিয়াকর্ম ইসলামী শিক্ষার সমাজ সংগঠনমূলক শিক্ষানীতি ও আদর্শের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। অতীতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার স্বর্ণযুগের সূচনাকালে হযরতের অনুসৃত বিধিবিধান শিক্ষার আদর্শ ও উৎস হিসেবে কাজ করে। বদরের যুদ্ধে বন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে শিক্ষা দানে নিয়োগ একটি অনন্য ও অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত।[৯]

ঘ. **রাষ্ট্র-জাতীয় শিক্ষা** : শেষ নবীর জাতীয় শিক্ষার মূলনীতি কুর'আন নির্দেশিত পথে পরিচালিত। শিক্ষাকে পৃথক করে দেখা হতো না। শাসন কার্যের সাথে শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। প্রতিটি প্রশাসক বা সেনাপতি ছিলেন নামাযের ইমাম বা পরিচালক। মসজিদেও ইমাম নিযুক্ত থাকতো। নামাযের নেতৃত্ব দেয়া ছাড়াও তাঁর একটি প্রধান কাজ ছিল শিক্ষা দান। কারণ শিক্ষা ব্যতীত নামায হতো না। প্রত্যেককেই শিখতে হতো। তার অর্থ ছিল শিক্ষক, বিদ্যালয়, পুস্তক, শিক্ষার্থী। প্রথমেই কেউ কুর'আন পড়তে যেতো না। তার পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা দান চলত বহু সময় ধরে। অক্ষর, শব্দ ও ভাষায় দখল আসলেই কুর'আন পড়া হতো। মহানবী সা. জীবিত থাকাকালীন এ সম্পর্কে অনেক নির্দেশ দিয়ে শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। জাতীয় শিক্ষা সংগঠনের নীতির মূল আদর্শের নির্দেশনা আসবে রাসূল সা.-এর রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মনীতি থেকে।

৪. **ইসলামের গতিশীলতার আদর্শ** : ইসলামের কিছু ব্যবস্থা আছে যা শিক্ষার বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম ও সংগঠনমূলক নীতি নির্ধারণে সহায়ক। বস্তুত ইসলাম একটি গতিশীল (Dynamic) সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তক। শিক্ষার সকল ব্যাপারে কুর'আন, হাদীস যথেষ্ট নাও হতে পারে। সামাজিক, মানবিক কল্যাণ ও জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে অনেক নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন হবে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামী শিক্ষায় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত কমিটি বা শিক্ষা কমিশন শিক্ষার উৎস ও নিদের্শনার কাজ করবে। এর জন্য নিদর্শন রয়েছে ইতিহাসে। প্রথমে আসে ইজতিহাদ। ইজতিহাদ হলো কোন সমস্যা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির সর্বোচ্চ মানসিক দক্ষতা প্রয়োগ এবং চিন্তা বা গবেষণা করে কুর'আন ও হাদীস অনুযায়ী সমাধান বের করা। আল্লামা ইকবাল ইজতিহাদকে বলেছেন গতিশীলতার নীতি। শিক্ষার উৎস হিসেবে কুর'আন ও সুন্নাহর পরই-এর স্থান হতে পারে। যেসব বিষয়ে কুর'আন হাদীসে কোন নির্দেশনা নেই সেসব বিষয়ে রাসূল সা. নিজেই ব্যক্তিগত বিচার ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ

---

৯. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন রচিত ও ড. এএইচ এম মুজতবা হোছাইন সম্পাদিত, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা. : সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃ ৪৯২।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন। মুয়ায ইবন জাবালকে ইয়ামেনের গভর্নর নিয়োগের সময় রাসূল সা. তাঁকে জিজ্ঞেস করেন কোন সমস্যা আসলে কিভাবে সমাধান করবে? মুয়ায-এর উত্তরে বলেন প্রথমে কুর'আন, পরে সুন্নাহ এবং শেষে নিজের বিবেচনায়। এতে তিনি খুবই খুশী হন। তাছাড়া জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যে কোন সমস্যার সমাধান কুর'আন ও হাদীসে না পেলে কিয়াস (কুর'আন সুন্নাহর সদৃশ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত), ইজমা' (জ্ঞানীদের সম্মিলিত মতামত), ইসতিহসান (কোন জিনিস ভালো বিবেচনা করে) প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে সমাধান দেবেন। কাজেই সমাজ, জাতি ও সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী একটি সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনায় কুর'আন ও হাদীস সমাধান না দিলে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কিয়াস, ইজমা', ইজতিহাদ প্রভৃতির সহায়তায় অগ্রসর হবেন।

ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য

ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্যই হচ্ছে একজন মানুষের বিশ্বাস, কাজ-কর্ম, সম্ভাবনা, ধীশক্তি, চিন্তা ভাবনা, মতের প্রকাশ, উচ্চাকাঙ্খা, উদ্যম এবং ঐ মানুষটির সাথে সম্পর্কিত সকল কিছুরই একটা পরিপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করা। অন্যকথায়, আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি হিসেবে একজন মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের সুষম উন্নয়ন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা জ্ঞান আহরণ, দক্ষতা অর্জন ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভের মাধ্যমে শুধু এই জীবনের সাফল্য ও সুখের লক্ষ্যেই পৌঁছিয়ে দেয় না বরং আল্লাহর অপার কৃপা ও দয়ায় আখিরাতের পথকেও সহজ করে। শিক্ষার সর্বস্তরে সকলের নিকটই এই লক্ষ্যই জানা থাকতে হবে। আল্লাহর সর্বশেষ নবী (জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক) হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নবুয়ত কাল ৬১১-৬৩২ খ্রীস্টাব্দে 'আরব দেশে এমন শত সহস্র ইসলাম চর্চাকারী মুসলমান ছিল যাঁরা কথা-কাজে ছিল একই নীতিতে অবিচল আর এই শিক্ষায় তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁরই কাছ থেকে। এই সুষম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিরা জাহেলী সমাজেরই অংশ ছিলেন। তাঁরা কেউ ছিলেন ব্যবসায়ী, কেউ ক্রীতদাস, দিনমজুর, অপরাধী, ব্যভিচারী এমনকি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, শুধু স্থানীয়রাই নয় তাদের মধ্যে বিদেশীরাও ছিল। উদাহরণ স্বরূপ : খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (৫৫৫-৬১৯ খ্রী.), আবূ বকর ইবন আবি কুহাফাহ (মৃ. ৬৩৪ খ্রী.), 'উমর ইবন আল-খাত্তাব (মৃ. ৬৪৪ খ্রী.), আবূ উবাইদাহ ইবন আল জাররাহ (মৃ. ৬৩৯ খ্রী.), খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ (মৃ. ৬৪৩ খ্রী.), আবূ সুফিয়ান ইবন হারব (মৃ. ৬৫২ খ্রী.), বিল্লাল ইবন রাবাহ (মৃ. ৬৪১ খ্রী.), ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ সা. (মৃ. ৬৩২ খ্রী.), আয়িশা বিনতে আবী বকর (৬১৩-৬৭৮ খ্রী.), খাব্বাব ইবন আল-ইরস (মৃ. ৬৫৮ খ্রী.), সুমাইয়া বিনতে খুব্বাত (মৃ. ৬২২ খ্রী.), সালমান আল-ফারসী (মৃ. ৬৫৭ খ্রী.), হামজাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব (মৃ. ৬২৫ খ্রী.), 'আব্বাস ইবন 'আবদুল মুত্তালিব (মৃ. ৬৫৩ খ্রী.), 'উসামাহ ইবন যায়দ রা. (মৃ. ৬১৪-৬৭৪ খ্রী.) হচ্ছেন ইসলামের প্রথম দিকের অসংখ্য মুসলিমদের তালিকা হতে কয়েক জন। এই সকল মহামানবই তাঁদের ঈমানী শক্তির জোরে পারস্য ও পূর্ব রোম সাম্রাজ্যকে সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইসলামের সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন।

ইসলামী সমাজের চেষ্টা করা উচিত একই সাথে ইসলামের জ্ঞান বিতরণ ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানকে কুর'আন ও রাসূল সা.-এর সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামিকরণ করতে না পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্য পূর্ণ হবে না। কেবলমাত্র ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই ইসলামী সমাজ পদ্ধতির টিকে থাকা ও তার অগ্রসরমানতাকে নিশ্চিত করতে পারে। বিশ্বব্যাপী পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার অখণ্ড অংশ হিসেবেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা উচিত।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য বহুমুখী। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. **খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের উপযুক্তরূপে গড়ে তোলা :** ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে এ পৃথিবীতে দায়িত্ব পালনের জন্য যে ধরনের যোগ্যতা, দক্ষতা ও গুণাবলী প্রয়োজন তা অর্জনই হবে শিক্ষা ব্যবস্থার মৌল-লক্ষ্য।

২. **আল্লাহর বান্দারূপে গড়ে তোলা :** আল্লাহ মানুষকে তাঁর বন্দেগী, আনুগত্য ও দাসত্ব করার লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন মানুষকে আল্লাহর খাঁটি বান্দারূপে তৈরী করা।

Dhaka University Institutional Repository

৩. **উত্তম চরিত্র গঠন :** উত্তম চরিত্র গঠন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছেঃ 'আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও'।[১০] অর্থাৎ মহৎ চরিত্রের অধিকারী হও। মহানবী সা. বলেছেন : 'আমাকে নৈতিক চরিত্র মাহাত্ম পরিপূর্ণ করে দেয়ার জন্যেই প্রেরণ করা হয়েছে।' কাজেই নৈতিক চরিত্র গঠন, সুন্দর ও মহৎ জীবন গড়ে তোলা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

৪. **তাকওয়া সৃষ্টি :** শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে করে মানুষ আল্লাহর সঠিক পরিচয় লাভ করে তাকে ভয় করতে শিখে। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্ব যেন মানুষ গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন : 'নিশ্চয় জ্ঞানবানরাই আল্লাহকে ভয় করে'।[১১] কাজেই তাকওয়া অর্জন আল্লাহ-ভীতি সৃষ্টি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৫. **দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ সাধন :** ইসলাম মানুষকে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণের শিক্ষা দিয়েছে। কুর'আনের ভাষায় : 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর আর দান কর আখিরাতের কল্যাণ'।[১২] কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যার মাধ্যমে মানুষ উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়।

৬. **ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা সৃষ্টি :** শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে করে এর মাধ্যমে একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনার উপযুক্ত কর্মীরূপে গড়ে তোলা যায়।

৭. **সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তি অর্জন :** শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্টিজগত তথা প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে জ্ঞান গবেষণা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : 'আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান-জ্ঞানবান লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।[১৩]

অন্যত্র রয়েছে 'আর পৃথিবীতে রয়েছে নিদর্শনাবলী দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্যে এবং তোমাদের সত্তারও। অতএব তোমরা কি কিছুই উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে পারো না?'[১৪]

হাদীসে আছে : 'এক ঘণ্টা কালের চিন্তা-গবেষণা এক বৎসরের 'ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।' পবিত্র কুর'আন থেকে জানা যায়', ফিরিশতাদের উপর হযরত আদম 'আ.-এর শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষায় সৃষ্টি বস্তুসমূহের নাম (অর্থাৎ বস্তুর পরিচয়, গুণাবলী ইত্যাদি) জানার বিষয়টি পেশ করা হয়। অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা এও জানিয়েছেন যে, পৃথিবীর সব কিছু আমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব প্রাকৃতিক জগত ও বস্তুজগতের উপর জ্ঞান গবেষণা, বস্তুর উপকারিতা অবগত হওয়া, তাকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন ও আবিষ্কার, অনুসন্ধান আমাদের দায়িত্ব। কাজেই চিন্তা-গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার জানা শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য।

৮. **জাতীয় স্বকীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও সুনাগরিক তৈরী :** ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করা। স্বীয় দেশ-যা ইসলামের আবাস ভূমি তাকে ভালোবাসা এবং দেশের একজন সুনাগরিকরূপে নিজেকে তৈরী করা। মুসলিম চেতনাবোধ জাগ্রত করাও শিক্ষার লক্ষ্য।

৯. **মানবতাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি :** ইসলাম সত্যিকার মানবতাবাদী আদর্শ। ইসলামের দৃষ্টিতে গোটা মানব জাতি এক আদম-হাওয়া থেকে সৃষ্ট। মানব জাতির বিভিন্ন গোত্র, জাতি-গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে শুধু পরিচয়ের সুবিধার জন্য। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টত্বের কিছুই নেই। ইসলামে গোত্রবাদ, বর্ণবাদ, জাতি

---

১০. কুর'আন, ২ : ১৩৮।

১১. কুর'আন, ৩৫ : ২৮।

১২. কুর'আন, ২ : ২০১।

১৩. কুর'আন, ৩ : ১৯০।

১৪. কুর'আন, ৫১ : ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িকতার কোন সুযোগ নেই। ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতাবোধ শিক্ষা দেয়। তাই ইসলামী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবতাবোধ জাগ্রত করা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা।

১০. **শরীর চর্চা ও সামরিক শিক্ষা** : ইসলাম স্বাস্থ্যরক্ষা ও সামরিক শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিক নিক্ষেপ করো না'।[১৫] অন্য আয়াতে আছে: 'তোমরা নিজদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনেক দয়াবান'।[১৬] আর রোগ-শোক ও স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা নিজেদের ধ্বংস ও হত্যারই শামিল। তাই মহানবী সা. বলেছেন : 'হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা রোগের চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করো। কেননা আল্লাহ কোন রোগেরই সৃষ্টি করেন নি যার জন্য কোন ঔষধের ব্যবস্থা করেন নি'।[১৭]

অতএব স্পষ্ট প্রমাণিত হলো স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞানার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামরিক শিক্ষার উপরও ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন মহানবী সা. বলেছেন : 'তীরন্দাজী করো ও ঘোড়ায় চড়া শিখ'।[১৮] অন্যত্র বলেছেন : 'তোমাদের কেউই যেন তীরন্দাজী খেলার ব্যাপারে গড়িমসি না করে'।[১৯] সে যুগে তীরন্দাজী ও ঘোড়া যুদ্ধের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিধায় সে বিষয়ের উপর অত্যধিক তাগিদ করা হয়েছে। কাজেই এটি স্পষ্ট যে, সামরিক শিক্ষা ইসলামী শিক্ষার একটি অত্যন্ত জরুরী দিক। মোটকথা স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শরীর চর্চা ও সামরিক শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

১১. **বিশেষজ্ঞ তৈরী** : শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষত উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দ্বীন ও সমাজের জন্য কল্যাণকর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরী করা। কুর'আনে বলা হয়েছে : 'প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না যারা দ্বীনের বুৎপত্তি লাভ করতো ও স্বজাতিকে সতর্ক করতো'।[২০]

উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, দ্বীন বিষয়ক একদল বিশেষজ্ঞ তৈরী হওয়া জরুরী। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ প্রয়োজনকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। সাথে সাথে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়েও একমত যে, সমাজ ও মানবজাতির জন্যে অন্য যেসব বিষয় প্রয়োজন ও কল্যাণকর যেমন চিকিৎসা, বাণিজ্য, শিল্পকৃষি ইত্যাদি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জনও ফরজে কিফায়াহ। তাই এসব প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরী করা জরুরী। এককথায় বিশেষজ্ঞ তৈরী করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যকে এভাবে সারসংক্ষেপ করা যায় :

১. ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে তৈরী ও প্রশিক্ষিত করা।

২. সমাজে ভালো (মারুফকে) কে উৎসাহিত ও মন্দের (মুনকার) ধ্বংস নিশ্চিত করা।

৩. একজন মানুষের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

৪. শিশুদের তাদের বয়োঃপ্রাপ্ত জীবনে দায়-দায়িত্ব, অভিজ্ঞতা অর্জন ও সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য আত্মিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, শারীরিক, মানবিক ও বাস্তবগত চিন্তাধারার উন্নতি সাধন করা।

৫. মানুষের সমস্ত প্রচ্ছন্ন ধারণার উন্নতি সাধন করা।

৬. আখিরাতের দায়-দায়িত্ব ও হিসাবের প্রতি পূর্ণ সচেতনতা এবং বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতার উন্নতি সাধন।

---

১৫. *কুর'আন,* ২ : ১৯৫।

১৬. *কুর'আন,* ৪ : ২৯।

১৭. ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল আশশায়বানী, *আল-মুসনাদ,* কায়রো : মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৯৬৭, ১ম খ, পৃ ৮২।

১৮. আবু দাউদ তায়ালিসী, *মুসনাদ,* মিসর : আল-মাতবা'আতুস সালাফিয়া, ১৩৮৯ হি. ১ম খ, পৃ ১২৯।

১৯. মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম,* দিল্লী : আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. ২য় খ, পৃ ১২৪।

২০. *কুর'আন,* ৯ : ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

৭. মানুষকে সমাজের অর্থনৈতিক ও বস্তুগত উন্নতির জন্য মানব জাতির ঐক্য ও সম্পদের পক্ষপাতহীন সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কাজ করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলা।

৮. সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা, ইকোলোজিক্যাল ক্ষতি করা ও সৃষ্ট প্রত্যেকটি জীবের ভালোর রক্ষাকবচ হিসেবে সামাজিক দায়-দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যাওয়ার ধারণাগত উন্নতি সাধন করা।

৯. জনগণ ও সমাজের মহত্ত্ব কল্যাণের সর্বোচ্চ লক্ষ্যকে চরম উৎকর্ষতা দানে সকল ভালো কাজের প্রতিযোগিতায় উৎসাহ যোগানো।

১০. শিশুরা সুযোগ-সুবিধার সমভাগাভাগি, নিরপেক্ষতা, ন্যায়বিচার, ন্যায্য ব্যবহার, ভালোবাসা, যত্ন, স্নেহ, স্বার্থহীনতা, সততা, বিনয়, ন্যায়পরায়ণতা এবং কঠিন নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে বড় হবে এর নিশ্চয়তা বিধান করা।

১১. জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল ধারণা ও জ্ঞান অর্জন ইসলামী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

১২. জড় ও আত্মার সঠিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যমীনে আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

১৩. ব্যক্তি প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশ সাধন সামষ্টিক জীবন ধারাকে কুর'আন ও সুন্নাহর বিধান মোতাবেক পরিচালনার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন ইসলামী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

১৪. সৃষ্টি জগতের সকল বস্তু প্রাণী পদার্থ প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদকে মানব কল্যাণের জন্য ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

১৫. বস্তুত মানুষের পার্থিব ও পরকালীন জীবনের সুখ, সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও সাফল্যের লক্ষ্যে বাস্তবধর্মী উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও বিশ্ব প্রকৃতির সকল সৃষ্টিকে মানব কল্যাণের লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালনার সার্বিক যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক পরিচালনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপযোগী সমাজ গঠন ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

১৬. ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য, ব্যক্তির নিজের প্রতি, পরিবার-পরিজনের প্রতি, প্রতিবেশী ও সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানদান ও কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধকরণ।

১৭. ইসলামী আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানদান।

১৮. ধর্মীয় বিধান পালনের কায়দা-কানুন ও নিয়ম-নীতির সাথে পরিচিত করা।

১৯. সঠিক পদ্ধতিতে জীবিকা উপার্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা এবং সে পদ্ধতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা।

২০. স্ত্রী-পুরুষের আচার-আচরণ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে তোলা।

২১. চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জন এবং সে অনুযায়ী জীবন গঠন ও মূল্যবোধ সৃষ্টি।

২২. ইসলামী বিধান অনুযায়ী সম্পদ অর্জন, অংশীদারিত্বের ব্যাপারে অর্থাৎ নিজের, প্রতিবেশীর ও দরিদ্রের হক সম্পর্কে সচেতন করা।

২৩. একজন নাগরিকের মধ্যে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে সে-সব কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করা।

২৪. ইসলামের গতিশীলতার প্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল বিশ্বে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

২৫. নবী করীম সা.-এর শিক্ষা ও ক্রিয়াকর্মকে জীবনাদর্শের মূল নিয়ামকরূপে গ্রহণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি করা।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. সৃষ্টি রহস্য ও আল্লাহর কুদরতের উপর গবেষণা করার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।

২৭. মানব কল্যাণের উপাত্ত ও উপকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে যথাযথ মানব কল্যাণের পথে ধাবিত হওয়ার যোগ্য করে তোলা।

২৮. ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনের প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের চাহিদার বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, সামাজিক জীবন ধারা ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সকল কিছুকেই ইসলামের বুনিয়াদে পরিচালিত করার উপযোগী নেতা ও কর্মী বাহিনী সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য। সর্বোপরি ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীক, ঈমান ও নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান জনশক্তি সৃষ্টি করা, নিরক্ষরতা ও জাহিলীয়াতের অভিশাপ মুক্ত সমাজ কৃষ্টিই ইসলামী শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষা মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। শিক্ষা মানুষের প্রাণশক্তি, জাতির মেরুদণ্ড, উত্থান-পতনের মানদণ্ড। জাতির উন্নতি-অবনতি শিক্ষার মানদণ্ডেই বিবেচিত হয়ে আসছে। সুশিক্ষায় জাতি অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়, দুনিয়ায় আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়। শিক্ষা আর অশিক্ষার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান বর্তমান। একজন শিক্ষিত আর একজন অশিক্ষিতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই এ প্রভেদ সম্যক উপলব্ধি করা যায়। আলো আর অন্ধকারে যেমন পার্থক্য, তেমনি পার্থক্য সুশিক্ষা আর অশিক্ষা বা কুশিক্ষার মধ্যে। শিক্ষার্জন করে একজন হন জ্ঞানী, পণ্ডিত আর শিক্ষার অভাবে অন্যজন হয় অজ্ঞ, মূর্খ। মানুষের সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা ও মননশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেছেন :

> যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?[২১]

অন্য আয়াতেও প্রশ্ন করা হয়েছে :

> অন্ধ আর চক্ষুস্মান কি সমান হতে পারে?[২২]

উপরোক্ত দু'টি আয়াতে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অশিক্ষা বা কুশিক্ষা কোনমতেই কাম্য হতে পারে না। শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিশক্তির ন্যায় আর অশিক্ষা অন্ধত্বের শামিল। অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি যেমন মানুষকে পথ চলতে সাহায্য করে, তেমনি শিক্ষা মানুষকে সঠিক জীবন-পথের নির্দেশ দেয়।

মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো, সে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি। তাই আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাস্তবায়ন ও তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠাই হলো একজন মুসলিমের গুরুদায়িত্ব। ইসলাম শব্দের অর্থই হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছার সম্মুখে সম্পূর্ণ আনুগত্যের শির নত করে দেয়া। আল্লাহর প্রত্যেকটি আদেশ তার পালনীয়, আর প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ বস্তু ও কাজ বর্জনীয়। ইসলামী শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য হলো মানুষের ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ। তার সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে সহায়তা দান, অর্থাৎ, প্রকৃত মুসলিমরূপে জীবন-যাপন ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা, যাতে মানুষের জীবনের সব দিক ও বিভাগের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভবপর হয়। সর্বোপরি আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধান এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর জীবনাদর্শের অনুসরণ দ্বারা ইহলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির পথ উন্মুক্ত করাই হলো ইসলামী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। ইসলামী শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনে সাহায্য করে। মানুষকে শুধু প্রকৃতিস্থ, স্বাস্থ্যবান ও প্রয়োজনীয় শক্তিমত্তার অধিকারী করাই ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়; বরং তার মধ্যে কল্যাণকর চেতনা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করাও এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

---

২১. *কুর'আন,* ৩৯ : ৯।

২২. *কুর'আন,* ১৩ : ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম দার্শনিক, আইনবিদ ও শিক্ষাবিদ শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর মতে, ইসলামী শিক্ষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এ শিক্ষা মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সত্যিকারের উন্নতির পথে নিয়ে যায়, যা তার সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতির দ্বারা এবং তার সামাজিক বৈশিষ্ট্য 'আদালত[২৩]-এর পূর্ণতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

ইসলামী শিক্ষা যে মানুষের মধ্যে উচ্চস্তরের নৈতিক ও মানসিক গুণাবলীই সঞ্চার করে তা-ই নয়; বরং এর একটি বৃহদাংশের লক্ষ্য হলো মানুষের স্বাভাবিক উন্নতির পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে পথ প্রদর্শন। এসব প্রতিবন্ধকতা সাধারণত শারীরিক ও জৈবিক শ্রেণীর- যা আবেগের তাড়না, বিকৃত বস্তুবাদী মানসিকতা এবং ভ্রান্ত শিক্ষার ফলেই জন্ম নিয়ে থাকে।[২৪]

তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের মূল কথা হলো মানুষের মাঝে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য গুণ সৃষ্টি করা, আর সে সঙ্গে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা, স্বাধিকারের চেতনা জাগ্রত করে মানুষকে শ্রেণী, বর্ণ, জাত, গোত্র ও গোষ্ঠী সম্পর্কীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে তুলে ধরে বিশ্বজনীন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করা। এছাড়া ইসলামের মৌল আদর্শসমূহ প্রতিপালনের মধ্যে সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক কারণও নিহিত রয়েছে। এ জন্য মুসলিম মনীষী শাহ ওয়ালী উল্লাহ র. নামাযকে বহুবিধ যৌগিক বলবর্ধক ওষুধ বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, নামায তথা ইসলামের অন্যান্য মৌলিক আদর্শের মধ্যে মানুষের সার্বিক গুণাবলীকে উজ্জীবিত করে তোলার মতো শক্তি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইসলামী শিক্ষায় কুর'আন অধ্যয়ন মানুষের ভাবাবেগকে বিশুদ্ধকরণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ছাড়াও তার বুদ্ধিবৃত্তি গঠনের সহায়ক অন্যান্য গুণাবলীর উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করে। অবশ্য কুর'আনে চিন্তা-গবেষণার বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমতের উপর গুরুত্বারোপ করে অহমিকাহীন নম্রতাপূর্ণ ভাব সহকারে আল্লাহর সৃষ্টি সম্বন্ধে উৎসুক মনোভাব নিয়ে প্রকৃতির সম্বন্ধে গবেষণা করতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামী শিক্ষা যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ, মৌলিকতা ও সৃজনশীলতার ক্ষমতা দান করে তা-ই নয়, বরং আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্নতিও ঘটায়। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ইসলামী শিক্ষার মৌলিক ক'টি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায় :

মনুষ্যত্বের বিকাশ : ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ জীবনবিধান। জীবনের প্রত্যেক দিকের পথ-নির্দেশই এ জীবনবিধানে রয়েছে। মানুষের অন্তর্নিহিত সর্ববিধ শক্তির সুষ্ঠু ও সুসমন্বিত সার্বিক বিকাশ সাধন দ্বারা ইহকালীন সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং পরকালীন মুক্তির পথ উন্মুক্ত করাই ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সা. নারী-পুরুষ সবার উপর শিক্ষা ফরজ করেছেন। সার্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করতে হবে। কারণ, মনুষ্যত্বের যথাযথ বিকাশই সমাজ-সংস্কৃতির উৎকর্ষ লাভের প্রথম সোপান। মানুষের সীমিত পার্থিব জীবনকে অনন্ত জীবনের সেতুবন্ধন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন মজীদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দৈহিক ও আত্মিক উন্নতি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী, জনকল্যাণ, জনসেবা, সামাজিক ন্যায়-নীতি, উদারতা, প্রেম, ভালোবাসা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে মানবকল্যাণে প্রয়োগ করে নিজের বিকাশ সাধন ও অন্যের বিকাশে অনুপ্রেরণা দানই ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

আধ্যাত্মিক ও বাস্তব জীবনের সমন্বয় : ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সমন্বিত উৎকর্ষ সাধন। উভয় জীবনের সমন্বিত উন্নতির প্রয়োজন সঠিক পন্থায় সম্পাদনের দিক-নির্দেশনা এ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান।

---

২৩. ইসলামী শরী'আতের ভাষায় 'আদালত হলো সর্ববিষয়ে ন্যায্যতা, মহানুভবতা, ন্যায় -নিষ্ঠতা, মহত্ত্ব, নৈতিক পবিত্রতা এবং আল্লাহ সম্পর্কে আধ্যাত্মিক গুণাবলীর সমন্বিত বিকাশ।

২৪. ড. আবদুল ওয়াহিদ, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, ঢাকা : ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০১, পৃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন : মানব জীবনের প্রধান ভূষণ ও সম্পদ হলো চরিত্র। ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করা। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর মনোনীত খলীফা বা প্রতিনিধি। আত্মবিশ্বাস ও যথাযোগ্য প্রচেষ্টা থাকলে মানুষের জীবনে সর্ববিধ গুণের বিকাশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত হতে পারে আর ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই সেটা সম্ভব।

আত্মপরিচয় ও স্রষ্টার পরিচয় লাভ : ইসলামী শিক্ষা আত্মপরিচয়, আত্মোপলব্ধি ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভের সুযোগ করে দেয়। কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া আয়াতগুলোতে এ সম্পর্কে জানার, পরিচয় লাভের নির্দেশ রয়েছে। কুর'আনের অনেক আয়াতেই স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির পরিচয় লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করে চিন্তা-গবেষণা ও সত্যোদঘাটনের পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, জ্ঞানার্জন ব্যতীত আত্মপরিচয় ও স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। রাসূল সা. ইরশাদ করেন : 'যে আত্মপরিচয় লাভ করেছে, সে আল্লাহর পরিচয়ও লাভ করেছে।'

মানব কল্যাণ ও মুক্তি : পরিবেশ-প্রতিবেশে প্রাপ্ত বস্তু নিয়ে নিজের ও জগতের অন্যান্য কল্যাণের প্রয়োগের শিক্ষাই হলো ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটায় জ্ঞান। জ্ঞান ছাড়া মানবতার কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। তাই, অধিকতর জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করাই ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন : 'জ্ঞান অনুসন্ধানকারীর পূর্ববর্তী সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর বিদ্যার্জনকালের মৃত্যু শাহাদাত লাভের সমান।'

বিজ্ঞান সাধনা : মানব জীবন সদা পরিবর্তনশীল, আরো বেশি পরিবর্তনশীল মানুষের পরিবেশ ও প্রতিবেশ। এগুলোর সঙ্গে মানব জীবনের সামঞ্জস্য বিধান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ইসলামী শিক্ষার একটি অপরিহার্য লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের মৌল-বিশ্বাসের পরিপন্থী এবং এর সঙ্গে সংঘাতশীল যে-কোন ধরনের শিক্ষা বর্জনীয়। তাই জ্ঞানার্জন, জ্ঞানের প্রসার ও প্রভাবকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং পরিবেশ-প্রতিবেশে প্রাপ্ত প্রতিটি বস্তুকে মানব জীবনের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানের কাজে লাগাতে হবে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বস্তুসমূহের মধ্যেও মানব কল্যাণ ও উন্নতির অনেক উপাদান বর্তমান। এর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন :

> 'নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত-দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।' [২৫]

তাই, মানুষের নিকটতম ও দূরতম পরিবেশের বস্তুনিচয় সম্পর্কে জ্ঞানীদের গবেষণা দ্বারা খুঁজে বের করতে হবে বস্তু ও শক্তিসমূহের কোনটিকে কিভাবে মানব কল্যাণের কাজে লাগানো যায়। আর এই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহর। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, মানুষের কল্যাণার্থে বিজ্ঞান সাধনাও ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

দ্বীনের পুনর্গঠন : সমাজ জীবনে ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে পুনর্জীবন দানও ইসলামী শিক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য। সমাজ জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনবিধান হিসেবে ইসলাম সমাজজীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে তবেই ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশ ও বিস্তার লাভ করতে পারে। এক মুসলমানের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অন্যকে শিক্ষাদান করা তার নৈতিক দায়িত্ব। যে শিক্ষার দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হয় না, সে শিক্ষা যেমন মূল্যহীন, তেমনি কোন বিদ্বজ্জনের শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যাবত্তা দ্বারা যদি দেশ-জাতি উপকৃত না হয়, কোন প্রকার কল্যাণ লাভ না করে, তবে সে ব্যক্তিরও কোন মূল্য নেই। তাই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বীনের পুনর্জীবনকল্পে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালাবে। তবেই দেশ-জাতি তার বিদ্যাবত্তা থেকে উপকৃত হবে এবং তার শিক্ষার্জন সার্থক বলে পরিগণিত হবে। দ্বীনের পুনর্জীবনের জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা ওয়াজিব।

পার্থিব সুখ-শান্তি লাভ : পার্থিব জীবনে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে, আর সমাজজীবনে সব মানুষই সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন-যাপন করতে চায়। শিক্ষা ও জ্ঞান মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করে। মানুষ

---

২৫. *কুর'আন*, ৪ : ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

নিজ বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানবলে আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদরাজি কাজে লাগিয়ে নিত্য-নব আবিষ্কারের মাধ্যমে নিজের জন্য, দেশ ও জাতির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে পারে, দেশবাসীর জন্য জীবিকা অর্জনের বহুমুখী পন্থা উদ্ভাবন করে দেশ থেকে বেকারত্বের অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার মূলোৎপাটন করতে পারে।

চূড়ান্ত লক্ষ্য : জ্ঞানার্জনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন : 'প্রথম জ্ঞান আল্লাহকে জানা এবং শেষ জ্ঞান তাঁর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা'। আল্লাহর অপার শক্তি, কুদরত, সৃষ্টিকৌশল তথা আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে জেনে এবং তাঁর সৃষ্টির পরিচয় লাভ করে তাঁর কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার নামই হলো ইসলাম। এটা বিদ্যার্জন ব্যতীত আদৌ আশা করা ঠিক নয়। অতএব সৃষ্টির সেরা মানব জাতি জ্ঞানলাভ করবে, মহান স্রষ্টা সম্পর্কে জানবে এবং তাঁর সৃষ্ট বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে তাঁরই কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে- এটাই স্বাভাবিক।[২৬] এই স্বাভাবিকতার জ্ঞানবোধ সৃষ্টি করবে মূলত ইসলামী শিক্ষা। এ নিরিখেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বিচার্য।

ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

১. **তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা :** ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতেই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

২. **আধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয় :** ইসলাম যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলে তা নিছক আধ্যাত্মবাদী ও ধর্মীয় নয় আবার বস্তুতান্ত্রিকও নয়। ইসলাম দেহ ও আত্মার উভয়ের বিকাশ ও কল্যাণের কথা বলেছে। বস্তুত শিক্ষা ব্যবস্থা উভয়দিকের সমন্বিত হতে হবে।

৩. **ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের সমন্বয় :** ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এতে উভয় জগতের কল্যাণের দিকটি সামনে রাখা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে।

৪. **জীবনের অখণ্ডতা ও অবিভাজ্যতা ভিত্তিক শিক্ষা :** ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন অখণ্ড ও অবিভাজ্য। পরস্পর সম্পর্কহীন মানব জীনের ভাগ বিভক্তি ইসলাম সমর্থন করে না। তাই শিক্ষা ব্যবস্থা অখণ্ড জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদাকে সামনে রেখে প্রণীত হতে হবে।

৫. **ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয় :** ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা একদিকে যেমন ব্যক্তির নৈতিক আধ্যাত্মিক বুদ্ধিবৃত্তিক দৈহিক বিকাশ ও কল্যাণের প্রয়াসী তেমনি সমাজের কল্যাণের উপরও জোর দিয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের সমন্বয় সাধন ইসলামী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৬. **জীবনমুখী :** ইসলাম জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলে। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। জীবন ও সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামে নেই। ইসলাম সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তিকে গড়ে তুলতে চায়। অর্থাৎ ইসলাম জীবনাশ্রয়ী ও জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবক্তা।

৭. **ওহী ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমন্বয় :** ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ওহী। সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও বিকাশ ইসলামী শিক্ষার অঙ্গ। উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি নয় বরং সমন্বয় সাধনই ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

৮. **পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রাধান্য :** ইসলাম ওহী ভিত্তিক আদর্শ হলেও বৈষয়িক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদির উপর জোর দিয়েছে। এক্ষেত্রে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। যেমন মহানবী সা. বলেছেন, 'দুনিয়ার বিষয়ে তোমরাই ভালো জানো।' কাজেই বস্তুগত বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যুক্তি প্রয়োগ ইসলামী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

---

২৬. আঃ খাঃ আবদুল মান্নান, *শিক্ষার ইতিহাস ও শিক্ষানীতির মূলকথা*, ঢাকা : তা বি, পৃ ৩৫-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

৯. **সার্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষা** : ইসলাম নির্দিষ্টমান পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। সার্বজনীন ও বৈষম্যহীন এক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবক্তা ইসলাম। ইসলামের শিক্ষা নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সবার জন্য উন্মুক্ত।

১০. **কল্যাণকর সমস্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের সমন্বয়** : ইসলাম শিক্ষার ব্যাপক ও বিশাল ধারণা পেশ করেছে। সেক্ষেত্রে ইসলাম কোন প্রকার সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেয় নি। যেখানেই প্রকৃত ও কল্যাণকর জ্ঞানের সন্ধান মিলবে সেখান থেকে তা আত্মস্থ করতে হবে। মহানবী সা. বলেছেন : 'হিকমতের কথা জ্ঞানীর (অপর বর্ণনায় মোমেনের) হারানো সম্পদ। সুতরাং যেখানে বা যার কাছেই পাবে সেই তার উত্তরাধিকারী'- (তিরমিযী ও ইবন মাজা) অর্থাৎ সমস্ত কল্যাণকর বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা কর্তব্য। তা যেখানেই থাকুক না কেন মুমিনগণই তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় কল্যাণকর জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমন্বিত করে নিতে হবে।

১১. **জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন** : ইসলাম শুধু নিছক শিক্ষার কথা বলে না বরং তা বাস্তবে অনুশীলনের কথা বলে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে শিক্ষা ও বাস্তবায়ন অনুশীলন যুগপৎ সম্পন্ন হয়। শিক্ষাবিহীন আমল আর আমল বিহীন শিক্ষা ইসলামে গ্রহণীয় নয়। তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা জীবন গঠনের শিক্ষা ব্যবস্থা।

১২. **পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা** : ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। সমাজের সার্বিক চাহিদা পূরণ ও সমগ্র মানবিক গুণাবলী এবং বৃত্তির বিকাশের সুযোগ ইসলাম প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে। ইসলামী শিক্ষা ছাড়া কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই পূর্ণাঙ্গ নয়, হতে পারে না।

১৩. **একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা** : ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা একমুখী একটি ব্যবস্থা। ইসলাম জীবনের যেমন দ্বৈততা বিভাজ্যতা স্বীকার করে না তেমনি ধর্মীয় ও স্যেকুলার শিক্ষার নামে দ্বিমুখী কোন শিক্ষার স্থানও ইসলামে নেই। একই শিক্ষা কাঠামোতেই ধর্মীয় ও বৈষয়িক সব ধরনের শিক্ষার সুযোগ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে।

১৪. **যুগোপযোগী ও গতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা** : ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কোন স্থবির ও সেকেলে ব্যবস্থা নয়। এটি এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা যা সার্বজনীন আদর্শ, যুগের সার্বিক ও বাস্তব প্রয়োজন এবং চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এ হচ্ছে শাশ্বত আদর্শ ও সমকালীন প্রয়োজন ও বাস্তবতার সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা। তাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা যুগোপযোগী ও গতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা।

ইসলামী শিক্ষার পরিধি

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি হওয়ায় মানব জীবনের সকল শাখার জ্ঞানই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত। ঈমান 'আকীদা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, মার্জিত আচরণ, নীতি-নৈতিকতা, ইবাদাত-বন্দেগী, তাওহীদ-রিসালাত, কুফর-শিরক, কৃষ্টি, সভ্যতা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, বিবাহ-শাদী, সৌজন্য-শালীনতা, ব্যবসায় বাণিজ্য, রাষ্ট্রদর্শন, সমাজ বিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, প্রশাসন, শিষ্টাচার, মানবাধিকার, নারীর অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, গণতন্ত্র, আইন বিচার, শাসন সকল কিছুই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।[২৭]

বিজ্ঞানের সব শাখা ইসলামী শিক্ষায়ও স্বীকৃত। রসায়ন, জীব, পদার্থ, তড়িৎ বিদ্যাসহ বিজ্ঞানের সব শাখার আলোচনা কুর'আন ও হাদীসে গুরুত্বসহ উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পরিচালনার জন্য কলা ও সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনা 'ইসলামী শিক্ষায়' যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে। পূর্ব

---

২৭. ড. আবু ইউছুফ মোঃ নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বাংলাদেশের অবদান* (১৯৭১-১৯৯৯ খ্রী.), অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আগামীর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ইসলামী শিক্ষায় ইতিহাস বিষয়কে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[২৮]

যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ মানব জাতির বিশ্বাস ও মূল্যবোধের চেতনার সাথে সাথে পার্থিব জীবনাচরণ এবং বস্তু ও আত্মার নির্ভুল পন্থা ও প্রক্রিয়া দান করেছে। নবীগণ কুটির শিল্প, পাত্র শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, বস্ত্র শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পে পারদর্শী ছিলেন। বস্তুত মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনার প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় জ্ঞানই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী শিক্ষা কাঠামো

ক. ইসলাম জড় ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তি স্বত্তাকেই মানুষ মনে করে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মাকে রূহ বলে; আর আত্মা বিবর্জিত দেহকে লাশ বলে। তাই দেহ ও আত্মার যথার্থ গুরুত্ব প্রদানই ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর মূল দর্শন।

খ. মানব সমাজে ব্যক্তি ও সমষ্টির অধিকার, স্বার্থের সংরক্ষণ, ব্যক্তি ও সমাজের সুবিচার ভিত্তিক সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় শর্ত।

গ. চিন্তা বিশ্বাস প্রত্যয় ও কর্ম এবং বাস্তব জীবনের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। তাই চাহিদা উৎপাদন, আত্মিক ও বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ সাধন ও স্ফুরণ, আল্লাহমুখী, কল্যাণধর্মী, আদর্শবাদী, সংবেদনশীল, মানবদরদী জনশক্তি সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. আত্মসচেতন, দায়িত্বশীল, জবাবদিহিতামূলক কর্তব্যপরায়ণ, ব্যক্তি স্বত্তার সার্বিক উন্নয়ন সার্বজনীন কল্যাণমুখী মানবতার মূর্ত প্রতীক, তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান বিশ্বাস ও কর্মের বাস্তব মিল ও সমন্বয় সাধনের উপযোগী জনগোষ্ঠী সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

ঙ. দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্যের বিলুপ্তির সাধন করে ধর্ম ও বাস্তব জীবনকে একই বৃত্তে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চ. এ শিক্ষার সকল বিভাগে ইসলামী দৃষ্টিকোণকে প্রাধান্য প্রদান ও ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে পুনর্গঠন ও ইসলামী জীবন চেতনার প্রভাব সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ

একটি জাতির শিক্ষার স্বরূপ সে জাতির জীবনাদর্শনের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট জাতির জীবনবোধ, জীবনাচার, জীবনের বিকাশ ও পরিণতির ভিত্তি করেই শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামো তৈরি হয়। আধুনিককালের শিক্ষাবিদদের কেউ কেউ মনে করেন, ইসলামী শিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি শাখাবিশেষ। এই শ্রেণীর শিক্ষাবিদদের মতে, এ শিক্ষা ব্যক্তি জীবনের একটি অংশের সাথেই সম্পৃক্ত, ব্যক্তির গোটা জীবন এই শিক্ষার আওতায় আসে না। বলা বাহুল্য, ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কিত এ ধরনের ধারণা প্রাক-ইসলামী যুগের একটি বিশেষ চিন্তা থেকেই উৎসারিত। আর তা হচ্ছে জীবন লোকায়ত ও ধর্মনিরপেক্ষ। তাই শিক্ষার অধিকাংশ পর্যায়ই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে এর সামান্য অংশই সম্পর্কযুক্ত।

শিক্ষা সম্পর্কিত এ ধরনের অভিমত ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ, ইসলাম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন-বিধান। মানব জীনের প্রতিটি বিভাগ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা তথা জীবনের সর্বদিক সম্পর্কেই ইসলামের বিধান রয়েছে। ইসলাম সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান দিতে পারে। এ জন্য এই বিধানের পরমুখাপেক্ষিতার কোন অবকাশ আদৌ নেই।

---

২৮. অধ্যাপক মাওলানা এ কিউ এম ছিফাতুল্লাহ, 'ইসলামী শিক্ষা : বক্ষ সংকোচন ও নিরসন', *মাসিক দারুস সালাম*, ৩য় বর্ষ ২য়-৩য় সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০০, পৃ ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম মানব সৃষ্টি ও মানব প্রকৃতির বিকাশ, চলমানতা, যুগ চাহিদা সম্পর্কে একটি নির্ভেজাল স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। বিশ্ব স্রষ্টা মহান রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সেরা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। মহান আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছা তথা আদেশ-নিষেধের বাস্তবায়নই হলো মানবতার ধর্ম। মানুষ এই দায়িত্ব পালনে যদি কৃতকার্য হয়, সফলতা লাভ করে তা হলেই তার জীবন সার্থক। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ একটি জটিল সৃষ্টিও বটে। তিনি মানবের মাঝে অনন্ত সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে রেখেছেন। সেই প্রতিভার বিকাশ ও প্রকাশে শিক্ষার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। সে জন্য প্রয়োজন সঠিক পথ-নির্দেশনাসম্বলিত বিধি-বিধানের। মহান রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা হযরত আদম আ. থেকে আরম্ভ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত এক বা দুই লক্ষাধিক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষকে সঠিক পথ-নির্দেশ করার জন্য। তাঁদেরকে দেয়া হয়েছিল ১০৪ খানা কিতাব ও সহীফা। এগুলো ছিলো আসমানী সংবিধান। এর আদলেই বনী আদমের জীবন পরিচালনা অপরিহার্য ছিলো, আছে, থাকবে। দুনিয়াতে শুরু থেকে নবী-রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ধারা চলে আসছিলো। হযরত আদম আ.-এর সময়ে ইসলামী শিক্ষার সূচনা ও হযরত নূহ আ.-এর সময়ে এটি বাস্তবায়িত হলেও সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী-রাসূল হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়ত কালীন। আল্লাহ্ তা'আলা দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে তাঁর হাবীবের উপর নাযিল করেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ আল-কুর'আন। এই গ্রন্থকেই তিনি মানবজাতির জন্য জীবন-বিধান হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন, আর ইসলামকে করেছেন মানুষের জন্য মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন পদ্ধতি। কুর'আন হচ্ছে সেই জীবন-বিধানের প্রধান উৎস। সুতরাং ধর্ম জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলাম ব্যতীত জীবন সুন্দর ও সমুজ্জ্বল হতে পারে না। জীবন ও ইসলাম এ দুটোর একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা যায় না। মুসলমানের জীবন কুর'আন হাদীসে বর্ণিত বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হবে। আমৃত্যু মানব জীবন ইসলামী অনুশাসনের অধীন। দৈনন্দিন জীবন-যাপন পদ্ধতি থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়-এককথায় জীবনের সব দিকই ইসলামী বিধি-বিধানের অধীনে পরিচালিত হওয়াই আল্লাহর নির্দেশ।

দুনিয়াতে মানুষ কর্মশীল। কাজই মানুষের জীবন। তাই, জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেকেরই একটা না একটা অবলম্বন রয়েছে। সে অবলম্বন বা বৃত্তি মানব জীবনের সঙ্গে সংযোজিত। এটা জীবনের এক অঙ্গ। সুতরাং মানব জীবন কেমন হবে, কিভাবে পরিচালিত হবে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বা কি, মানুষের দাবীই বা কিসে পূরণ হতে পারে, মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তিই বা কিভাবে অর্জিত হতে পারে-এমন সব প্রশ্নের জবাবদানই হলো দ্বীনি শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ।

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে দুনিয়ায় তাঁর খলীফা হিসেবে এ জন্য পাঠিয়েছেন যে, তারা দুনিয়াতে তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাস্তবায়ন করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। এই গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-বিবেচনা এবং জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য দান করেছেন। প্রকৃতিগত এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই মানুষ অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ-সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

জ্ঞান মানুষের অমূল্য সম্পদ। এর মাধ্যমেই আদিমানব হযরত আদম আ. ফিরিশতাকুলের মোকাবিলায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যথারীতি বজায় রাখতে সমর্থ হন। সে জন্য আল্লাহ তা'আলা শিক্ষালাভ ও জ্ঞান আহরণের জন্য সব পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। একমাত্র যথার্থ জ্ঞানের আলোকেই মানুষ ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের পূর্ণ মর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। বস্তুত জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ মহান স্রষ্টার সাথে নিজের ও অন্যের সম্পর্ক অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তা'আলার যত নিয়ামত মানুষের উপর বর্ষিত হতে পারে তার মধ্যে জ্ঞান দ্বারাই হযরত আদম আ. আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি লাভ করেন। আর মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব লাভের গোড়ার কথাই হলো বিদ্যার্জন। কুর'আনে ঘোষিত হয়েছে : আর আল্লাহ আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।[২৯]

---

২৯. কুর'আন, ২ : ।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানার্জন সাধারণত পড়াশোনার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তাই, জ্ঞানার্জনের প্রথম শর্তই হলো 'পড়'। পড়ার সঙ্গে জ্ঞানার্জনের সম্পর্ক সেই আদিকাল থেকেই স্বীকৃত। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের কাছে প্রেরিত প্রথম ওহীতেই ঘোষণা প্রদান করেন :

> (হে নবী!) পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন এবং আপনার রব মহাসম্মানিত, যিনি কলম দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তা -ই শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।[৩০]

উপরে উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৃষ্টি রহস্যের প্রতিও ইঙ্গিত দিয়েছেন। মানুষ প্রথমে কোন অস্তিত্বসম্পন্ন জীব ছিল না। অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকেই সে অস্তিত্ব লাভ করে পূর্ণাঙ্গ মানুষের রূপ লাভ করেছে। তাই, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাকেই প্রথম জ্ঞান আহরণ করতে হবে। স্বীয় অস্তিত্বের জ্ঞান কারো অর্জিত হলে সে মানুষ কোন অবস্থাতেই অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার দ্বারা স্বীয় মনুষ্যত্বকে কলুষিত করতে পারে না। আর ইসলামী শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নৈতিক শিক্ষাদান এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা।

অতএব, নির্ভুল-নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারাই এই যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব। এর জন্য মানুষকে অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান সূত্রেরই শরণাপন্ন হতে হবে।

সৃষ্ট জগত আল্লাহর মহাকুদরত, আর জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। গোটা সৃষ্ট জগতই সীমাহীন রহস্যের ভাণ্ডার। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্বপ্রকার সৃষ্টিই গভীর রহস্যের জালে আবৃত। অনেক কিছুই মানুষের অজানা আর মানুষ ইচ্ছা ও চেষ্টা করলেই সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে না। মানুষের এই অসহায়ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ ঘোষণা করেন :

> আল্লাহ মানুষকে তা-ই শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।[৩১]

এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত অর্থেই মানুষের জন্য কল্যাণকর জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য সূত্র একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান। এ জন্যই ঘোষিত হয়েছে :

> যাকে হিকমত তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, তাকে সর্বোত্তম সম্পদই প্রদান করা হ য়েছে।[৩২]

জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ সম্ভব। যথার্থ শিক্ষা লাভ করা ছাড়া জ্ঞানের পরিপক্কতা, পরিপূর্ণতা আসে না। তাই কুর'আন ও হাদীসের অনেকাংশেই বিদ্যার্জনের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তাকিদ দেয়া হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত 'ফরয' শব্দটি ইসলামী শরী'আতে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে : ১. ফরযে আইন ও ২. ফরযে কিফায়াহ। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত অপরিহার্য করণীয় ও সমষ্টিগত অপরিহার্য করণীয়। ফরযে আইনের অন্তর্গত হলো নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রাত্যহিক জীবনের জন্য জরুরী সর্ববিধ বিষয়ের জ্ঞানার্জন। যেমন- নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, পবিত্রতা অর্জন, হালাল-হারাম, চারিত্রিক গুণাবলী ও বান্দার হক এবং ইসলামী শরী'আতের মৌলিক 'আকীদা ও ঈমানের বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। বলা যায়, পার্থিব জীবনের যে-সব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে পরকালে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে-সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ফরযে আইন।

ইসলামে ঈমান, 'আকাঈদ, 'ইবাদাত, পারস্পরিক লেন-দেন, সামাজিক লেন-দেন, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ এবং দেশ ও জাতির উন্নয়ন বিষয়ক অর্থনৈতিক, শিল্পসংক্রান্ত, কারিগরি, কৃষি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করা হলো ফরযে কিফায়ার অন্তর্গত। এটা সবার উপর সমভাবে ফরয নয়; বরং

---

৩০. *কুর'আন*, ৯৬ : ।

৩১. *কুর'আন*, ২ : ২৬৯।

৩২. *কুর'আন*, ৯৬ : ৫।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের কিছুসংখ্যক লোক এসব উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করলেই অন্যরা এসব জ্ঞানার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

বিদ্যার্জন সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শরী'আতসম্মত পন্থায় হতে হবে এবং অর্জিত জ্ঞান হবে শরী'আতের জ্ঞানসম্বলিত অথবা মানুষের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কোন জীবনের জন্যই প্রয়োজনীয় নয় তা অর্জনে অযথা সময় ব্যয় মূল্যবান সময়ের অপচয় মাত্র। তদুপরি ইসলামী শরী'আতসম্মত পন্থায় জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করা না হলে হিতে-বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। দ্বীনি ইলমই হোক আর পার্থিব ইলমই হোক, তা অর্জনের পদ্ধতি শরী'আতসম্মত হতে হবে।

দ্বীনি ইলম শিক্ষার উপর এর স্থায়িত্ব, কল্যাণ ও উন্নতি নির্ভরশীল। তাই দ্বীনি 'ইলম অর্জনেও মানুষকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। 'ইলম অর্জনে দ্বীনি 'আলিমের দ্বারস্থ হতে হবে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন :

> নিশ্চয়ই এ জ্ঞানই হলো দ্বীন, সুতরাং কার কাছ থেকে তোমরা দ্বীন গ্রহণ করছো, চিন্তা -ভাবনা করো।[৩৩]

ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করলেই কারো দায়িত্ব শেষ হয় না। নিজে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের মধ্যেই দেশ-জাতির অশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কারণ, এ পন্থা ছাড়া দ্বীনি 'ইলমের প্রচার, প্রসার ও স্থায়িত্ব লাভের দ্বিতীয় কোন কার্যকর পন্থা নেই। রাসূলুল্লাহ সা. দ্বীনি 'ইলম নিজে শিক্ষা করতে ও অন্যকে শিক্ষা দিতে ইরশাদ করে বলেন :

> উত্তম সদকা বা দান হলো কোন মুসলমান দ্বীনি ইলম শিক্ষা করবে, অতঃপর সে ইলম তার অপর ভাইকে শিক্ষা দেবে।[৩৪]

বিদ্যার্জনের প্রতি আরও উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

> তোমরা দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞানান্বেষণ কর।

অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত যেন জ্ঞানান্বেষণে কোন ধরনের বিরতি না পড়ে; বরং অবিচ্ছিন্ন ধারায় এই মহৎ কর্মটি চালিয়ে যেতে হবে। এর মাধ্যমেই সাফল্য আশা করা যেতে পারে। বিদ্যা তথা দ্বীন-দুনিয়ার ইলম ব্যতীত কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারে না, আর সীমিত জ্ঞান দ্বারাও আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে ইলম বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা শিখিয়েছেন এভাবে :

> হে নবী! আপনি বলুন : ওগো প্রভু, আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।[৩৫]

মানুষকে সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় দ্বীনি 'ইলম এবং পরবর্তীতে দুনিয়াবী 'ইলম অর্জন করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে, যাতে কোন দিকই উপেক্ষিত না হয়, আর দুনিয়ার জীবন পরকালীন জীবনের প্রস্তুতি ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্বাস জন্মে এবং তা মনে বদ্ধমূল হয়। কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে জীবন-যাপন করলে মানুষ এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে সে সম্পর্কে পথ-নির্দেশ দানই হলো ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ। বলা বাহুল্য, ইসলামী শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ মহৎ লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারে।

---

৩৩. মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশায়রী : প্রাগুক্ত, পৃ ২১।

৩৪. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *মেশকাত শরীফ*, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৪, ২য় খ, পৃ ৩০।

৩৫. কুর'আন, ২০ : ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যায়, ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেথোডিস কলেজ, প্রটেস্ট্যান্ট কলেজ, ট্রিনিটি (ত্রিত্ববাদ) কলেজ, জুয়িস স্কুল-কলেজ ইত্যাদি থাকলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না। মুসলমানদের স্বকীয়তার জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন অত্যধিক।

যে কোন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা সে জাতির বিশ্বাস, জীবনাচার ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে, পরিচর্যা করে এবং নতুন প্রজন্মকে সে বিশ্বাস ও আদর্শের আদলে গঠন করে। এদেশের ৯০% ভাগ মানুষ মুসলমান। কাজেই, শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের ৯০% ভাগ মানুষের মন-মানস, বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতিফলন ও পরিচর্যা হওয়াটাই যুক্তির দাবী।

উল্লেখ্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মাদরাসাতেই লেখাপড়া শুরু করেন। মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব ছিল বলেই তাঁর লেখায় এত 'আরবী, ফারসী শব্দের সুন্দর প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। অতীতের মাদরাসাগুলো থেকেই ইবনে সিনা, ওমর খৈয়ামের জন্ম হয়েছিলো। এমনকি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স থেকে ছাত্র এসে মুসলিম স্পেনের মাদরাসার ছাত্র হয়েছিলেন, কারণ স্পেনের মাদ্রাসাই তখনকার অক্সফোর্ড-ক্যামব্রিজ-হার্ভাডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে ছিল। ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করা দ্বিতীয় সিলভেস্টার (৯৫০-১০০০ খ্রীস্টাব্দ) কর্ডোভার মাদরাসায় শিক্ষিত হন।

মাদ্রাসা-ই-আলীয়া প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে এ কথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, ইংরেজরা ইসলাম মুসলমানদের ভালোবেসে কলকাতা আলীয়া প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দেয় নি। বরং বরাবরই ইংরেজরা মুসলমানদের পক্ষ হতে জিহাদ পরিচালনার ভয়ে এবং হঠাৎ রাজনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টির শংকায় ছিল। আর তাই সার্বক্ষণিক তদারকি ব্যবস্থা হিসেবে মাদষাসার প্রিন্সিপাল দায়িত্ব ইংরেজদের হাতে ন্যস্ত রেখেছিল। তিনি দেখতেন প্রশাসনিক দিক আর একাডেমিক বা দীক্ষার ব্যাপারটি ন্যস্ত ছিল সবচেয়ে অভিজ্ঞ 'আলিমের উপর। তার উপাধি ছিল হেড মাওলানা। বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট এরশাদের শাসনামল পর্যন্ত মাদ্রাসায় হেড মাওলানার এ পদবী চালু ছিল, যা বর্তমান ভাইস-প্রিন্সিপালে রূপান্তরিত হয়েছে। মাওলানা সাত্তার কৃত 'তারিখে মাদ্রাসা আলীয়া' অধ্যয়ন করলে ঐতিহাসিক সত্য তথ্য পাওয়া যাবে। কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটটি মাওলানা আবদুস সাত্তার উর্দু ভাষায় প্রণীত গ্রন্থে তুলে ধরেছেন এভাবে :

> গভর্নর (লর্ড হেস্টিংস) নিজে বোর্ড অব ডাইরেক্টরের ১৭-৮-১৭৮১ তারিখে প্রদত্ত এক পত্রে এ সম্পর্কে বলেছেন যে, ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একদিন কলকাতার শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি দল আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। মজদুদ্দীন নামে একজন অসাধারণ জ্ঞানী, পণ্ডিত বিবিধ বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি যিনি ক'দিন যাবত এখানে তশরীফ এনেছেন, তাকে কলকাতায় থাকতে দেয়ার জন্য তারা আমার নিকট আবেদন করেন। তিনি একটি ইসলামী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষা ও যেগুলোতে তার দক্ষতা রয়েছে তা মুসলমানদের শিক্ষা দিবেন। আরও জোর দিয়েছেন যে, এ ধরনের বিদ্যায়তন নিছক শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরী তা নয়, বরং এ জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারের জন্য এমন দূরদর্শী ও শিক্ষিত যুবক প্রয়োজন, যারা ফৌজদারি আদালতে জজ এবং আদালতে মুন্সেফ ও জুরির দায়িত্ব পালন করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদের জাতীয় লোকদের প্রশিক্ষণদানের প্রয়োজন রয়েছে ফিকহ ও উসূলে ফিকহতে (ইসলামী আইনশাস্ত্রে) দক্ষতা অর্জনের। কারণ বিগত দিনের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রয়োজনের সময় এসব লোক পাওয়া বড়ই মুশকিল হয়।[৩৬]

এ প্রেক্ষাপটেই কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসা তথা 'আলীয়া মাদ্রাসাসমূহের গোড়াপত্তন হয়। এর ১০০ বছর পর দেওবন্দ মাদ্রাসা তথা কওমী মাদ্রসাসমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইংরেজদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্থ মুসলিম সিপাহসালার 'আলিমগণ সমরকৌশল পরিবর্তন করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির রণাঙ্গন খোলেন এসব মাদ্রাসার মাধ্যমে।

---

৩৬. আবদুস সাত্তার, তারিখ-ই-মাদ্রাসা আলীয়া, ঢাকা : ১৯৫৯, পৃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

নিরক্ষরতা দূরীকরণে মাদ্রাসা-মক্তবগুলোর ভূমিকা স্বীকৃত। 'আল্লামা ইকবাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও মাদ্রাসার পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেন :

> এ মক্তব মাদ্রাসাগুলোকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। গরীব মুসলমানের ছেলেরা এগুলোতে পড়ছে, পড়তে দাও। এ মোল্লা-ফকীরগুলো যদি না থাকে তবে যা হবে, আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, ভারতবর্ষের মুসলমানরা যদি মক্তব-মাদ্রাসাগুলোর প্রভাব থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে তবে ফলাফল ঠিক তা-ই হবে যা হয়েছিল গ্রানাডা ও কর্ডোভায়। সুদীর্ঘ আটশ' বছরের মুসলিম শাসন সত্ত্বেও আজ সেখানে ধ্বংসাবশেষ আলহামরা ও বাবুল খাওয়াতিনের নিদর্শন ছাড়া ইসলামের অনুসারীদের ও ইসলামী সভ্যতার কোন নিদর্শন অবশিষ্ট নেই। অনুরূপ, এ মক্তব, মাদ্রাসাগুলো না থাকলে ভারতবর্ষে আগ্রার তাজমহল আর দিল্লীর লালকেল্লা ছাড়া আটশ' বছরের মুসলিম শাসন ও মুসলিম সভ্যতার কোন নিদর্শনই খুঁজে পাওয়া যাবে না।[৩৭]

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঈমানের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর উপরই (তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত) গড়ে তোলা অত্যাবশ্যকীয়। আমাদের জীবনের সর্বত্রই এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে- সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শারীরিক, আত্মিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে। এই ধর্মহীন ও মূল্যবোধহীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালিয়ে যেতে প্ররোচিত করার মাধ্যমে আমাদের এই সংকটাবস্থাকে আর দীর্ঘায়িত করা উচিত হবে না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে ঈমান এবং মূল্যবোধে পরিপূর্ণ করতে হবে। প্রয়োজনীয়তার উপর আস্থা বিশ্বাস ছাড়া কোন শিক্ষাই অর্থপূর্ণ হয় না এবং কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই হিতকর হয় না যদি না তা একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়াতে পারে এবং গভীরভাবে লালন করতে পারে এর সততা, ন্যায়পরায়ণতা, স্বার্থহীনতা, সামাজিক কল্যাণে সহযোগিতা ও প্রবল দায়বদ্ধতা এবং অন্যের প্রতি সেবা করার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে। যদিও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এসব মূল্যবোধের লক্ষ্যের কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে তথাপিও তাদের এই পার্থিব পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এ সকল লক্ষ্য ভিন্ন চরিত্রেরই প্রকাশ করে আর তাই এই পদ্ধতিতে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে হলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই হবে লক্ষ্যে পৌঁছার একমাত্র বাহন।

---

৩৭. এম রহমান, 'ইকবাল দেশে-বিদেশে', *মাসিক মুসলিম ডাইজেস্ট*, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : দুই

হযরত মুহাম্মদ সা.-এর যুগে ইসলামী শিক্ষা

শিক্ষা মনুষ্যত্ব বিকাশের মাধ্যম, আত্মোপলব্ধির চাবিকাঠি, আত্মবিকাশ ও সুকোমল বৃত্তির পরিস্ফুটন ও জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের দিক দর্শন। বহু শতক ব্যাপী অজ্ঞানতা ও বর্বরতায় নিমজ্জিত মানব সমাজকে নৈতিক শিক্ষার পবিত্র স্পর্শে সুসভ্য জাতিতে পরিণত করতে এগিয়ে এসেছিলেন হযরত মুহাম্মদ সা.। মানব জাতিকে উন্নত ও সভ্য করার লক্ষ্যে ওহী ভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণে উজ্জীবিত করে জীবন ও আলোকের পতাকা উত্তোলনের প্রয়াসে তিনি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন।[৩৮] শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর ওহী ভিত্তিক শিক্ষাই মানুষকে আকাঙ্খিত শান্তি ও প্রগতির সন্ধান দিতে পারে এবং আদর্শবান, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, যার উজ্জ্বল নমুনা ও অনুপম দৃষ্টান্ত মহানবী সা.-এর সাহাবায়ে কিরাম।[৩৯]

আল্লাহর পক্ষ হতে হেরা পর্বতের চূড়া বেয়ে নেমে আসা ইসলামের সর্বপ্রথম বাণী ছিল 'ইকরা' পড়। কোন জাতিকে একটি নির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হলে সে জাতির লোকদের ব্যাপক হারে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে। সমাজের লোকগুলোকে সুশিক্ষিত করে তুলতে না পারলে তাদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন ও উন্নতি না হলে সার্বিক উন্নতি সাধিত হলেও মানুষের কোন কল্যাণ হবে না। বস্তুত মানব জাতিকে মুর্খতার অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্যই রাসূল সা.-এর আবির্ভাব হয়েছিল।[৪০] কুর'আনের প্রথম বাণী 'পড়'র[৪১] দ্বারা জ্ঞানের আলো প্রজ্জলিত করার প্রতি তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। কুর'আন ছাড়া বিশ্বের অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থ শিক্ষার প্রতি এতবেশী গুরুত্ব আরোপ করে নি।

ইসলামী শিক্ষার সূচনা

পৃথিবীতে মানুষের আগমন ও ইসলামের সূচনা অনেকটা সমার্থক। হযরত আদম আ. বিশ্বের প্রথম মানব, প্রথম নবী। ধর্মবিশ্বাস তথা ইসলামের সূচনা তখন থেকেই। মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানুষের মধ্য থেকে নবী-রাসূল পাঠিয়ে মানুষকে সত্যের পথ–সহজ-সরল পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। নবী-রাসূলদের বিশিষ্ট ক্রমধারায় হযরত আদম আ.-এর পর হযরত নূহ 'আ., হযরত ইব্রাহীম 'আ., হযরত হুদ 'আ., হযরত সালিহ 'আ., হযরত লূত 'আ., হযরত শু'আয়ব 'আ., হযরত মূসা 'আ. প্রমুখের পর হযরত ঈসা 'আ. এবং শেষ নবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তাঁদের সামগ্রিক প্রচেষ্টা ছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব জাতির

---

৩৮. মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা*, মুস্তফা নূর-উল ইসলাম অনূদিত, ঢাকা : ১৯৬৯, পৃ ৩।

৩৯. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, 'হযরত মুহাম্মদ সা. ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ২৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানু-মার্চ ১৯৮৮, পৃ ৩১৬।

৪০. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও এ এস এম আলাউদ্দীন, *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৯, পৃ ৯।

৪১. *কুর'আন*, ৯৬ : ১।

Dhaka University Institutional Repository

ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি সাধন। হযরত মুহাম্মদ সা. ব্যতিরেকে অন্য নবীদের আগমন ঘটেছে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে। সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সা.-কে সর্বকালীন ও সার্বজনীন নবী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন ইসলামের উজ্জ্বল বার্তা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে তিনি যে নতুন জাতি গঠন করেছেন, তাঁদের প্রয়াসে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই আদম আ.-এর সময়ে সূচিত ইসলামের পূর্ণতা সাধিত হয় বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়ে।[৪২]

ইসলাম চিরন্তন শাশ্বত জীবন পদ্ধতি। আল্লাহর ওহী ইসলামী শিক্ষার নির্ভুল উৎস। ইসলামের সূচনা লগ্ন হতে আজ পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা বলতে শুধু আনুষ্ঠানিক জীবনের কতিপয় আচার অনুষ্ঠান ও মৌলিক 'ইবাদাতের পদ্ধতি শিক্ষাকেই ইসলামী শিক্ষা বলা হয় নি। বরং মানব জীবনে সকল সমস্যার সমাধান সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ওহী ভিত্তিক সামষ্টিক জ্ঞান লাভই ইসলামী শিক্ষার অন্ত র্গত। মানব সূচনা লগ্ন হতেই ইসলামী শিক্ষার সূত্রপাত ঘটেছে। শিক্ষার প্রথম শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ও প্রথম ছাত্র 'আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম।[৪৩]

মহানবী সা.-এর যুগে শিক্ষা

মহানবী সা. জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, 'আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।[৪৪]

মহানবী সা. মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়ের পথ প্রদর্শক ছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় তিনি ছিলেন ভূষিত। তিনি মানব জাতির চরিত্র সংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।[৪৫]

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ ও ক্ষেত্রকে কুক্ষিগত করে রাখার অপপ্রয়াস অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের একাংশের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও মহানবী সা.-এর জীবন বিধান মহান। তিনি মহানবী সা. শিক্ষা অর্জন করাকে প্রত্যেক নরনারী নির্বিশেষে সকলের জন্য ফরয বা অবশ্য কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন।[৪৬] শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বলেছেন, বিদ্যানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও মূল্যবান।[৪৭]

শিক্ষাগ্রহণ ও জ্ঞানান্বেষণের পথে যাত্রা করা আল্লাহর পথে যাত্রা করার সমতুল্য বলে ঘোষণা করায় ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজে আবিদ হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে।[৪৮] মহানবী সা.-এর পক্ষ থেকে শিক্ষাগ্রহণ ও জ্ঞান অর্জনে নর-নারী নির্বিশেষে উৎসাহ সঞ্চারের ফলেই পরবর্তী যুগে অসংখ্য মুসলিম শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী গাণিতিক, কবি প্রভৃতি মনীষীর মাধ্যমে মুসলিম সমাজ আজও স্মৃতির

---

৪২. আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর, *ইসলামের পূর্ণতা ও হযরত মুহাম্মদ সা.*, ঢাকা : পানাম প্রেস লিমিটেড, ২০০২, পৃ ৯।

৪৩. অধ্যাপক মাওলানা এ. কিউ. এম ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪২।

৪৪. *কুর'আন*, ২১ : ১০৭।

৪৫. *বুয়িছ্তু লি উতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক।*

৪৬. আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়াযীদ ইবন মাজা আল-কাবীনী, *আস সুনান*, দেওবন্দ : আল-মাকতাবা রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি., পৃ ২০।

৪৭. *হাদীস*।

৪৮. আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, দিল্লী : মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫০, বাবুল ইল্ম, পৃ ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

শীর্ষে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাদেরই নীরব অনুপ্রেরণায় ক্রুসেডোত্তর যুগে পাশ্চাত্য জাতি শিক্ষা ও জ্ঞানের ভুবনে রেনেসাঁ আনতে সক্ষম হয়েছে।[৪৯]

বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক

হযরত ইব্রাহীম ‘আ. ও হযরত ইসমাঈল ‘আ.-এর বংশধরদের শিক্ষিত ও শুদ্ধ করার জন্য তাদের মধ্য হতে একজন নবীর আগমন কামনা করে তাঁরা মুনাজাত করেছিলেন। (যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের প্রাচীর তুলেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত করো এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত সৃষ্টি করো। আমাদের ‘ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু! হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করো যে তোমার আয়াত সমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়![৫০]

হযরত ইব্রাহীম ‘আ-এর দু‘আ আল্লাহ কবুল করেন এবং ‘আরবদের শিক্ষিত ও পবিত্র করার জন্য তাদের মধ্য হতেই একজন রাসূলের উদ্ভব ঘটান। ‘আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেন।’[৫১] মহান আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল-জুম‘আতে ঘোষণা করেন, ‘তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন, কিতাব ও হিকমত। যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।’[৫২]

মহানবী সা.-কে সমগ্র মানবমণ্ডলীর শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ সংক্রান্ত আয়াতসমূহে তিনটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিবরণ পরিলক্ষিত হয় :

১. তিনি আল্লাহর হুকুম ও আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করেন এবং তাদের যৌক্তিকতা জনগণের সামনে তুলে ধরেন।

২. তিনি তাদের কিতাব এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষা দেন, যাতে তারা কিতাবের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা বুঝতে পারে। আল্লাহর আইন অনুসারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে জ্ঞানের প্রয়োজন আর তা নির্ভর করে ব্যক্তির সামর্থ ও শক্তির উপর।

৩. তাদের আচরণে অসৎ চরিত্র ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা পরিশোধন করে তদস্থলে তাদের মধ্যে সুন্দর গুণাবলী, সচ্চরিত্র এবং সঠিক আচরণ অঙ্কুরিত করেন।[৫৩]

পৃথিবীর বুকে আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আগমন হয়েছিল মানুষকে ঐ শিক্ষা দিতে যে শিক্ষা দ্বারা মানুষ পৃথিবীর বুকে আদর্শ হতে পারে এবং আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভ করতে পারে।

---

৪৯. শেখ ফজলুর রহমান, ‘সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় মহানবী সা.’, *সীরাতুন নবী সা. স্মরণিকা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ ১৯।

৫০. *কুর'আন*, ২ : ১২৭-১২৯।

৫১. *কুর'আন*, ২ : ১৫১।

৫২. *কুর'আন*, ৬১ : ২।

৫৩. আফজালুর রহমান, *হযরত মুহাম্মদ সা. জীবনী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৯, ১ম খ, পৃ ১৬৩-১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ খেলাচ্ছলে পৃথিবী সৃষ্টি করেন নি। সৃষ্টির মূলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষ তাঁরই 'ইবাদত ও গুণগান করবে। তাঁর প্রিয় হাবীবকে এজন্য রহমত স্বরূপ এবং বিশ্বশিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন।

হযরত সা. শুধু বক্তব্য রেখে মানুষকে শিক্ষা দেন নি। মহান আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কুর'আন তাঁর ছিল। সে বাণী, সে হুকুম বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি জীবনের বিভিন্ন স্তরে কাজ দ্বারা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কুর'আনের প্রতীক, কুর'আনের আদর্শ, কুর'আনের প্রতিটি বাণী নিজের জীবনে প্রতিফলিত করে বিবিধ শিক্ষা তিনি মানুষকে দিয়েছিলেন, যে শিক্ষা দ্বারা মানব দেহ, মানব মন ও মানবাত্মার উৎকর্ষ লাভ করে মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায়।[৫৪]

নবুওয়াত-পূর্ব সময়ে 'আরবদের শিক্ষা

জাহিলিয়া যুগের কবিগণ তাদের গোত্র ও গোত্রীয় বীরদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, যুগের বিবরণ, উটের বিস্ময়কর গুণাবলী এবং সর্বোপরি সুন্দরী নারী ও প্রেমিক-প্রেমিকাদের নিয়ে কাব্য ও উপাখ্যান রচনা করতেন। তাদের এসব কবিতা অজ্ঞতার যুগের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঐতিহাসিক সুয়ূতী বলেন, কবিতা আরবদের সার্বজনীন পরিচয়ের সাক্ষরিত দলিল। সুতরাং দেখা যায়, আধুনিককালের ন্যায় নির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত না থাকলেও আরবরা তখন কাব্যচর্চা ও বাগ্মিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।[৫৫]

'আরবদের মুখের ভাষা 'আরবী এবং এটা চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। 'আরবী হরফ লেখা শুরু হয় আবূ সুফিয়ানের পিতা হারব-এর আমলে। মক্কার লোকেরা এই প্রথম আরবীর লিখিত রূপ দেখতে পায়। নবী করীম সা. তখন যুবক। ঐতিহাসিকদের মতে, ইরাকের অন্তর্গত হিরার একজন অধিবাসী মক্কায় আসে এবং হারবের কন্যার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ সে হারবকে একটি গোপন সূত্রের সন্ধান দেয়। সে বলে, গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত তথ্য বা ঘটনার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলো লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা যায়। এ কৌশল শেখার জন্য সে হারবকে পরামর্শ দেয়। কুদামাহ ইবন জাফর রচিত কিতাবুল খারাজ, বালাযুরীর ফুতুহুল বুলদান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে এ ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়াত লাভের অল্প কিছুকাল পূর্বে মক্কা শহরে পড়ালেখার ব্যবস্থা চালু হয়।

মহানবী সা.-এর নবুওয়াতের পূর্বেই বেশ কিছু মহিলাও লেখাপড়ার কৌশল রপ্ত করেছিলেন। এমনি এক শিক্ষিতা মহিলার নাম শাফাদ। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্‌র কন্যা এবং উমর রা.-এর আত্মীয়া। এ শিক্ষাগত যোগ্যতার সুবাদেই মদীনার এক বাণিজ্যিক অফিসের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিলো। ইবন হাজারের বর্ণনা মতে তাঁর এ দায়িত্ব ছিল মদীনার একটি বাজারকেন্দ্রিক, যেখানে মহিলারা বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী নিয়ে বাজারে আসত। সম্ভবত তাদের বাণিজ্য তদারক করাই ছিল শাফাদের দায়িত্ব।[৫৬]

এতে প্রতীয়মান হয়, পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আবির্ভাবকালে 'আরবে পড়ালেখার ইতিহাস ছিল খুবই স্বল্প সময়ের। বলতে গেলে লেখাপড়ার চর্চা তেমন একটা প্রসার লাভ করে নি। কুর'আন শরীফকেই বলা

---

৫৪. বেগম রুনু সিদ্দিকী, 'বিশ্বশিক্ষক নবী গোলাম মোস্তফা সা.', *মাসিক তরজুমান*, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ৭৩-৭৪।

৫৫. অধ্যাপক কে আলী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, ৩৪ সং, পৃ ১৩-১৪।

৫৬. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, 'নবী যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা', মুহাম্মদ লুৎফুল হক অনূদিত, *অগ্রপথিক*, ১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৮, ঢাকা : ইফাবা, পৃ ১৪৯-১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

যেতে পারে 'আরবী ভাষার প্রথম লিখিত কিতাব। শুধুমাত্র সাবা মুয়াল্লাকাত[৫৭] এর মত কিছু কিছু লিখিত বিষয় ছিল এবং শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে এগুলো কা'বা ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হতো। অবশ্য কিছু চুক্তিপত্রও লিখিতভাবে সম্পন্ন হতো। ইবন আল নাদিম 'আল ফিরিশতায় উল্লেখ করেছেন, খলীফা আল মামুনের দরবারে একখানা পাণ্ডুলিপি ছিল। পাণ্ডুলিপি মানে এক প্রস্থ কাগজ। পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষরও ছিল খুবই নিম্নমানের। বলা হয়ে থাকে যে, এটা ছিল আবদুল মুত্তালিবের লেখা একখানা পত্র।[৫৮]

মহানবী সা.-এর যুগে 'আরবী ভাষার উন্নয়ন

মহানবী সা.-এর নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত একটি কলা হিসেবে আরবী লেখা একেবারেই নতুন ছিল এবং এর তেমন কোন প্রসার ঘটে নি। সম্ভবত এর কারণ, হিরা থেকে আসা লোকটি তার দেশের প্রচলিত হস্তাক্ষরের আদলেই আরবী লিখন পদ্ধতি লিখেছিল। হিরার লেখাপড়া হতো ২৪ বর্ণে; তদস্থলে আরবী বর্ণ হলো ২৮টি।

বিভিন্ন 'আরবী বর্ণমালার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে একমাত্র পথ হলো নুক্তা বা ফোঁটার ব্যবহার। খতীব আল বোগদাদীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ ত্রুটি অপনোদনকল্পে নবী করীম সা. প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আমীর মুআবিয়া রা. উবায়দ আল খাসানী নামের একজন লিপিকারকে ডেকে পাঠালেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দানের পর বললেন, এটাকে 'রাক্‌শ' করে নাও। লিপিকার 'উবায়দ বললেন, রাক্‌শ আবার কি? মৃদু হেসে তিনি বললেন, তিনি নিজেও নবীজীর একজন লিপিকার ছিলেন। একদিন নবীজী তাঁকে কিছু লিখতে বলার পর বললেন, এটাকে রাক্‌শ করে নাও। তিনি তখন নবী সা.-কে রাক্‌শ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। নবীজী বললেন, এটা হলো শ্রুতলিপি বা নুক্‌তা দেয়ার প্রক্রিয়া। এ থেকে বোঝা যায়, নবীযুগে আরবী লিখন প্রক্রিয়ার ফোঁটা বা নুক্‌তা প্রদানের প্রথা চালু হয়। তায়েফের শহরতলীতে আনুমানিক পঞ্চাশ হিজরীর একটি উৎকীর্ণ লিপি আবিস্কৃত হয়েছে। মুআবিয়ার শাসনামলে তায়েফের গভর্নর যে সংগ্রহশালা তৈরী করেছিলেন, উৎকীর্ণ লিপিটিও সেই সংগ্রহের মধ্যে ছিল। আবিস্কৃত এই উৎকীর্ণ লিপির কিছু কিছু বর্ণে নুক্‌তা দেয়া ছিল। তুলনামূলকভাবে এ আবিস্কারের ঘটনাটি বেশ পুরাতন।

সম্প্রতি এ সংক্রান্ত আরো কিছু প্রমাণপঞ্জী পাওয়া গেছে। এগুলো আরো সিদ্ধান্তমূলক। মিসরে কাগজ হিসেবে ব্যবহৃত কিছু চামড়া পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে বাইশ হিজরীতে উমর রা.-এর লেখা দু'খানা পত্রও রয়েছে। উল্লেখ্য, তিনি তখন মুসলিম জাহানের খলীফা। এই পত্র দু'খানাতেই নুক্‌তার ব্যবহার ছিল। এ সমস্ত আবিষ্কার থেকে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে, হযরত 'উমর রা.-এর খিলাফত কালেই আরবী বর্ণমালার নুক্‌তা ব্যবহারের বিষয়টি বেশ প্রসার লাভ করে। এতে প্রমাণিত হয়, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-এর শাসনামল বা তারও পরবর্তী সময়ে আরবী বর্ণমালায় নুক্‌তা প্রদানের রীতি চালু হওয়া সম্পর্কে যে কথা আছে, তা ঠিক নয়। নবী করীম সা. কোন পত্র লেখার পরপরই তা ভাঁজ না করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। বরং লেখাটি প্রথমে শুকাতে হবে এবং তারপরই তা ভাঁজ করতে হবে। নবী করীম সা. তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে এ পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ কখনো এমন হয় যে লেখার সঙ্গে

---

৫৭. **আস-সাবউল মুয়াল্লাকাত** : জাহিলিয়া যুগে রচিত আস-সাবউল মুআল্লাকাত বা ঝুলন্ত গীতিকা সপ্তকের প্রাচীনতম কবি হচ্ছেন ইমরুল কায়েস ইবন হাজার ইবন উমর কিন্দী (৪৮০-৫৪০ খ্রী.)। ইমরুল কয়েসসহ তুরফা, যুবাইর, লবীদ, আনতারাহ, আমর ইবন কুলসুম এবং হারিস বি হিল্লাজাহ এই মুআল্লাকাত বা ঝুলন্ত গীতি সপ্তক নামে অভিহিত করা হয়।

৫৮. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, 'নবী যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা', *অগ্রপথিক*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে কালি শুকায় না। লেখার পরপরই চিঠি ভাঁজ করলে কালি লেপটে যায়। ফলে লেখা অস্পষ্ট বা অপাঠ্য হয়ে পড়ে।

ইবন আল আসীরের সূত্রেও গুরুত্বপূর্ণ আরেকখানা হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেমন : নবী করীম সা. সীন অক্ষর লিখতে দাঁত বা শিঙ্গা বিশিষ্ট করার পরামর্শ দিয়েছেন। তা না করে সরল রেখা বা অন্য কোন ভাবে লেখা হলেই বিভ্রান্তির আশংকা থাকবে। হস্তলিপি সংক্রান্ত আরও কতক হাদীস রয়েছে। একজন তুর্কী পণ্ডিত এরূপ চল্লিশখানা হাদীস সংগ্রহ করেছেন। নবী করীম সা. প্রতিষ্ঠিত আস্ সুফফায় নিয়োগকৃত শিক্ষকগণ তাঁদের ছাত্রদের আরবী লেখার মাধ্যমে ইলম শিক্ষা দিতেন এবং ক্যালিওগ্রাফি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতেন। তাছাড়া, নবী করীম সা.-এর মক্কা অবস্থান কালে তাঁকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু দলিলপত্র লিখিতভাবে সম্পাদিত হয়েছে।[৫৯]

মক্কায় শিক্ষা বিস্তার

মহানবী সা.-এর প্রতি আল্লাহ্র সর্বপ্রথম বাণী 'পড়ুন' অর্থাৎ 'জ্ঞান অন্বেষণ করুন'।[৬০] রাসূলে করীম সা. স্বয়ং ইরশাদ করেছেন, আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।[৬১] তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ সে, যে নিজে কুর'আন শিখে এবং অন্যদের শেখায়।[৬২] তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করে তার অতীতের দোষ-ত্রুটি মুছে যায়।[৬৩] মহানবী সা. উদ্বুদ্ধ করেছেন এই বলে যে, আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে দ্বীনে গভীর জ্ঞান দান করেন।[৬৪]

মহানবী সা. হেরা গুহা থেকে ফিরে এসে খাদীজা রা.-কে ইহকাল ও পরকালের মুক্তির শিক্ষা প্রদান করেন। তারপর তাঁর পরিচারক যায়দ ইবন হারিসা, চাচাত ভাই আলী, বন্ধু আবূ বকর রা. প্রমুখকে তাঁর প্রতি ওহী ভিত্তিক সার্বজনীন শিক্ষা প্রদান করেন। প্রতিকূল পরিবেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন যার ফলে সাফা পর্বতের পাদদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রথম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৫] মহানবী সা.-এর অন্যতম কর্তব্য ছিল মুমিনদের কুরআন শিক্ষা দেয়া। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন। তবে হিজরতের পূর্বে নিরাপদে বসে নিশ্চিন্তে কুর'আন শিক্ষাদানের স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে তোলা ছিল প্রায় অসম্ভব। কারণ তখন নির্যাতন-নিপীড়ন অহরহই চলছিল। সুতরাং মহানবী সা.-এর সাহচর্যই ছিল এ যুগের সার্বক্ষণিক ভ্রাম্যমান শিক্ষাকেন্দ্র। এ সময়ে সাহাবাগণ তাঁর সান্নিধ্যে এসে কুর'আন শিক্ষা করতেন এবং অন্যদের শিক্ষা দিতেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সা., আবূ বকর রা., খাব্বার ইবনুল আরাত রা. প্রমুখ সাহাবী ছিলেন এ যুগের শিক্ষক।

মক্কায় প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষাকেন্দ্রের নাম উপস্থাপন করা যায়, মহানবী সা.-এর সময়ে এসব ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠেছিল :

---

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১-১৫২।

৬০. কুর'আন, ৯৬ : ১।

৬১. ওলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ আততিবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ,* দেওবন্দ : মাকতাবা রহীমিয়া, ১৯৭৮, পৃ ৩৫।

৬২. মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* দেওবন্দ : আল-মাকতাবা আর রহীমিয়া, ১৩৮৪ হি., কিতাবুল 'ইলম, পৃ ১৭।

৬৩. আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আততিরমিযী, *প্রাগুক্ত,* পৃ ৯৭।

৬৪. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *মেশকাত শরীফ,* ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৪, ২য় খ, পৃ ৬।

৬৫. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

১. **মসজিদে আবূ বকর রা.** : এখানে আবূ বকর রা. সালাত আদায় করতেন এবং সুমধুর কণ্ঠে কুর'আন তিলাওয়াত করতেন। এটি ছিল একটি উন্মুক্ত স্থান। আবূ বকর রা. যখন এখানে বসে সুললিত কণ্ঠে কুর'আন পড়তেন, তখন মুশরিকদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ছুটে আসত এবং মুগ্ধ হয়ে কুর'আন শুনত। এতে মুশরিকগণ ক্ষেপে ওঠে। তারা আবূ বকর রা.-এর উপর চাপ সৃষ্টি করলে তিনি বাসস্থান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ইবন দাগানা নামক এক ব্যক্তি তাঁকে বাসস্থান ত্যাগ না করার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি গৃহাভ্যন্তরে সালাত ও কুর'আন পড়া শুরু করেন। আবারো তাঁর কণ্ঠে কুর'আন শুনার জন্য মুশরিকদের স্ত্রী ও বালক-বালিকাদের ভিড় জমতে থাকে।

২. **বায়তে ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব** : ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব ইবন নাফিল ছিলেন হযরত উমর রা.-এর বোন। তিনি এবং তাঁর স্বামী সাঈদ ইবন যায়দ গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিজ নিজ গৃহে হযরত খাব্বাব বিন আরাত রা.-এর কাছে কুর'আন শিক্ষা করতেন। হযরত উমর রা. ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তরবারী হাতে বোনের বাড়ি গিয়ে তাঁর বোন ও ভগ্নিপতিকে কুর'আন পাঠরত অবস্থায় দেখতে পান। সীরাতে ইবন হিশামে আছে, এসময় খাব্বার ইবন আরাত উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কাছে একখানা সহীফা ছিল। তাতে সূরা ত্বা-হা লিখিত ছিল এবং তিনি তা তাঁদের পড়াচ্ছিলেন। সীরাত ইবন হালবিয়াহ গ্রন্থে হযরত 'উমর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. আমার বোনের বাড়িতে দুজন মুসলিমের খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তাদের একজনের নাম খাব্বাব ইবন আরাত। অপর জনের নাম আমার জানা নেই। খাব্বাব ইবন আরাত আমার ভগ্নির বাড়ীতে আসা যাওয়া করতেন এবং তাদের কুর'আন শিক্ষা দিতেন। সুতরাং বায়তে ফাতিমা বিনতুল খাত্তাবকেও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র বলা যেতে পারে।

৩. **দারুল আরকাম** : হযরত আরকাম ইবন আবিল আরকাম রা. প্রথম সারির মুসলিমদের একজন। মক্কায় সাফা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর বাড়ী ছিল। ইসলামের ইতিহাসে এই বাড়ীর গুরুত্ব অপরিসীম। এটি দারুল আরকাম নামে খ্যাত। নবুওয়াতের পঞ্চম সালে বহু মুসলিম হাবশায় হিজরত করেছিলেন। যাঁরা মক্কায় ছিলেন, তারাও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। নবুওয়াতের ষষ্ঠ সালে রাসূলুল্লাহ সা. সহ সাহাবীগণ দারুল আরকামে আশ্রয় নেন। এখানে অবস্থান করেই তাঁরা ইসলামী দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতেন। তাবাকাতে ইবন সা'দ এবং মুসতাদরাকে হাকিমে আছে, রাসূলুল্লাহ্ গোড়ার দিকে এ বাড়ীতে থাকতেন এবং এখান থেকেই মানুষকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতেন। এখানে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। দারুল আরকামে মুসলিমদের কুর'আন শিক্ষা দেয়া হতো। ইমাম আবুল ওলীদ আযরাকী লিখেছেন, এ বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ্ সা. ও তাঁর সাহাবাগণ একত্রিত হতেন এবং কুর'আন অধ্যয়ন করতেন। দাওয়াতের ফলে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে কোন অবস্থাসম্পন্ন মুসলিমের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হতো। তিনি সেখানে অবস্থান করতেন এবং আহার করতেন।[৬৬]

দারুল আরকাম[৬৭] দারুল ইসলাম এবং দারুল মুরতাবী নামেও খ্যাত ছিল। এখানে রাসূলুল্লাহ্ সা. ও সাহাবাগণ প্রায় এক মাসকাল অবস্থান করেন এবং দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন। এটি

---

৬৬. শায়খ 'আলী ইবন বুরহানুদ্দীন আল-হলবী, *আস্‌সীরাতুল হলবিয়্যা*, মিসর : মাতবা'আ মুসতাফাল বাবিল হলবী, ১৯৬৪, ১ম খ, পৃ ৩০১।

৬৭. হযরত আরকাম বাড়ীটি তাঁর পুত্রের নামে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর পৌত্র আবদুল্লাহ্ ইবন আম্মান ইবন আরকাম নিজের অংশ খলীফা আবূ জাফর আল-মনসুরের কাছে সতের হাজার দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন, খলীফা মেহদী তার দু' পুত্র মূসা ও হারুনের নামে তাদের জননী খাযরানকে এটি দিয়ে দেন। তখন এটি পুনঃনির্মিত হয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

ছিল একাধারে বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস। এখানে এসেই হযরত 'উমর রা. মহানবী সা.-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং তারা কা'বায় নামায পড়তে আরম্ভ করেন।

শিয়াবে আবূ তালিব : শিয়াবে আবূ তালিব নামক স্থানে একাধারে তিন বছর অবরুদ্ধ থাকাকালেও রাসূলুল্লাহ্ সা. কুর'আন শিক্ষাদান অব্যাহত রেখেছিলেন। সেখানে আবূ তালিব পরিবারের বাইরের লোকও অবস্থান নিয়েছিলেন।[৬৮]

মদীনায় শিক্ষা বিস্তার

নবুওয়াতের দশম সালে হজ্জের মওসুমে মদীনার খাজরাজ গোত্রের ছয়জন আনসার মক্কায় এসে ইসলাম কবুল করে মদীনায় ফিরে যান। পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবুওয়াতের ১১শ' সালে মদীনার আউস গোত্রের মোট ১২ জন আনসার মক্কায় এসে বিশ্বনবী সা.-কে জানান, মদীনায় ইসলামের দাওয়াতী কাজ চলছে। কিন্তু এ কাজ ও ইসলাম প্রচার দ্রুত এগিয়ে নেবার জন্য পবিত্র কুর'আন এবং ইসলামী নীতি আদর্শ শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁদের একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। তাঁদের এ আকাঙ্ক্ষা ও আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ সা. হযরত মুস'আব ইবন উমায়রকে মনোনীত করলেন।

মুস্'আব ইবন উমায়র ছিলেন হাশিম ইবন আবদে মুনাফের প্রপৌত্র এবং একজন প্রথম সারির মুসলমান। মুস'আব ইবন উমায়র ছিলেন মহানবী সা.-এর মনোনীত মদীনার প্রথম ধর্মীয় শিক্ষক। তিনি প্রথম বায়আতে আকাবার সদস্যগণের সাথে মদীনায় চলে আসেন এবং মদীনার তখনকার ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তি হযরত আসওয়াদ বিন জুরারাহ্ রা.-এর গৃহে অবস্থান করেন। এটা ছিল মদীনার প্রথম ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র। উল্লেখ্য, বর্তমান বিশ্বে যে ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি চালু হয়েছে, তৎকালীন যুগে এ ধরনের ব্যবস্থা ছিল না। হযরত মুসআব ইবন উমায়র রা. প্রতিদিন নিয়মানুযায়ী আনসারদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন এবং কুর'আন শরীফের বিভিন্ন আয়াত (মহানবী সা.-এর প্রতি নাযিলকৃত অংশ) পাঠ করে শোনাতেন। কুর'আন যেহেতু তাঁদের মাতৃভাষা 'আরবীতে নাযিল হয়েছে, সেহেতু তাঁরা কুর'আনের অর্থ ও মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারতেন। ফলে প্রতিদিন ২/৩ জন করে ইসলাম কবূল করতে থাকেন। এভাবে মদীনায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠা জোরদার হয়েছিল।[৬৯]

হিজরতের পর মহানবী সা. মদীনার মসজিদে সাহাবাগণকে শিক্ষা প্রদান করতেন। যাঁরা প্রিয় নবী সা.-এর মুখ নিঃসৃত কুর'আনের পবিত্র বাণী লিপিভুক্ত করতেন, তাঁদের মধ্যে হযরত মুআবিয়া রা.-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওহী নাযিলের সাথে সাথে যে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম তা লিপিবদ্ধ

বায়তুল খাযরান নামে খ্যাত হয়। অতঃপর খলীফা হারুন অর রশীদ তাঁর স্ত্রী যুবায়দার নামে ক্রয় করে বাড়ীটি ওয়াক্ফ করে দেন। এবার এটির নাম হয় দারুয্ যুবায়দা। স্থানটি মক্কার অন্যতম দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়।

৬৮. লুৎফুর রহমান ফারুকী, 'হিজরতের পূর্বে মক্কার কুর'আন শিক্ষাকেন্দ্র', *মাসিক পৃথিবী*, বর্ষ ১১, সংখ্যা ৯, জুন ১৯৯২, পৃ ২৫-২৬।

৬৯. মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, 'মদীনার প্রথম ধর্মীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকেন্দ্র', *ইসলামিক নলেজ এন্ড ডায়েরী*, ঢাকা : ১৯৯৪, পৃ ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

করতেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪২। মহানবী সা. কুর'আন শিক্ষা দেয়ার জন্য মদীনা থেকে বিভিন্ন গোত্রের নিকট শিক্ষক প্রেরণ করতেন।[৭০]

শিক্ষা-সূচী

মওলানা আবদুস সাত্তার 'তারিখে মাদ্রাসা আলীয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তৎকালীন শিক্ষাসূচীতে কুর'আন, হাদীস, অংক, ফারায়িয, বংশতালিকা ও তাজবীদ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে শিক্ষক যে বিষয়ে অভিজ্ঞ থাকতেন, তিনি সে বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। ব্যায়াম সম্পর্কেও তখন শিক্ষাদান করা হতো।[৭১] ব্যায়ামের পাশাপাশি অশ্বারোহণ, তীরন্দাজী ও অভিযানমূলক কসরতও শেখানো হতো।[৭২]

রাসূলুল্লাহ সা. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ ছিলেন। তিনি চাইতেন, মুসলমানরা এসব বিষয়ে শিক্ষালাভ করবে। কুর'আন কেবলমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস, 'ইবাদত-বন্দেগী বা নীতি সম্বলিত জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে কুর'আন মজীদে। এখানে ইতিহাস সম্পর্কে যেমন আলোচনা রয়েছে, তেমনি বর্ণনা রয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে। বিজ্ঞানের বিষয়সূচীর মধ্যে জীববিদ্যা, সমুদ্রবিজ্ঞান, জ্যোতিবিদ্যা, উদ্ভিদবিজ্ঞান, স্ত্রীরোগ বিজ্ঞান ইত্যাদি। কুর'আন থেকে সমুদ্রের ঝড়, জাহাজের পাল, গভীর সমুদ্রের মণিমুক্তা ও প্রবাল ইত্যাদি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা যায়।

একজন মানুষের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকতে পারে। তবে প্রত্যেক মুসলমানকেই মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এটাই ছিল মহানবী সা.-এর স্থির নির্দেশ। আল-কুর'আনের মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে, সেহেতু আল-কুর'আন তিলাওয়াত করার জন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে।

নবী করীম সা.-এর আমলে কলা এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ততটা বিকাশ ঘটে নি। তবে আবশ্যকীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে মানুষের ঠিকই ধারণা ছিল এবং এসব ক্রমবিকাশের ধারায় যথারীতি এগিয়ে যাচ্ছিল। এ রকম একটি বিষয় ছিল চিকিৎসাবিদ্যা।[৭৩]

হাদীসে এসেছে, একবার একজন সাহাবী অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম সা. তাঁকে দেখতে যান এবং আশপাশে কোন চিকিৎসক পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে জানতে চান। তাঁকে দু'জন ডাক্তারের নাম বলা হলো। দু'জনের মধ্যে ডাক্তার হিসেবে যিনি ভালো ও অভিজ্ঞ নবীজী সা. তাঁকে ডাকতে বললেন।[৭৪]

কুর'আন মজীদে জ্যোতির্বিদ্যার উল্লেখ রয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যেই একজন পর্যটক রাতের বেলা চলতে পারেন। এ বিদ্যার সাহায্যেই হজ্বের মৌসুম ও সময় নির্ধারণ করা যায়। নবী করীম সা.-ও

---

৭০. মুহাম্মদ ওয়াজিদুর রহমান ও মোঃ সাহাব উদ্দীন, *ইসলামী শিক্ষা পরিচিতি*, ঢাকা : পূর্বদেশ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬, পৃ ১৫০।

৭১. M. A. Sattar, *Tarikh-i-Madrasha-i-Aliah*, Dacca : Research Publication Section, Madrasha-i-Aliah, 1957, p 141.

৭২. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৮।

৭৩. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭-১৫৮।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে যথেষ্ট জানতেন। হিজরতের পর কুবার মসজিদ নির্মাণকালে কিবলা নির্ধারণ নিয়ে সমস্যা হলে রাসূল সা.-এর সমাধান দেন।[৭৫]

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে মদীনার বাইরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মরুভূমির বেদুঈন ও সভ্য নাগরিক ক্রমান্বয়ে হতে থাকলো ইসলামে বায়'আত প্রাপ্ত। ইসলামের ক্রমবর্ধমান জনশক্তি বৃদ্ধির সাথে এ শিক্ষাও দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। মহানবী সা.-এর জীবনের শেষ অধ্যায়ে আরব ভূখণ্ডের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এবং শিক্ষার জন্য অবশ্যম্ভাবীরূপে একটি সুষ্ঠু কাঠামো তৈরী করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ পরিকল্পনাধীনে প্রত্যেক গোত্রের লোকদের কুর'আন-হাদীস শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।[৭৬] এ শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য দু'টি পন্থা অবলম্বন করা হয়।

প্রথমত: মহানবী সা. শিক্ষিত সাহাবাগণের মধ্য থেকে কতককে বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত: প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্নরকে তাঁদের নিজ এলাকার জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, এ সম্পর্কে মহানবী সা.-এর দরবার থেকে আমর ইবন হাযমকে যে সারগর্ভ নির্দেশ করা হয়েছিল, শিক্ষা বিস্তারের দিক নির্দেশনায় তা অদ্যাবধি ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

শিক্ষাসূচীর অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে কুর'আন শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক ছিল। অতঃপর শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে অন্য বিষয়ের পঠন-পাঠনে অগ্রসর হতেন। মহানবী সা. তাঁর সহচরদের বিশেষ বিশেষ দক্ষতা অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করতেন।[৭৭] তাঁর যুগে যায়দ ইবন সাবিত অংক বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ভাষা শিক্ষায় তাঁরা শুধু আরবীকেই প্রাধান্য দিতেন না বরং 'আরব দেশের বাইরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অন্যান্য ভাষাও শিখতেন এবং এটা রাজনৈতিক কারণেও প্রয়োজন ছিল।[৭৮]

প্রথম আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মদীনায় পৌছার পরক্ষণেই তাঁর প্রথম কাজ ছিল একখানা মসজিদ নির্মাণ। কুবায় পৌছার পরপরই তিনি সেখানে একখানা মসজিদ নির্মাণ করেন। এই কুবা আওস গোত্রের নিকট এলাকা। কুবা ছেড়ে যখন তিনি নাজ্জার (খাজরায গোত্রের শাখা) এলাকায় প্রবেশ করেন, তখন পুরাতন মসজিদের আরো সম্প্রসারণ করেন। মসজিদের সঙ্গেই ছিল নবীজীর আবাসস্থল। মসজিদের এক অংশকে লেখাপড়ার স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। মসজিদ-ই-নববী সংলগ্ন এ শিক্ষায়তনকেই মাদ্রাসা-ই-সুফ্ফা বলা হয়। সুফ্ফা অর্থ প্ল্যাটফরম। দিনের বেলা এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আর যে সমস্ত ছাত্রের অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা ছিল না, তারা এখানেই রাত্রি যাপন করতেন। সুফ্ফায় স্থানীয় গরীব ছাত্র এবং বহিরাগত ছাত্রদের আবাসিক বন্দোবস্ত ছিল। বস্তুতপক্ষে এটাই ছিল ইসলামের প্রথম আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আবাসিক সুযোগ-সুবিধার জন্য ভর্তুকি দেয়া হতো। ভর্তুকির অর্থ আসত রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ ও ব্যক্তিগত অনুদান থেকে। তা ছাড়া, জনগণ এতে পূর্ণ সহযোগিতা করতেন। যেমন ফসল কাটার

---

৭৫. প্রাগুক্ত।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৮।

৭৭. Hamidulla Khan, Vol. II. Karachi : 1967, p 22.

৭৮. The Islamic University Studies, Vol 1, No 1, Kustia, June 1990, p 38.

Dhaka University Institutional Repository

সময় প্রত্যেক আনসারী সাহাবী এক কাঁদি খেজুর দান করেন। সুফ্ফার একটি উঁচু স্থানে এগুলো ঝুলিয়ে রাখা হতো। যখন খেজুর পাকত এবং নিচে ঝরে পড়ত, তখন সুফ্ফায় বসবাসকারী ছাত্ররা এগুলো কুড়িয়ে খেত। খেজুরের কাঁদিগুলো পাহারা দেয়ার জন্য একজন লোকও নিয়োগ করা হয়েছিল। মু'আজ ইবন জাবাল রা. এ দায়িত্ব পালন করতেন।[৭৯]

সুফ্ফায় দু'ধরনের ছাত্র ছিলেন। প্রথমত: সার্বক্ষণিক ছাত্রবৃন্দ, দ্বিতীয়ত, এমন কিছু ছাত্র যারা আশ্রয়হীন হওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে এখানে থাকতেন। এদের সংখ্যা কখনো কমে যেতো; কখনো আবার বেড়ে যেতো। খলীফা 'উমর রা.-এর পুত্র আবদুল্লাহ রা.-ও ছিলেন এরকম একজন ছাত্র। আস সুফ্ফায় ছাত্রগণ অধ্যয়নের পাশাপাশি কাজও করতেন।[৮০] অধ্যয়নের সাথে সাথে নিজের প্রয়োজনীয় আর্থিক খরচ মেটানোর জন্য উপার্জনও করতে হবে- রাসূলুল্লাহ্ সা. এ শিক্ষাও সবাইকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ফরয 'ইবাদতের পর হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা আর আরেকটি ফরয।[৮১] আধুনিক বিশ্বে কর্মমুখী শিক্ষা নামে যে শিক্ষা বহুলভাবে প্রচলিত মহানবী সা. এ বিষয়ে শিক্ষার প্রতি খুবই উৎসাহ প্রদান করেছেন।

আস সুফ্ফায় কুর'আন হাদীস ও মাস'আলা-মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হতো। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দানের দায়িত্ব বিভিন্ন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। কারো কারো দায়িত্ব ছিলো ছাত্রদের লিখতে ও পড়তে শেখানো। যাঁদের লেখা ও পড়ার কৌশল শেখা হয়ে যেতো, তাঁদের বলা হতো অন্যদের ইতোমধ্যে নাযিলকৃত কুর'আনের আয়াতসমূহ শেখাতে। সম্ভবত কাউকে কাউকে ইসলামের বিধি-বিধান সুন্নত, সালাত, 'ইবাদত-বন্দেগী প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার জন্য বলা হতো।[৮২]

রাসূল সা. মাঝে মধ্যে দু'একটি ক্লাস নিতেন। যখনই সময় পেতেন, চলে আসতেন আস সুফ্ফায়। ব্যস্ত সাহাবীগণও তখন ছুটে যেতেন সেখানে এবং গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠে হাজির থাকতেন।[৮৩]

মহানবী সা.-এর সহচরবৃন্দ যদিও জিহাদের মধ্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন, তথাপি তাঁরা প্রত্যেকেই জ্ঞান চর্চায় সর্বদা নিমগ্ন থাকতেন। তাঁদের মধ্যে যিনি যে শিক্ষা অর্জন করতেন তা প্রচার করা এবং এর প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট করা নিজেদের প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করতেন।[৮৪]

হাদীসে এসেছে, নবী করীম সা. তাঁর ব্যক্তিগত নিবাস থেকে মসজিদে এলেন। সেখানে দুটো দল দেখতে পেলেন। এক দল তাস্বীহ পড়ছেন, অন্য দল বিদ্যাচর্চা করছেন। নবীজী সা. বললেন, দু'টি দলই বন্দেগীতে মশগুল রয়েছে। তবে যে দল বিদ্যা চর্চায় মগ্ন, সেটাই উত্তম। এ কথা বলে নবীজীও সে দলে যোগ দিলেন।[৮৫]

---

৭৯. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১-১৫২।

৮০. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৮।

৮১. ওলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ আততিবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬।

৮২. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫২।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩।

৮৪. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া, *ছাহাবা কাহিনী*, মোজাফ্ফর হোছাইন ও মোঃ মোছলেহুদ্দীন অনূদিত, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৯, পৃ ২৩৮।

৮৫. ওলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ আততিবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত মা'আজ ইবন জাবাল, হযরত আবূ যর গিফারী রা. প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী সাহাবী ছিলেন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেরা ছাত্র। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে এসে শিক্ষা লাভ করতেন এবং পুনরায় দেশে ফিরে আসতেন। নও মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই বসবাস করতেন মদীনার বাইরে। তাঁরা মাঝে মধ্যেই মদীনায় আসতেন। তখন তাঁদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। এভাবে সুফ্ফা মদীনার কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তন হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। শিক্ষা সমাপ্তির পর এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হতো এবং তারা বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রে গিয়ে দ্বীনিয়াত ও কুর'আন শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা সুফ্ফায় লেখাপড়া করার জন্য তাদের অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিও প্রেরণ করতেন। তাঁরা এখান থেকে শিক্ষা লাভ করে গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে যেতেন এবং তাদেরকে লেখাপড়া শিখাতেন।[৮৬]

মসজিদ ভিত্তিক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আস্ সুফ্ফা চালু হওয়ার পরপরই নবীজী সা. আরও কতক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বালাযুরী উল্লেখ করেছেন, নবীজীর আমলে মদীনায় নয়খানা মসজিদ ছিল, যেসব একই সাথে শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সুফ্ফার সন্নিকটে অপর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ইবন হাম্বল তাঁর মসনাদে হযরত আনাস রা. থেকে একখানা হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, সুফ্ফার ছাত্রদের থেকে সত্তর জন ছাত্র মদীনার বিভিন্ন শিক্ষায়তনে পড়াশোনা করাতেন এবং তাঁরা সেখানে সকাল পর্যন্ত থাকতেন। ইবন সা'দ মদীনায় দারুল কুররাহ্ মহানবী সা.-এর ঘোষণা প্রদান করেন, তোমরা স্থানীয়রা মসজিদে যাবে এবং প্রতিবেশীদের নিকট লেখাপড়া শিখবে। তোমাদের ব্যাপক হারে কেন্দ্রীয় মসজিদে আসা অনাবশ্যক।[৮৭]

সম্ভবত আস্ সুফ্ফায় ছাত্রসংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি এরূপ করেছিলেন। কারণ এর ফলে তাদের প্রত্যেকের লেখাপড়া বিঘ্নিত হবে। সম্ভবত এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পরিবহন ও যোগাযোগ সমস্যা।[৮৮]

যুদ্ধবন্দী কর্তৃক মদীনায় শিশুদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা

বদর যুদ্ধের সময় ৭০ জন মুশরিককে বন্দী করা হয়। নবী করীম সা. শিক্ষিত বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ দাবী করেন নি। বরং মুক্তিপণের পরিবর্তে তাদের প্রত্যেককে দশ জন করে মুসলমান শিশুকে লেখাপড়া শেখানোর শর্ত আরোপ করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এতে প্রতীয়মান হয়, অমুসলিমদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করা বিধিসম্মত এবং ইসলামী বিধান মতে একজন মুসলমানের জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টায় কোন কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।[৮৯]

মহানবী সা.-এর যুগেই শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তার পার্থক্য বিশেষভাবে অনুভূত হয়। শিশুদেরকে কোন্ বিষয়ে এবং কোন্ সময়ে শিক্ষা দেয়া হবে তা হাদীস শরীফে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে। সে যুগে লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ ও সাঁতার বিদ্যা বিশেষত বাল্যাবস্থায় শিক্ষা দেয়া হতো। নামাযের পদ্ধতি শিক্ষাদান ও নামাযে অভ্যস্ত করার প্রতিও বাল্যকাল থেকেই নজর রাখা হতো। সাত বছর

---

৮৬. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৭।

৮৭. Ibn-I-Sad, Tabaqat-I-Kuabre IV/IN.D, p 150.

৮৮. Islamic Culture (Hydarabad Deccan) Vol. XII. 1993, p 48.

৮৯. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

বয়স থেকে নামায পড়ার নির্দেশ ছিলো। বালকদের খেলাধুলা ও চিত্তাকর্ষণের প্রতিও নজর দেয়া হতো। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশু মানসিকতার প্রতিও গভীর মনোযোগ দেয়া হতো।

সরকারী ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পরিদর্শক

প্রথমে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা মদীনায় সীমাবদ্ধ থাকলেও রাসূল সা.-এর ওফাত পর্যন্ত আঠার উনিশ লক্ষ বর্গমাইল পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি পায়। আয়তন বৃদ্ধির সংগে সংগে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসার দ্রুত বাড়তে থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-নীতির উন্নতি সাধন করে বিশাল ভূখণ্ডকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি প্রদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। ইয়ামনের গভর্নর আমর ইবন হায্মের নিকট মহানবী সা. যে দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন তা আজও ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। তাতে লোকদেরকে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, দীনিয়াত, ইসলামী জ্ঞান ও চারিত্রিক বিষয়াবলী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এমনিভাবে প্রাদেশিক গভর্নরদের প্রতি শিক্ষার প্রসারে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ ছিলো।[৯০]

অমুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা

নবী করীম সা. যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে অমুসলিমরা পূর্ণ স্বাধিকার ভোগ করত। একজন খ্রীস্টান ছাত্র একটি বিদ্যালয়ে কুর'আন শেখার জন্য একজন ভালো শিক্ষক পেত। কিন্তু বাইবেল শেখার জন্য একজন ভাল শিক্ষক হয়তো পেত না। সে কারণে অমুসলিমদের স্বার্থেই তাদের স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার ছিল। অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা পুরোপুরি প্রদানের লক্ষ্যেই স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, কখনো কখনো ইয়াহুদীরা নবীজীর কাছে আসতো এবং ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত হতো। এ ধরনের আলোচনার ফলাফল মাঝে মধ্যে প্রকৃত অর্থেই ফলপ্রসূ হতো।[৯১]

নও-মুসলিমদের শিক্ষা ব্যবস্থা

হিযরতের প্রাথমিক যুগে মদীনার বাইরের যেসব লোক ইসলামে বায়'আত হতেন তাদের সংখ্যা কম হলে তাদেরকে মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করার জন্য বলা হতো। উদ্দেশ্য ছিল অমুসলিমদের অত্যাচার থেকে তাদেরকে রক্ষা করা এবং তাদের লেখাপড়ার সু-বন্দোবস্ত করা। কেননা দু'একজন মানুষের জন্য শিক্ষক প্রেরণ সম্ভব হতো না। যদি সংখ্যায় বেশী হতো তাহলে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য রাসূল সা. শিক্ষক পাঠিয়ে দিতেন। মদীনায় নও-মুসলিমদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করার পেছনে আরও যুক্তি ছিল। তাদের সুশিক্ষিত করার পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনে মুজাহিদদের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায়, সেটাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।[৯২]

---

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪।

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫।

৯২. কাজী আবু হোরায়রা, 'মহানবী সা.-এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা', *সীরাত স্মরণিকা*, ঢাকা : ইফাবা, ১৪১৭ হিজরী, পৃ ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষা

শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতা আসে না। এই পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার হিসেবে মহানবী সা. নারীকে শিক্ষার অধিকার দিয়েছেন; শুধু অধিকার নয়, অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নারীকে আত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য হিসেবেই দৈহিক সত্তার বিকাশের পাশাপাশি তার বিবেক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের উপরই মহানবী সা. অতীব গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[৯৩]

পুরুষদের শিক্ষার পাশাপাশি মহানবী নারী শিক্ষারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে নারীদের নিকট বক্তৃতা করতেন এবং তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। মহানবী সা. সম্ভ্রান্ত মহিলাদের এবং দাসীদেরও শিক্ষা দান করার আদেশ করেছেন।[৯৪]

রাসূলে করীম সা.-এর সময়ে যে জ্ঞান চর্চার মজলিস অনুষ্ঠিত হতো, মহিলারা অদূরে পর্দার অন্তরালে উপস্থিত থেকে তা হতে যথেষ্ট উপকার লাভ করতেন। ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনই ছিল এসব মজলিসে তাঁদের উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্য। অনেক মহিলা এমনও ছিলেন, যাঁরা রাসূল সা.-এর মুখে কুর'আন পাঠ শুনেই তা মুখস্ত করে ফেলতেন। রাসূলে করীম সা. নিজেও মহিলাদের দীন ইসলাম শিক্ষা লাভের বিশেষ চিন্তা বিবেচনা করতেন ও সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। কোন সময় মহিলারা ঠিকমত শুনতে পারেন নি বলে মনে করলে একবার তিনি বলা কথা মহিলাদের কাছে উপস্থিত হয়ে পুনরাবৃত্তি করতেন।[৯৫]

সমাজে পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও যে দ্বীন সম্পর্কে সুশিক্ষিতা করে তোলার ব্যবস্থা করা সমাজ প্রধানের দায়িত্ব, তাতে সন্দেহ নেই। তাই সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা মহিলাদের জন্য যথেষ্ট মনে না হলে রাসূলে করীম সা. তাঁদের জন্য অনেক সময় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও গ্রহণ করতেন। মহিলারাই একবার রাসূলে করীম সা.-এর কাছে অভিযোগ করলেন এবং আবেদন জানালেন এই বলে যে, আপনার দরবারে সব সময় কেবল পুরুষদের ভীড় জমে থাকে, আমরা আপনার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাই না। কাজেই আমাদের শিক্ষাদানের জন্য ভিন্নতর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। তাঁদের আবেদন অনুযায়ী তা-ই করেছিলেন।[৯৬]

আবূ দাউদ একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন, মহানবী সা.-এর স্ত্রী হযরত হাফসা রা. জনৈক মহিলার নিকট লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করতেন।[৯৭] বালাযুরী বলেন, আবদুল্লাহ্র কন্যা আল-শাফিয়া ইসলামের পূর্বে লিখন পদ্ধতি শিখেছেন।[৯৮] তিনি আরও বলেন, ইসলামের প্রাথমিক কালে মক্কায় যে ১৭ জন

---

৯৩. Muhammad Kutub, *Islam And Women*, Dhaka : Adhunik Prokashoni, 1988. p 22.

৯৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈ'ল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, পৃ ২০।

৯৫. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *নারী*, ঢাকা : সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ১৯৮৮, ২য় সং, পৃ ৫০-৫১।

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৫১।

৯৭. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস্‌সাজিসতানী, *সুনান আবূ দাউদ*, কানপুর : আল-মাতবা'আল মাজীদী, ১৩৭৫ হি., পৃ ১৮০।

৯৮. 'আল্লামা আহমদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন জাবির বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, কায়রো : মাতবা'আতুস শরকিল ইসলামিয়া, ১৯৭৭, পৃ ৪৭২।

Dhaka University Institutional Repository

লেখাপড়া জানতেন তাঁদের মধ্যে ৫ জন মহিলা ছিলেন।[৯৯] মহানবী সা.-এর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. ২২১০ খানা হাদীস মুখস্ত করেছিলেন।[১০০]

তিনি শুধু নারীদের নয়, পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং বড় বড় সাহাবী ও তাবিয়ী তাঁর কাছে হতে হাদীস, তাফসীর ও জরুরী মাসায়িল শিখতেন।[১০১] সা'দ এর কন্যা আয়েশা তাঁর পিতার নিকট লেখাপড়া শিখতেন।[১০২]

মহিলাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভের সঠিক, উপযুক্ত ও উত্তম হচ্ছে তাঁর ঘর ও পারিবারিক পরিবেশ। এ কারণে তাঁদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমতঃ পিতা-মাতা ও স্বামীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। রাসূলে করীম সা.-এর এ পর্যায়ের এক নির্দেশের ভাষা এই, তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট চলে যাও, তাদের মধ্যে বসবাস কর, তাদের জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য তাদের আদেশ কর।[১০৩]

আল কুর'আনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ ঘরের মহিলাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী করীম সা. পুরুষ সমাজকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী সমাজের মহিলারা দ্বীন সম্পর্কে জরুরী জ্ঞান লাভ করুক-রাসূলে করীম সা.-এর এই ছিল বাসনা এবং চেষ্টা। কেবল নীতিগত জ্ঞান শিক্ষা দেয়াই লক্ষ্য ছিল না; সে সঙ্গে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল অনিবার্যভাবে। এ জন্য কেবল উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি, আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। পিতা-মাতা বা স্বামী যদি পারিবারিক পরিবেশে জরুরী দ্বীনী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করেন, তা হলে ঘরের বাইরে গিয়েও সেই জ্ঞান লাভ করার সুযোগ-সুবিধা দিতে গোটা সমাজই দায়িত্বশীল। এ পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তা দূর করতে হবে সমাজকেই। শুধু কিতাবী বিদ্যাই নারীদের যথেষ্ট নয়, তাদের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে সত্য ও তত্ত্ব উদঘাটনের জন্য তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করা ইসলামী সমাজের কর্তব্য।[১০৪] মহানবী সা. নারীর জন্য শিক্ষাকে সীমিত করে দেন নি। আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন, 'যারা প্রকৃত জ্ঞানী ও বিদ্বান, তারা বলেন, আমরা উহার (কুর'আন) প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য কথা এই যে, জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল কোন জিনিস (এখানে কুর'আন বুঝানো হয়েছে) হতে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।' সুতরাং আল্লাহর বাণী কুর'আন বুঝার জন্যও ইসলামের অনুসারীদের বিদ্যা অর্জন করতে হবে। এখানে মহানবী সা. নারী শিক্ষার উপর অনন্য গুরুত্বারোপ করেছেন।[১০৫]

কারিগরী ও অন্যান্য শিক্ষা

রাসূল সা.-এর যুগে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ তৈরি করা হতো। বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করতেন। রাসূল সা.-এর যুগেই মুসলমানরা প্রস্তর নিক্ষেপণ যন্ত্রসহ বেশকিছু জিনিস

---

৯৯. মওলানা শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন্নবী*, আ'যম গড় : মাতবা' মা'আরিফ, ১৯৫২, পৃ ৮১।

১০০. Mufti Amimul Ahsan, *Tarikh-I-Ilm-I-Hadith,* Dacca : Mufti Monzil, nd, p 21

১০১. মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন, *ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান*, ঢাকা : আল হেরা প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ ৪৮।

১০২. Tuta Khalil, *The Contribution of the Arabs to Education,* New York : 1926, p 79.

১০৩. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১।

১০৪. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১-৫২।

১০৫. ইউএবি রাজিয়া আখতার বানু, 'সংবিধানে ও ধর্মে বাংলাদেশের মুসলিম নারী অধিকার ও মর্যাদা : একটি পর্যালোচনা', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, দ্বাদশ খ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৪, পৃ ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তর নিক্ষেপণ যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন হযরত সালমান ফারসী রা.। মহানবী সা. স্বয়ং উচ্চস্তরের প্রকৌশল জানতেন। কা'বাঘর নির্মাণের সময় তাঁর প্রস্তর স্থাপন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মক্কার দিকে কা'বা পরিবর্তন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলে তাঁকে এক বড় দার্শনিক ও প্রকৌশলী বলেই মনে হয়। খন্দকের যুদ্ধে পরিমাপ করে খোঁড়ার কাজ তিনি আরম্ভ করেছেন। বর্তমানের যুদ্ধ বিদ্যায় টেঞ্চ করার যে পদ্ধতি তার মূলত উদ্ভাবক ছিলেন রাসূলুল্লাহ সা.। সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিত্য-নতুন কৌশলের জুড়ি নেই। আর এর যাবতীয় হিকমত শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সা.।[১০৬]

শিক্ষকদের বেতন

উমাইয়া এবং আব্বাসীয় যুগে শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু মহানবী সা.-এর সময়ে শিক্ষকদের নির্ধারিত বেতন ছিল কি না, তা অস্পষ্ট। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, সেকালে শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত কোন বেতন ছিল না। আবূ দাউদ শরীফে উবাদা বিন সামিত থেকে বর্ণিত একখানা হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি সুফ্ফার শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি কুর'আন ও লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। তাঁর জন্য একজন ছাত্র তাঁকে একটি ধনুক উপহার দিয়েছিলেন।[১০৭] গোল্ডজিহার মন্তব্য করেন, যেহেতু তৎকালীন দিনে লেখাপড়া কোন পার্থিব উন্নতির জন্য করা হতো না, তাই বেতনের প্রশ্নই উঠতো না।[১০৮]

প্রত্যয়ন

মহানবী সা.-এর যুগে সার্টিফিকেট প্রদান সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।[১০৯] জাহিলিয়া যুগে যারা মক্তবে লেখাপড়া শেষ করতেন তাঁদের 'কামিল' বলা হতো। রাফি বিন মালিককে কামিল বলা হতো; কিন্তু এটা তাদের কোন সার্টিফিকেট ছিল না;[১১০] উপাধি ছিল মাত্র। উল্লেখ করা যেতে পারে, মহানবী সা.-এর সময়ে যাঁরা লেখাপড়া শিখতেন তাঁদের পার্থিব লাভের আশা ছিল না বরং তাঁরা পারলৌকিক পরিত্রাণের আশায় লেখাপড়া শিখতেন। সুতরাং সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রশ্নই উঠতো না। অতঃপর পরবর্তী যুগে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্য যখন পার্থিব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়ে ওঠে, তখন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন দেখা দেয়।[১১১]

সারকথা, মহানবী সা.-এর সময়ে আধুনিক কালের মত কোন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে উম্মী হয়েও শিক্ষার জন্য যে ভূমিকা রেখেছিলেন, তা অনন্তকাল পর্যন্ত মানুষকে প্রেরণা দিতে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সা. নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন, আমাকে পৃথিবীর মানুষের জন্য শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে।[১১২] বাহ্যিকভাবে নিরক্ষর মহানবী সা.-এর শিক্ষানীতি পৃথিবীর সকল মহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। অমুসলিমরা পর্যন্ত তাঁর শিক্ষানীতির প্রতি সম্মান জানিয়েছেন। আমেরিকান চিন্তাবিদ ফ্রান্স রোমাদীন বলেছেন, 'The acquisation of knowkedge

---

১০৬. কাজী আবু হোরায়রা, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৬।

১০৭. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আসসাজিতানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৯।

১০৮. *Encyclopedia of Religion and Ethics* (Gold Ziher), Vol V, Edinburah, p 202.

১০৯. Dr. Hamidullah, *History of Muslim Education,* Bairut : 1945, p 147.

১১০. *Islam war Asr-I-jadeed,* New Delhi : 1970. Vol. II, p 45.

১১১. P. K. Hitti, *History of the Arabs,* London : 1970. 10th Edition.

১১২. ওলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ আত তিবরীযী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

has been a mainstay of Islamic Faith since its enunciation by the Prophet Muhammad (sm) nearly 1400 years ago.'[১১৩]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পৃথিবীর অন্য কোন মহাপুরুষের এ ধরনের উদাহরণ বিরল।[১১৪]

সার্বিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, মহানবী সা. প্রবর্তিত শিক্ষাই মানবতার জন্য কল্যাণকর। এটাই ইসলামী শিক্ষার সূচনা পর্ব। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা মানুষকে যথার্থ শিক্ষিত করতে অক্ষম, এতে আদর্শ ও নৈতিকতার প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কুর'আন হাদীসের শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার পূর্ণতা আসে না। এতেই নিহিত রয়েছে জীবনের প্রতিটি দিকের সঠিক দিক নির্দেশনা। মহানবী সা.-এর শিক্ষা ব্যবস্থার মডেলে প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থাই জাতিকে ন্যায়-নীতি, কল্যাণ ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম।

---

১১৩. Hamiduddin Khan, Ibid, Karachi 1967, p 16.

১১৪. The Islamic University Studies, Vol. I. No 1, June 1990, p 39.

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : তিন
সাহাবা ও পরবর্তী যুগে ইসলামী শিক্ষা

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা

আল কুর'আনের শিক্ষার আলোকে মহানবী সা. যে শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা করেন, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর হাতে সে শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত বিকাশ লাভ করে। মহানবী সা.-এর ইন্তিকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে নতুন নতুন দেশ ও এলাকা বিজিত হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পায়। কাজেই শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা অধিকহারে অনুভূত হয়। তাই ইসলামী জ্ঞানের অনুশীলন ও শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপকভিত্তিতে সম্প্রসারণ করা হয়। বিজিত অঞ্চলে নতুন নতুন মসজিদ নির্মিত হয় এবং শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে এ সকল মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। রাসূল সা. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা খুলাফায়ে রাশেদার যুগে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। নতুন নতুন মসজিদ স্থাপিত হয় এবং দেশের বিভিন্ন মসজিদে জ্ঞান বিস্তারের জন্য অনেক 'আলিমকে নিয়োগ করা হয়।[১১৫]

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের প্রতি সাহাবায়ে কিরাম ও তৎকালীন নব মুসলিমগণ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। আল কুর'আনের শিক্ষা এবং ইসলামী জ্ঞানকে দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়া তাঁরা নিজেদের কর্তব্য মনে করতেন।[১১৬]

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ইসলামের সোনালী যুগ। এ যুগ হল মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষার যুগ। এ আমলেই ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদসহ 'আরবী ব্যাকরণ রচনার সূত্রপাত হয় এবং হিজরী সাল গণনা করা আরম্ভ হয়। শিক্ষকগণের বেতন ভাতার ব্যবস্থা ও উত্তরাধিকার আইন (ফারায়িয) এ সময়ই প্রবর্তিত হয়।[১১৭]

উমাইয়া আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা

এ যুগে ইসলামী শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। উমাইয়া শাসনামল ৬৬১ খ্রীস্টাব্দ হতে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ে উমাইয়া বংশের খলিফাগণ বিভিন্ন অঞ্চল বিজয় ও আভ্যন্তরীণ শাসনে বিশেষ মনোযোগদান এবং বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল দমনে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা বিস্তারের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

শিক্ষা কেন্দ্র

উমাইয়া যুগে সাম্রাজ্যের মসজিদগুলো ছিল শিক্ষা বিস্তারের প্রাণ কেন্দ্র। কুর'আন-হাদীসকে ভিত্তি করে এ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ সময় মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা এবং মিশর ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে।

উমাইয়া যুগে বহুসংখ্যক সাহাবা জীবিত ছিলেন। রাসূল সা.-এর প্রত্যেক সাহাবাই ছিলেন জ্ঞানের মশাল ও হিদায়েতের আলোক বর্তিকা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. (মৃ. ৬৮ মতান্তরে ৬৯ হি.), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর রা. (মৃ. ৭৪ হি.), যায়িদ ইবন সাবিত রা., আবূ হুরায়রা রা.

---

১১৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬, ২য় খ, পৃ ১২৪।

১১৬. প্রাগুক্ত।

১১৭. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান সম্পাদিত, *মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, রাজশাহী : সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লি. ১৯৮৯, পৃ ৮৯; সায়্যিদ আমীর আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম*, অধ্যাপক দরবেশ আলী খান অনূদিত, ঢাকা : ১৯৯৩, পৃ ৩৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

(মৃ ৫৭/৫৮/৫৯ হি.), আমর ইবনুল আস রা., আবূ সাঈদ খুদরী রা. এবং আনাস ইব্‌ন মালেক রা. (মৃ. ১৭৯ হি.)। তাবিয়ীগণ এ সকল বড় বড় সাহাবার কাছে হতে ইসলামী জ্ঞানার্জন করে শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। তাবিয়ীদের মধ্যে যারা শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞান গরিমায় বিশিষ্ট ছিলেন, তাদের মধ্যে কাজী শুরাইহ, সাঈদ ইবন মুসাইয়্যির, ইকরামা, নাফি', হাসান বসরী এবং ইব্রাহীম নাখয়ী রা. ছিলেন অন্যতম।[১১৮]

প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে এমনকি সম্ভ্রান্ত বাড়িতেও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ গুলোকে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বলা যায়। হাজ্জাজ ইবন ইউসূফ এ ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। কোন কোন স্থানে এ সকল বিদ্যালয়ে বেতন দিতে হতো। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এ মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিদ্যালয়ের জন্য সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন। ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য মসজিদ সংলগ্ন স্থানে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হতো। উমাইয়া যুগের প্রথম দিকে সিরিয়ার 'বাদিয়া' নামক স্থানে বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। উমাইয়া-খলীফা আমীর উমরাহগণ গৃহ শিক্ষক শিক্ষিকা রেখে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। গৃহ শিক্ষকগণ উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা শিক্ষার্থীর ভাল-মন্দ নিয়ে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করতেন।[১১৯]

উমাইয়া যুগের ইসলামী শিক্ষা

সার্থক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ইসলামের অনুসারীদের সক্ষম করে তোলার জন্য মানব জীবনের বহুমুখী সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত ইসলামে রয়েছে। মানুষের জীবনে অজ্ঞতা একটি বিরাট সমস্যা। জ্ঞান মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর পথে এগিয়ে নেয়, জ্ঞান মানুষের বিবেককে শাণিত করে; মানুষকে করে জাগ্রত; সমাজ জীবনকে করে সুন্দর ও সুশোভিত। তাই যথার্থ শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মানব জীবন যাতে সুখী ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে সে জন্যই ইসলাম শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

উমাইয়া যুগের শিক্ষা বিস্তৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তারা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। শিক্ষা কার্যক্রমের লালন ও সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন।[১২০]

পবিত্র কুর'আনের বিখ্যাত আটজন ক্বারীই[১২১] ছিলেন উমাইয়া যুগের। এ যুগেই ফরাযদাক, জারীর ও আখতালের মতো বিখ্যাত কবিরা বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। কালাম শাস্ত্রীয় বিভিন্ন ফিরকা এ যুগেই সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময়ে নাহু সরফ শাস্ত্রের উৎপত্তি হয় এবং মুতাজিলাদের তথাকথিত যুক্তিবাদী আন্দোলনও এ যুগেই শুরু হয়। খলীল ইবন আহমাদ বাসরী 'ইলমে উরুজ এবং সায়বুরিয়া 'আরবী ব্যাকরণ পুস্তক রচনা করেন। এ যুগে চিকিৎসা শাস্ত্র এত দ্রুত উন্নতি লাভ করে যে, চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাসহ সারা দেশে হাসপাতালও প্রতিষ্ঠিত হয়।

জ্ঞান বিজ্ঞানের যে গুলবাগিচা আব্বাসীয় যুগে ষোলকলায় পূর্ণতা লাভ করে, উমাইয়া যুগেই তার বীজ বপণ করা হয়েছিল।[১২২]

---

১১৮. *ইসলামী শিক্ষা সংকলন*, পৃ ৩৩।

১১৯. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও এ এস এম আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫।

১২০. ইলমে কির'আতের আটজন খ্যাতনামা ইমাম : নাফে ইবন কাসীর, আবূ আমর, ইবন আমের, আসেম, হামজা আল কিসারী ও ইয়াকুব হাদরামী। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, তাদের সংখ্যা সাতজন এবং ইলম কিরাআতে সাতটি প্রসিদ্ধ পঠন পদ্ধতি তাদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। তারা ইয়াকুব হাদরামীর নাম উল্লেখ করেন নি। [দ্র. বায়যাবী, *তাফসীরে বায়যাবী*, ঢাকা : দি হলি প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৮, পৃ ৮।]

১২১. *ইসলামী শিক্ষা সংকলন*, পৃ ২২।

১২২. *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি*, পৃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্বাসীয় যুগে ইসলামী শিক্ষা

ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় 'আব্বাসীয় যুগের অবদান অনন্য সাধারণ। মুসলিম শাসনামলের মধ্যে 'আব্বাসীয় যুগেই জ্ঞানানুশীলন এবং শিল্প সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ সর্বাধিক হয়েছিল। এ কারণে ঐতিহাসিকগণ এ যুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছেন।[১২৩] উমাইয়া খলিফাগণ দেশ জয়ের কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে তারা শিক্ষার দিকে তেমন নজর দিতে পারেন নি। 'আব্বাসীয় খলিফাগণ দেশ বিজয়াভিযান পরিত্যাগ করে জ্ঞান আহরণের সুদূর-প্রসারী অভিযান শুরু করেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তারা ধ্বংস ও বিলুপ্ত প্রায় ইরাক, মিশর, পারস্য ও গ্রীসের প্রাচীন সাহিত্য সভ্যতা ও কৃষ্টিকে শুধু রক্ষাই করেন নি বরং তাকে জীবনীশক্তি দান করে নতুন ভাবে জাগিয়ে তোলেন। এ সময়ে মুসলমানদের জ্ঞান-চর্চার স্পৃহা এতই প্রবল ছিল যে, তাঁরা প্রাচীন গ্রীক, মিশরীয় এমনকি ভারতীয়দের নিকট হতে জ্ঞান আহরণ করতে সংকোচবোধ করতেন না। এ যুগে 'আব্বাসীয় খলিফাগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম পণ্ডিতগণ চিকিৎসাবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস দর্শন, ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র, গণিত ও রসায়ণ শাস্ত্রে গবেষণা চালিয়ে বহু নতুন নতুন দিক আবিষ্কার করে মানবীয় জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করেন।[১২৪]

শিক্ষা পদ্ধতি

শিক্ষার স্তর বিন্যাস : 'আব্বাসীয় যুগে মুসলমানদের শিক্ষার দু'টি স্তর ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে ওঠে। এ সকল বিদ্যালয় মসজিদ ও ব্যক্তিগত গৃহে সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া অনেক মক্তব ছিল যেগুলোর মান ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো।[১২৫]

স্কুলের পাঠ্য তালিকা : পঠন, লিখন, ব্যাকরণ, হাদীস, প্রাথমিক গণিত, কিছু ভাবমূলক কবিতা পাঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত ছিল। এ সময় মুখস্ত করার উপর বেশি জোর দেয়া হতো। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা কুর'আনের ব্যাখ্যা ও গবেষণামূলক সমালোচনা, রাসূল সা.-এর হাদীসের বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা, আইন শাস্ত্র, ধর্ম তত্ত্ব, ছন্দ ও সাহিত্য প্রভৃতি পাঠ করতো। উচ্চ স্তরের শিক্ষার্থীগণ জ্যোতিষশাস্ত্র দর্শন ও সঙ্গীত বিদ্যা অধ্যয়ন করতো।[১২৬]

শিশু শ্রেণীতে সহশিক্ষা : 'আব্বাসীয় আমলে গৃহেই শিশুদের শিক্ষা শুরু হতো। ছয় বছর বয়সে বালক বালিকারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হতো। হযরত ইমাম গাযালী র.-এর মতো মনীষীগণও ছয় বছর বয়সে অধ্যয়ন শুরু করেন। বালিকারা কুর'আন শরীফ পাঠ ও ইসলামী জ্ঞান আহরণ করতো। যে সব লোক অধ্যয়নের মাধ্যমে ধর্ম তত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করতো, তারা শিক্ষাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতো।[১২৭]

গৃহ শিক্ষক নিয়োগ : 'আব্বাসীয় যুগে গৃহ শিক্ষক নিয়োগের প্রথা চালু ছিল। সমাজের ধনাঢ্য লোকেরা গৃহ শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতো। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন খালদুনের এক বর্ণনা থেকে 'আমরাহ' নামক এক বিখ্যাত মহিলার কথা জানা যায় যিনি তার নিজ গৃহকে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতেন।

---

১২৩. পি কে হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃ ৪৬৫।

১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬১।

১২৫. অধ্যাপক মুহাম্মদ মোমিন উল্লাহ, *শিক্ষার ইতিহাস*, ঢাকা : রহমান আর্ট প্রেস, ১৯৮০, পৃ ৪৯।

১২৬. *ইসলামী শিক্ষার সংকলন*, পৃ ৩৫-৩৬।

১২৭. পি কে হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বজনীন শিক্ষা

সে যুগে শিক্ষা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ধনাঢ্য দরিদ্র সকলেই শিক্ষা লাভে সমর্থ ছিল। শিক্ষার ব্যয় খুবই স্বল্প হওয়ার কারণে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরাও শিক্ষার আলো লাভে সমর্থ হতো। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে দাসগণও স্কুলে ভর্তি হতে পারতো।[১২৮]

খলিফা আল মামুন বাল্যকালে বিখ্যাত আরবী ভাষা ও বৈয়্যাকরণিক মহাপণ্ডিত কাসায়ীর কাছে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। পণ্ডিত কাসায়ীর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল এই যে, তিনি ছাত্রদের পড়তে বলতেন এবং আনতশিরে শুনতে থাকতেন, ছাত্র যখনই কোন ভুল পড়তো তৎক্ষণাৎ তিনি মাথা তুলে ছাত্রকে তা শুধরে দিতেন। শিশু মামুন এতই বুদ্ধিমান ছিল যে, উস্তাদ মাথা তোলা মাত্রই সে ভুল সেরে নিত, ওস্তাদকে ভুল ধরার সুযোগ দিতেন না।

একদিন তিনি কাসায়ীর কাছে সূরা সরফ-এর সবক পড়ছিলেন, ওস্তাদ চুপ করে বসেছিলেন, মামুন যখন এ আয়াত পাঠ করলেন :

হে বিশ্বাসীগণ! যা তোমরা রক্ষা কর না, তা বল কেন?[১২৯] তখন অজ্ঞাতসারে কাসায়ী মাথা তুলে আবার নত করলেন। মামুন তৎক্ষণাৎ স্বীয় পাঠ দ্বিতীয় বার পড়ে ভুল দেখতে না পেয়ে মহাভাবনায় পড়লেন, কারণ মামুন জানতেন যে, ওস্তাদ কোন ভুল না পেলে মাথা তুলেন না। ওস্তাদের কাছে হতে বিদায় হয়ে মামুন স্বীয় পিতা হারুনুর রশীদের নিকট গিয়ে বললেন :

> আব্বা! আপনি যদি ওস্তাদজীকে কিছু অঙ্গীকার করে থাকেন, তাহলে শীঘ্রই তা রক্ষা করুন। হারুনুর রশীদ বললেন, হ্যাঁ! আমার কাছে তিনি বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছিলেন। আমিও তা দিতে চেয়েছিলাম। তিনি কি এ সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলেছেন? মামুন বললেন না। হারুনুর রশীদ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তবে তুমি কিভাবে জানলে? মামুন তখন উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে বললেন, ওস্তাদজী ছাত্রের পড়ায় কোন ত্রুটি না পেলেও যখন মাথা তুললেন তখন বুঝলাম যে, সে আয়াতের শব্দে ভুল না থাকলেও মর্মে কোথাও ভুল ঘটেছে।

শিশু পুত্রের এ বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে হারুনুর রশীদ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা

শিক্ষকগণ যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। শিক্ষকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। যে সকল শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের কুর'আন শরীফ শিক্ষা দিতেন তাদের 'মুয়াল্লিম' বলা হতো। ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের জন্য কোন কোন সময় তাদেরকে 'ফকীহ' বলা হতো। মুয়াল্লিমদের সামাজিক মর্যাদা অন্যান্যদের চেয়ে নিম্নমানের ছিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষকগণকে বলা হতো 'মুয়াদ্দিব'। এ শ্রেণীর শিক্ষকগণ সমাজের মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তারা খলিফার সন্তানদের শিক্ষা দিতেন। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন অধ্যাপকবৃন্দ। তারা উচ্চ শিক্ষাদানে নিযুক্ত ছিলেন। ন্যায় শাস্ত্র, গণিত, ছন্দ ও আইন শাস্ত্র শিক্ষাদানে নিযুক্ত অধ্যাপকগণকে জনসাধারণ খুবই শ্রদ্ধা করতো। অধ্যাপকবৃন্দ নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[১৩০]

---

১২৮. প্রাগুক্ত।

১২৯. কুর'আন,

১৩০. পি কে হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৩, অধ্যাপক মুহাম্মদ মোমিন উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকদের বেতন

প্রথমদিকে শিক্ষকদের বেতন খুব কম ছিল। অনেকে নিয়মিত বেতন পেতেন না। সাধারণ শিক্ষক ও গৃহ শিক্ষকগণ যে বেতন পেতেন, তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম হওয়ায় তারা জীবিকা নির্বাহের খাতিরে রোজগারের জন্য অন্য কিছু করতেন। কবিতা ও গুণকীর্তন বাচক গীতি রচনাই ছিল আয়ের সব চেয়ে সহজ উপায়। খলিফাদের অনেক বেতনভোগী স্তুতি রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু যার উপর শাহজাদাদের শিক্ষাদানের ভার ন্যস্ত হতো, তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান। কালক্রমে শিক্ষকদের বেতন নিয়মিত হয়ে ওঠে এবং সুযোগ সুবিধাও বৃদ্ধি পায়। তাঁদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পেয়ে দৈনিক ১৫ দিনারে দাঁড়ায়।[১৩১] শিক্ষক ও ছাত্ররা মসজিদ, পবিত্র স্থান, হাসপাতালের আয় এবং ধনী সম্প্রদায়ের চাঁদা হতে সাহায্য লাভ করতেন। তাদের কেউ কেউ সরকারি কোষাগার থেকেও ভাতা পেতেন।

শিক্ষা পদ্ধতি ও বিষয় নির্বাচনে শিক্ষকদের স্বাধীনতা

পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক জ্ঞান লাভের পর পনের বছর বয়স্ক ছাত্ররা সাধারণত উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে যেতো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা অনুসরণের কোন ধরা বাধা নিয়ম ছিল না। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক খোদা বখস বলেন, 'নিয়মিত কোন শিক্ষা পদ্ধতি কিংবা নির্দিষ্ট কোন পাঠ্য তালিকা ছিল না। প্রত্যেক শিক্ষক বা অধ্যাপকের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্য তালিকা ছিল। শিক্ষক নিয়োগ ও বরখাস্ত করার অধিকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতার থাকলেও শিক্ষা পদ্ধতি ও বিষয় নির্বাচনের পূর্ণ স্বাধীনতা শিক্ষকগণ ভোগ করতেন।'

শাসক গোষ্ঠীর গদী ও ধর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত বিপদাপন্ন হতো না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা শিক্ষকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাৎসরিক নির্দিষ্ট কোন ছুটি ছিল না। পাঠ্য পুস্তক অধ্যায় শেষ না হলে সাধারণত ছুটি দেয়া হোত না।[১৩২]

প্রকৃত শিক্ষা প্রদানই শিক্ষকদের উদ্দেশ্য

প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পাঠ্য পুস্তক মুখস্ত ছিল। ফলে বক্তৃতা দেয়ার সময় তাদের কোন অসুবিধা হতো না। ছাত্ররা যাতে বক্তৃতা লিখে নিতে পারে সে জন্য তারা ধীরে ধীরে বক্তৃতা করতেন। শিক্ষকরা বক্তৃতা ঠিকমতো লেখা হচ্ছে কি না তা সঠিকভাবে পরীক্ষা করে দেখতেন। শুদ্ধরূপে কেউ লিখতে না পারলে তাকে তিরস্কার করা হতো। নিশাপুরের বক্তৃতা গৃহে ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য সর্বদা পাঁচশত দোয়াত প্রস্তুত ছিল।

শিক্ষকগণ দায়সারা গোছের বক্তৃতা করেই নিজেদের দায়িত্ব মুক্ত মনে করতেন না। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করতেন যাতে ছাত্ররা পূর্ণমাত্রায় অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এ জন্য শিক্ষক ছাত্রদের প্রশ্ন করতেন এবং তাদেরও প্রশ্ন করার সুযোগ দিতেন। অনেক শিক্ষক বক্তৃতার সময় নিজের আসন ছেড়ে ছাত্রদের নিকট গিয়ে তাদের বোঝাতেন। কেউ কেউ ছাত্রদেরকে অবসর সময় বাড়িতে আসতে বলতেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো ও শ্রদ্ধা করতো। তারা শিক্ষকদের সেবা করতো, তাদের সাথে বাইরে যেতো। বাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এনে দিত, এমনকি তাদের জন্য খাদ্য সামগ্রীও প্রস্তুত করতো। শিক্ষকগণ সন্তুষ্ট হয়ে অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন স্নেহভাজন ছাত্রের সাথে নিজ কন্যাকে বিয়েও দিতেন। ছাত্ররা পাঠ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ দ্বারা শিক্ষকদের সন্তুষ্ট করে তাদের কাছে থেকে সনদ লাভ করতো।[১৩৩]

---

১৩১. পি কে হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬২।

১৩২. *ইসলামী শিক্ষা সংকলন*, পৃ ৩৭।

১৩৩. পি কে হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬২, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি*, পৃ ৩৪, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও এ এস এম আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আব্বাসীয় যুগে শিক্ষা কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। খলিফা আল মামুন উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁর রাজধানীতে বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অনুবাদ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্র ও সাধারণ পাঠাগার হিসেবে কাজ করতো। এর সাথে একটি মসজিদও যুক্ত ছিল। এই কলেজের অধ্যক্ষ সালামকে খলিফা গ্রীক ভাষায় মূল্যবান গ্রন্থসমূহ আরবীতে অনুবাদ করার জন্য গ্রীসে পাঠিয়েছিলেন।

বায়তুল হিকমাহ

বায়তুল হিকমাহ মধ্যযুগ ও আধুনিক বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যারয়ের গৌরব দাবী করতে পারে। কারণ এ বিশ্ববিদ্যালয় প্যারিস, অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজের বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছিল। বায়তুল হিকমার সাথে একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। এর গ্রন্থাগারিক ছিলেন আল খারিযমী, তিনি একজন বিখ্যাত অংক শাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। আত তাবারী, মাসউদী ও ইয়াকুবীর মত অনেক পণ্ডিত ও মনীষী বাগদাদের এ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন। সর্ব সাধারণের মধ্যে জ্ঞান চর্চা এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, বাগদাদে সে সময় একশত গ্রন্থ বিপণী হতে বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ বিক্রয় হতো।[১৩৪]

নিযামিয়া প্রতিষ্ঠা

একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেলজুক সুলতান আলাপ আর সালান ও মালিক শাহের আমলে প্রখ্যাত মন্ত্রী নিজামুল মূলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'নিযামিয়া' ছিল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ নিযামিয়াই পরবর্তীকালে উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়েছিল। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে নিযামুল মূলকই প্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা দান পদ্ধতি এমন ছিল যে, জনসাধারণ ইচ্ছা করলে বক্তৃতা শোনার সুযোগ পেত। নিযামুল মূলক একটি ব্যাপক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং সরকারি আনুকূল্যে অনেক মাদ্রাসা-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অভিজ্ঞ, উচ্চ শিক্ষিত ও যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাযালীও (১০১৯-৯৫) দীর্ঘ চার বছর নিযামিয়ার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

---

১৩৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ মোমিন উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০; পি কে হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : চার
উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা

হযরত মুহাম্মদ সা. ও সাহাবা যুগ

প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই 'আরবরা তাদের আদি পিতার অবতরণ স্থান[১৩৫] এই উপমহাদেশে যাতায়াত করে আসছেন।[১৩৬] ঐতিহাসিক এলফিস্টোন বলেছেন যে, হযরত ইউসূফ আ.-এর আমল থেকেই এ উপমহাদেশের সাথে 'আরবদের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক চালু ছিল।[১৩৭] জেমস টেইলর-এর মতে, হযরত 'ঈসা আ.-এর জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্ব থেকে দক্ষিণ আরবের সাবা সম্প্রদায়ের লোকেরা এ উপমহাদেশের পূর্ব-উত্তর এলাকায় পাল তোলা জাহাজে করে যাতায়াত করতো।[১৩৮]

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর গবেষণা গ্রন্থ 'আরব ও হিন্দ তা'আল্লুক'-এর সূত্র উল্লেখ করে বলেছেন, 'আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসার হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এ উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশে পাশে 'আরবদের স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। 'আরব দেশ থেকে বছরে অন্তত দু'বার এসব উপনিবেশে নৌবহর এসে নোঙর করতো। ফলে ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই তা এ দেশের জনগণের কাছে পৌছেছিল।[১৩৯] কারণ ইসলামের আবির্ভাব তখন সমগ্র 'আরবে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এমন একটা সাড়া জাগানো খবর বণিকদের মাধ্যমে বিদেশে পৌছে নি এমনটা ধারণা করা যায় না। বরং তখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর আবির্ভাব এবং তার প্রচারিত ইসলামের কথা লোকমুখে এক চমকপ্রদ খবর হিসেবে প্রচারিত হতো বলেই অনুমান করা যায়।

---

১৩৫. মানব জাতির পিতা হযরত আদম আ. জান্নাত থেকে সর্বপ্রথম ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় দ্বীপ লঙ্কাতে আগমন করেন। মা হাওয়া পৌছেন 'আরবে। উভয়ের সাক্ষাত ঘটে প্রথমে জিদ্দায় ও পরে আরাফাতে। এটাকেই 'আরব এবং ভারত উপমহাদেশের প্রথম সম্পর্ক মনে করা হয়। মাওলানা আজাদ বিলগ্রামী এ ধরনের কয়েকটি বর্ণনা একত্র করে উভয় দেশের সম্পর্ক প্রমাণের চেষ্টা করেন। তিনি ইঙ্গিত করেন যে, হযরত আদম আ. জান্নাত থেকে বের হওয়ার সময় হাজরে আসওয়াদ বা জান্নাতের কালো পাথরটি তার সাথে ছিল। পরে সে পাথরটি লঙ্কা এবং দক্ষিণ ভারত হয়ে মক্কায় কাবা গৃহে স্থাপিত হয়। এ উভয় দেশের সম্পর্ক সূত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ভারতের গোলাম আহমদ মোর্তজা তাঁর 'চেপে রাখা ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আদম আ. সর্বপ্রথম নবী হিসেবে ভারতে এসেছেন, ফলে আল্লাহর প্রধান ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল আ. সর্বপ্রথম ভারতের মাটিতেই পদার্পণ করেন। তিনি আরও লিখেছেন যে, হযরত আদম আ. যখন ভারতে আসেন তখন স্বর্গীয় সুগন্ধে তার দেহ সুরভিত ছিল। ফলে ভারতের সুগন্ধি দ্রব্য তুলনামূলকভাবে পৃথিবীতে বিখ্যাত। যেমন মৃগনাভী, কর্পূর, চন্দন কাঠ, জাফরান, কেওড়া, গোলাপ ইত্যাদি। 'চেপে রাখা ইতিহাস' গ্রন্থে তাবরাণী থেকে হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, হযরত আদম আ. কে পৃথিবীতে পাঠানোর পরেই হযরত জিবরাঈল আ. কে সেখানে পাঠানো হয়। হযরত জিবরাঈল 'মুহাম্মদ' শব্দটি উচ্চারণ করেন। হযরত আদম আ. তখন মুহাম্মদ-এর পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে হযরত জিবরাঈল আ. বলেন, তিনি আপনার সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। গবেষক ড. মুহাম্মদ আলী উল্লেখ করেছেন, বিশ্বনবী নিজেও ভারতকে ভালোবাসতেন। তিনি একবার বলেছেন, ভারত হতে আমার নিকট স্নিগ্ধ শীতল হাওয়ার হিল্লোল ভেসে আসছে। [দ্র. গোলাম আহমদ মোর্তজা, *চেপে রাখা ইতিহাস*, কলিকাতা : এ্যাভন্ডান্স বুক ডিপো, ১৯৮৯, পৃ ৫৬-৬৫।]

১৩৬. *মাসিক তরজুমানুল হাদীস*, ১০ সংখ্যা, (পাবনা) পৃ ৪৩২।

১৩৭. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান* (১৭৫৭-১৮৫৭), অপ্রকাশিত পিএইচ ডি ডিগ্রী অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ ৪১।

১৩৮. James Tailor, 'Remark on the segnal to periprlus of the Erithreom sea', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. 16, 1847, p 76.

১৩৯. মুহীউদ্দীন খান, '*বাংলাদেশে ইসলাম : কয়েকটি তথ্যসূত্র*', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ২৭ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৮৮, পৃ ৩৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

আশরাফ আলী থানবী র.-এর 'ইসলাম কি সাদাকাত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, গুজরাটের রাজা ভোজের বংশধর বলে দাবীদার মৌলবী হাসান রিজা বলেছেন, একদা গুজরাটের রাজা ভোজ তাঁর ইমারতের ছাদে উঠেন এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত দেখতে পান, এ রহস্য উদঘাটনের জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠান। তারা যোগ সাধনা বলে বললেন, 'আরবদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি তার ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য আঙ্গুলের ইশারায় এ অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন। রাজা হযরত রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এক দূত পাঠালেন ও সাথে একখানা পত্র দিলেন। তাতে লিখলেন, হে মহামান্য! আপনার এমন একজন প্রতিনিধি আমাদের দেশে পাঠান, যিনি আমাদের আপনার সত্য ধর্ম শিক্ষা দিতে পারবেন। তখন বিশ্বনবী সা. তাঁর জনৈক সাহাবাকে হিন্দে পাঠিয়ে দেন, তিনি রাজা ভোজকে ইসলামের বয়াত করেন। তাঁর নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ। রাজার ধর্ম পরিবর্তনে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা রাজার বদলে রাজার ভাইকে সিংহাসনে বসায়। যে সাহাবা এসেছিলেন তিনি এ দেশেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর ও 'আবদুল্লাহর (রাজা ভোজের) মাজার গুজরাটের ধারদা শহরেই রয়েছে।[১৪০]

'ইসাবা ফী তমিইজ আস সাহাবা' গ্রন্থের এক বর্ণনায় বাবা রতন আল হিন্দ নামে এক লোক রাসূলুল্লাহ সা.-এর খিদমতে গিয়ে সাহাবা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৪১] ঐতিহাসিক বুজুর্গ বিন শাহরিয়ার বলেন, আরবে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর ইসলাম প্রচারের কথা জানতে পেরে স্বরণদ্বীপের বাসিন্দারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে দূত পাঠায়। এ দূত মদীনায় পৌছেন হযরত উমর রা.-এর খিলাফতকালে। হযরত উমর রা.-এর সাথে তার সাক্ষাত হয়। তিনি কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন। ইসলাম ও ইসলামের নবী এবং সাহাবাদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। দেশে ফেরার পথে ঐ দূত বেলুচিস্তানের কাছে মাকরান এলাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তার সাথী স্মরণদ্বীপ পৌছে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। এতে স্মরণদ্বীপের জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। স্মরণদ্বীপের রাজাও এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৪২]

কলিকাতা থেকে প্রকাশিত বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমাল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মগ্রহণ অভিলাষে মক্কা নগরী গমন করেন।[১৪৩] শায়খ জয়নুদ্দীন প্রণীত 'তুহকাতুল মুজাহেদীন' পুস্তকেও উল্লেখ করা হয়েছে, মালাবরের রাজা মক্কা গমন করে রাসূলুল্লাহ সা.-এর খিদমতে হাজির হন। তাঁর নিকট ইসলামের বয়াত গ্রহণ করেন। মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় রাজা আল্লাহর নবীর জন্য আদা ও এদেশে তৈরী একটি তরবারীসহ কিছু মূল্যবান উপহার সামগ্রী সঙ্গে করে নেন। রাসূলুল্লাহ সা. সেই আদা নিজে খান এবং সাহাবীদের মধ্যেও বন্টন করে দেন। সেই তরবারীটি বরাবরই হযরত সা.-এর সঙ্গে ছিল। সে সময় থেকেই স্থানীয় মুসলমান ও অমুসলমানগণ এ ধারণা পোষণ করতো যে, রাজা কিছু কাল হযরতের খিদমতে অবস্থান করেন। পরে দেশে ফেরার সময় 'শহর' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[১৪৪]

হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবদ্দশায় তাঁর কয়েকজন শিষ্য ভারতের মালাবার[১৪৫] উপকূলে আগমন করেন। সেখানে তারা 'চেরুমাল' পেরুমল নামক হিন্দু রাজার সাথে সাক্ষাত করেন। এ রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন।

---

১৪০. এ কে এম মহিউদ্দীন, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৬, পৃ ১৫-১৬।

১৪১. ইবন হাজার আসকালানী, *আল-ইসাবা ফী আহওয়ালিস আস সাহাবা*, ১ম খ, পৃ ১০৯৫।

১৪২. K M Nizami, *Arab accounts of India* গ্রন্থের ভূমিকা।

১৪৩. *বিশ্বকোষ*, কলিকাতা : ১৪ খ, পৃ ২৩৪।

১৪৪. শায়খ জয়নুদ্দীন, *তহফুতুল মোজাহেদীন* দ্র.।

১৪৫. মালাবর ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশের একটি জেলার নাম, ভৌগোলিক পরিভাষায় অনেক সময় সম্পূর্ণ নাম 'আরববাসী কর্তৃক প্রদত্ত হয়। মালাবর 'আরবী শব্দ, মালয়+আবার মালাবর। মালয় মূলত একটি পর্বতের নাম, আবার অর্থ-কূপপুঞ্জ, জলাশয়। 'আরবরা এদেশকে মা'বার বলে থাকেন, মা'বার অর্থ অতিক্রম করে যাওয়ার স্থল পারঘাট। যেহেতু 'আরব বণিকরা এ মাঠ দু'টি পার হয়ে মাদ্রাজ ও হিজাজ প্রদেশে যাতায়াত করতেন, এ জন্যই তারা এ দেশকে মা'বার বলতেন। [দ্র. মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, ঢাকা : ১৯৬৫।]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি 'শরিফ বিন মালিক' নামক একজন 'আরবীয় মুসলিমকে ভূমি প্রদান করেন ও ইসলাম প্রচারের অনুমতি দেন। 'আরবীয় বণিকগণ সমগ্র মালাবর উপকূলে ও দাক্ষিণাত্যে ইসলাম প্রচার করেন।[১৪৬]

ভারত উপমহাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে মাওলানা আকরম খাঁ বলেছেন, 'আরব নাবিক ও বণিকগণ সর্বদা এ পথ দিয়ে বঙ্গদেশ ও কামরূপ হয়ে চীন দেশে যাতায়াত করতেন। এই মালাবরই ছিল তাদের মধ্যপথের প্রধান বন্দর। এখানকার মুহাজিরগণের ভাষাও ছিল 'আরবী। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা.ও ইসলাম ধর্মের সকল প্রকার বিবরণ সম্পর্কে যে তাঁরা যথাসময়ে সম্যকরূপে অবগত হতে পেরেছিলেন, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। এ প্রসঙ্গে এটিও স্মরণ করতে হবে যে, 'আরব বণিকরাই ছিলেন হিজরী ৭ম শতক পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের প্রধান উদ্যোগী ও সদাসক্রিয় উপলক্ষ। উক্ত বর্ণনার আলোকে বলা যায় যে, এ উৎসাহী ও ধর্মপ্রাণ প্রচারকগণের সংশ্রবে আসার ফলেই মালাবরের 'আরব মুহাজিরগণ হযরতের জীবনকালে খুব সম্ভবত হিজরী সনের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মালাবরের অনারব অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামের প্রসার আরম্ভ হয়।[১৪৭]

রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে 'আরবদের ব্যবসা বাণিজ্য ভারতের পশ্চিম উপকূল হয়ে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালীন চীন সম্রাট তাইসুঙ-এর নিকট রাসূলুল্লাহ সা.-এর লিখিত একটি পত্র এর প্রমাণ বহন করে। পত্রটির কথা N.G Wells এভাবে উল্লেখ করেছেন, To the Monarch (Tai-Sung) also came (in A.D. 628) messeges from Mohammad they came to canton on a tradingship they have sailed the whole way from Arabia along the Indian coasts unlike Heracleus and kavadh. Tai sung gave there envoys a courteous heoring. He expressed his interest in their theological ideas and practices and assisted them to build a mosque in canton a mosque survivsit is said to this day the oldest mosque in the world.[১৪৮]

উপরোক্ত বিবরণসমূহের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, হিজরী প্রথম শতকের প্রারম্ভেই ভারতের পশ্চিম উপকূল ইসলামের সত্যবাণীর সংস্পর্শে আসে। এটাও স্বতঃসিদ্ধ ইসলামের বাণী নিয়ে যে সকল মুসলিম বণিক সে সময় এ অঞ্চলে এসেছিলেন তারা ছিলেন সাহাবী। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন বন্দর হয়ে চীন দেশে ও তার আশ পাশে ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক শক্তিশালী দলীলের অভাবে আমরা তাদের পরিচয়, আগমনের সঠিক তারিখ চিহ্নিত করতে পারছি না। তবে রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে সাহাবীদের মাধ্যমে যে মালাবরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে মালাবরে ইসলাম প্রচারের জন্য কে বা কারা এসেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ইসলামের প্রাথমিক যুগের পটভূমি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

নবী করীম সা.-এর নবুয়্যাতের পঞ্চম সালে মক্কার বৈরী পরিবেশে ইসলাম অনুসারীদের অস্তিত্ব নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ায় তিনি দু'দফায় ১১৭ জন সাহাবীকে আবিসিনিয়া (হাবশা) রাজ্যকে নিরাপদ ও বন্ধুসুলভ জেনে সে দেশে হিজরত করার আদেশ দিয়েছিলেন।[১৪৯]

একটি অমুসলিম রাষ্ট্রে মহানবী সা. কোন্ ভরসায় তার প্রিয় সাহাবাগণকে পাঠিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল তাঁর *হায়াতে মুহাম্মদ* গ্রন্থে লিখেছেন মক্কার মূর্তিপূজকরা ছিল ইসলামের চরম শত্রু। পক্ষান্তরে ইসলামও মূর্তিপূজার চরম শত্রু। এমতাবস্থায় বাইরে ইসলামী আদর্শের পরিবেশ সহায়ক হতে

---

১৪৬. ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ঢাকা : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০, পৃ ২১১।

১৪৭. মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮-৪৯।

১৪৮. উদ্ধৃত, সৈয়দ মাহমুদুল হাছান, *বাংলাদেশে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ*, ঢাকা : বাংলাদেশে সৌদী 'আরব ভ্রাতৃ সমিতি, ১৯৯১, পৃ ৪৩।

১৪৯. শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর রাহিকুল মাখতুম*, রিয়াদ : মাকতাবাতু দারুস সালাম, ১৯৯৩, পৃ ৯২-৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

পারে ভেবে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁদের পাঠিয়েছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে, এ হিযরত রাসূলুল্লাহ সা.-এর দূরদর্শিতার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।[১৫০]

মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদবীর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ সা. যখন দেখলেন যে, কুরাইশদের প্রতিকূলতার মধ্যে ইসলামী আহকামের উপর প্রকাশ্য 'আমল এবং অন্যদের সামনে ইসলামকে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না, তখন তিনি হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন।[১৫১]

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান উল্লেখ করেছেন, ইসলামের বাণী বাইরে প্রচার করার জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই রাসূল সা. প্রধানত কিছু সংখ্যক সাহাবীকে হাবশায় পাঠিয়ে ছিলেন। কারণ লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত হাবশা ছিল তখন একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র। পশ্চিমে মিশর এবং পূর্বে চীন পর্যন্ত পণ্য বিনিময় হতো। রাসূলুল্লাহ সা. এ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রটি পূর্ণ মাত্রায় খবর আদান প্রদানের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।[১৫২]

ইবন কাইয়্যেম আল যাওযী তাঁর 'যাদুল মা'য়াদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাবশার মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সা.-এর মদীনায় হিজরতের সংবাদ পেয়ে ৪২ জন নারী-পুরুষ ফিরে আসেন। অবশিষ্ট মুহাজিরগণ হাবশায় থেকে যান। ৭ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সা. নাজ্জাশীর নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একপত্র সাহাবী আমর ইবন উমাইয়া আজ্জামরীর রা.-এর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। এ পত্রেই অবশিষ্ট মুহাজিরদের ফিরে আসার অনুমতি দেন। পত্র পেয়ে নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দু'খানা জাহাজে তাদের পাঠিয়ে দেন। খায়বর বিজয়ের দিনে তারা এসে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে মিলিত হন। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁদেরকেও খায়বরের গনিমতের অংশ দান করেন।[১৫৩]

আবিসিনিয়ায় যারা হিজরত করেছিলেন তারা সকলেই কি মক্কায় বা মদীনায় ফিরে গিয়েছিলেন? এ সম্পর্কে রুহুল আমীন তাঁর 'বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান' অভিসন্দর্ভে উল্লেখ করেছেন যে, আবিসিনিয়ার অন্যতম মুহাজির রাসূলুল্লাহ সা.-এর মামা হযরত আবূ ওয়াক্কাস রা.[১৫৪] হাবশা থেকে মক্কায় বা মদীনায় ফিরে আসেন নি। প্রবাস স্থল থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুয়াতের ৭ম সালে সম্রাট নাজ্জাশীর দেয়া একখানা সমুদ্রগামী জাহাজে তিনজন সঙ্গীসহ পূর্বদিকে সুদীর্ঘ বাণিজ্য পথ ধরে বের হয়ে পড়েন। তিনি ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে মহাচীন গমন করেন। সে ঝাণ্ডা সবল হাতে চীনের মাটিতে পুঁতে সেখানেই জীবন অতিবাহিত করেন। আবার সেখানকার মাটিতেই কবরস্থ হন।[১৫৫]

জয়নুদ্দীন ফকীহ প্রণীত 'তুহফাতুল মুজাহেদীন' গ্রন্থের উল্লেখ মতে অভিযাত্রী দল পূর্ব দিকে জাহাজ ভাসিয়ে প্রথমে ভারতের মালাবরে উপনীত হন। সেখানকার রাজা চেরুমল ও পেরুমল সহ বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশেষে অনেক স্থানে যাত্রা বিরতির পর চীনের ক্যান্টন বন্দরে উপনীত হন। চীনা ভাষায় সে দেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে যেসব তথ্য সূত্র রয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, খ্রীস্টীয় ৬২৬ শতাব্দীর কাছাকাছি কোন এক সময়ের মধ্যে এ ইসলাম প্রচারক দল চীনের উপকূলে অবতরণ করেন। এ প্রচারক দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আবূ ওয়াক্কাস রা., তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাসূল সা.-এর আরও তিনজন সাহাবী।[১৫৬]

---

১৫০. মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল, হায়াতে মুহাম্মদ, কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ আল মুহাম্মদীয়া, ১৯৬৮, পৃ ১৫৪-১৫৮।

১৫১. সাইয়্যেদ সুলাইমান নদবী, *'আরব ও হিন্দ কে তায়াল্লাকাত*, এলাহাবাদ : ১৯৩০, পৃ ৬৯।

১৫২. মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৭।

১৫৩. ইবন কাইয়্যেম আল জাওযী, *যাদুল মা'য়াদ*, বৈরুত : মাকতাবাতু বুহুছ ওয়াদ দারাসাত, ১৯৯৫, ৩য় খ, পৃ ২১।

১৫৪. হযরত আবূ ওয়াক্কাস ছিলেন রাসূল সা.-এর মাতা আমিনার ভাই। সে হিসেবে তিনি রাসূল-এর মামা, রাসূল সা.-এর নবুয়তের ৫ম বৎসরে কোন এক সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর আবিসিনিয়ায় হিযরতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। চীনের কোয়াংটা মসজিদের অদূরে তার কবর অবস্থিত। [দ্র. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪]

১৫৫. প্রাগুক্ত।

১৫৬. সাইয়্যেদ সুলাইমান নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটা মসজিদটি এখনও সমুদ্রতীরে তার সুউচ্চ মিনারগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদের অদূরে তাঁর কবর এখনও বিদ্যমান। তাঁর তিন সঙ্গীর দুজন সমাহিত রয়েছেন। উপকূলীয় কুকীল চুয়াম চু বন্দরের নিকটবর্তী লিং নামক পাহাড়ের উপর। তৃতীয়জন সম্পর্কে এটুকু বলা হয়েছে যে, তিনি দেশের অভ্যন্তর ভাগে চলে গিয়েছিলেন।

বিভিন্ন তথ্যসূত্রে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ প্রচারক দলটি হাবশা থেকে নবুয়তের সপ্তম সালে যাত্রা করেছিলেন। আর নবুয়তের ষোড়শ বর্ষে এসে চীনে পৌঁছেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা পথিমধ্যে কমপক্ষে নয় বৎসরকাল অতিবাহিত করেছিলেন। দীর্ঘ এ নয় বৎসর তারা সমুদ্র বক্ষে কি কাজে ব্যয় করেছিলেন তা একটা অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের এ নয় বৎসরের ভ্রমণ বৃত্তান্তের লিখিত কোন দলিল পাওয়া যায় না। তবে ইতোপূর্বে বিভিন্ন সূত্রের যে সব প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, যেমন হাবশা থেকে যাত্রা করার পর তাদের ইসলাম প্রচারের প্রথম মঞ্জিল মালাবর, মালাবর থেকে রওয়ানা হওয়ার পর দ্বিতীয় মঞ্জিল খুব একটা জটিল মনে হয় না।

আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদবী লিখেছেন, 'মিশর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত সমুদ্র পথে 'আরব নাবিকগণ নৌ পরিচালনা করতেন। মালাবর উপকূল হয়ে তারা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন। এখানকার চট্টগ্রাম এবং কামরূপে তাদের বাণিজ্য বহর নোঙ্গর করতেন। দীর্ঘপথে পাল টানা জাহাজের একটানা যাত্রা সম্ভব ছিল না। পথে পথে যে সব মঞ্জিল ছিল সেগুলোতে থেমে থেমে জাহাজ মেরামত এবং পরবর্তী মঞ্জিলের জন্য রসদপাতি সংগ্রহ করতেন।[১৫৭]

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মালাবর থেকে রওয়ানা হওয়ার পর হযরত আবূ ওয়াক্কাস রা.-এর জাহাজ বাংলার বন্দরে নোঙ্গর করেছিল। চীনের পরিব্রাজক মাহুয়ানের বর্ণনানুযায়ী জানা যায়, বর্তমান চট্টগ্রাম কক্সবাজারের মধ্যবর্তী কোন একটি স্থানে এমন একটি বন্দর নগরী ছিল, যেখানে খুব উন্নতমানের সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরী হতো। এ সব তৈরী জাহাজ সমগ্র প্রাচ্য জগতে ব্যবহৃত হতো। এ বন্দরে জাহাজ মেরামতের কাজও হতো। দূর থেকে প্রতিটি জাহাজ এ বন্দরে যাত্রা বিরতি করতো।[১৫৮]

হযরত আবূ ওয়াক্কাস-এর কাফেলা সেই বিখ্যাত বন্দরে যাত্রা বিরতি না করেই সুদূর চীনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, এমনটা কল্পনাও করা যায় না। বরং অনুমান করা যায় যে, এখানে যাত্রা বিরতির পর কিছুকাল অবস্থান করে কিছু লোককে ইসলামের দীক্ষা দিয়েছেন।

মুহাম্মদ রুহুল আমীন তাঁর অভিসন্দর্ভে এ প্রচারক দলের একটি অনিবার্য ধারণা পেশ করেছেন।
প্রথমতঃ হাবশা থেকে সরাসরি চীনে পৌঁছা তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। হাবশা সম্রাটের নির্দেশও তা ছিল না। তারা এ সময়টা প্রমোদ ভ্রমণ বা দৃশ্যাবোলোকনেও অতিবাহিত করেন নি। যাত্রা পথে সমস্ত সময়টাই তাঁরা প্রচার কার্যে নিয়ত ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশে ইসলামের প্রথম আলো এসেছিলো রাসূল সা.-এর জীবদ্দশায়, এ সম্মানিত সাহাবীগণের দ্বারা। তারাই মালাবরে পরে চট্টগ্রামে যাত্রাবিরতি করে সেখানে চাটি গেঁড়েছিলেন। যা থেকে পরে চাটিগাঁ বা চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হয়।

তৃতীয়তঃ চট্টগ্রামের পর চীনের পথে ব্রহ্মদেশ ও মুসলিম অধ্যুষিত মালয়েশিয়াতেও ইসলামের প্রচার কাজ করেছিলেন। তা ছাড়া ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপাঞ্চল এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যে সকল দ্বীপাঞ্চল মুসলিম বসতিপূর্ণ দেখা যায়, সে সব অঞ্চলে তারাই ইসলাম প্রচার করেছেন।

চতুর্থতঃ নয় বৎসরের প্রতি এক বৎসরে এক একটি স্থানে জাহাজ ভিড়িয়ে প্রচার কাজ করলেও মালাবর এবং চট্টগ্রামসহ অন্ততঃ নয়টি স্থানে তারা ভ্রমণকালের কর্মস্থল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এ হিসেবে দক্ষিণ পূর্ব

---

১৫৭. মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৭।

১৫৮. জয়নুদ্দীন ফকির, *তুহফাতুল মুজাহেদীন*, পৃ ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

এশিয়ার কোন গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ তারা বাকি রাখেন নি। 'আরব বণিকরা এ সকল স্থানে পরে ইসলামের কাজ করলেও সূচনার কাজ এ কাফেলার দ্বারাই সাধিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

গবেষক এ প্রচারক দলের চারটি নাম উল্লেখ করেছেন :

১. হযরত আবূ ওয়াক্কাস ইব্‌ন ওয়াহাব ইব্‌ন মানাফ রা.

২. হযরত উরওয়া ইবন আছাছা রা.

৩. হযরত কায়েস ইবন হুযায়ফা রা.

৪. হযরত আবূ কায়েস ইবনুল হাবিস রা.।[১৫৯]

এ কে এম মুহিউদ্দীন তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে এ সময়কার অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে চট্টগ্রামে আগত সাহাবায়ে কিরামের পাঁচটি নাম উল্লেখ করেছেন ।

১. আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইব্‌ন ওয়াহাব রা.

২. তামীম আনসারী রা., (হিজরত করেন নি)

৩. কায়স ইবন হুায়রাফী রা.

৪. উরওয়াহ ইবন আছাছা রা.

৫. আবূ কায়েস ইবন হারেছা রা.।[১৬০]

এখানে হযরত তামীম আনসারীর নাম সংযোগ হয়েছে। তামীম আনসারী হাবশায় হিযরতকারী ছিলেন না। ফলে তিনি হযরত আবূ ওয়াক্কাসের সাথী হিসেবে আগমন করেন নি এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। হতে পারে তিনি পরবর্তী কোন সময়ে মুসলিম বণিকদের সাথে এ দেশে এসেছিলেন।

হযরত উমর রা.-এর খিলাফতকালে প্রথমে কয়েকজন প্রচারক (মুমিন) বাংলাদেশে আসেন। একই উদ্দেশ্যে এর রকম পাঁচটি দল পর পর এদেশে আগমন করেন। তাদের সাথে কোনও অস্ত্র শস্ত্র বা বই পুস্তকও থাকতো না। তারা রাজ ক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাদের প্রচার পদ্ধতির একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল যে, তাঁরা এদেশের চলতি ভাষার মাধ্যমেই ধর্ম প্রচার করতেন। অল্পসংখ্যক সত্যিকার মুসলমান তৈরী করা তাদের লক্ষ্য ছিল। তাঁরা গ্রামে বাস করতেন। সফর করে ধর্ম প্রচার করা তাদের প্রধান কাজ ছিল। এরপর আরও পাঁচটি দল মিশর ও পারস্য থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাদের বলা হতো 'আবিদ' তারা বিভিন্ন স্থানে 'খানকাহ' বা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে ধর্ম প্রচার চালিয়ে যেতেন।[১৬১]

হযরত 'উমর রা.-এর শাসনামলে (৬৩৩-৬৪৩ সাল) সিন্ধু প্রদেশের সাথে 'আরবদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। ঐতিহাসিক বালাজুরী তাঁর 'ফুতুহুল বুলদান' গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। 'উসমান ইব্‌ন আবুল আবী সাকাফী তার ভাই মুগীরা, সাকাফ হাবিস ইবন মুরুরী 'আবদী প্রমুখ সেনাপতি কয়েকবার সিন্ধু সীমান্তে আসেন এবং বিভিন্ন এলাকা দখল করেন। চুয়াল্লিশ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনামলে সেনাপতি মুহাল্লাব ইবন আবূ সফুরী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে সুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়াজ নামক স্থানে পৌছেন। মুহাল্লাবের পর 'আবদুল্লাহ ইবন সারওয়ার, রাশিদ ইবন আমর জাগীবী, সিনান ইবন সালমাহ, আব্বাস ইবন যিয়াদ ও মুসজির ইবন জারুদ 'আবদী কয়েকবার হিন্দুস্থান সীমান্তে অভিযান চালান।[১৬২]

---

১৫৯. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫।

১৬০. এ কে এম মহিউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

১৬১. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮-৫৯।

১৬২. আবদুল গফুর, 'মহানবীর যুগে উপমহাদেশে ইসলাম', অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ ৪৯-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ভারত অভিযান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দুটি হাদীস প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের এ অঞ্চলের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কারণ হাদীস দুটির মধ্যে হিন্দুস্থান বিজয়ের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। নাসায়ী শরীফে সংকলিত হযরত সাওবান বর্ণিত একটি হাদীস :'আমার উম্মতের মধ্যে দুটি দলকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি দেবেন। তার মধ্যে একটি দল হিন্দু অভিযানকারী সেনাদল, আর দ্বিতীয়টি হল ঈসা ইব্‌ন মারিয়ম আ.-এর সহযোগী দল।[১৬৩]

নাসায়ী শরীফে সংকলিত অন্য হাদীসটিতে হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে ভারত অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। কাজেই সে সময় পর্যন্ত আমি জীবিত থাকলে অবশ্যই এ যুদ্ধে আমার ধন ও প্রাণ দান করতে কুণ্ঠিত হবো না। এতে যদি আমাকে হত্যা করা হয়, তবে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। আর যদি সহিসালামতে ফিরে আসতে পারি, তাহলে আমি হবো দোযখ মুক্ত।'[১৬৪]

রাসূলুল্লাহ সা. নিজেই ভারত অভিযানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করায় সাময়িকভাবে ব্যর্থতা সত্ত্বেও 'আরবদের ভারত অভিযানের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় নি। নৌপথ এবং স্থলপথে বার বার অভিযান চালানো হয়েছে। এ সময় হয়তো অনেক সাহাবী এবং তাবেয়ী উপমহাদেশের বিশেষ অঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন। প্রফেসর মুহাম্মদ এছহাক তার India's Contribution to the Study of Hadith Literature শীর্ষক পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভে হযরত 'উমর রা.-এর খিলাফত আমল (হিজরী ১৩/৬৩৩ সাল) থেকে হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর খিলাফত হি. ৬০/৬৭৩ সাল পর্যন্ত নয় জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যারা ভারত উপমহাদেশে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।[১৬৫]

হযরত 'উমর রা.-এর যুগে (১৩-২৩ হি./৬৩৩-৬৪৩ খ্রী.) ভারত উপমহাদেশে আগমনকারী সাহাবাগণ হলেন:

১. 'আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইতবান রা.।[১৬৬]

২. আ'সিম ইব্‌ন আমুর তামীমী রা.।[১৬৭]

৩. সুহার ইবনুল আবদী রা.।[১৬৮]

---

১৬৩. দ্র. আবূ 'আব্দির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন নাসায়ী, *সুনান আন নাসায়ী*, লেবানন : কারাজ আল ফিকর, ১৯৯০, ৩য় খ, পৃ ৪৩।

১৬৪. দ্র. আবূ 'আব্দির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন নাসায়ী, *সুনান আন নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩।

১৬৫. ড. মোহাম্মদ এছহাক, *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৩, পৃ ১২।

১৬৬. 'আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইতবান মদীনার আনসারদের একটি গোত্র বনুল হুবলার সাথে সংযুক্ত ছিলেন, তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী এবং আনসারদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। (২১ হি/৬৪১ সালে) সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাসের স্থলে কুফার গভর্নর নিযুক্ত হন এবং সে বছরের শেষ ভাগে বসরার গভর্নর নিযুক্ত হন। এরপর তিনি পূর্ব ইরান ও উপমহাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে একের পর এক যুদ্ধ জয়ের সূচনা করেন। তাঁর ইন্তিকালের তারিখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। [দ্র. ইবন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ ৮৭১]

১৬৭. আসেম ইবন আমর তামীমী রাসূল সা.-এর সাহাবী এবং প্রাথমিক যুগের একজন খ্যাতনামা সৈনিক ছিলেন। ইরাক বিজয়ে তিনি বিশ্ববিশ্রুত জেনারেল হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদের সাথে শরীক ছিলেন এবং যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনিই প্রথম 'আরব জেনারেল, যিনি হিলমন্দের পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন এবং সিন্ধু উপত্যকার বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। [দ্র. ইবন আবদিল বার, আল-ইস্তিআব, হায়দারাবাদ : ১২২৬ হি, ২য় খ, পৃ ৫০০]

১৬৮. সুহার ইবন আবদীর সম্পর্ক ছিল আবদুল কায়স গোত্রের সাথে। (৮ম হি/৬৩১ সাল) তিনি একটি প্রতিনিধি দলের সাথে হজর থেকে মদীনায় আগমন করতঃ ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উমরের খিলাফতকালে তিনি বসরায় গমন করেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধসমূহে অংশ নেন। সিন্ধু নদের পূর্বাঞ্চলের যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন, তা থেকে বুঝা যায় যে, এখানকার ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং অধিবাসীদের সাথেও গভীর যোগাযোগ রাখতেন। সম্ভবত তিনি আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলের শেষভাগে বসরায় ইন্তিকাল করেন। [দ্র. ইবনুল আসীর, *উসদুল গাবা*, ২য় খ, পৃ ১১]

Dhaka University Institutional Repository

৪. সুহায়ল ইবন আদী রা.।[১৬৯]

৫. হাকাম ইবন আবিল-আস সাকাফী রা.।[১৭০]

হযরত উসমান রা.-এর খিলাফতকালে (২৩-৩৫ হি./৬৪৩-৬৫৫ খ্রী.) যে সকল সাহাবী ভারত উপমহাদেশে আগমন করেছেন :

১. উবায়দুল্লাহ ইবন মা'মার তামীমী রা.।[১৭১]

২. আবদুর রহমান ইবন সামুরা রা.।[১৭২]

হযরত মু'আবিয়া রা.-এর শাসনামলে (৪১-৬০ হি./৬৬১-৬৭৩ খ্রী.) যে সকল সাহাবী ভারত উপমহাদেশে আগমন করেছেন :

১. সিনান ইবন সালামা আল হুযালী রা.।[১৭৩]

---

১৬৯. সুহায়ল ইবন আদী আসদ গোত্রের লোক ছিলেন এবং বনু আশহালের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি যে সাহাবী ছিলেন এ বিষয়ের কোন সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ১৭ হি/৬৩৭ খ্রী.) তিনি আল জাযীরার বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযানের নেতা ছিলেন। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, রাসূল সা.-এর জীবদ্দশায় সাহাবীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার মত বয়স সুহায়েলের ছিল। [দ্র. ইবনুল আসীর, *উসদুল গাবা,* ৩য় খ, পৃ ১১; ইবন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৩য় খ, পৃ ২২]

১৭০. হাকম ইবন আবুল আস-সাকাফী বসরায় হিজরতকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি নিজে রাসূল সা.-এর প্রমূখাৎ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং মু'আবিয়া ইবন কুররা আল মুযানী (মৃত্যু ১১৩ হি) তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সকীফ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ গোত্রের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক লোক ১১ হিজরীর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং রাসূল সা.-এর সাথে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিল। সে হিসেবে হাকাম যে সাহাবী এবং তার বর্ণিত হাদীসসমূহ যে মারফূ' এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তদুপরি যাহাবীও তার সাহাবী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। ৪৪ হি/৬৪ খ্রী. পর্যন্ত হাকাম জীবিত ছিলেন। [দ্র. ইবন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ ৭০৭; ইবনুল অআসীর, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ ৩৫]

১৭১. 'উবায়দুল ইবন মা'মার তামীমী এসব বিদ্রোহী উপজাতিকে দমন করার জন্য পরবর্তী খলিফা হযরত উসমান রা. সাহাবী 'উবায়দুল্লাহ ইবন মা'মার তামীকে প্রেরণ করেন। উবায়দুল্লাহ ছিলেন মদীনার বাসিন্দা এবং অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি একজন হাদীস বর্ণনাকারীও বটে। তাঁর এ নিয়োগের সঠিক সন তারিখ অজ্ঞাত। কিন্তু তাবারীর বর্ণিত ঘটনাবলী হতে জানা যায় যে, হযরত 'উসমান ২৩ হিজরীতে খলিফা হওয়ার পরেই তাঁকে মুজরান অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। মুকরানে পৌঁছে 'উবায়দুল্লাহ কেবল বিদ্রোহীদের শক্তিই পিষ্ট করে দেন নি, বরং সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাও করতলগত করেছিলেন। এভাবে 'আরবদের ক্ষমতা স্থায়ী হয়ে যায়। সে মতে ৩০ হি. যখন 'উবায়দুল্লাহকে ফারিস-এ বদলী করা হয়, তখন তার স্থলে উমায়র ইবন উসমান নিযুক্ত হন। [দ্র. 'আল্লামা আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত্তাবারী, *তারীখুত তাবারী,* মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৭, ১ম খ, পৃ ২৮-২৯]

১৭২. আবদুর রহমান ইবন সামুরা ইবন হাবীব ইবন আবদ শাম্স ইবন আবদ মানাফ ছিলেন পরবর্তী সাহাবী, যার উল্লেখ হযরত উসমান খিলাফতকালে ভারতীয় উপমহাদেশের বিরুদ্ধে অভিযানের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। তিনি কুরাইশদের গোত্রের লোক ছিলেন। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল সা. তার নাম রাখেন আবদুর রহমান। ইতোপূর্বে তার নাম ছিল আবদ কিলাল অথবা আবদুল কাবা। ৯ম হি/৬৩০ সাল আবদুর রহমান তাবুক যুদ্ধে রাসূল সা.-এর সাথে শরীক হন। তিনি রাসূল সা.-এর প্রমূখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবন আব্বাস, সাঈদ ইবন মুসায়্যিব, ইবন সিরীন, আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা এবং হাসান বসরীর ওস্তাদ হওয়ারও গৌরব অর্জন করেন। তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে একটি বুখারী ও মুসলিমে এবং দুটি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। [দ্র. ইবনুল আসীর, *উসদুল গাবা,* ৩য় খ, পৃ ২৯৭-৯৮; ইবন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ ৯৬৩-৬৪]

১৭৩. ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনকারী সর্বশেষ সাহাবী ছিলেন সিনান ইবন সালমা আল হুযালী। (৮৫৩ হি/৬২৯-৬৭৩ খ্রী.) তাঁর জন্মের পর স্বয়ং রাসূল সা. তার নাম রেখেছিলেন। তিনি প্রকৃতই একজন সাহাবী ছিলেন। কেননা রাসূল সা. তাঁকে শৈশবকালে দেখেছিলেন। ইবন হাজার আসকালানী তাকে কম বয়সী সাহাবী গণ্য করে ইসাবা গ্রন্থে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করেছেন। সে মতে রাসূল সা. থেকে তার বর্ণিত হাদীসসমূহকে মুরসাল গণ্য করা হয়েছে তার কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ ও নাসাঈতে সংরক্ষিত আছে। ইরাকের গভর্নর (৪৮ হি/৬৮ খ্রী.) সিনানকে উপমহাদেশীয় অভিযানের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি মুকরান জয় করেন, মুকরান শহরের ভিত্তি স্থাপন করে সেটাকে স্বীয় বাসস্থান হিসেবে নির্বাচিত করেন এবং রাজস্ব ব্যবস্থা কায়েম করেন। অতপর তিনি নিজেকে একজন সুযোগ্য জেনারেল এবং পারদর্শী প্রশাসক বলে প্রমাণিত করেন। অজ্ঞাত কারণে তাকে পদচ্যুত করা হয়। সিনানের স্থলে রশীদ ইবন আমর জুদায়দী গভর্নর নিযুক্ত হন। সিনানের মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে কিছু জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। ইবন সাদের

Dhaka University Institutional Repository

২. মুহাল্লাব ইবন আবী সুফরা রা.।[১৭৪]

ইসলাম প্রচারক ও মুসলিম ব্যবসায়ী

ভারত উপমহাদেশে যে সকল মুসলমান আগমন করেছিলেন, তাদের দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর মুসলমান ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আগমন করে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেন। আর এক শ্রেণীর মুসলমান এসেছিলেন বিজয়ীর বেশে দেশ জয়ের অভিযানে।[১৭৫] মুসলিম বিজেতাগণের দেশ জয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, এ প্রতিষ্ঠা লাভে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও বিশ্বের এমন কিছু দেশ রয়েছে, যেখানে কোন দিন কোন মুসলিম বিজেতার আগমন হয় নি। সেখানে একমাত্র ধর্ম প্রচারকদের দ্বীনের দাওয়াতই ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এক্ষেত্রে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও তথা সমগ্র ইন্দোনেশিয়া ও মালদ্বীপের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৭৬] এ সকল এলাকায় ধর্ম প্রচার, মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ এবং ইসলামী শিক্ষাদীক্ষা বিস্তারে তারা ব্যাপকহারে মনোনিবেশ করেন। তাদের ধর্মভীরুতা, সৎ ও মার্জিত জীবনবোধ এবং ন্যায় পরায়ণতায় বিমুগ্ধ হয়ে তাদের হাতে ব্যাপকহারে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। নবদীক্ষিত মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তারা স্থায়ীভাবে সে সব এলাকায় বসবাস করতে শুরু করেন।[১৭৭] ১১৯২ সাল সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক উত্তর ভারত বিজয়ের মাধ্যমে ভারত বর্ষে স্থায়ীভাবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় পারস্য ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন মুসলিম শাসনাধীন অঞ্চলে যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল ভারতের মুসলিম সুলতানগণ এখানেও সেই কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।[১৭৮] এ সময় থেকে দিল্লীকেও মুসলিম তথা প্রাচ্যের ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সেকালে আধুনিক বিশ্বের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ না থাকলেও যে সকল মাদ্রাসা, দারুল 'উলূম, গড়ে উঠেছিল তা একালের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের তুলনায় কোন অংশেই কম ছিল না।

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

বাংলাদেশে ইসলামের প্রথম আগমন ঘটে হযরত 'উমর রা.-এর খিলাফতকালে (৬৩৪-৪৪ সাল) একদল সাধক 'উলামার নেতৃত্বে। এ দেশের মানুষ ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের হাতে ঈমান গ্রহণ করতে থাকে।[১৭৯] এ ছাড়াও হযরত ওমর রা.-এর খিলাফত কালে (হিজরী ১৩-২৪) দুজন তাবি'য়ী মুহাম্মদ মামুন ও মুহাম্মদ মোহাইমেন বাংলা মুলূকে ইসলাম প্রচার করতে আসেন। তাঁদের পর খ্রীস্টীয় ৭ম ও ৮ম শতকে

বর্ণনানুযায়ী সীনানের ইন্তেকাল হাজ্জাজের শাসনামলের (৮৩-৯৬ হি/৭০২-৭১৩ খ্রী.) শেষ ভাগে হয়েছিল। [দ্র. ইবন হাজার আসকালানী, *তাহযীব*, হায়দারাবাদ : ১৩২৫ হি. ৫ম খ, পৃ ৩২৮-২৯।]

১৭৪. মুহাল্লাব ইব্‌ন আবী সুফরা আযদী (৮-৮৩ হি./৬২৯-৭০২ খ্রী.) আমীর মুয়াবিয়ার খিলাফতকালে ভারতে আগমন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ তাবিয়ী। তাঁর নাম ইসিতাব, উসদুল গাবা, তাজরীদ, ইসাবা গ্রন্থে বিদ্যমান আছে বিধায় তাকে সাহাবী মনে করা হয়। কিন্তু রিজাল শাস্ত্রের সমালোচকগণ একমত যে, মুহাল্লাব একজন প্রবীণ তাবিয়ী ছিলেন-সাহাবী নন। তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস, সামুরা ইব্‌ন জুনদুব ও বারা ইব্‌ন আযের প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাল্লাব থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ আবূ দাউদ, নাসা'ঈ, তিরমিযী ও মুসনাদ আহমদ ইব্‌ন হাম্বলে লিপিবদ্ধ আছে।

১৭৫. আব্বাসী আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪, পৃ ১৩।

১৭৬. ড. এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ ৬৫; জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *চিন্তাধারা*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৮, পৃ ০২।

১৭৭. আবদুল ফাত্তাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান*, ঢাকা : আল আমিন রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ ২৫।

১৭৮. মোঃ তৌহিদুল হাছান, *বাংলাদেশে মুসলিম দর্শন চর্চা* (১৯৪৭-৯৩), অপ্রকাশিত এম. ফিল থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ ১৯; Yusuf Husain, *Glimpses of Medieval Indian Culture*, London : Asia Publishing House 1959, 2nd ed, p 71.

১৭৯. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ০৩।

Dhaka University Institutional Repository

হামিদুদ্দীন, হোসেন উদ্দীন, মুহাম্মদ মুর্তজা, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ আবূ তালিব নামক পাঁচজন মু'মিনের একটি দল এদেশে আসেন। কথিত আছে বিভিন্ন সময়ে এরূপ পাঁচটি দল বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করে।[১৮০]

বাংলাদেশে ইসলাম এর আগমনের পূর্বে এখানে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরা বসবাস করতো। ইসলাম প্রচারকগণের সংস্পর্শে এসে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এম. এন রায় লিখেছেন : 'ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামী বৌদ্ধ বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করলো। তাতেই প্রচলিত ধর্ম বিরোধী অগণিত মানুষ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে নীড়হীন নির্যাতিতের মতো দিশেহারা হয়ে ফিরেছে। তারাই ইসলামের মতবাদকে জানিয়েছে সাদর সম্ভাষণ।[১৮১] মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর রচিত 'মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেন যে, 'আরব বণিকগণ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলো দিয়েই বাংলাদেশ ও কামরূপ (আসাম) হয়ে চীন যাতায়াত করতেন।

মুহাদ্দিস ইমাম আবাদান হিজরী তৃতীয় শতকের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায়, রাসূল সা.-এর সাহাবী ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাইব রা. নবুওয়াতের ৫ম সনে (খ্রীস্টীয় ৬১৫) হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করেন। নবুওয়াতের সপ্তম সনে (খ্রীস্টীয় ৬১৭) তিনি কায়েস ইবন হুযায়ফা রা., উরওয়াহ ইবন আছাছা রা., আবূ কায়েস ইবনুল হারেছ রা. এবং কিছু সংখ্যক হাবসী মুসলিমসহ দুটি জাহাজে করে চীনের পথে সমুদ্র পাড়ি দেন।[১৮২]

শায়খ যাইনুদ্দীন তাঁর রচিত গ্রন্থে বলেন : ভারতের তামিল ভাষার প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, একদল 'আরব জাহাজে চড়ে মালাবার এসেছিলেন। তাদের প্রভাবে রাজা চেরুমল, পেরুমল ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওহাইব রা. দীর্ঘ নয় বছর সফরে ছিলেন। চেরুমল, পেরুমল তার কাছেই ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিলেন বলে মনে হয়।

সূফী 'আলিম ও মুজাহিদগণের ইসলাম প্রচার

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সূফী ও 'আলিমগণের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র থেকে এ আলিমগণ বাংলায় আগমন করেন। এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে তারা এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তারা কখনও একাকী আবার কেউ সাথীদের নিয়ে অচিন দেশে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বসতি স্থাপন করেছিলেন। প্রথম যুগের অনেক সূফী 'আলিম সমুদ্র পথে এ দেশে আগমন করেন। 'আরবদের সাথে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠার মূল কারণ হল, এ অঞ্চলের সমুদ্র পথ ছিল তাদের নিকট সুপরিচিত। এ দেশে ইসলামের দ্রুত প্রসার লাভের এটিও একটি কারণ। 'সূফী আলিমগণের সঠিক সংখ্যা পাওয়া না গেলেও হাজারের কম হবে না এতে সন্দেহ নেই।[১৮৩]

এসব তথ্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, 'আরব বণিক এবং মুবাল্লিগগণের মাধ্যমেই বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামের আলো পৌঁছে। পরবর্তীকালে অনারব অঞ্চল থেকেও মুসলিমগণ এদেশে আসতে থাকেন।

---

১৮০. এ কে এম মুহিউদ্দীন, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯৬, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০; ফজলুল হাছান ইউসুফ, *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫, পৃ ২৭।

১৮১. আজিজুল হক বান্না, *বরিশালে ইসলাম*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৪, পৃ ৭৩।

১৮২. এ কে এম নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯, পৃ ২০; এ কে এম মুহিউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬।

১৮৩. ড. এবনে গোলাম সামাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বণিক এবং মুবাল্লিগগণের উপস্থাপিত শিক্ষা ও আচরণ স্থানীয় লোকদের একাংশকে মুগ্ধ করে। ইসলামের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তারা ইসলাম কবুল করে। এভাবেই তারা এতদঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে মুসলিম লোকালয় গড়ে তোলে।

সূফী সাধকগণের মাধ্যমে কিভাবে উপমহাদেশে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে এর উল্লেখ করতে গিয়ে ড. গোলাম সাকলায়েন 'বাংলাদেশের সূফী সাধক' গ্রন্থে উল্লেখ করেন 'আরব জাতি বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই সভ্যতার শীর্ষদেশে আরোহণ করেন এবং তাঁরা বিদেশ ভ্রমণে, ব্যবসা-বাণিজ্যে অভ্যস্ত ও উন্নত ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে বহু 'আরব বণিক দলে দলে বাণিজ্য পথ ও নৌচালনা করে বিভিন্ন দেশে গমনাগমন করতে থাকেন এবং এভাবেই ভারতের সাথেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তারা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহে উপনিবেশ গড়ে তোলেন এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসস্তূপে আবিষ্কৃত একটি প্রাচীন 'আরবী মুদ্রা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই মুদ্রাটি 'আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ (৭৮৬-৮০৯ সাল)-এর শাসনামলে ৭৮৮ সালে (১৭২ হিজরী) আল মুহাম্মদীয় টাকশালে মুদ্রিত হয়েছিল।[১৮৪]

ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী যে সময় বঙ্গ বিজয় (১২০১ সাল) করেন, তার অনেক কাল আগে অর্থাৎ ৮ম শতাব্দীর গোড়াতে আরবের বণিক ও ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ইসলামের বাণী বহন করে আনেন। খ্রীস্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর আরব বণিকদের উপনিবেশে পরিণত হয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল আরবীয় বণিক ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে যখন স্থানীয় লোকজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং এ ধর্ম এদেশের বহু অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়, তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার বহু পীর-দরবেশ ও সূফী সাধক ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পূর্ব বঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[১৮৫] অতঃপর তুর্কীগণের দ্বারা বাংলাদেশ বিজিত হলে বাংলাদেশের পীর-দরবেশ ও সূফী-সাধকগণ ধর্মপ্রচারের মহান ব্রত গ্রহণ করেন। তুর্কী মুসলমান শাসকরা এদেশ জয় করার পরেও যুদ্ধ বিগ্রহ ও দেশের আভ্যন্তরীণ গঠন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কাজেই এদেশে ইসলাম প্রচার ও মুসলিম প্রভাব প্রতিপত্তি প্রসারের জন্য দেশীয় ও বহিরাগত পীর, দরবেশ, ওলী, আবদাল, আওলিয়া, সূফী, গাওস, কুতুব প্রমুখকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।

বাংলাদেশ মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হওয়ার পূর্বেই 'আরব ব্যবসায়ী ও বণিকেরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের সাথে ভাব বিনিময় করেন।

আসলে ব্যবসা-বাণিজ্যই এই সব 'আরব বণিকদের লক্ষ্য ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু বাণিজ্যিক পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে তারা ইসলাম ধর্মের বাণী ও রাসূল সা.-এর আদর্শ প্রাচ্যের দেশগুলোতে বহন করেছেন। জাভা, সুমাত্রা, মালয় ও সুদূর চীন দেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে।

ধীরে ধীরে 'আরবীয় সূফী-সাধকদের দৃষ্টি বাংলাদেশের দিকে আকৃষ্ট হয়। সূফী-দরবেশগণ মনে করেছিলেন যে, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে ইসলামী শিক্ষা প্রচার করতে পারলে দেশের অপরাপর অঞ্চলেও তা আপনা আপনি ছড়িয়ে পড়বে। এ ধারণা একেবারে অমূলক ছিলো না। কারণ বনে জঙ্গলে সাধনা করে ইসলাম কখনও বিস্তৃত হয় নি, হয়েছে লোকালয়ের মধ্যে। তাছাড়া 'আরব, পারস্য, বোখারা, বাগদাদ

---

১৮৪. এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ড. আবদুর রহীমের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : It is clear that the Arab mercharts visited the coastal regions of Bengal from the mouth of Meghna to Cox's Bazar and prized its commodites such as the fine cotton cloth (muslin) and aloe-wood. অর্থাৎ স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, মেঘনার মোহনা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত উপকূল অঞ্চলে 'আরব বণিকদের আগমন ঘটেছিল। এখানকার সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র (মসলিন) ও আগড়কাঠ প্রভৃতিকে তারা মূল্যবান পণ্য বলে গণ্য করতেন। [দ্র. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, ঢাকা : আবদুল্লাহ ব্রাদার্স, ১৯৪৮, পৃ ১০]

১৮৫. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬-২০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু পীর ও সূফী-সাধক যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আগমন করেন তার কিছু পূর্বে এদেশে ইসলামী আন্দোলন গড়ে উঠে। এ ধর্মীয় আন্দোলন বা ধর্ম কলহ কেবল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মমতের ক্ষেত্রেও ছিল বিদ্যমান।

মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার সময় বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের অন্যান্য স্থানে ভাব জগতে যে বিপ্লব উপস্থিত হল, বাংলায় তা প্রকাশ পেয়েছিল আরো বেশি। মুসলমান অধিকারের সাথে সাথে যতগুলো নব্যভাবের আগমনে এ দেশের চিন্তাজগতে বিপ্লব উপস্থিত হলো সূফী ভাবধারা তার মধ্যে প্রধান।

বাংলাদেশ-পাক-ভারতে মুসলমান অভিযানের সময় তেত্রিশ কোটি দেবতার অস্তিত্ব ছিল। হিন্দুগণ এ অসংখ্য দেব দেবীকে নানা শক্তির উৎস বলে বিশ্বাস করেছে। দেব দেবী ছাড়া তারা তাদের অস্তিত্বের কথা চিন্তাই করতে পারতো না। পক্ষান্তরে, মুসলমানগণ সঙ্গে করে নিয়ে এলো এক নতুন শক্তি ও শিক্ষা। মুসলমানের এ নতুন শক্তির উৎস হল তার আত্মার উন্নতিতে মানুষ অজেয় হতে পারে। আধ্যাত্মিক সাধনা করে বিরাট শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে। এই বিশ্বাস ও আদর্শ নিয়ে ইসলাম বাংলায় অধিকার স্থাপন করলো। ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমান বিজেতাদের আত্মসাৎ করতে পারলো না। তার কারণ মুসলিমরা সেই প্রয়াস ব্যর্থ করে দিল। ইসলাম একত্ববাদ ছাড়া আর কিছুই পরোয়া করে না। কোন বিচার বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা সহ্য করে না। ইসলাম সেমিটিক গোষ্ঠীর ধর্ম, তার হিসেব পত্রও সেই গোষ্ঠীর মতই একেবারে পরিষ্কার। হিন্দুদের গাছ, পাথর, পশু, মানুষ যে কোন জিনিসকেই দেবশক্তির আঁধার বলে পূজা করতে বাধে না। ইসলাম এরূপ তত্ত্বকথা সহ্য করে না। অথচ হিন্দু জীবনে অনেক খানি জুড়ে রয়েছে সেই মূর্তি, বিগ্রহ, মন্দির। তাছাড়া ইসলামে নেই পুরোহিত তন্ত্রের ও জাতিভেদের স্থান। ইসলাম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নয়। তা সকল মানুষের একমাত্র ধর্ম। ইসলাম প্রচারশীল ধর্ম। এটি অন্যকে জয় করেই ক্ষান্ত হয় না, কোলেও টেনে নেয়।[১৮৬]

ইসলাম সংস্কার মুক্ত ধর্ম। এই ধর্মের প্রচারক ও সূফী দরবেশগণ ছিলেন উদার ও সংস্কার মুক্ত। মুসলমান রাজত্বের স্থায়িত্ব এবং সংসার ত্যাগী দরবেশ ও সূফী সাধকগণের ধর্ম প্রচারের ফলে হিন্দু আচার আচরণের রূপ অনেকটা পরিবর্তিত হলো। সারা রক্ষণশীল হিন্দু, তারা নিজেদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী হিন্দু আচার অনুষ্ঠানকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল। কিন্তু পরিবর্তন রোধ করা যায় নি। হিন্দুদের সামাজিক সংস্কার এর নির্মম বিধানে যে সব নর-নারী অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হচ্ছিল, তারা ইসলাম গ্রহণ করে সামাজিক নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছে। সুতরাং-হিন্দু সমাজের বিধান দাতাদের নিকট থেকে যারা শুধু উৎপীড়ন ছাড়া আর কিছুই লাভ করে নি; সূফী-সাধক ও পীর-দরবেশগণ তাদের শিক্ষা দিলেন মুক্ত মানুষের অধিকার, শুধু তাই নয়, তারা ব্রাহ্মণদের উপরেও প্রভূত্ব করার ক্ষমতা দিলেন। সামাজিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও এই উদার শিক্ষা এবং সমানাধিকারের আদর্শই ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।[১৮৭]

মুসলমান সমাজ সংস্কৃতি-প্রগতিশীল হওয়ায় একদিকে মুসলমানদের বিজয় অভিযান অপ্রতিহতভাবে চলেছিল এবং অন্যদিকে তাদের বিজয় অভিযান ও ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে পীর, ফকির ও দরবেশগণ অসংখ্য নর-নারীকে ইসলাম ধর্মের দীক্ষা ও শিক্ষা দান করতে সামর্থ হয়েছিলেন।[১৮৮] সেকালে বর্ণ হিন্দুদের অহংবোধ জাত্যভিমান ও বহিরাগত ব্যক্তিদের প্রতিবিদ্বেষ ও ঘৃণা এবং যুক্তিহীন আত্মসর্বস্বতা তাদের জীবনকে গ্রাস করেছিল। সুতরাং তারা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক স্বৈরাচার চালিয়ে সর্ব সাধারণের উপর প্রভুত্ব করতো। বিখ্যাত

---

১৮৬. গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকা : রহমান আর্ট প্রেস, ১৯৭৪, পৃ ১৯২।

১৮৭. গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৫।

১৮৮. ড. অরবিন্দ পোদ্দার, *মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্য মধ্যযুগ*, কলকাতা : এসখান প্রিন্টার্স, তাবি, পৃ ৬৭; A Large number of Persian and Mughal families adopted bergal as their home after the establishment of Mughal rule in missionary activites in different places of the province. The Arabic names of people places and things of everyday-Life in Chittagong. Noakhali and Comilla Speak of the tremendous influence of Arabs there. Se, Dr. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Karachi, 1967, Vol. II, p 51]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজক আল বেরুনী ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন ত্রয়োদশ শতকে। তিনি তদানীন্তন কালের বর্ণ হিন্দুদের অহংকার, বিকৃতবুদ্ধি ও জাত্যাভিমান বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায়, জ্ঞানানুশীলনের পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাসবোধ সামাজিক উচ্চবর্ণের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখতে সাহায্য করেছে।[১৮৯] তাছাড়া আরো জানা যায় যে, সর্বক্ষেত্রে সমাজের অজ্ঞ জনসাধারণকে বঞ্চিত ও পদানত করে রাখার প্রচেষ্টা চলত। বাংলাদেশের জন মানস ও চিন্তাধারায় যখন এমন একটা শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হয়, তখন বহিরাগত পীর-দরবেশ ও সূফীরা বাংলার জনমানস ও চিন্তার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাদের জন্যই জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়। তখন পূর্ব বাংলা ছিল অমুসলিম অধ্যুষিত। অমুসলিম দেশে গিয়ে তারা প্রতিপক্ষের ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, যুক্তিতর্ক ও ধর্মপ্রাণতায় তাদের পরাজিত করতেন, অলৌকিক কার্যাবলী দ্বারা জনসাধারণের হৃদয় জয় করে উক্ত ধর্মীয় নেতাদের এলাকায় মুসলিম প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতেন।

তের শতকে লক্ষণাবতী ও দিল্লীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মনে হয় যে, নতুন নতুন গভর্নরের সঙ্গে নতুন নতুন মুসলমান এসেছিলেন এবং বিখ্যাত আওলিয়ার সাগরেদগণ এদেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন। চৌদ্দ ও পনের শতকে বহুসংখ্যক আওলিয়া বাংলায় এসেছিলেন। সুলতানগণ তাদেরকে শ্রদ্ধা করতেন। ইলিয়াস শাহের শিলালিপিতে আলাউল হক নামক এক সূফী সাধকের খবর জানা যায়। ১৩৪২ সালে সেটি উৎকীর্ণ হয়েছিল। তিনি আঁখি সিরাজুদ্দীন নামক অপর এক দরবেশের উত্তরাধিকারী হন। গৌড়ে আঁখি সিরাজুদ্দীনের মাজার আছে। আলাউল হকের পুত্র হযরত নূর কুতুব আলম রাজা গণেশের আমলে রাজনৈতিক কাজে হস্ত ক্ষেপ করতেন। গণেশের পুত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করার ব্যাপারে তার হাত থাক বা না থাক, এটা যথার্থ যে, সিংহাসন লাভের জন্য উদারপন্থী হিন্দুগণ ধর্ম ত্যাগ করতে বিবেকের দংশন অনুভব করতেন না। এরূপ উদারতার উদাহরণ এ সময় প্রচুর পাওয়া যায়। মখদুম শাহ হোসেন ধুককারপোশ হযরত নূর কুতুব আলমের সমসাময়িক ছিলেন। আরো একজন বিখ্যাত ওলী আল্লাহ ছিলেন মাওলানা আতা। দেবীকোর্টে সিকান্দর শাহ তার জন্য একটি মাজার তৈরী করেছিলেন।[১৯০]

ইসলাম প্রচারে সুলতানগণ কতদূর অংশগ্রহণ করতেন বলা সহজ নয়। তবে মুসলিম সুলতানগণ ওলী ও দরবেশের শ্রদ্ধা করতেন। তাদের জীবিকার জন্য জমিজমা দিতেন, দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের জন্য সকল প্রকার সুবিধা প্রদান করতেন, এরূপ কথাও নানা কিংবদন্তীতে লেখা আছে। তবে এ কথা ঠিক যে, আরেক ধরনের সৈনিক ছিল যারা ইসলাম প্রচারে সাহায্য করতো। বাগেরহাটের খান জাহান আলী, ত্রিবেনীর জাফর খান গাজী এবং কাঁটা দুয়ারের শাহ ইসমাইল গাজী-এঁরা প্রত্যেকে ছিলেন সেনানায়ক। এক একটি এলাকা জয় করার জন্য সুলতানরা তাদের পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধে জয়ী হবার পর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এতটা বৃদ্ধি পেত যে, তারা ওলী পীর দরবেশ বলে পরিগণিত হতেন। তাদের হাতে স্থানীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতো। পীর ও যোদ্ধা খান জাহানের হাতে এক ব্রাহ্মণের, পীর আলী মোহাম্মদ তাহের (পীরালী মুসলমান) নামে ইসলাম প্রচারের কথা সুবেদিত।[১৯১] যে সব অঞ্চল ধর্মীয় সাধকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথবা মন্দির ও ধর্ম কেন্দ্র থাকার দরুন পূর্ব থেকেই পবিত্র জ্ঞানে বিবেচিত হতো, সে সব অঞ্চলে সাধারণতঃ মুসলিম ওলী ও পীর-দরবেশগণের দরগা আছে। এসব জায়গায় নিয়মিতভাবে লোকজন যাতায়াত করার পীর-দরবেশগণের জ্ঞান ও অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নিকটবর্তী অধিবাসীরা তাদের প্রতি আরো আকৃষ্ট হতো। দলে দলে তারা আসতো তাদের দু'আ নিতে এমনকি তারা নিজেদের মুসলমান বলে আখ্যায়িত করতে ইতস্ততঃ করতো না।

প্রকৃত প্রস্তাবে, সর্বশ্রেণীর মানুষের সাথে ভাব বিনিময় ও পারস্পরিক আদান প্রদানের ফলে এ দেশের সাধারণ মানুষ পীর-ফকিরদের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক সম্পদ ও স্বাধীনতা লাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়। এক কথায় বলা

---

১৮৯. আল বেরুনী, *ভারতবর্ষ*, কলকাতা : মিত্রা প্রকাশন, তা বি, ১ম খ, পৃ ২৩।

১৯০. মাসিক *মাহে নও*, মার্চ, ১৯৫৩, পৃ ১-৩।

১৯১. প্রাগুক্ত, পৃ ৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

যায়, পূর্ব বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় পীর-ফকির ও সূফীদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দরবেশগণই বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সভ্যতার প্রকৃত মশালবাহী। ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিধর্মীদের মধ্যে সত্য ধর্ম প্রচার ও মানবতার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার জন্যই এই সব পীর-দরবেশ মধ্য এশিয়ার দূর দূরান্তর থেকে সুদূর বাংলায় আগমন করেন।

বাংলাদেশের পীর-সূফীদের প্রভাব প্রতিপত্তি যে কত গভীর, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এক খানা পত্র থেকে। মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী এই পত্র জৌপুরের সুলতান ইবরাহীম শারকীর কাছে লিখেছিলেন। পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন :

> God be praised! what a good lood is that of Bengal where numerous saints and ascetics came from many directions and made it their habitation and home For example, at Devgaon Seventy leading disciples of Hazrat Shaikh Shahab Uddin Suharwardi are taking their central rest, several saints of the suharwardi order are lying buried in Mahisur and this is the case with the saits of Jalilia order in Deotala. In Narkoti some of the best companions of the Shaikh of Shaikh Ahmed Damishqui are found. Hazrat Shaikh Shaifuddin tawwama one of the twelve of the Qadarkhani order whose chief pupil Hazrat Shaikh Shart Uddin Maniri is Lying buried at sonarga-on And then there was Hazrat Badr Alam and Badr Alam Zahidi in short in the country of Bengal what to speak of the cities there is no town and no village where holy saints did not come and settle down. Many of the saints of the Suharwardia order are dead and gone under earth but those still alive are also in fairly large numbers.[১৯২]
>
> সব প্রশংসা আল্লাহর। কি চমৎকার স্থান এই বাংলাদেশ! এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে বহু পীর-দরবেশ আওলিয়া এসে বসবাস করতে থাকেন এবং এটাকে তাঁরা তাঁদের স্থায়ী বাসভূমি রূপে গ্রহণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিখ্যাত সাধক হযরত শেখ সাহাবুদ্দীন, সুহরাওয়ার্দী সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু সংখ্যক দরবেশের কবর আছে মাহিসুনে। জলিলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু সংখ্যক সূফী-সাধক দেওতলায় সমাহিত। শেখ আহমদ দামিশকী নামক বিখ্যাত দরবেশের কতিপয় শ্রেষ্ঠ অনুচর ও শিষ্যের কবর নারকোটি নামক স্থানে অবস্থিত। কদরখানী সম্প্রদায়ের দ্বাদশ সূফীর অন্যতম হযরত শেখ শরফুদ্দীন তাওয়ামাহ কবর সোনারগাঁয় আছে। তার একজন প্রসিদ্ধ শিষ্যের নাম হযরত শেখ শরফুদ্দীন মানেরী। হযরত বদর আলম এবং বদর আলম জাহেদীও তাঁর সাগরেদ ছিলেন। মোটের উপর বলা যায়, কেবল বসতি স্থাপন করেন নি। সুহরাওয়ার্দী তরীকার বহু পীর দরবেশ সমাহিত আছেন। কিন্তু যারা এখনও জীবিত আছেন তাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়।

বাংলাদেশে পীর ও সূফী-সাধকগণের জীবন ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তারা এদেশে এসে কোন নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন তরীকা[১৯৩] অবলম্বনের মাধ্যমে খানকা[১৯৪] প্রতিষ্ঠা করতেন, সেখানে তার চতুষ্পার্শ্বে ভক্ত ও শিষ্যরা এসে উপস্থিত হতেন। মুর্শিদ শিষ্যদের নানা রকমের প্রয়োজনীয় ধর্মীয় নির্দেশ দিতেন। তাঁরা জনসাধারণের সম্মুখে ইসলামের সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবানদর্শ তুলে

---

১৯২. Quoted by Prof. Hassan Askari, *Bengal : Past & Present*, Vol, LXVII, Serial No. 130, 1948, p 35-36.

১৯৩. তরীকা : শব্দটি 'তরক' শব্দ থেকে উৎপত্তি। অর্থ পথ, পথচলা, ইলমে তাসাউফের পরিভাষায় কোন শায়খের পথ নির্দেশিকে তরীকাহ বলে। পীর মাশায়েখগণের অনেক তরীকা রয়েছে রাসূল সা. থেকে সকল তরীকার উদ্ভব। [দ্র. ফকীর আবদুর রশীদ, সুফী দর্শন, ঢাকা : ইফাবা, ১৮৮৫, পৃ ১৮৪।]

১৯৪. খানকাহ্ : যেখানে সূফী সাধকগণ ইবাদত করেন দুনিয়াত্যাগী ফকীর দরবেশের আবাস স্থল। 'খান' ফকীর দরবেশ, 'কাহ'-স্থান অর্থাৎ ফকীর দরবেশের স্থান। যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে উৎসুক। তাঁরা খানকা হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। [দ্র. বাংলা বিশ্বকোষ, বাংলা একাডেমী, ২য় খ, পৃ ২৫০]

Dhaka University Institutional Repository

ধরতেন, এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন। প্রকৃতপক্ষে এসব সাধু পীর-দরবেশের সাধুতা, নিষ্ঠা নির্লিপ্ততা এদেশের অসংখ্য শান্তিকামী মানুষের হৃদয় জয় করেছে। নানা স্থান থেকে শিষ্যরা এসে সূফী-দরবেশদের কাছে উপস্থিত হতেন। তাদের কেউ কেউ মুর্শিদের খানকা শরীফের কাছে ঘরবাড়ী তৈরী করে বাস করতেন এবং সেখানেই তারা মৃত্যু পর্যন্ত থাকতেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দরগাহগুলো দেখে মনে হয় 'আরব, পারস্য, বুখারা প্রভৃতি দেশ থেকে আগত পীর-দরবেশের চতুষ্পার্শ্বে যে ভক্তেরা এসে উপস্থিত হতেন, তারা শুধু বড় বড় শহর বন্দরেই খানকা প্রতিষ্ঠা করে বাস করতেন না, তারা এদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে খানকা প্রতিষ্ঠা করতেন। সূফী-সাধকগণ দুই উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পতিত জমি চাষাবাদ করে এবং অযাচিত দান গ্রহণ করে। জমি চাষাবাদ করা পছন্দ করতেন না। কারণ পতিত জমি চাষাবাদ করলে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের সংশ্রবে আসতে হতো। সূফী সাধকেরা মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ চিন্তায় বিভোর থাকতেন, আল্লাহর বন্দেগী করতেন, ফলে সব অবস্থাতেই সরকারী কর্মচারী সংশ্রব এড়িয়ে চলতেন। তারা লোকজনের কাছ থেকে যেসব সম্পদ ও পদার্থ অযাচিতভাবেই পেতেন তা সেই মুহূর্তেই শিষ্য ও অনুসারীদের মধ্যে বিতরণ করতেন। নিজস্ব বলতে কিছুই রাখতেন না।

বাংলাদেশের সূফী সাধকগণ যে উত্তর ভারতের সূফী-সাধকগণের অনুকরণে খানকা পরিচালনা করতেন সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। শেখ আলাউল হক সম্বন্ধে জানা যায় যে, তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁর খানকা শরীফে হাজার হাজার দুঃস্থ, দরিদ্র, মুসাফির প্রতিপালিত হতো। তিনি দান গ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। শেখ শরফ উদ্দিন আবূ তওয়ামার ব্যাপারে জানতে পারা যায় যে, সোনারগাঁ পৌঁছে তিনি খানকা ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। তাঁর খানকায় প্রতিপালিত হতো অসংখ্য লোকজন। তাদের খানা খেতে সময় লাগতো। ফলে তাঁর প্রধান শিষ্য শেখ শরফ উদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরী খাবার টেবিলে সকলের সঙ্গে খাওয়া বন্ধ করে দেন। কারণ তাতে তার সময় নষ্ট হতো, লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটতো। সিলেটের হযরত শাহজালাল রহ.-এর আস্তানায় বহু লোকের যাতায়াত ছিল। লোকেরা আসার সময় খাবার নিয়ে আসতেন এবং তখনই শিষ্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। তিনি নিয়মিত রোজা রাখতেন। তিনি নিজ হাতে খানকা পরিষ্কার করতেন, কাপড়-চোপড় ধুতেন।

শেখ নূর কুতুবউল আলমকে তাঁর ভাই আজম খাঁন একটি চাকরি নিতে বললে তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন। তাছাড়া নিতান্ত সাধাসিধে জীবন-যাপন ও ধর্মভীরুতার ফলে দলে দলে লোক তাদের দিকে আকৃষ্ট হতো। সূফীদের খানকা ও আস্তানায় গিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের চেষ্টা করতো। লোকজন মনে করতো যে, খানকাগুলো হলো শান্তির আঁধার, তাই দিবা রাত্রি সেখানে মানুষের ভিড় লেগে থাকতো। কোন কোন শাসক সূফী-সাধকদের শ্রদ্ধা করতেন। ভক্তি ভরে তাদের ব্যয়ভার বহন করতেন। এভাবে পীর-দরবেশগণের ঐকান্তিক চেষ্টা, মানবিক ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজ ক্রমশ উন্নতি লাভ করে এবং মুসলিম জাতি সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়। পীর ও সূফীগণের প্রতিষ্ঠিত খানকা ও দরগাগুলো এখনও সর্বসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে পরিদর্শন করে থাকে। এ থেকে খুব সহজেই অনুমান করতে পারা যায়, সূফী-দরবেশগণ তাদের জীবদ্দশায় সর্বসাধারণকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিলেন। এসব দরবেশ ও সূফী বহুকাল আগেই ইন্তিকাল করেন। কিন্তু তাদের স্মৃতি এখনও লক্ষ লক্ষ লোকের মনে জাগরুক রয়েছে। তাদের জীবনাদর্শ ও অলৌকিক কর্মতৎপরতার কথা দেশে বিদেশে এখনও কিংবদন্তিরূপে প্রচলিত।

বাংলাদেশের অসংখ্য পীর ও সূফীদের নাম নানা সূত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের জীবন কাহিনী নানা উপকথার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। প্রাচীন সূফী-সাধক ও দরবেশদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারা গেছে, তাঁদের বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

বাংলায় ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা প্রচারের এই স্বর্ণ যুগের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ বলেন :

১. ফরিদ উদ্দিন শকরগঞ্জ। তের শতকের মাঝামাঝি তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসেন এবং ফরিদপুর এলাকা ভ্রমণ করেন। শুলুক বহরে তাঁর একটি ঝরণা আছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. মাখদুম শাহ গজনবী ওরফে রাহীপীর। বর্ধমান জেলার মঙ্গল কোর্ট এ দরবেশের আস্তানা ছিল এবং এখানে তাঁর মাজার রয়েছে। সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকে তাঁর আগমন হয়। তাঁর সাথে আরো ১৭ জন দরবেশ এদেশে আসেন। তাদের মধ্যে ছিলেন : সৈয়দ শাহ তাজুদ্দীন, যাজদীন চিশতী, শাহ হাজী আলী, শাহ সিরাজুদ্দীন, শাহ ফিরোজ, পীর পাঞ্জাতন, পীর ঘোড়াশহীদ এবং আরো এগারজন। তাঁদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না।

৩. মাওলানা তাকী উদ্দীন আল 'আরাবী। তের শতকের প্রথমদিকে তিনি এদেশে আসেন। সম্ভবত তিনি দেশে ফিরে গিয়ে ইন্তিকাল করেন।

৪. শাহ তুরকান শহীদ। উত্তরবঙ্গের বগুড়ায় তাঁর প্রচার কেন্দ্র ছিল এবং সেখানেই তার মাজার আছে।

৫. শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা সম্ভবত ১২৭০ মতান্তরে ১২৭৮ সালে তিনি সোনারগাঁ আসেন। তিনি তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ-এ গভীর পারদর্শী ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে সোনারগাঁয়ে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন, যাতে দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র অধ্যয়ন করতো। বিহারের প্রসিদ্ধ সূফী-দরবেশ শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল মুনীরী তাঁরই তত্ত্বাবধানে সুদীর্ঘ ২২ বছর এ সোনারগাঁয় জ্ঞান সাধনা করেন। শায়খ আবূ তাওয়ামা ৭০০/১৩০০-তে ইন্তেকাল করেন। এখানে তার মাজার রয়েছে।

৬. শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী ১২৭০-৭৫ সালে সোনারগাঁয়ে আসেন। তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ইন্তেকাল করেন।

৭. আমীর খান লোহানী। আফগানিস্তান থেকে আগত এই পীর ইসলাম প্রচার করেন।

৮. শায়খ সূফী শহীদ ১২৯০ সালে সাতগাঁও আসেন। হুগলী পাণ্ডুয়ায় তাঁর মাজার আছে।

৯. উলুগ-ই আযম হুমায়ুন জাফর খাঁ বাহরাম ইৎসীন গাজী সংক্ষেপে জাফর খাঁ গাজী। তিনি একজন সেনাপতি ও ধর্মীয় নেতা। উত্তর বঙ্গ ও হুগলী নদীর ধারে ত্রিবেনীতে তাঁর মাজার রয়েছে।

১০. পীর শাহ বদর উদ্দিন, সংক্ষেপে বদর পীর, দিনাজপুরের হেমায়াতাবাদ তাঁর কর্মস্থল ছিল। সেখানেই তাঁর মাজার রয়েছে।

১১. সৈয়দ আব্বাস আলী। তিনি ১২৯১ সালে দিল্লীতে এবং ১৩২৩ সালে বাংলাদেশে আসেন, চব্বিশ পরগনার হাড়োয়া নামক স্থানে তিনি খানকাহ নির্মাণ করেন এবং সেখানে তাঁর মাজার ও বংশধর রয়েছে।

১২. সৈয়দ রওশন আরা মক্কী, সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কীর বোন। চব্বিশ পরগণার তারাগুনিয়ার খানকায় তিনি থাকতেন। সেখানে তাঁর মাজার রয়েছে। তার ভাইয়ের সঙ্গে তিনি এদেশে আসেন এবং ১৩৪২ সালে ইন্তি কাল করেন।

১৩. শাহ বদরউদ্দীন আল্লামা, সংক্ষেপে বদর পীর। ১২৪০ সালে বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ-এর আমলে চট্টগ্রামে আসেন এবং চট্টগ্রামে স্বাধীন মুসলিম রাজ্য গঠনে সহায়তা করেন। চট্টগ্রাম শহর-এর বখশী বাজার মার্কেটের দক্ষিণে তাঁর মাজার রয়েছে।

১৪. কাত্তাল পীর। চট্টগ্রামের উত্তরে কাতালগঞ্জে তার মাজার আছে। তাদের পরে আরও অনেক দরবেশ এখানে এসেছিলেন। যেমন শাহমোল্লা, মিসকান শাহ নূর, শাহ আশরাফ, কাবুলী শাহ, বান্দা রিয়াশাহ, চট্টগ্রামের চন্দনপুরা টিলার উপর তাদের মাজার বিদ্যমান।

১৫. শাহ কামাল ১৩৮৫ সালে এদেশে আসেন। তিনি সুনামগঞ্জে শাহার পাড়া এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। পাহাড়িয়া এলাকায় তার মাজার রয়েছে।

১৬. শাহ কালাম। তার মাজার কুমিল্লার উৎনুড়া গ্রামে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. সৈয়দ আহমদ কল্লা শহীদ। নোয়াখালী ও কুমিল্লায় ইসলাম প্রচার করেন। কুমিল্লার আখাউড়ার খরমপুরে তাঁর মাজার রয়েছে।

১৮. শরীফ শাহ। কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কুটিয়ারে তাঁর মাজার।

১৯. শাহ মালেক ইয়ামানী। ঢাকা ওসমানী উদ্যানের পূর্ব পার্শ্বে তার মাজার রয়েছে।

২০. শাহ কলমী, শাহ ইয়ামানীর মাজারের পাশেই তাঁর মাজার।

২১. শায়খ বখতিয়ার সাইফুর। দিল্লী থেকে তিনি এদেশ আসেন। সন্দ্বীপের রোহিনীতে তাঁর মাজার বিদ্যমান।

২২. মাখদুম শাহ জালালুদ্দীন গাজী পাশত বুখারী প্রথমে পাণ্ডুয়ায় ও পরে রংপুর জেলার মাহীগঞ্জে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৩৮৩ সালে উছ নগরে তার মৃত্যু হয়। সেখানেই তার মাজার রয়েছে।

২৩. বাসতি শাহ। চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানাধীন শ্রীপুর গ্রামে তাঁর মাজার। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এদেশে আসেন।

২৪. শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী। তিনি একই সময়ে এদেশে আসেন। কুমিল্লার শহরতলীতে তাঁর মাজার রয়েছে।

২৫. সাইয়্যেদুল আরেফীন, পটুয়াখালীর ফালীগুড় গ্রামে তাঁর মাজার রয়েছে।

২৬. শাহজালাল। তিনি সোনারগাঁও-এর মুয়াজ্জিমপুরে আস্তানা স্থাপন করেন, সেখানে মসজিদের সাথে তাঁর মাজার রয়েছে।

২৭. শাহ মুহসিন আউলিয়া। তিনি ১৩৯৭ সালে ইন্তিকাল করেন। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলীতে তাঁর মাজার রয়েছে।

২৮. শাহ আলাউদ্দিন আলাউল হক প্রথমে পাণ্ডুয়া ও পরে সোনারগাঁও-এ খানকাহ স্থাপন করেন। ১৩৯৮ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। পাণ্ডুয়াতে হাট দরগায় তাঁর মাজার রয়েছে।

বিজয় অভিযানোত্তর : প্রশাসনিক পর্যায়

১২০৩ খ্রী. মুসলিম বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর এদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের গোড়া পত্তন হয়। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রথম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় রংপুরে (পূর্বতন নদীয়া)। বখতিয়ার খিলজী এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এভাবে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯৫] এগুলোর মাধ্যমে কুর'আন ও হাদীসের আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। ফলে বাগদাদ ও কর্ডোভার অনুসরণে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মাদরাজ, লুভালী, সোনারগাঁ ও ঢাকাসহ তদানীন্তন ভারতের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ শিক্ষার জন্য বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মুসলিম শাসকগণ দেশের মোট ভূমির এক তৃতীয়াংশ/এক চতুর্থাংশ লাখেরাজ করে দিয়েছিলেন।

তুর্কী মুসলমান শাসকেরা এদেশ বিজয়ের পরও যুদ্ধ বিগ্রহ ও আভ্যন্তরীণ গঠন কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। কাজেই এদেশে ইসলাম প্রচার ও এর উৎকর্ষ সাধনে অলী-আবদাল, আউলিয়া, সূফী গাউস-কুতুবগণকেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ড. আবদুর রহীম মন্তব্য করেন :

> It is clear that the Arab Merchants Visited the Costal region of Bengal from the mouth of Meghna to Cox's Bazar and Prized its Commodities such as the fine cotton cloth (muslin) and aloeWood.[১৯৬]

---

১৯৫. প্রফেসর মুজিবুর রহমান, প্রবন্ধ : মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা : অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত, জাতীয় সেমিনার, ঢাকা : ১৯৯৩।

১৯৬. ড. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সুফী সাধক*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৩, পৃ ৬-৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের সমাজ-সংস্কৃতি প্রগতিশীল হওয়ায় একদিকে মুসলমানদের বিজয় অভিযান অপ্রতিহতভাবে চলে আসছিল এবং অন্যদিকে পীর-ফকির ও দরবেশগণ অসংখ্য নর-নারীকে ইসলাম ধর্মের দীক্ষা দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৯৭]

মুসলিম শাসকদের মধ্যে অনেক শাসক, বাদশা বা নবাব ছিলেন, যাঁরা ইসলামী চিন্তা চেতনাকে ধারণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। ফলে ইতিহাসে তাঁরা কেবল শাসকই বিবেচিত হন নি, তাঁরা ইসলামের 'দা'য়ী' বা 'মুবাল্লিগ' হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। বিবেচিত হয়েছেন- ইসলামী শিক্ষার মহান পৃষ্ঠপোষক রূপে। তাদের এই পৃষ্ঠপোষকতার প্রভাব অপরিসীম। তাঁরা এই উপমহাদেশে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের যে স্রোত ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, 'আলিম ও বিদ্বান শ্রেণীকে এই এলাকায় যে পরিমাণে স্থান করে দিয়েছিলেন, ইংরেজদের দু'শ বছরের হাজারো দমন-নিপীড়নে একেবারে শেষ করে দিতে পারে নি মুসলমানদের অর্জিত সেই গৌরবকে।[১৯৮]

উপমহাদেশে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার ধারাবাহিকতা ঐতিহাসিক পালা বদলের অমর সাক্ষ্য বহন করে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি আমরা এক্ষেত্রে আবহমান বাংলার সমাজ সভ্যতার ধারক ও বাহক বলি তাহলে বেশী বলা হবে না। বরং একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, ইসলামী শিক্ষার অবদানেই এদেশে বহু মনীষার জন্ম হয়েছে, যাঁরা রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্য তাদের প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছেন। ফলে দেখা যায়, এক সময় ইসলাম পাহাড়, সাগর, মহাসাগর ও নদী ইত্যাদি পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে পৌঁছে যে বিস্ময়ের সূচনা করেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঐ সূচনা কর্ম ধীরে ধীরে সতেজ আকার ধারণ করেছে।

সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সূচনার পর দ্রুত পরিণত বয়সে পৌঁছে আবার তা কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে। উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস এর থেকে ব্যতিক্রম। এখানে বাধাগ্রস্ত হয়ে গতি হারিয়েছে কিন্তু মূল অস্তিত্ব হারিয়ে যায় নি। যার ফলে আজও এখানকার পথে প্রান্তরে, পরিবেশ, সমাজ, সভ্যতা ও অফিস-আদালতে এককথায় সর্বত্র ইসলামী শিক্ষার সুন্দর নমুনা প্রত্যক্ষ করা যায়।

---

১৯৭. Dr. Muhammad Abdur Rahim, Social and cultural History of Bengal, Karachi : 1957, Vol. 2, p 5.

১৯৮. ড. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, ঢাকা : বা এ, ১৯৮৩, পৃ ২০৫-২০৯।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : দুই

বাংলাদেশ অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা

[৮০০-১৯৭১ খ্রী.]

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : এক

মুসলিম শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা

[১৭৬৫ খ্রী. পর্যন্ত]

উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদদেশে, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে তেলিয়াগাতি গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল জনপদের নাম ছিলো বাংলা।[১] সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৩৯-৫৮) লক্ষণাবতী, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁওসহ অগণিত জনপদকে একটি শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপদান করে বৃহৎ বঙ্গ গঠন করেন।[২] মুসলিম বিজয়ের পূর্বে কোন শাসকই অত্র অঞ্চলকে একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে বিবেচনা করেন নি। সে সময় এটা ছিল বিভিন্ন রাজবংশের শাসনাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও জনপদে বিভক্ত এক ভূ-ভাগ। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে এ অঞ্চল সেন বংশের শাসনাধীন ছিলো। প্রাকৃতিক গঠন ও নদীর গতিধারার কারণে বাংলাভূমি তখন ছিলো পাঁচটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। যেমন : বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ, বাগদী এবং মিথিলা।[৩] বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশ অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিমাংশ শুষ্ক ও কিছুটা উচ্চভূমি। ভূমির এরকম গঠন প্রকৃতিই তুর্কী বংশোদ্ভূত ঘোড়সওয়ারদের জন্য এদেশ আক্রমণ ও এদেশে শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছিল। তাই গাজী ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ্মণাবতী রাজ্য অধিকার করেন।[৪]

বর্তমানে বাংলা তার আদিরূপে অবশিষ্ট নেই। ১৯১১ সালে উর্দুভাষী বিহার ও তেলেগুভাষী উড়িষ্যাকে বৃহৎ বঙ্গ থেকে পৃথক করে দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা দেয়া হয়।[৫] ১৯৪৭ সালে অবশিষ্ট বঙ্গকে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গ নামে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৬]

সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মতো বাংলাদেশ অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থাও প্রভূত প্রভাবান্বিত হয়েছিলো। এ দেশে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস চারটি বিশেষ অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা : সূচনাপর্ব, স্বর্ণযুগ, পতন যুগ (অন্ধকার যুগ) এবং পুনঃ নির্দেশ ও পুনর্গঠন যুগ।

শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকে ৯ম খ্রীস্টাব্দ অথবা তৎপূর্বে যখন 'আরব বণিক এবং প্রখ্যাত মুসলিম সাধু-দরবেশগণ এ অঞ্চলে পরিভ্রমণে আসেন তখন থেকে এ পর্বের সূচনা হয়।

১২০৩ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম বীর ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয় থেকে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে বাংলার দিওয়ানী হস্তান্তরের সময় পর্যন্ত ব্যাপৃত এর দ্বিতীয় যুগ। এ যুগের সময়কাল মোট ৫৬৮ বছর। এ সময়ে বাংলায় তুর্কী, আফগান, পারসিক, 'আরব এবং মুঘলদের শাসন চলছিল। এ সময়কাল বাংলায় ইসলামী শিক্ষার স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত।[৭]

---

১. A K M Yaqub Ali, 'Education for Muslims Under Bengal Sultanat', *Islamic Studies*, XXI V. 4, Pakistan: Islamic Research Institute. 1985, p 420.

২. A H Bani, *Shamsuddin Ilyas Shah, Sir Jadunath Sarker, Commemoration Volume*, Punjab University, 1958, p 56.

৩. A H Bani, 'Date of Bakhtyars Raid on Nudiyah', Indian Historical Quarterly (IHQ), Vol. XXX. Calcutta :1945. p 133; A K M Yaqub Ali, Ibid, p 420.

৪. A H Bani, Ibid, (কোন কোন ঐতিহাসিক বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয় ১২০৩ সালে অনুষ্ঠিত হয় বলে উল্লেখ করেছেন)

৫. বিপিন চন্দ্র, *আধুনিক ভারত*, দিল্লী : ১৯৮৯, পৃ ৪১৫-১৬।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. A K M Ayub Ali, History of the Traditional Islamic Education in Bengal, Dhaka : 1983, p 6.

Dhaka University Institutional Repository

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে একদল ইংরেজ সেনাবাহিনীর হাতে বাংলার শেষ স্বাধীন নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও নিহত হওয়ার পর[৮] ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত তৃতীয় যুগটি ব্যাপৃত। এর সময়কাল প্রায় ১৯০ বছর। এ সময় ক্রমান্বয়ে বাংলার সমগ্র মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে অমানিশার এক ঘোর অন্ধকার নেমে আসে।[৯] এ যুগকে বাংলায় ইসলামী শিক্ষায় পতনের যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে সময়কালকে বাংলার ইসলামী শিক্ষার পুনঃনির্দেশ ও পুনর্গঠনের যুগ বলা হয়। মূলত এ যুগটি একটি নতুন জাতির পক্ষে পশ্চিমা আদর্শের গোলামী ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের জিঞ্জির মুক্তির পদক্ষেপ হিসেবেই চিহ্নিত।

ইসলামী শিক্ষার সূচনা পর্ব [৮০০-১২০০ খ্রী.]

খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধু ও পাঞ্জাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়।[১০] নবম শতাব্দীরও বহু পূর্বে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ইসলামের বীজ বপন করা হয়েছিলো বলে অগণিত ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণে পাওয়া যায়। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত আরব-পারসিক বণিক, মুসলিম ধর্ম প্রচারক এবং সূফী-সাধকগণ এ সময় বাংলায় ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের পথিকৃৎ ছিলেন।[১১] সপ্তম শতাব্দী থেকে 'আরব বণিকগণ ভারত, সিংহল (শ্রীলঙ্কা), পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং চীন দেশে বিপুল পরিমাণে নৌবাণিজ্য সম্ভার সাথে করে নিয়ে আসেন। তারা শত শত বছর ধরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বাস্তবে একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে আসছিলেন। ইসলাম অভ্যুদয়ের পর এ সকল 'আরব মুসলিম বণিক নিজেদের বাণিজ্য সম্ভারের সাথে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা বহন করে নিয়ে আসেন।[১২] বাংলাদেশের প্রাচীন নৌবন্দর চট্টগ্রাম 'আরব-চীন নৌবাণিজ্যের অন্যতম যোগসূত্র ছিল। সে সময় প্রতিটি সামুদ্রিক বন্দরেই 'আরবী ভাষা চর্চা হতো বলে জানা যায়। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় মুসলিম বণিকদের আসা-যাওয়া ছিলো। প্রাচীনকাল থেকেই এটা পাশ্চাত্যের দেশসমূহের সাথে নিজস্ব উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবসায়ের সুযোগ ভোগ করে আসছিলো। তখন বিনিময়ের মাধ্যম ছিল কড়ি।[১৩] বাংলা এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাংলার কতিপয় আভ্যন্তরীণ নৌবন্দর এবং বাণিজ্য কেন্দ্রের বিস্তার লাভ করে। আর এ সম্পর্কই এ দেশে ইসলামী প্রভাবের স্রোতধারা বজায় থাকার কারণ হিসেবে নিরূপিত। খ্রীস্টীয় দশম ও দ্বাদশ শতকের 'আরব ভূগোলবিদগণ বাংলার এমন অনেক শহরের উল্লেখ করেছেন, যেগুলো উপকূলের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত। তথায় মুসলমানগণ নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন। কতিপয় শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক সূফী-সাধক এবং আধ্যাত্মিক পুরুষ যাঁরা নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এ অঞ্চলে আগমন করেছেন, তাঁরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ, চিল্লাখানা, খানকা এবং ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে অমরত্ব লাভ করেছেন। যেমন :

---

৮. Ibid.

৯. Ibid, p 7.

১০. Ibid

১১. Ibid, p 8.

১২. Ibid.

১৩. K Fazli Rabbi, *The Origin of the Musalmans of Bengal*, nill dated, p 6 Footnote. নবম শতাব্দীর দুজন মুসলিম বণিক এ বিষয়ে একটি সুন্দর তথ্য প্রদান করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, রামি নামক এক রাজার বিপুল সংখ্যক হাতী, আগরকাঠ, উদবিড়ালের এবং গণ্ডারের শিং, ঢাকাই মসলিন কাপড় সমৃদ্ধ ছিলো। এ সকল দ্রব্য রফতানী করা হতো এবং কড়ির বিনিময়ে এগুলো ক্রয় করা হতো। কেননা উক্ত রাজ্যেও মুদ্রা ছিলো কড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ বায়েজিদ বোস্তামী রহ. (মৃ ৮৭২ খ্রী.) : একজন বিখ্যাত ইরানী সূফী-সাধক। তিনি সম্ভবত নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম আগমন করেন।[১৪] চট্টগ্রাম শহরের অদূরে এক ক্ষুদ্র টিলার উপর তাঁর চিল্লাখানা অবস্থিত। বিপুল সংখ্যক ভক্ত তাঁর অনুগামী হন ও এদেশে আগমন করেন তাঁরা এ নির্জন এলাকাটিকেই আধ্যাত্মিক সাধনা স্থল হিসেবে বেছে নেন।[১৫]

শেখ মীর সুলতান মাহমুদ : তিনি সুলতানুল-বালখী হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু শেখ তাওফিকের নির্দেশে তিনি একাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। তাঁর চরিত্র ও মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে রাজা থেকে কৃষক পর্যন্ত সর্বস্তরের মূর্তিপূজারী ও বিপুল সংখ্যক বর্বর লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ঢাকা ও বগুড়া জেলার হিন্দু রাজন্যবর্গের কঠোর প্রতিবন্ধকতার মুকাবিলা করে তিনি সাফল্য লাভ করেন।[১৬]

শেখ মুহাম্মদ সুলতান রুমী : ১১ শতকে তিনি ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখেন। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ও বিপুল সংখ্যক শিষ্য তাঁর সাথে চট্টগ্রাম আগমন করেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে স্থানীয় রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এক বিরাট অংশ ইসলামে দীক্ষিত হন।

শেখ বাবা আদম শহীদ : তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা সম্ভবত ১২ শতকের প্রারম্ভে ঢাকা জেলার স্থানীয় এক হিন্দু রাজার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি উক্ত যুদ্ধে সহচর সমভিব্যহারে শহীদ হন।

শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ বুতশিকন এবং মখদুম শাহ্ দউলা : ঢাকা ও পাবনা জেলায় ইসলাম প্রচারের অদম্য উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশের জন্য প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। এরা সম্ভবত ১৩ শতকের দিকে বাংলায় আগমন করেন।

বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পূর্বে সূফী-সাধক ও ধর্ম প্রচারকদের মাঝে যাঁরা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে বিধর্মীদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করা এবং আমৃত্যু ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানে সীমাহীন অবদান রেখেছেন, এমন মহৎপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের মাঝে তিনজন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন : শেখ আহমদ বিন হামযাহ নিশাপুরী (মৃ ২৮৮হি./৯০০খ্রী.), শেখ ইসমাইল বিন নাযানূদ নিশাপুরী (মৃ ৩৪হি./৯৫২খ্রী.) এবং শেখ আহমদ তকী (মৃ ৫৬৫হি./১১৬৯খ্রী.)।[১৭]

'আরব বণিকদের ইসলাম প্রচার সম্পর্কীয় তৎপরতার সঠিক তথ্য আজও অজানা। ৯ম ও ১২শ শতকের কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ সূফী-সাধকের মিশনারী তৎপরতার নগণ্য সংখ্যক গল্প ও কাহিনী কোন কোন পুস্তকে সংক্ষিপ্ত তথ্য ইত্যাদির মাধ্যমে সামান্য অবহিত হওয়া যায়। তবে অনেক পণ্ডিতই এ কথা স্বীকার করেন, খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকে এতদঞ্চলে 'আরব বণিকদের সাহায্যেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। আর নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুসলিম সূফী-সাধকদের মাধ্যমে এ ভূভাগে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী ধর্মবিশ্বাস দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব লাভ করে।

সূচনা পর্বে ইসলামী শিক্ষা কোনরূপ প্রাতিষ্ঠানিক বা সিলেবাসভুক্ত ছিলো না। সূফী-সাধকগণ নিজেদের চিল্লাখানা বা খানকার মাধ্যমে ভক্তশিষ্যের মাঝে মহান আল্লাহর একত্ব, মানবজাতির বিশ্বভ্রাতৃত্ব, শান্তি, প্রেম এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ললিতবাণী প্রচার করতেন। তাঁরা নামায, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে মসজিদ ও খানকা নির্মাণ করেন। এ সকল মসজিদ ও খানকাই ছিল বাংলায়

---

১৪. ড. শোহাবুল হুদা তাঁর 'The Saints and Shrines of Chittagong' শীর্ষক অভিসন্দর্ভে বায়েজিদ বোস্তামীর চট্টগ্রাম আগমনের কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, চট্টগ্রামের উক্ত স্থানে অবস্থিত মাযারটি স্থানীয় একজন সাধকের ছিলো। তাঁর নাম সম্ভবত বায়েজিদ ছিলো।

১৫. Dr. A K M Ayub Ali, Ibid, p 10.

১৬. Ibid.

১৭. Ibid, p 11.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষার সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। মসজিদ, খানকা ও চিল্লাখানাগুলোতে শত শত নওমুসলিম পবিত্র কুর'আন পাঠসহ ইসলামের মৌলিক জ্ঞান, নামায, রোযার জরুরী মাস'আলা-মাসায়িল, ধর্মীয় জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। এ সকল মসজিদ ও খানকা বাংলায় তৎকালে মক্তব বা পাঠশালার প্রয়োজন মিটাতো আর এগুলোই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় ইসলামের বিজয়ের পথ সহজ ও সুগম করে তুলেছিলো।

মুসলিম সমাজ ও শিক্ষার বিকাশ

১২০৩ খ্রীস্টাব্দে গাজী ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলায় সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় হয়।[১৮] উক্ত সময়সীমা থেকে ১৭৬৫ সালের ১২ অক্টোবর পর্যন্ত[১৯] প্রায় ৫৬৫ বছরাধিক কাল এদেশে মুসলমানদের শাসন স্থায়িত্ব লাভ করে। এ সময়ে প্রায় ৭৬ জন মুসলিম শাসক এবং রাজা বাংলা শাসন করেন।[২০] এরা কেউ ছিলেন আফগান, কেউ তুর্কী, কেউ মুঘল, কেউ বা পারসিক বা কেউ ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। লক্ষ্মনাবতী (গৌড়), সাতগ্রাম, তান্দা, ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া), সোনারগাঁও এবং মুর্শিদাবাদ ছিলো তাঁদের রাজধানী বা সরকারের প্রধান কেন্দ্র।

ইসলাম ধর্মতত্ত্ববিদ, মুসলমান সূফীবৃন্দ ও মুসলমান শাসক শ্রেণী, এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে বঙ্গদেশে মুসলমান সমাজ বিকাশ লাভ করে। শাসক শ্রেণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ ঘটে। ফলে মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর ক্ষুদ্র লক্ষৌতি এলাকা-এর প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড় শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গদেশ একটি শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান রাজ্যে পরিণত হয়। নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া মুসলমান সমাজ জন্মের পর তার চারপাশের অসংখ্য অমিত্রভাবাপন্ন অমুসলমান স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে সংঘর্ষের মুখে টিকে থাকা সম্ভবপর ছিল না। ক্ষমতা বিস্তারের পাশাপাশি শাসকশ্রেণী 'উলামা ও সূফীদের পৃষ্ঠপোষকতায় মনোনিবেশ করেন। তাঁরা মসজিদ-মাদরাসা ও খানকাহ্ নির্মাণ করেন। জনগণকে শিক্ষাদানের পথ সুগম করার লক্ষ্যে মাদরাসার ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী তহবিল হতে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।[২১]

'উলামা ও মাশায়িখ নিয়ে গঠিত আহলি কলম শ্রেণীর ধর্মতত্ত্ববিদগণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। তাঁরা নব বায় 'আতপ্রাপ্ত মুসলমানদেরকে শরী'আত সম্পর্কে শিক্ষাদানে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া কুর'আন, হাদীস, ফিক্হ, তাসাউফ, ইসলামী সাহিত্য ও বাংলা ভাষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। কিন্তু তাঁদের প্রধান অবদান ছিল জনগণকে ইসলামী শিক্ষায় বিশেষ করে শরী'আ সম্পর্কে শিক্ষাদান করা।

মুসলিম সমাজের বিকাশে 'আলিম সমাজ ও সূফীদের অবদান ছিল আরও বিস্তৃত। তাঁরা রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না বরং তাঁরা রাজনৈতিক শক্তির বিকাশে সহায়তা করেছিলেন।[২২] তাঁরা শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনবোধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শাসকদের সহযোগিতা করতে দ্বিধাবোধ করতেন না।[২৩] তবে তাঁদের

---

১৮. A K M Ayub Ali, Ibid, p12.

১৯. আবদুস সাত্তার, তারীখ-ই-মাদ্রাসা আলিয়া, ঢাকা : ১৯৫৯, পৃ ৩০।

২০. A K M Ayub Ali, Ibid, p 12.

২১. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত আন নাসিরি*, এ কে এম জাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, মূল পৃ ১৫, অনু, পৃ ৫৬; I. H Qureshi, *Administration of Sultanate of Delhi,* 5th edition (n.d) p 76-190; আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশ', *প্রবন্ধ সংকলন*, মনসুর মুসা সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ ৮২।

২২. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৪, পৃ ২৪৫, কে. আলী, *বাংলাদেশ ও পাক ভারতের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ ২২৮-২২৯।

২৩. ড. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ঢাকা : ১৯৮২,৩য় সং, পৃ ১৯০-৯১।

Dhaka University Institutional Repository

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তাঁরা জনগণকে কুর'আন-হাদীসের জ্ঞান দান করেছিলেন এবং ধর্মীয় আচার-আচরণে চার পাশের জনগণকে আকৃষ্ট করেছিলেন। ফলে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে।[২৪]

এভাবে এ দেশে মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকে, মুসলমানরা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। এ দেশের ভাষা শিখে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মিশে যায় এবং স্থানীয় মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে।[২৫] তাদের খাদ্যাভ্যাস ও বসতবাড়ীর ব্যাপারে তারা স্থানীয় প্রাপ্তিসাধ্য উপকরণের উপর নির্ভর করে। এসব তথ্যই প্রমাণ করে যে তারা বঙ্গদেশকে স্বদেশরূপে বিবেচনা করে। পাশাপাশি ইসলামী ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত থাকে এবং নিজেদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। মুসলমান সমাজ ইতোমধ্যে তাদের গঠনশীল পর্যায় অতিক্রম করে একটি নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে এবং দেশে সহিষ্ণুতা, সাম্য ও বিশ্বপ্রেমের নতুন চেতনা সঞ্চার করে। ফলে জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ ইসলাম গ্রহণ করে।[২৬]

নব বায়'আতপ্রাপ্ত মুসলিম সমাজে কুর'আন হাদীসের জ্ঞান প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ লক্ষ্যে শাসক মহলের পৃষ্ঠপোষকতা এবং 'আলিম সমাজ, হাদীসবিদ ও সূফীদের প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী জ্ঞান চর্চা শুরু হয়। এ সময় 'আলিম সমাজ কর্তৃক কুর'আন, হাদীস ও ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে মুসলমানদেরকে পাঠদান করা হতে থাকে। ইসলামী জ্ঞান চর্চার সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাদরাসা, মসজিদ ও খানকাহ্ গড়ে ওঠে।[২৭] বখতিয়ার খিলজী লক্ষ্ণৌতি জয় করে মাদরাসা-মসজিদ ও খানকাহ্ নির্মাণ করেন। বখতিয়ার খিলজীর পরবর্তী শাসকরাও অনরূপ ধর্ম প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। এমনকি সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্ (১৩৯২-১৪১০ খ্রী.) সুদূর 'আরব দেশের পবিত্র মক্কা নগরীতে একখানা পূর্ণাঙ্গ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এ ব্যয় নির্বাহের জন্য বিপুল অর্থ ও ভূমি ক্রয় করে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন।[২৮] সুলতান 'আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ্‌র শাসনামলে (১৪৯৩-১৫১৮ খ্রী.) তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশে কুর'আন ও হাদীস শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী 'আলিমগণকে বঙ্গে এসে বসতি স্থাপন করার আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[২৯] তাঁর ও অন্যান্য শাসকদের প্রচেষ্টায় এ দেশে অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যায়ে মাহিসুন বা বর্তমান দিনাজপুরের মাহি সন্তোষ নামক স্থানে অবস্থিত মাওলানা তকী উদ্দীন 'আরবী কর্তৃক স্থাপিত মাদরাসা, সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার মাদরাসা, রাজশাহীর বাঘায় অবস্থিত মাওলানা শাহ দৌলার মাদরাসা ও গৌড়ে অবস্থিত 'আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের মাদরাসার নাম উল্লেখ করা যায়।[৩০] ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, ১২৯৮ খ্রীস্টাব্দে সুলতান রুকন উদ্দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে ত্রিবেণীতে একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। এতে একখানা মাদরাসা নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। শিলালিপিটির প্রারম্ভে রয়েছে মহানবীর হাদীস। জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহের ১৪৩২ খ্রীস্টাব্দের সুলতানগঞ্জ শিলালিপিতেও হাদীসের উদ্ধৃতি রয়েছে। সুলতান 'আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ্‌ও ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দের শিলালিপিটির প্রারম্ভেই রয়েছে একখানা হাদীস।[৩১]

---

২৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, কলকাতা : ১৩৮০ বাং. পৃ ২৩৪-২৩৫।

২৫. ড. মুস্তাফিজুর রহমান, '*ভাষা ও ইসলাম*', *মাসিক আল-হক*, জুলাই ১৯৯৭, (১ম সংখ্যা) চট্টগ্রাম, পৃ ৯।

২৬. এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, কলকাতা : ১৯৩৫, পৃ ১৬৪।

২৭. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত আল-নাসিরি*, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ ১৫১।

২৮. মুফতি কুতুব উদ্দীন, *তারিখে মক্কা*, লাইপ সিবা : ১৮৫৭, পৃ ১৯৮-২০০।

২৯. Dr. Muhammad Ishaq; *Indian Contribution to the Study of Hadith literature*, Dhaka : University of Dhaka, 1976, p 115.

৩০. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬, পৃ ২-৮; ড. আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ ২২৫-২২৬।

৩১. ড. আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ ৭৬-৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, ধর্ম প্রচারক 'আলিম ও সূফীগণ কর্তৃক তৎকালে মসজিদ মাদরাসা ও খানকাহতে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর পাঠদান করা হতো। স্থানীয় ধর্মীয় প্রথা ও সংস্কার নামে তিরোহিত হতে থাকে। মুসলিম সমাজ আল্লাহর নবী কাংখিত সমাজের দিকে ক্রমান্বয়ে ধাবিত হতে থাকে। সমসাময়িক বাঙালী কবিদের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, তৎকালের মুসলমানগণ কুর'আন-হাদীসের নীতি অনুসারে নিজেদের রূপান্তরিত করতে শুরু করে। বাঙালী কবি মুকুন্দরামের কবিতায় বর্ণিত হয়েছে, তৎকালীন মুসলমানরা প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে এবং লাল পাটি বিছিয়ে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, সোলেমানী মালা গুণে, সর্বদা কুর'আন কিতাব পাঠ করে। তারা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করে না এবং প্রাণ গেলেও এরা রোযা ত্যাগ করে না।[৩২] তারা মাথায় টুপি পরিধান করে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে পীর ও সূফীদের আস্তানায় যেতে শুরু করে। মহিলারা পর্দা মেনে চলতে লাগল, দিনের বেলায় তারা সচরাচর বাড়ীর বাইরে বের হতো না। তারা নিজেদের সযত্নে গৃহকাজে নিয়োজিত রাখতো। বিবাহের ক্ষেত্রেও তারা রাসূলের সা. রীতি অনুসরণ করতে লাগলো।

ধর্ম প্রচারক, সূফী 'আলিমগণের কার্যক্রম কেবলমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা খানকাহ্র চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাঁরা এ দেশের শাসন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম, শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা জনগণের মন-মানসিকতার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মাদরাসা বা খানকাহতে ইসলামী বিষয়ে শিক্ষাদানরত 'আলিম সমাজ ও সূফীবৃন্দ দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর নীরব দর্শক ছিলেন না; বরং সুলতানের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করে ইসলামের বিরুদ্ধে গেলে তাঁরা এগুলোকে কুর'আন-হাদীসের আলোকে সংশোধিত করতে চেষ্টা করতেন। দেশ ও ধর্মের প্রয়োজনে তাঁরা যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতেন। এ ক্ষেত্রে সিলেট বিজয়ে হযরত শাহজালাল রা.-এর অংশগ্রহণ, চট্টগ্রাম বিজয়ে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্র সঙ্গে সহযোগিতা, কামরূপ ও উড়িষ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রুকনউদ্দীন বরবক শাহ্র সঙ্গে শাহ ইসমাঈল গাজীর সহযোগিতার কথা উল্লেখ করা যায়।

শাসক শ্রেণীকে ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে 'আলিমগণ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা ইসলামের আলোকে শাসনকার্যের রূপরেখা শাসকদের প্রদান করতেন। শাসকগণ যাতে শোষকে পরিণত না হয় সে জন্যে তাদেরকে বারবার সতর্ক করে দিতেন। এমন কি শাসকগণকে অধর্মীয় কাজে লিপ্ত হতে দেখলে 'উলামা ও সূফীরা দিক নির্দেশনা দান করতেন বলে অনেক সময় তাঁরা শাসকদের অসন্তোষের কারণ হতেন। অবশ্য শাসকগণ ধর্মপ্রচারক 'আলিম সমাজ ও সূফীদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।[৩৩] তারা ধর্মীয় বিষয়ে 'আলিম সমাজ ও সূফীদের নিকট থেকে উপদেশ গ্রহণ করতেন।

'আলিম ও সূফীগণ এদেশের মুসলমানদেরকে ইসলামের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাদেরকে কুর'আন হাদীসের শিক্ষা দানে সচেষ্ট হন। কুর'আন হাদীস

---

৩২. ড. এম. এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (১২০৩-১৫৭৬), মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান অনূদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, ১ম খ, পৃ ৩৪০।

ফজর সময়ে উঠি, বিছায়্যা লোহিত পাটি
পাঁচবেরি করয়ে নামাজ।
সোলেমানি মালা ধরে জপে পীর পয়গম্বওে
পীরের মোকামে দেই সাঁজ
দয়বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কিতাব কোরান
বড়ই দানিসমন্দ কাহাকে না করে ছন্দ
প্রাণ গেল রোজা নাহি ছাড়ে। (মুকুন্দরাম : চণ্ডিকাব্য, পৃ ৩৪৪)

৩৩. ড. এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (১৫৭৬-১৭৫৭), মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান ও ফজলে রাব্বী অনূদিত, ঢাকা : বা এ, ১৯৮২, ২য় খ, পৃ ১৭৮-১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থোপার্জনে মানুষের অস্থিরতা আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে। অনুরূপভাবে ব্যায়ের ক্ষেত্রেও একটি সীমারেখা বেঁধে দেয়। অর্থ রোজগারের ক্ষেত্রে তারা হালাল (বৈধ) ও হারাম (অবৈধ) পন্থার কথা চিন্তা করে এবং যথাসম্ভব তা মেনে চলতে থাকে। অনুরূপ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তারা ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। এভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এখানে মুসলিম সমাজে এক নবধারা সূচিত হয়।

মানুষের কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রধানতঃ সমকালীন সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। ব্যক্তি মানসের মধ্যে সংস্কৃতির প্রভাব নিয়ত কখনো সচেতনভাবে কখনো অবচেতনভাবে কাজ করে।[৩৪] এ দেশে মুসলিম সমাজ গঠিত হবার পর মাদরাসা, মসজিদ, খানকাহ্ ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ইসলামী জ্ঞান চর্চার ফলে নতুন ধারা সৃষ্টি হয়। এ সংস্কৃতি মুসলমান ও অমুসলমান উভয়কেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। চিরাচরিত ধারণা ও বিভ্রান্তি থেকে সরে এসে তারা ইসলামী ঐতিহ্যের পতাকা তলে সমবেত হতে থাকে। তাদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছেদ, শিল্প-সাহিত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই ইসলামের ছাপ পরিদৃষ্ট হয়।

ইসলামের আগমনের প্রাক্কালে উপমহাদেশে তথা বঙ্গদেশের সমাজ ব্যবস্থা ছিল পঙ্গু। বর্ণবৈষম্য ও নানারূপ কুসংস্কারের ফলে জনজীবন ছিল বিপর্যস্ত। এমনি সময় ইসলামের আবির্ভাব হয়ে এবং ইসলামের পতাকা বহন করে নিয়ে আসেন শান্তিকামী সরল অনাড়ম্বর সূফী দরবেশ ও 'আলিম সমাজ। তাঁরা ছড়িয়ে দেন কুর'আন হাদীসের জ্ঞানের আলো। মাদরাসা, মসজিদ, খানকাহ্ ইত্যাদি থেকে ইসলামী জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বস্তরে। ফলে বদলে যায় সমাজের রূপ-চিত্র। সমাজ জীবনের সর্বস্তরে ইসলামের প্রভাব সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়।

মুসলিম শাসনের এ সুদীর্ঘ সময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বাংলায় জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা অধিক হারে বিরাজিত ছিলো।[৩৫] এর উর্বর পলিগঠিত ভূমি, পর্যাপ্ত উৎপন্ন দ্রব্য এবং সহজলভ্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অধিবাসীদের জন্য সকল প্রকার সুখ-শান্তির নিশ্চয়তা এবং আগন্তুক ও অভ্যাগতদের জন্য সহজলভ্য জীবিকার প্রতিশ্রুতিশীল ছিল। মুসলিম বিশ্বেও বিভিন্ন অংশ থেকে পণ্ডিত, শিক্ষক, ধর্ম প্রচারক এবং সূফী-সাধকদের এক বিরাট স্রোতধারা এদেশে প্রবেশ করেছিলো, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার মুসলিম শাসকবর্গ কলা; বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য এবং স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৩৬] শিক্ষা রাষ্ট্রীয় নীতির শীর্ষদেশে ছিল। প্রত্যেক পরগণায় কসবা বা গ্রামেই মাদরাসা, মসজিদ ও মক্তব নির্মাণ করা হয়েছিলো। সে সময়কার শিক্ষা ছিলো মসজিদ কেন্দ্রিক। সমগ্র দেশে এমন কোন মসজিদ ছিলো না, যাকে কেন্দ্র করে কোন মক্তব অথবা মাদরাসা গড়ে ওঠে নি।[৩৭] এতদ্ব্যতীত দেশের বিভিন্ন অংশে সূফী-সাধকদের অগণিত খানকা ও হুজরা ছিলো। এগুলোর প্রত্যেকটির সাথেই মাদরাসা সংযুক্ত ছিলো। বর্ধিত সংযোগ হিসেবে (বর্ণ-গোত্র-নির্বিশেষে দরিদ্র জনগণের মধ্যে তৈরি করা আহার্য বন্টনের নিমিত্ত) লঙ্গরখানা ছিলো।

ইসলামী শিক্ষার প্রসারে শাসকদের অবদান

মুসলমানগণ এদেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে।[৩৮] উমাইয়া খলিফা ওলীদ ইবন 'আবদুল মালেকের শাসনামলে (৭০৫-৭১৫ খ্রী.) সেনাপতি ইমাদ উদ্দিন মুহাম্মদ বিন কাশেম সাকাফি

---

৩৪. হাফেজ হাবিবুর রহমান, *সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা : আইডিয়েল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৭, পৃ ৩৮।

৩৫. A K M Ayub Ali, Ibid p 13.

৩৬. Ibid.

৩৭. Education Consultation Bengal Provincial Committee, 1886, Part II, Para 183. Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslim of Bengal*, Riyadh, 1985 Vol IB, p 827.

৩৮. ড. মুহাম্মদ ইছহাক, *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৩, পৃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বপ্রথম (৭১২-১৩ খ্রী.) ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু ও মুলতান এলাকা মুসলিম শাসনাধীন করেন।[৩৯] অতঃপর গজনীর সুলতান সবুকতগীন (৯৭৭-৯৭ খ্রী.) এবং তাঁর পুত্র সুলতান আবুল কাসেম মাহমূদ (৯৯৮-১০৩০ খ্রী.) পূর্বদিকে বিস্তৃত করেন। এরপরে বিভিন্ন সময়ে নানা উপায়ে বিভিন্ন মুসলিম ব্যক্তি ও বংশ এদেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁরা গোটা ভারতবর্ষ অধিকার করে নেন। এদেশে দিল্লী কেন্দ্রিক প্রথম স্বাধীন ইসলামী সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন কুতুবুদ্দীন আইবক (১২০৬-১০ খ্রী.)। ১২০৩ সাল ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।

এ সকল বিজয়ী শাসকগণ কিভাবে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রচার প্রসারে সক্রিয় অবদান রেখেছিলেন নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দী মুসলমানদের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির চরম যুগ। এই গৌরবময় ঐতিহ্য নিয়ে বিজয়ী মুসলমানগণ প্রথমে উত্তর ভারতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ভারতের অন্যান্য এলাকায়। ফলে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সযত্নে লালিত ও বিকশিত হয়েছে ইসলামের ঐতিহ্যময় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা।

সুলতান মাহমূদ (১০০১-১০৩০ খ্রী.) গজনীকে তদানিন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করেন। তিনি শিক্ষা ও শিক্ষিতদের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর দরবার ছিল জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের মহামিলন কেন্দ্র। তিনি প্রায় চারশতাধিক কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।[৪০]

সুলতান শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী (১১৭৪-১২০৬ খ্রী.) ইসলামী শিক্ষা প্রসারের জন্য আজমীর এবং আরও অনেক শহরে বড় বড় মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি দিল্লীতে ১১৯২-৯৩ সালে বিখ্যাত 'কুওয়াতুল ইসলাম' নামক মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি কয়েকজন যোগ্য ক্রীতদাসকে সু-শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত ক্রীতদাসগণই পরবর্তীকালে দিল্লীর যোগ্য সুলতান রূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। শিহাবুদ্দীন ঘোরী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক এস এম জাফর বলেন, 'ভারতীয় রাজা বাদশাহদের মধ্যে মুহাম্মদ ঘোরীই ছিলেন সর্ব প্রথম শাসক যিনি শিক্ষা বিস্তারকে নিজ দায়িত্ব বলে মনে করতেন। তাই ভারতে ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ স্থাপনে মুহাম্মদ ঘোরীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।'[৪১]

কুতুবুদ্দীন আইবক (১২০৩-১২১০ খ্রী.) ছিলেন ক্রীতদাস। তিনি সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর জামাতা ও সেনাপতি ছিলেন। সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতুবুদ্দীন আইবক স্বাধীন সুলতানরূপে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন, কুতুবুদ্দীন ছিলেন জ্ঞানী, গুণী ও সুশিক্ষিত। 'আরবী ও ফারসী ভাষায় তার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। দানশীলতার জন্য তিনি ইতিহাসে দ্বিতীয় হাতেম হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

কুতুবুদ্দীন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি মসজিদসমূহে ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইসলামী শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি মুহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'কুওয়াতুল ইসলাম' মসজিদটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। তার নির্মিত আজমীরের মসজিদকে আড়াই দিনকা ঝোপড়া বলা হত। মসজিদ সংলগ্ন মক্তব, মাদরাসা ও খানকা ছিল সে যুগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মক্তব ছিল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে সূরা কিরা'আত, অক্ষর জ্ঞান ও লিখন পঠন শিক্ষা দেয়া হতো। আর মাদরাসা

---

৩৯. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪, পৃ ১৪; এ কে এম আবদুল আলিম, ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ ১২।

৪০. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৫, ১৮শ খ, পৃ ৭১৪; ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, ভারতের ইতিহাস কথা, কলিকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃ ১৯, ২০।

৪১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৮৬ ২য় খ, পৃ ৩৫৮; ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত *ভারতের ইতিকথা*, পৃ ২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল উচ্চ স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানে কুর'আন, হাদীস, ফিকহ, উসূল, সাহিত্য ও দর্শন শিখানো হতো। রাজপ্রাসাদেও স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল।[৪২]

১২০৩ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজী বাংলা বিজয় করেন এবং এ দেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। তিনি একজন দ্বীনদার শাসক ছিলেন। তিনি নিজেই কয়েকটি মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁকে অনুসরণ করে আঞ্চলিক শাসকগণও বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[৪৩]

সুলতান ইলতুতমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রী.) বিদ্যোৎসাহী শিক্ষানুরাগী ও বিচক্ষণ সুলতান ছিলেন। তিনি শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সালতানাতে ইসলামী শিক্ষাদানে বহু মক্তব, মাদরাসা, সাধারণ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ফলে রাজধানী দিল্লী ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মস্ত বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

সুলতান ইলতুতমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়াও তার পিতার মত শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মুইজী মাদরাসা খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে। উচ্চ শিক্ষা লাভের এ প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল।

সুলতান ইলতুতমিশের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমূদ (১২৪৬-১২৬৬ খ্রী.) মুসলিম ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি পূর্ণ ইসলামী জীবন যাপন করতেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। তার দরবার সাহিত্যিক ও বিভিন্নমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।[৪৪] সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৬৮ খ্রী.) তাঁর পূর্বসূরীদের মত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তার দরবার সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সুলতান বলবনের মত তার সুযোগ্য পুত্রগণও বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন।[৪৫]

খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দীন খিলজী (১২০৯-১২৯৬ খ্রী.) বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যানুরাগী ও শিক্ষানুরাগী সুলতান ছিলেন। তাঁর দরবারে যে সব যশস্বী মনীষীর সমাবেশ ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমীর খসরু, খাজা হাসান আমীর আরসামা, তাজউদ্দিন ইরানী ও কাজী মুগীস আমীর। খসরু রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন।[৪৬]

সুলতান 'আলাউদ্দিন খিলজীর সময় দিল্লী শিক্ষিত ও বিদ্বানদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। কলা ও বিজ্ঞানে ডিগ্রী প্রাপ্ত পঁয়তাল্লিশ জনের মত ব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে কাজ করতেন। তাঁর সময়ে দিল্লী মুসলিম শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি বহু প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা মক্তব, এতিমখানা ও পান্থশালা নির্মাণ করেন।[৪৭]

---

৪২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৭ ৩য় খ, পৃ ৩৫২; এ কে এম আবদুল আলিম, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩-৪৪।

৪৩. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৮ ৪র্থ খ, পৃ ৬৪৪-৪৫; ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৪।

৪৪. ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১-৪২।

৪৫. ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৬১-৬২।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াস উদ্দিন তুঘলক বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। তাঁর সময়েই বিদ্বান ব্যক্তিদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।[৪৮]

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রী.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। কলা ও বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তিনি ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষার জন্য তাঁর অবদান ছিল অতুলনীয়। তাঁর বদান্যতায় দিল্লীতে বহু মক্তব, মাদরাসা ও মসজিদ স্থাপিত হয়। পরিব্রাজক ইবন বতুতা তাঁর দরবারে নয় বছর কাযী হিসেবে কাজ করেন।

তৎকালীন জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দক্ষতা ছিল। কুর'আন, হাদীস, তর্কশাস্ত্র, গ্রীক ও মুসলিম দর্শন, গণিত, শরীর বিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।[৪৯]

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রী.) শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন তার কোন তুলনা হয় না। তিনি নিজে ফতূহাতে ফিরোজ শাহী নামে তাঁর শাসনামলের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি অকৃপণ হাতে দান করতে কুণ্ঠিত হতেন না। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে তিনি বিশিষ্ট শিক্ষকগণকে তাঁর রাজত্বের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তিনি তাঁর রাজত্বে প্রায় ত্রিশটির মতো মহাবিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করে তাতে বেতনভোগী দক্ষ অধ্যাপক নিয়োগ করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফিরোজশাহী মাদরাসা। এর সঙ্গে ছিল মসজিদ ও জলাধার। জালাল উদ্দিন রূমী ছিলেন মাদরাসার অধ্যক্ষ।[৫০]

লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাহলুল লোদী (১৪৫১ খ্রী.) সংস্কৃতিবান ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁর শাসনাধীন এলাকায় কয়েকটি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সুলতান সেকেন্দার লোদী নিজেই একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। তিনি সামরিক কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপর জোর দিতেন। মুসলমানদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাঁর সময়ে সামরিক প্রশিক্ষণ ও সাধারণ শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একীভূত করা হয়েছিল।[৫১]

শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এর যুগকে বাংলার স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি মসজিদে মক্তব চালু হয়। গৌড়, পাণ্ডুয়া, মহীসুর, সোনারগাঁও, নামর, মান্দারল, বাঘা, রংপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সুলতান মালদহে একটি বিরাট মাদরাসা স্থাপন করেন। প্রখ্যাত 'আলিম নূর কুতুবুল 'আলমের মাদরাসা, মসজিদ ও হাসপাতাল স্থাপনে সুলতান বিরাট অংকের অর্থদান করেন। তাছাড়া হিন্দুদের জন্য টোল চালু ও তার পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন।[৫২]

---

৪৮. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢ.কা: ইফাবা ১৯৯১, ১০ম খ, পৃ ৪৫৮; ড. মুহাম্মদ ইছহাক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৪।

৪৯. এ কে এম আবদুল আলিম, পৃ ৯০-৯১; সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯১, ১০ম খন্ড, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯৯৪, ১৫শ খ, পৃ ১৮৬।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ ১০২-১০৩।

৫১. ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, পৃ ১২৩-১২৪।

৫২. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ ৫৪৪; ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭১-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষে মোঘল শাসনামল শিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করে। মোঘল পরিবারের প্রতিটি সদস্যই প্রতিভাশালী, শিক্ষানুরাগী বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। মোঘল দরবার জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। এর সুনাম সমগ্র বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

মোঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা জহীর উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩১ খ্রী.) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রতিভাবান কবি এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু মক্তব ও মাদরাসা নির্মাণ করেন। নির্মাণ ও গঠনমূলক কাজ সম্পন্ন করার জন্য 'শুহরত-ই-আম' নামে একটি গণপূর্ত বিভাগ সৃষ্টি করেন। তাঁর শাসনকালে দিল্লী শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৫৩]

সম্রাট নাসির উদ্দিন হুমায়ুন (১৫৩০-৪০, ১৪৫৫-৫৬) ছিলেন তুর্কী, ফারসী এবং 'আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত। সম্রাট হুমায়ুন নারী শিক্ষা প্রসারে সচেষ্ট ছিলেন। শাহজাদীদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি ইরান ও তুরস্ক থেকে শিক্ষয়িত্রী এনেছিলেন যাদের 'আতুন' বলা হতো।[৫৪]

শুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা শেরশাহ (১৫৪০-১৫৪৫) ছিলেন অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী। ফলে অল্প বয়সে শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি শিক্ষা প্রসারের জন্য বহু মাদরাসা মক্তব মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পাতিয়ালার শেরশাহী মাদরাসা খুবই বিখ্যাত ছিল। তাছাড়া মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসায় 'আরবী ও ফারসী ভাষা ছাড়াও ইসলামী বিষয় শিক্ষাদান করা হত। তিনি মসজিদ ও মাদরাসার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর সময়ে মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা, টোল, পাঠশালা দেশের আনাচে কানাচে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৫]

সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৫ খ্রী.) একজন পণ্ডিত ছিলেন তিনি ফারসী, তুর্কী ও হিন্দি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, নীতিকথা, জ্যোতির্বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি কিছু সংখ্যক বিলুপ্ত প্রায় মক্তব ও মাদরাসার সংস্কার সাধন করে পুনরুজ্জীবিত করেন যেগুলো পশু-পাখির বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি এসব প্রতিষ্ঠানকে অধ্যাপক ও ছাত্রদের সমাবেশ ঘটিয়ে চালু করেন।[৫৬]

সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রী.) নিজে বিদ্বান ছিলেন। ফলে শিক্ষা ও শিক্ষিতের তিনি যথার্থ মর্যাদা দিতেন। তিনি 'দারুল বাকা' নামক মাদরাসা পুনর্নির্মাণ করেন। ১৬৫৮ সালে দিল্লী জামে মসজিদের উত্তর পাশে প্রসিদ্ধ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৭]

সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) ছিলেন অতীব মেধাবী। তিনি সমস্ত কুর'আন শরীফ মুখস্ত পড়তে পারতেন। তা ছাড়াও তিনি ইসলামী শরী'আত ও ফিকহ্ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট হয়েও তিনি অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। কুর'আনের আদেশ-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তার পুত-পবিত্র চরিত্র ও পরহেজগারীর জন্য তাকে 'জিন্দা পীর' বলা হয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য আওরঙ্গজেব সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। উসূলুল ফিকহ, নূরুল আনোয়ার গ্রন্থের লেখক মোল্লা জিওয়ান ছিলেন তাঁর গৃহ শিক্ষক।

তিনি তাঁর শাসনামলে অসংখ্য মক্তব, মসজিদ, মাদরাসা, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। আওরঙ্গজেবের সময়কালে শিক্ষা পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষা দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি ইসলামী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তারই সময়ে পাঞ্জাবের শিয়াল কোর্ট ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

---

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২২২।

৫৪. এ কে এম আবদুল আলিম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯১।

৫৫. ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত, *ভারতের ইতিহাস কথা*, পৃ ২৩৮।

৫৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯২, ১১ তম খণ্ড, পৃ ৫৪১; ভারতের ইতিহাস কথা, পৃ ২৭৯-২৮০।

৫৭. ইসলামী বিশ্বকোষ ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৭, ২৩ তম খণ্ড, পৃ ৬৫৮; ভারতের ইতিহাস কথা, পৃ ২৭৩-২৮০।

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট ইসলামী আইন ও ফিকহ্ শাস্ত্রে গভীর আগ্রহী ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে রচিত 'ফতোয়ায়ে আলমগিরী' মুসলিম আইনের ক্ষেত্রে একটি প্রমাণ্য গ্রন্থ।[৫৮]

শিক্ষা কাঠামো

মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো। বর্তমানের সরকারী কলেজ অথবা বোর্ড নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ের মতো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিলো না। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয়সহ শিক্ষার সর্বস্তর ছিলো সম্পূর্ণ অবৈতনিক। ছাত্রদের ওপর কোন বেতন ধার্য করা হতো না।[৫৯] মুসলিম রাজ-রাজড়া এবং সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তাঁরা বিদ্বান ও পণ্ডিতদের এবং মসজিদ, মাদরাসা ও খানকার পৃষ্ঠপোষকতা করাকে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব ও ধর্মীয় কর্তব্য বলে জ্ঞান করতেন। আমীর এবং সম্পদশালীগণ করমুক্ত ভূমি দান করে মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা ও খানকার ব্যয় নির্বাহের জন্য উদার বৃত্তির ব্যবস্থা করতেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ অর্ধাংশে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার শাসনভার গ্রহণের প্রাক্কালে দেশটির এক-চতুর্থাংশ ভূমি খাজনামুক্ত তালুক হিসেবে পান।[৬০] এগুলোর আয় থেকে মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা ও খানকাসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা হতো। প্রতিটি গ্রাম-প্রধান নিজেদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্য মাদরাসা পরিচালনা করতেন। একইভাবে তাঁর দরিদ্র পাড়া-পড়শির ছেলেমেয়েরা সে মাদরাসায় শিক্ষালাভের সুযোগ পেতো।[৬১] মুসলিম আমলে প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামেই সাধারণ অধিবাসীদের শিক্ষা উপকরণ ও সামাজিক চাহিদা পূরণের নিমিত্তে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ সম্পন্ন আত্মনির্ভর মাদরাসার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতো।[৬২] এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলো। এগুলো মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিভিত্তিক, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং সাংস্কৃতিক জীবনের প্রেরণা দানের জ্বালামুখ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলো। গৌড়, পাণ্ডুয়া, দারসবাড়ি, রংপুর, রাজশাহী, চট্টলা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, সিলেট, সোনারগাঁসহ অনেক স্থানে, যেখানে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় ও বিশেষ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, উচ্চশিক্ষার নিমিত্তে প্রখ্যাত ও প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিলো। শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের নিকট উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাংলার প্রত্যন্তাঞ্চলে, উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান, এমন কি ভারতের বাইরে থেকেও জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রগণ ভীড় করতো।

সাধারণত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসা নামে পরিচিত ছিলো।[৬৩] প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মক্তব নামে আখ্যায়িত হতো। তাজবিদসহ পবিত্র কুর'আন শুদ্ধভাবে শিক্ষাদানের নিমিত্তে বিশেষ মক্তব, ফোরকানিয়া মক্তব এবং শুধুমাত্র কুর'আন মুখস্ত করার নিমিত্তে প্রতিষ্টিত মাদরাসা 'হাফিজিয়া মাদরাসা' নামে অভিহিত হতো।

শিক্ষা ব্যবস্থা পার্থিব ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত ছিলো।[৬৪] সচরাচর মসজিদেই মক্তব বসতো। কখনো কখনো মসজিদ ছাড়া বাড়ি-ঘর ও দোকান-পাটেও মক্তব বসতো। মক্তবে পবিত্র কুর'আন ছাড়া অংকের প্রাথমিক জ্ঞান, 'আরবী ব্যাকরণের প্রাথমিক সূত্র ও ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হতো। এটা নারী-পুরুষ-উভয়ের জন্য উন্মুক্ত ছিলো।

---

৫৮. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারত বর্ষের ইতিহাস*, কলিকাতা : নবজীবন প্রেস, ১৯৮৩, পৃ ১০৮।

৫৯. A K M Ayub Ali, Ibid, p 14; Muhammad Mohar Ali, Ibid, p 838.

৬০. W Adam, Reports on the State of Education in Bengal, Calcutta : 1941, Report no 3, 1838, p 826. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯, A K M Ayub Ali, Ibid, p 13.

৬১. A K M Ayub Ali, Ibid, p 15.

৬২. Muhammad Mohar Ali, Ibid, 826-42; A K M Ayub Ali, Ibid, p 15.

৬৩. Muhammad Mohar Ali, Ibid, 826-42; A K M Ayub Ali, Ibid, p 15.

৬৪. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৭৯, পৃ।

Dhaka University Institutional Repository

কোন বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি বা পণ্ডিতকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের বৃত্ত মজলিস বা হালকা বসতো। বর্তমানকালে এ জাতীয় মজলিস বা হালকা সেমিনার নামে আখ্যায়িত হচ্ছে। উক্ত মজলিসে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখা যেমন হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, সাহিত্য এমনকি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দেয়া হতো। কিন্তু কালের বিবর্তনের সাথে সাথে মসজিদের বাইরে পৃথক স্থানেও এ সব মজলিস বসতো।

মজলিস বা খানকার সম্প্রসারিত রূপ হলো মাদরাসা। একাধিক বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিতদের সমাবেশকে কেন্দ্র করে মাদরাসা গড়ে উঠতো। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অন্বেষী ছাত্রগণ এ সকল পণ্ডিতদেরকে পরিবেষ্টন করে জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করতেন। মাদরাসাও প্রথম প্রথম মসজিদ কিংবা তৎসংলগ্ন স্থানে বসতো। পরে পৃথক ও স্বতন্ত্র ইমারতে মাদরাসা গৃহ নির্মাণ করা হয়। মুসলিম শাসনামলে স্থাপিত মাদরাসার সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে বৃটিশগণ এক জরিপের মাধ্যমে বাংলায় আশি হাজার মাদরাসার সন্ধান পেয়েছে। তখন প্রতি চারশ' জনের জন্য গড়ে একটি করে মাদরাসা ছিলো। উন্নতমানের ব্যবস্থাপনা, উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার প্রশিক্ষণ, বিপুল অর্থ-ভাণ্ডার সহকারে এ সকল মাদরাসা দক্ষতার সাথে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতো। কারো কারো প্রয়োজন ও চাহিদানুযায়ী এ সকল মাদরাসায় সংক্ষিপ্ত শিক্ষা কার্যক্রমেরও সুযোগ ছিলো।[৬৫]

শিক্ষার সিলেবাস

মুসলিম সূফী-সাধকদের খানকা আর শি'আদের ইমামবাড়া বিদ্যাপীঠ হিসেবে কাজ করতো। এ সকল স্থানে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে এবং কঠোর সাধনার ভিত্তিতে ব্যক্তির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন করা হতো। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষক, আধ্যাত্মিক গুরু এবং ইসলাম প্রচারক বের হয়ে আসতেন। শিক্ষার মাধ্যম ছিলো ফারসী। তবে শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 'আরবী সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছিলো। ইসলামী বিষয় শিক্ষার নিমিত্তে ফারসী ভাষায় লিখিত পাঠ্য পুস্তকের বদলে 'আরবীতে লেখা গ্রন্থসমূহ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অনুমোদন লাভ করেছিলো।

এ সময় শিক্ষার তিনটি স্তর ছিলো। যথা: প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চস্তর। বলা বাহুল্য, প্রাথমিক শিক্ষা মসজিদে অনুষ্ঠিত মক্তব অথবা পৃথক বাড়ি ও দোকান-পাট, প্রাথমিক বিদ্যালয় অথবা নিজ ঘরেই দেওয়া হতো। প্রতিটি শিশু চার বছর চার মাস বয়সে উপনীত হলে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে প্রাথমিক জ্ঞানের সবক দেয়া হতো। এ ব্যবস্থাকে 'বিসমিল্লা খানি' বলা হতো। যখন শিশুর বয়স চার মাস চার দিন হতো, তখন তার জন্য একখানা রূপার প্লেট তৈরি করা হতো। শিক্ষক প্লেটের উপর 'সূরা ইকরা' লিখে দিতেন এবং শিশুটিকে সেটি বারবার পড়তে বলতেন। এ সময় তার জন্য একজন শিক্ষকও রাখা হতো।[৬৬]

প্রাথমিক স্তরে (পবিত্র কুর'আন ব্যতীত) প্রথমে উচ্চারণের সাথে বর্ণমালা শিক্ষা দেয়া হতো। অতঃপর শিক্ষার্থীকে ছোট ছোট বাক্য পড়তে ও লিখতে দেয়া হতো। তাকে কিছু অনুশীলন দেয়া হতো। যা সে পড়তো তা সে শ্লেটে লিখতো। এভাবে ক্রমশ শিশু লিখতে ও পড়তে শিখতো। এ নিয়মে লেখাপড়া শিক্ষার পর সে মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতো। প্রাথমিক স্তরের পর মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে শিক্ষার্থী ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, হিসাব বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতো।[৬৭] মাদরাসাগুলো 'আরবী ও ফারসী- এ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলো। মাদরাসায় ব্যাকরণের নানা তত্ত্ব, অলংকারশাস্ত্রের নানা দিক, যুক্তিবিদ্যা, আইনশাস্ত্র, ইসলামের মূলনীতিসমূহ সবকিছুই পড়ানো হতো। ইউক্লিডের জ্যামিতি, টলেমির জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক দর্শন, আধ্যাত্মবিদ্যা প্রভৃতি মাদরাসায় পড়ানো হতো। ফারসী মাদরাসায় প্রাথমিক ও উচ্চ পর্যায়ের ব্যাকরণ, চিঠিপত্রাদি লেখা এবং গল্প-

---

৬৫. W Adam, Ibid, p 438; A K M Ayub Ali, Ibid, p 15; Muhammad Mohar Ali, Ibid, p 826-42.

৬৬. এস এম জাফর, মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা, ঢাকা : বাং এ, ১৯৮৮, পৃ ৯২। বর্ণিত আছে যে, হযরত শেখ নিযামউদ্দীন (ম.৭২৫হি১৩২৫খ্রী.) তাঁর শিষ্য আখি নিরাজ উদ্দীনের জন্য এমন এক সংক্ষিপ্ত কোর্সের ব্যবস্থা করেছিলেন।

৬৭. এস এম জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

গল্পাদি প্রধানত পাঠ্য থাকতো। অলংকারশাস্ত্র, ধর্ম, দর্শন কিংবা চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠও ফারসী উচ্চশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ফারসী ভাষা চর্চার উদ্দেশ্য ছিলো জীবিকার্জন।

তখনকার প্রচলিত শিক্ষা বিষয়সমূহ 'উলূমুন-নাকলিয়া আর্থাৎ প্রচলিত বিজ্ঞান অর্থে ধর্মীয় বিজ্ঞান এবং 'উলূমুল আকলিয়া- অর্থাৎ গবেষণাধর্মী বিজ্ঞানে বিভক্ত ছিলো। আধুনিক কালের কলা, বিজ্ঞান, কৃষি এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানকে আলোচ্য 'উলূমুল-'আকলিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।[৬৮] দেশীয় সমাজে শিক্ষার সাথে ধর্ম শিক্ষার নৈকট্য ছিলো নিবিড়। ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যাসহ সকল বিষয় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ানো হতো।[৬৯] শিক্ষাকোর্স সমাপ্ত করে একজন যুবক ব্যাকরণ, ন্যায়বাগ্মিতায় এবং দর্শনে বর্তমান কালের একজন অক্সফোর্ড গ্রাজুয়েটের মতো দক্ষ হয়ে উঠতেন। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারক, বিচারক, প্রশাসক, প্রকৌশলী, পদার্থবিদ, অধ্যাপক ও আমলা তৈরি করা হতো।

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ছিলো। এদের ব্যবস্থাপনার জন্য স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা ব্যতীত তাদের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সরবরাহেরও উদার ব্যবস্থা ছিলো। কখনো কখনো দরিদ্র ও ইয়াতীম ছাত্রদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে স্কুল ও ইয়াতীমখানা তৈরি হতো। রাজপুরুষ ও অভিজাত শ্রেণী নিজ খরচে এদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতেন। ধনী ও দরিদ্র সন্তানের মাঝে কোন প্রকার তারতম্য করা হতো না, যার একটি সম্মিলিত প্রভাবও ছিলো।

শিক্ষা ও শিক্ষকের মান

'আলিমদের উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হতো। পণ্ডিত এবং জ্ঞানীরা ছিলেন মর্যাদাসম্পন্ন। মুসলিম আমলে বিশেষ করে বাংলার সুলতানী আমলে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সমাজের উচ্চস্তরের লোক। তাঁদেরকে আহলি-খায়র, আহলি-ফযল, আহলি সাদাত এবং আহলি কলম নামে অভিহিত করা হতো।[৭০] আহলি কলমের সৈয়দগণ টুপী পরতেন। তাঁরা 'কুলাহ দারা' বলে অভিহিত হতেন। 'আলিমগণ যাঁরা পাগড়ি বা দস্তার পরতেন তাঁরা 'দস্তার বন্দা' নামে অভিহিত হতেন। সূফীগণ 'আলিম হওয়ায় তাঁরাও দস্তার পরতেন। কেননা তখনকার দিনে শরী'আতে পারদর্শী ('আলিম) না হলে সূফীগণ খিলাফতনামা বা ইজাজতনামা পেতেন না। 'আলিমগণ আইনের প্রবক্তা ছিলেন। সুলতানগণ বিভিন্ন বিষয় সমাধানের জন্য তাঁদের শরণাপণ্ণ হতেন। তাঁরা সদর-ই-সুদূর, কাযী, শায়খুল ইসলাম, শিক্ষকতা, ইমামতি এবং খুতবাতের সমুদয় পদ অধিকার করতেন। 'আলিমদের নিজ নিজ কাজে শিক্ষাদান ও গবেষণাকাজের প্রচুর স্বাধীনতা ছিলো। ছাত্রগণও বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা ভোগ করতো। তারা শ্রেণীভিত্তিক না হয়ে বিষয়ভিত্তিক গ্রুপে বিভক্ত হতো। তারা নিজেদের যোগ্যতা ও রুচিমত যে কোন বিষয় গ্রহণ-বর্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো। ফলে খুব কম সময়েই তারা বাছাইকৃত বিষয়ে উন্নতি ও দক্ষতার্জন করতো। ছাত্রদের মাঝে যারা শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয় শর্ত যেমন সদাচার, সচ্চরিত্র, বুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য অর্জন করতো তারা শিক্ষাসনদ বা শিক্ষা প্রদানের অনুমতি লাভ করতো। কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা বা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন পরীক্ষা পদ্ধতি ছিলো না। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকই ছিলেন ছাত্রের প্রধানতম বিচারক। ছাত্রের শিক্ষার যোগ্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেই তিনি ছাত্রকে দস্তার অথবা সনদ ও ইজাজত দিতেন।[৭১] বেতনধারী শিক্ষকগণ ও অধ্যাপকবৃন্দ

400628

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১১।

৬৯. 'উলূমুন-নাকলিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে : 'ইলমুল কির'আত, 'ইলমুত তাফসীর, 'ইলমুল তাওহীদ, আল-আদাবুল 'আরবী (গদ্য ও পদ্য), কাওয়াইদুল-আরবী, 'ইলমুল বায়ান এবং 'ইলমুল মিরাস (উত্তরাধিকার ও সম্পদ বন্টন বিদ্যা)।

'উলূমুল-আকলিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে : 'ইলমুল-মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), 'ইলমুল ইকমাত, 'ইলমুল ফালসাফা, (দর্শন), 'ইলমুল হাইয়্যাত (জ্যোতির্বিদ্যা), 'ইলমুল হিসাব (গণিত), 'ইলমুল হিন্দাসা (প্রকৌশলী), 'ইলমুল মুসিকী (স্বর ও বাদ্য বিদ্যা), 'ইলমুত-তিব্ব (ইউনানী চিকিৎসাবিদ্যা), রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান এবং শরীরতত্ত্ব।

৭০. ড. এ আর মল্লিক, *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান*, দিলাওয়ার হোসেন অনূদিত, ঢাকা : ১৯৮২, পৃ ১৭৫, ।

৭১. ড. আবদুল করিম, বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার গোড়ার কথা, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, পৃ ৪।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্র পরিচালিত স্কুল ও প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। এসব প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশাল সম্পত্তি ও জায়গীর প্রদান করা হতো। সাধারণ বাড়িঘরে প্রতিষ্ঠিত স্কুল শিক্ষকেরা পাঠ দানের বিনিময়ে ব্যক্তিগত সেবা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করতেন না। গ্রামের স্কুল মাস্টারেরা ফিস হিসেবে নগদ টাকার বদলে জিনিসপত্র গ্রহণ করতেন। শিক্ষকগণ শিক্ষাপ্রদানকে তাঁদের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব জ্ঞান করতেন। সে জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা একরূপ বিনাবেতনে ছাত্রদের গৃহে শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র-শিক্ষক সমবায়ের সাহায্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন।[৭২] শিক্ষার্থীদের জানা ছিল-শিক্ষকগণই তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মূল্যমান যাচাই করার একমাত্র কর্তৃপক্ষ। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা পাসের জন্য বাছাই করে পড়ার বা অন্য প্রকারে ফাঁকি দেয়ার কোন অবকাশই ছিলো না।

বাংলার মুসলমানদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার গুণগান করে এএমইসি বেইলী বলেন :

> They possessed a system of education which we have abolished, was capable of affording a high degree of intellectual training and polish, was founded on principle not wholly unsound. Though presented is an antiquated form, it was infinitely superior to any other system of education than existing in India; a system wich secured to them an intellectual as well as a material supremacy.[৭৩]

মুসলমানদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনা করে জনৈক ইংরেজ পণ্ডিত[৭৪] মন্তব্য করেন :

> বিশ্বে খুব কম সংখ্যক জাতিই আছে, যারা মুসলমানদের ন্যায় শিক্ষাকে এত ভালোবেসে আঁকড়ে ধরেছে। এমন কি মাথাপিছু বিশ টাকার যৎসামান্য উপার্জনকারী ব্যক্তিও নিজের সন্তান-সন্ততির জন্য প্রধানমন্ত্রীর বংশধরদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

কয়েক শতাব্দী কালের এ দীর্ঘ শাসনামলে এ দেশে মুসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল দক্ষ ও আদর্শ মানুষ গড়ার কারখানা। মুসলমানরা এদেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সুদূর প্রসারী বিপ্লব সাধন করেন।

১৮৮২ সালে ইংরেজদের একশিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয় আর সব মুসলিম দেশের মতই ভারতবর্ষে মুসলমানদের অনুপ্রবেশের পর তাঁরা তাদের মসজিদগুলোকে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করে। ধর্মই তাদের শিক্ষার বুনিয়াদ হবার কারণে এসব শিক্ষা কেন্দ্রের সরকারকে তেমন ব্যয়ভার বহন করতে হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়াকফ ও উইলের সম্পত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। দ্বীনদার লোকেরা পারলৌকিক মুক্তিলাভের জন্য ওয়াকফ এবং সম্পত্তি প্রদানের অসিয়ত করে যান। পাক-ভারতীয় মসজিদ কেন্দ্রিক মাদরাসার এ অবস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[৭৫]

উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা কেন্দ্র গুলো গড়ে উঠার একটি চিত্র এ রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। তবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এদেশে সর্বপ্রথম কখন এবং কোথায় মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, সে কথা নিশ্চিত ভাবে বলা মুশকিল। অবশ্য ইতিহাস গ্রন্থাবলী থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আবুল কাশেম মাহমূদের শাসনামল থেকে এদেশে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন হয়।

---

৭২. W Adam, Ibid, Report I. p 24.

৭৩. W W Hunter, The Indian Musalmans, Lahore : 1968, p 152.

৭৪. তাঁর নাম জেনারেল স্লিম্যান।

৭৫. তারিখে মাদরাসা আলিয়া, পৃ ২১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মদ সলীম লিখেছেন, ৫৮৯ হিজরী মোতাবেক ১১৯২ সালে হিন্দুস্তানে মুয়েজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন সাম (শিহাবুদ্দীন গৌরী নামে পরিচিত) কর্তৃক ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়। তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে রাজ্যের চতুর্দিকে শিক্ষা দীক্ষার চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। এ জ্ঞান প্রিয় বাদশা-ই সর্বপ্রথম দিল্লীতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। বাদশার নাম অনুযায়ী এ মাদরাসার নামকরণ হয় 'মাদ্রসায়ে মুয়েযীয়া। পরবর্তী বাদশাহ কুতুবুদ্দীন আইবক (১২-০৬-৯২ খ্রী.) আজমীরে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তৃতীয় মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান ও শাসনকর্তা নাসিরুদ্দীন কুবাচা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাযী মিনহাজুদ্দীন সিরাজ জুরজানী (মৃ. ১২৬০ খ্রী.) সর্বপ্রথম উক্ত মাদরাসার শিক্ষক নিয়োজিত হন। পরে তিনি মাদরাসায়ে মুয়েযীয়ার প্রধান শিক্ষক হিসেবে বদলী হন।

অতঃপর মুসলিম শাসক, আলিম, আমীর ও বিদ্যোৎসাহী দ্বীনদার লোকদের প্রচেষ্টায় গোটা ভারত বর্ষের সর্বত্র মক্তব, মাদরাসা তথা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষ্য অনুযায়ী সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের (১৩২৫-৫১ খ্রী.) আমলে দিল্লীতে এক হাজার মাদরাসা ছিল। এর মধ্যে শাফিয়ী মাযহাবের লোকদের একটা মাদরাসা ছিল। শিক্ষকদের সরকারী কোষাগার থেকে ভাতা প্রদান করা হত। মাদরাসাগুলোতে দ্বীনী শিক্ষার সাথে অংক এবং দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষাও দেয়া হত।

রোহিলা খণ্ডের হাফিজুল মূলক নওয়াব রহমত আলী খানের (মৃ ১৭৭৪ খ্রী.) জীবন চরিত থেকে জানা যায়, দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়ার পরও কেবল মাত্র রোহিলা খণ্ড জেলার বিভিন্ন মাদরাসায় পাঁচ হাজার 'আলিম শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। হাফিজুল মূলক নওয়াব রহমত আলী খানের কোষাগার থেকে তারা নিয়মিত ভাতা পেতেন।

এস. বসুর 'এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ইংরেজ শাসনের পূর্বে কেবলমাত্র বাংলাদেশে আশি হাজার মক্তব ছিল।[৭৬]

এ ছাড়া গ্রামের ছাত্ররা অগণিত মসজিদ, খানকা ও নিজ নিজ বাড়ীর বৈঠকখানায় ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতো। গ্রামের জনসাধারণ এগুলো পরিচালনা করতেন। তারীখে ফেরেস্তা হতে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম মাদরাসা ভবন নির্মিত হয় মুলতানে, সম্ভবত নাসির উদ্দীন কুবাচা, মাওলানা কুতুবুদ্দীন ভাসানীর জন্য এ ভবন তৈরী করেন। এ শিক্ষা কেন্দ্রে হযরত শেখ বাহাউদ্দীন জাকারিয়া (মুলতানী, জ ৫৭৮ হি.) শিক্ষা লাভ করেন।

'ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া'তে বলা হয়েছে, সেকালের উচ্চশিক্ষার চাবি কাঠি ছিল 'আলিমদের হাতে।

ইংরেজ শাসনের পূর্বে শুধু বাংলাদেশেই অগণিত মাদরাসা স্থাপিত হয়েছিল। এর মধ্যে নদিয়া জেলার রংপুর নামক শহরে বখতিয়ার খিলজীর মাদরাসা (১১৯৭খ্রী.), লক্ষণাবতী ও গৌড়ের মাদরাসা (১২২১-১২২৭খ্রী.), হোসেন শাহের মাদরাসা (১৪৯৩খ্রী.), ঢাকায় অবস্থিত শায়েস্তাখানের মাদরাসা (১৬৬৪-১৬৮০খ্রী.), নওয়াব মুর্শিদ 'আলী খানের মুর্শিদাবাদ মাদরাসা, বর্ধমান মাদরাসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭৭]

শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. **অবৈতনিক শিক্ষা** : প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা নিরঙ্কুশভাবে অবৈতনিক ছিলো।

২. **ভাড়ামুক্ত আবাসিক সুবিধা** : অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার সুযোগসহ আবাসিক ব্যবস্থা ছিলো। শিক্ষক-ছাত্র সম্মিলিতভাবে একই চত্বরে বসবাস করতেন। ফলে তাদের মাঝে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হতো। শিক্ষকদের স্নেহপূর্ণ তত্ত্বাবধানে ও যত্নে প্রতিপালিত হওয়ার কারণে ছাত্রদের

---

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

৭৭. তারিখে মাদরাসা আলিয়া, (অনুবাদ) পৃ ২৭-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধিত হতো। শিক্ষকগণ ছাত্রদের নিকট আধ্যাত্মিক পিতা হিসেবে সম্মানিত ছিলেন।

৩. **সমন্বয় সাধনকারী পাঠক্রম** : শিক্ষাক্রম ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ের সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে বিবেক প্রসূত ও সমন্বয় সাধনকারী ছিলো। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আর্থ-সামাজিক ইত্যাদিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমাজের চাহিদা পুরনোপযোগী ছিলো এ শিক্ষা পাঠক্রম। প্রচলিত শিক্ষার প্রতিটি শাখা ইসলামী আদর্শ কেন্দ্রিক বিস্তৃত পাঠক্রমের ভিত্তিতে গঠিত ছিলো। শিক্ষা পরিকল্পনার ভিত্তি ও বুনিয়াদে ইসলাম থাকলেও ধর্মীয় ও নিরপেক্ষ বিষয়ে যুক্তি সম্পন্ন সঙ্গতি বিধান করা হতো। মানকুলাত ও মাকুলাতের মাঝে সঙ্গতি রক্ষার কারণে মাদরাসার সাথে সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। আর তা ছিলো সার্বিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির মাধ্যম। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে আসা 'আলিমগণ শুধুমাত্র ধর্মীয় নেতা ও আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে নয় বরং তাঁরা সমাজকর্মী, চিকিৎসাবিদ, বিচারক, আইনবিদ, সাহিত্যিক, প্রকৌশলী, স্থপতি, সেনাধ্যক্ষ এবং নৌধ্যক্ষ হিসেবে দেশ ও ঈমান রক্ষকের ভূমিকা পালন করতেন।

৪. **শিক্ষার স্বাধীনতা** : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ যে কোন সরকারী হস্তক্ষেপ ও প্রভাবমুক্ত ছিলো। প্রতিষ্ঠান প্রধান তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় শিক্ষা পাঠক্রম ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যবই নির্ধারণ করতে পারতেন।

৫. **বিষয় নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা** : নিজ নিজ মেধা ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষার্থীগণ পাঠ্যবিষয় নির্বাচন, গ্রহণ ও বর্জনের স্বাধীনতা ভোগ করতো। ফলে খুব কম সময়ের মধ্যেই বাছাইকৃত বিষয়ে শিক্ষার্থী উন্নত ও দক্ষ হয়ে উঠতো।

৬. **জ্ঞানাহরণ ও বিতরণ** : মুসলিম আমলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো, শিক্ষকদের পাঠদান করার অনন্য প্রণালী এবং শ্রেণীকক্ষে মনোনীত ছাত্রের মাধ্যমে একই পাঠের পুনরালোচনা পদ্ধতি। শিক্ষক পাঠ আলোচনা করার পর তিনি শ্রেণীর একজন মেধাবী ছাত্রকে তা পুনরুল্লেখের নির্দেশ দিতেন। পরিকল্পিত পাঠ্যক্রম সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সারা বছর এ নিয়ম চলতে থাকতো। এ পদ্ধতিতে এমনকি একজন কম মেধাবী ছাত্রও পরিকল্পিত বিষয়বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো। এর ফলে শুধুমাত্র ছাত্রের বোধশক্তি ও প্রকাশ ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করে না, বরং তারা ভবিষ্যতে দক্ষ শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক হওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করতো। অধিকন্তু শিক্ষানুশীলনের এ পদ্ধতি ছাত্রদেরকে শিক্ষাদানের কলাকৌশলী করে তুলতো। বর্তমান কালের বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়সমূহের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে থাকে তার বহুলাংশ সাধিত হতো এ পদ্ধতির মাধ্যমে। ছাত্রগণ দিবসের শ্রেণী পাঠের পূর্ণ প্রস্তুতিসহ শ্রেণীকক্ষেই উপস্থিত থাকতে আদিষ্ট হতো। শ্রেণীকর্ম সমাপ্তির পর তারা খণ্ড খণ্ড গ্রুপে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মাঝে শ্রেণীতে প্রদত্ত পাঠ আলোচনা (তাকরার) করার জন্য আদিষ্ট হতো।

শিক্ষা অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত ছিলো না বরং আত্মশিক্ষা ও অপরকে শিক্ষিত করে তুলে অশিক্ষিত ও অবহেলিত জনগণকে জ্ঞান বিতরণ, সত্যের প্রচার ইত্যাদি ছিল শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এককথায় বলা যায়, সেকালে জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণের লক্ষ্যেই শিক্ষা দেয়া হতো।

শ্রেণীবিন্যাস আবশ্যক ছিলো না। বর্তমানকালে যে কোন শিক্ষাই হোক না কেন তা শ্রেণী বিন্যাস ব্যতীত সম্ভবপর নয়। কেননা বেতনভোগী সীমিত শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক শিক্ষা পাওয়া পদ্ধতি ছাড়া অসম্ভব। শ্রেণীবিন্যাস ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীগণ কম উপকৃত হয়। প্রতিষ্ঠানে একই শ্রেণীতে শতাধিক বা ততোধিক ছাত্র ভর্তি হয়। এ ব্যবস্থায় একজন শিক্ষকের পক্ষে সকল শিক্ষার্থীকে জ্ঞানদান করা এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। ছাত্রগণ শিক্ষকের প্রদত্ত পাঠের শব্দও কোন কোন সময় শুনতে পায় না। আবার সময়ের সীমাবদ্ধতা ও গণ্ডগোলের মাঝে ছাত্রগণ শিক্ষকের নিকট থেকে দুর্বোধ্য কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করে পরিষ্কার করে নেওয়ার সুযোগও পায়

Dhaka University Institutional Repository

না। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর নেওয়াও শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় না। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর একটি বক্তব্য প্রদান করেন এবং সময় উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে চলে যান। ছাত্রগণ শিক্ষকের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকে এবং শিক্ষকগণ ছাত্রদের লেখাপড়ার উন্নতির খবরাখবর থেকে দূরে অবস্থান করেন। এ জন্য শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্পর্কে ছাত্রগণ অনবহিত থাকে। এ ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন কোন সময় বিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ সকল স্তরের শিক্ষকের স্থান একই হয়ে থাকে। সে সময় শিক্ষকগণ ছাত্রদের ভুল-ত্রুটি ধরার সুযোগ পেতেন। তাদের সন্দেহ অপনোদন করে দিতেন। আর ছাত্রগণও নিয়মিত শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ করার কারণে প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেদের দুর্বোধ্য পাঠোদ্ধার করে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ পেতো। সে যুগে শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে পড়ার সময়ে শিক্ষার্থীদের ছুটির ব্যবস্থাও ছিলো। ছুটির সময় শিক্ষার্থীগণ যাতে পঠিত বিষয় ভুলে না যায় সে জন্য বড়রা ও শিক্ষকগণ অবসর মুহূর্তে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বসতেন এবং পাঠের পুনরালোচনা করতেন। এর ফলে দুর্বোধ্য ও কঠিন পাঠ সহজসাধ্য হতো ও তাদের স্মৃতিপট থেকে পাঠ মুছে যেতো না।

নারীশিক্ষার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হতো। মুসলমানগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের কন্যাদের পড়ালেখা করাতেন। মেয়েরা ব্যাপক হারে মক্তবে কুর'আন শিক্ষা করতো। অভিজাত ঘরের মেয়েরা আতালিক বা গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করে উচ্চশিক্ষা লাভ করতো। ইবন বতুতা (১৩০৩-১৩৩৭ খ্রী.) তাঁর ঐতিহাসিক সফরে এদেশে তেরটি মহিলা মাদরাসা দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৮] সুলতান গিয়াসউদ্দীন খিলজী মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর মহলে পনের হাজার মহিলার মধ্যে বহু মহিলা স্কুল শিক্ষিকা, সঙ্গীতানুরাগী, স্তবিকা ছিলেন।[৭৯] এদের মাঝে হাজার হাজার হাফিজা, ক্বারিয়া, দ্বীনি শিক্ষিকাও ছিলেন।

মুসলিম শাসনামলে মুসলমানগণ কর্তৃক প্রবর্তিত ও উন্নীত শিক্ষাব্যবস্থা দেশের প্রত্যন্তাঞ্চলের সকল শ্রেণীর নাগরিকের মাঝে বিস্তৃত হয়। শিক্ষার লক্ষ্য ছিলো স্রষ্টা ও সৃষ্টির সঠিক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে পার্থিব জগৎ বা আত্মার উৎকর্ষ সাধন। আর এতদুভয় ক্ষেত্রে নিশ্চিত সুখ-শান্তি বিধান।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে দেশের আদিম অধিবাসী এবং সাধারণ জনবসতিসমূহ শতাব্দীর প্রাচীন কুসংস্কারের জঞ্জালে আবৃত ছিলো। নিম্নবর্ণের হিন্দু সকল প্রকার সামাজিক মর্যাদা ও ধর্মীয় আভিজাত্যের নাগালের বাইরে ছিলো। গর্বিত আর্য আভিজাত্যের কুপ্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের এ অঞ্চলে বাংলাভাষীদেরকে অপবিত্র মনে করা হতো। জ্ঞান ছিল জনসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ ফল সদৃশ। জ্ঞানের দ্বার তাদের জন্য ছিলো চিরতরে বন্ধ। তাদের কোন বই পড়ার অধিকার ছিলো না। সংস্কৃত বই-এর একটি শব্দ শোনারও অধিকার ছিলো না। স্থানীয় জনসাধারণের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের মাতৃভাষা 'বাংলা' আর্য অভিজাত সমাজের দৃষ্টিতে 'পিশাচের ভাষা' বলে আখ্যায়িত হতো। মোটকথা এ অঞ্চলে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা বা জাতীয় ভাষার অস্তিত্ব ছিলো না। ইসলামের শিক্ষা অল্পদিনের মাঝেই দেশের জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। শিক্ষাক্ষেত্রে সকল বাধা-বিপত্তি অপসৃত হয়, কোন প্রকার ভেদাভেদ ব্যতীত শিক্ষার দ্বার সবার জন্য অবারিত হয়। মুসলিম শাসকগণ প্রচার করেন যে, প্রতিটি মানব সন্তানেরই শিক্ষা লাভ করার মৌলিক অধিকার রয়েছে। তাদেরকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা কারো নেই।

---

৭৮. এস এম জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬।

৭৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : দুই
বৃটিশ শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা
[১৭৬৫-১৯৪৭ খ্রী.]

সুদীর্ঘ সাতশত বছর মুসলিম শাসনাধীন এ অঞ্চল ছিল শিক্ষা ও সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র। মুসলিম শাসকদের দূরদর্শিতার অভাবে বাণিজ্যের নামে আগত [১৪৯৮ খ্রী.] ইংরেজরা রাজ্য বিস্তারের অপকৌশল অবলম্বন করে। নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর বাংলার শাসনভার কার্যতঃ ইংরেজদের হাতে চলে যায়।[৮০] সে সময়ে কলকাতাই ছিলো বাংলার প্রধান নগরী ও রাজধানী শহর। সুতরাং কলকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিলো বাংলার শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। ফারসী ছিলো শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান বাহন। মুসলিম শাসনামলে ফারসী ছিলো রাজভাষা। রাজপদ লাভ করতে হলে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে ফারসী জানতে হতো। ইসলামী গ্রন্থাদী ফারসীও অধিক হারে রচিত ছিল বলে মুসলিম সমাজে ফারসী ভাষার কদর হিন্দুদের তুলনায় বেশী ছিলো। সংস্কৃত ছিলো হিন্দুদের ধর্মীয় ভাষা। সতের আঠার শতকের দিকে এদেশে আর একটি ভাষার আমদানী হয়, সেটি হলো উর্দু ভাষা। মাতৃভাষা বাংলা যদিও ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায় নি তবুও বাংলার চর্চা বরাবরই ছিলো। সুতরাং ইংরেজদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে 'আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, উর্দু ও বাংলা-এই পাঁচটি ভাষার প্রচলন ছিলো। ইংরেজদের আগমনে ইংরেজী ভাষার প্রচলন হলে এ দেশে ভাষার সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়টি।[৮১] তন্মধ্যে অন্যসব ভাষাকে ডিঙ্গিয়ে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত ফারসীই ছিলো মর্যাদার দিক থেকে সর্বোচ্চ।

এ সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই, শ্রেণী বৈষম্য বিরাজ করছিলো। হিন্দুদের মধ্যে উচ্চ বর্ণ, নিম্নবর্ণ ইত্যাদি বিভাজন বহু আগে থেকেই ছিলো। বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমানদের মধ্যেও 'আশরাফ-'আতরাফ' শ্রেণী বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছিলো।[৮২] যদিও তা কোনভাবে ইসলাম সমর্থিত না। এ সময়কার শিক্ষা আশরাফ বা অভিজাত শ্রেণীর পরিবারগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। নিম্নবর্ণের হিন্দুর মতো আতরাফ বা অনভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে লেখা-পড়ার চর্চা ছিলো না। শেখ, সৈয়দ, মোঘল, পাঠান বংশোদ্ভুত লোকেরা নিজেদের অভিজাত মনে করতেন। কৃষক, মাঝি-মাল্লা, জেলে-জোলা, মুটে-মজুর ছিলো আতরাফ শ্রেণীভুক্ত। দেশের এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শিক্ষা এদের কাছে প্রায় অজ্ঞাতই ছিলো। গ্রামের কোন কোন পরিবারের ছেলেরা মক্তব বা

---

৮০. হযরত উমর রা.-এর খিলাফতকালেই ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অঞ্চলে কয়েকজন মুসলিম সাধক এসেছিলেন বলে প্রমাণ মেলে। অতঃপর নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আরো সূফী দরবেশ একই অভিপ্রায়ে এদেশে পদার্পণ করেন। তাঁরা প্রধানতঃ মহাস্থানগড়, নেত্রকোনা, ঢাকা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি এলাকাকে কেন্দ্র করে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। খ্রীস্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশের অংশ বিশেষ জয় করার পর থেকেই এ দেশে মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন হয়। তখন থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার পতন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ'শ বছর প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে মুসলিম সুলতান-সুবেদার-নবাব-নাজিম বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। মাঝখানে রাজা গণেশ (১৪১৪-১৪১৮) চার বছর স্বাধীনভাবে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা তোডরমল (১৫৮০-৮২) এবং মানসিংহ (১৫৮৯-৯৬) বাংলাদেশ শাসন করেছিল বটে; কিন্তু তাঁরা ছিলেন আকবরের প্রতিনিধি। দ্র. ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ (১৮০১-১৯৭১)*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬, পৃ ৭; ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বা এ ঢাকা* : ১৯৮৩, ১ম খ, পটভূমিকা; ড. হাসান জামান, *সমাজ-সংস্কৃতি ইতিহাস*, ঢাকা : ১৯৮৭, পৃ ২১২ এবং *সংক্ষিপ্ত ইসলাম বিশ্বকোষ*, ২য় খ, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ ৫৭-৫৮।

৮১. ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ ৯৬।

৮২. মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*, ঢাকা : ১৯৭৭, পৃ ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসায় লেখা-পড়া করতো বটে, কিন্তু সেটি ছিলো ধর্ম নির্ভর।[৮৩] অর্থাৎ তারা শিক্ষা বলতে নামাযের সূরা ক্বিরাত, দোয়া-দুরূদ ও ধর্মীয় প্রাথমিক মাস'আলা-মাসায়িলকেই বুঝাতো। বৈষয়িক উন্নতি কিংবা জ্ঞান চর্চার জন্য ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার মনোভাব তাদের মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত ছিলো।[৮৪] এই ছিলো মোটামুটি তৎকালীন বঙ্গে শিক্ষার স্বরূপ।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের সাথে বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতার সূর্য্য অস্তমিত হয়। এরপর ১৭৬৫ সালে বাংলার শাসনভার কার্যত ইংরেজদের হাতে চলে যায়। মূলত তখন থেকেই মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে; যদিও তা ১৮৩৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নি। ১৭৬৫ সালে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করলে সুচতুর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের মর্মাঘাত এড়ানোর জন্য অফিস-আদালতের প্রচলিত ভাষা ফারসীকে প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখে। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিলো, এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা যদিও হিন্দু, তবুও হিন্দুদের পক্ষ থেকে আপাতত কোন সমস্যা নেই। কেননা তারা এদেশের শাসনক্ষমতা দখল করেছে মুসলমানদের নিকট থেকে। আর ফারসী ছিলো তাঁদের রাজভাষা তথা ধর্মীয় ভাষা।

সম্ভবতঃ এ কারণেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এ দেশের শাসন ক্ষমতা দখলের প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বছর পর্যন্ত ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য কোন সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করে নি। বরং এই ভেবে তারা এ ব্যাপারে নীরব ছিলো যে, এক্ষুনি শিক্ষার উপর হস্তক্ষেপ করলে জনগণের মনে বিশেষত রাজশক্তিহারা মুসলিম জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। আর তাই খ্রীস্টান মিশনারীরা স্কুল খুললে ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানীর লোকেরা তাদের উৎসাহ দেয় নি বরং মিশনারীদের বাধা দিয়েছিলো এই আশঙ্কায় যে, ধর্মভীরু ভারতবাসী মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে ক্ষিপ্ত হবে।[৮৫]

সুতরাং বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার গতি-প্রকৃতি যেরূপ চলে আসছিলো সেরূপই থেকে গেলো। অর্থাৎ মসজিদের বারান্দা, সম্পন্ন গেরস্তের বৈঠকখানা, মক্তব-মাদরাসা, টোল ও চতুষ্পাটিতে 'আরবী-ফারসীর প্রাথমিক তা'লীম বা ধর্ম শিক্ষা।

বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষা গবেষক প্রফেসর সিকান্দর আলী ইবরাহিমীর মতে এ দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব কায়েম হওয়ার পূর্বে মুসলমানদের জন্য প্রধানত দু'প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। ছোট সাইজের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হতো। ধনী, দরিদ্র, কৃষক, ব্যবসায়ী এমনকি জমিদারের ছেলে মেয়েরাও এসব শিক্ষা লাভ করতো। শিক্ষার্থীরা এসব প্রতিষ্ঠানে কুর'আন পড়ার নিয়ম শিখে সহীহ শুদ্ধভাবে কুর'আন তিলাওয়াত করতে পারতো। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় হুকুম-আহকাম, দোয়া-কালাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারতো। তার সঙ্গে কোন কোন মক্তবে উর্দু, ফারসী, বাংলা ও অংকের প্রাথমিক শিক্ষাও লাভ করতো। দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো বড় মসজিদ ভিত্তিক মাদরাসা বা স্বতন্ত্র মাদরাসা আর সূফীদের খানকাহ। এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষিত 'উলামা-মাশায়িখ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা দান করতেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার বিষয়বস্তু বা সিলেবাস কারিকুলাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ছিলো।[৮৬]

---

৮৩. ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ ৯৬।

৮৪. প্রাগুক্ত।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪; Muhammad Mohar Ali. *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities*, Chittagong : The Mehrab Publication. 1965, p 2.

৮৬. ড. সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : অতীত ও বর্তমান*, ঢাকা : ১৯৯১, পৃ ২৪, Dr. Sekandar Ali Ibrahimy, *An Introduction to Islamic Eduation in Bangladesh*. Dhaka : 1992, p 35

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজদের ইসলামী শিক্ষানীতি

এ রকম গতানুগতিক পন্থায় এ দেশের মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা হয়তো আর কিছু দিন চলতে পারতো। কিন্তু রাজভাষা ফারসী অপরিবর্তিত থাকায় এবং আদালতে মুসলিম আইন বলবৎ থাকায় সচতুর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এদেশীয় জনগণের মধ্য থেকে কিছু লোককে এমনভাবে ট্রেনিং দিয়ে নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করে যারা প্রশাসনকে সাহায্য করতে পারবে, এবং প্রশাসনের বিরোধিতা করবে না। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিং ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসা স্থাপন করেন।[৮৭] উক্ত মাদরাসায় শাসকদের কাঙ্খিত লোক তৈরীর উদ্দেশ্যে এমন এক সিলেবাস চাপিয়ে দেয়া হয় যাতে ইসলামের প্রকৃত প্রয়োজনীয় বিষয়াদির স্থান না দিয়ে অধিকহারে ফিক্‌হ মানতিক ও ফারসীর ন্যায় গৌণ বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়। এই মাদরাসায় লেখাপড়া করে যে সকল যুবক শিক্ষা লাভ করে বের হতো তাদেরকে মুসলমানদের ইতিহাস ও ইসলামী আইনে পারদর্শীতার উচ্চ প্রশংসাপত্র দেয়া হতো। যা রাজকার্যে প্রবেশের যোগ্যতার প্রমাণ বাহক। ফলে এরা প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে যথা দেওয়ান, মীরমুন্সী, মুফতি, কাযী, সদর, সদরে 'আলা, মৌলবী আদালত হিসেবে নিয়োজিত হতেন।[৮৮] বস্তুত ১৭৮০ সালে স্থাপিত কলিকাতা মাদরাসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিচার কার্যে দক্ষ কর্মচারী তৈরী করা। রাজভাষা ফারসী ও আদালতে মুসলমান আইন বলবৎ থাকায় মুসলমানদের একটি শ্রেণী রাজ কার্য পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষত সদর আমীন, আমীন, কাযী আল কুযাত, কাযী, মুফতী, মুনশী, মৌলবী, উকিল, মুহুরী, নকলনবিশ, অনুবাদক, জেলার, দারোগা প্রভৃতি কাজে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল।[৮৯] এ প্রসঙ্গে ড. ওয়াকিল আহমদ তৎকালীন মুসলমানদের বিভিন্ন চাকরি ও পেশার চমৎকার একটি বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সূর্যাস্ত আইন, লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আইন ইত্যাদির মাধ্যমে কোম্পানী ভূমি ও ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে মুহুর্মুহু নীতির পরিবর্তন করলে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং আইন ব্যবসায় লাভজনক বৃত্তিতে পরিণত হয়। ফারসী ভাষার কারণে মুসলমান আইজীবীরা ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত এ ব্যাপারে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। কলিকাতা ও মফস্বলে কয়েকটি কাযী পরিবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অনেক পরিবার বংশানুক্রমিক কাযী পদে বৃত ছিল। নিয়োগের ধারাটি ছিল এরূপ ফৌজদারী আদালতে কালেক্টরের অধীনে ১ জন কাযী, ১ জন মুফতী, ২ জন মৌলবী নিযুক্ত হতেন। সদর আদালতে ১ জন দারোগা, ১ জন প্রধান কাযী, ১ জন প্রধান মুফতী ও ৩ জন মৌলবী নিযুক্ত হতেন। কাযী ধর্মীয়, নৈতিক, সিভিল ও অপরাধমূলক সব ধরনের মামলার বিচার করতেন ও রায় দিতেন। মুফতী আইনের ব্যখ্যা দিতেন এবং রায় লিপিবদ্ধ করতেন। মৌলবী শরী'আতের বিধান দিতেন।[৯০]

কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসার অনুকরণে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে একই উদ্দেশ্যে মুহসীন ফান্ডের আর্থিক সহযোগিতায় মুহসিনিয়া মাদরাসা স্থাপন করা হয়। ফান্ডের সহায়তায় ১৮৭৩ সালে এ ধরনের আরও কয়েকটি মাদরাসা স্থাপিত হয়। নওয়াব আবদুল লতিফ মহসীন ফান্ডের টাকা বাঁচিয়ে রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন মাদরাসা

---

৮৭. ড. সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : অতীত ও বর্তমান*, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬।

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২৮।

৮৯. A R Mallick. *British Policy and the Muslims in Bengal*, Dhaka : 1977, p 47.

৯০. ড. ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলার মুসলমান রাজনৈতিক এলিট (১৮০০-১৮৫৭)', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ৯ম বর্ষ, ১ম খ, জুন ১৯৯১, পৃ ১০৫-১০৬।
মূলত রাজস্ব ও বিচার বিভাগ থেকে দেশীয় কর্মচারী অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। দেশের প্রচলিত আইন পরিবর্তন করে, কোম্পানীর স্বার্থোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের সব সময় ছিল, কিন্তু কাজী ও ফৌজদারগণ সহযোগিতা না করায় তাঁরা প্রথমে সুবিধা করতে পারেন নি। কিন্তু পরে কোম্পানীর জয় হয়। ১৭৯৩ সালে এক আইনের বলে ভারতীয়দের উচ্চ পদাধিকার রহিত করা হয়। ঐ বছর বিখ্যাত 'কর্ণওয়ালস কোড' অনুযায়ী বিচার ও শাসন বিভাগকে পৃথক করে জেলা-জজ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে দেশীয়দের আধিপত্যের অবসান ঘটানো হয়। দ্র. পৃ ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপনের পরামর্শ দিলে সরকার তা কার্যকরী করেন (১৮৭৪)।৯১ বলা বাহুল্য, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এ দেশে খাঁটি ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তন করার পক্ষপাতী কখনও ছিল না। বরং তারা মুসলমানদিগকে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে রেখে ঈমানী শক্তি লাভ করা থেকে বিরত রাখারই প্রয়াস পেয়েছিল। কলিকাতা 'আলীয়া মাদরাসা ও পরবর্তীতে অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ। আর তা হচ্ছে ১. মুসলমানদের মনের দাবী ইসলামী শিক্ষার ন্যূনতম দাবী পূরণ ২. প্রশাসনের সহায়তার জন্য যোগ্য লোক তৈয়ার করা এবং ৩. সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা থেকে মুসলমানদের দৃষ্টি দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়াস।

এ বক্তব্যের স্বপক্ষে ১৩৩৪/৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দু'একটি পত্রিকার উদ্ধৃতি এক্ষণে প্রনিধানযোগ্য। 'আলোচনা-তারতম্যের কারণ কি?' শিরোনামে মাসিক মোহাম্মদী এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলে :

> গভর্নমেন্টের অর্থে প্রতিষ্ঠিত বা সরকারী সাহায্যে পরিচালিত 'আরবী মাদরাসাগুলো বিগত অর্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া মুছলমানদিগকে আরবী পার্সী ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় যে 'শিক্ষা' দান করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কুর'আন ছিল না, হাদিস ছিল না, এসলামী সভ্যতা ও কালচারের সামান্য একটু আভাসও ছিল না। বস্তুত প্রথম অবস্থায় কেরানী সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্য যে এজেন্সীগুলি খোলা হইয়াছিল, তাহাই কালে মুসলমানদের ধর্মশিক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রতীত হইতে লাগিল।
>
> এই সকল মাদরাসার শেষ পরীক্ষা বা 'উলা পাশ করিয়া যে সকল ছাত্র 'আলেমদের বেশে দেশময় সংক্রামক হইয়া পড়িয়া পড়িতে লাগিলেন, ধার্মিক ও দার্শনিক প্রত্যেক দিকেই তাঁহারা সম্পূর্ণ নিঃসম্বল, নিজেদের শিক্ষা, সভ্যতা ও কালচার সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারে অজ্ঞ, কুর'আন হাদিসের শিক্ষার নৈতিক, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা হইতে তাঁহারা অতি শোচনীয় রূপে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বিশেষত আধুনিক শিক্ষা, সভ্যতা ও চিন্তাধারার সংস্পর্শ হইতে তাহাদিগকে অতি সন্ত র্পণে দূরে রাখা হইয়াছিল।৯২

'মোল্লাদের প্রভাব ও শিক্ষিত সমাজ' শীর্ষক নিবন্ধে জনৈক আহসানুল্লাহ সওগাতে লিখেন :

> ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিচার কার্য চালানোর জন্য লোকের দরকার হইলে কলিকাতা মাদরাসা স্থাপিত হয় এবং বিচারে কার্যের জন্য ফেকাহ ও মন্তেক বিশেষ দরকারী বলিয়া উহার নেসবও (Course) আগাগোড়া ফেকাহ ও মন্তেক দিয়া তৈয়ার হয়। তৎপর দানবীর হাজী মুহসিন হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রামে যে মাদরাসা স্থাপন করেন, তাহাতেও কোম্পানীর কোর্সই প্রবর্ত্তিত হয়,হাদিস-কোরান বা ইতিহাসের স্থান তাহাতে ছিল না। ইহাতে কেবল মাদরাসায় পড়িয়া সর্ব্ব বিষয়ে সুশিক্ষিত আলেম তৈয়ারীর পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।[৯৩]

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে ওয়ারেন হেস্টিংস নিজেই মাদরাসা স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এভাবে :

> It had been deemed expedient on maxim of sound policy to continue the administration of our criminal courts of judicature and many of the most important branches of the police in the hands of Mohammadan officers. But for the due fulfilment of the duties attached to them not only natural talents but also considerable attamminments in the Persian and Arabic languages and extensive knowledge of the complicated systems of laws founded on the tenets of Mohammadan religion were required and that species of learning had for sometime past been decline. With the decay of wealth and the importance of Mohammadan families in the province diminished year by year their means of giving their sons the education which fitted them for responsible and lucarative

---

৯১. ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ ১০৮, ড. সিকান্দর আলী ইব্রাহিমী, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : অতীত ও বর্তমান*, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯।

৯২. *মাসিক মোহাম্মদী*, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৪।

৯৩. মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬-১৭; *সওগাত*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

offices in the state. Hence the Madrasha was established with a view to give them once again their due share of the Govt…job.[৯৪]

ড. সিকান্দার আলী ইবরাহিমী বৃটিশ শাসক কর্তৃক এ দেশে প্রবর্তিত ধর্মীয় তথা মাদরাসা শিক্ষার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

> The object of British religious education had the motive to soothe the feelings of the Muslims only. The Madrasha education that they set up taught external aspects of Islam rather than its inherent spirit. W. S Blunt, an Englishman who came to visit India during the Viceroyality of Lord Ripon found that Madrasha teachers were chosen by the government from among the least rligious and most loyal of the *Ulama*. Madrasha students were neither equipped with true Islamic knowledge nor were prepared for any kind of employment under the Government.[৯৫]

ইংরেজীর প্রচলন, মুসলমানদের বিরোধিতা এবং ইসলামী শিক্ষার দুরবস্থা

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা তথা ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সুক্ষ্ম কলা-কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল সেই প্রথম থেকেই। মুসলমানদের সেন্টিম্যান্টের প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা এতদিন ফারসীর লালন করে আসছিল সত্য, কিন্তু তাদের মনের লুকায়িত অভিলাষ চরিতার্থ করার একটা মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় তারা এতদিন প্রহর গুণছিল এতেও কোন সন্দেহ নেই।[৯৬] ইতোমধ্যেই তারা এদেশীয় বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার সামান্য বিস্তার ঘটাতেও সক্ষম হয়। কারণ হিন্দুদের ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষা করায় ধর্মীয় কোন প্রতিবন্ধকতা তো ছিলই না, উপরন্তু ইংরেজীর প্রতি তাদের মানসিক একটি প্রচ্ছন্ন উৎসাহবোধই কাজ করেছে। তারা ফারসী পড়তো শুধু চাকরি লাভের আশায়। অন্য কোন কারণ বা উদ্দেশ্যে ছিল না। সুতরাং পরাজিত শাসক মুসলমানদের দরদের ভাষা ফারসীর প্রতি তাদের বিশেষ কোন মোহ না থাকাই স্বাভাবিক।

উপরোক্ত মানসিক-সামাজিক পটভূমির প্রেক্ষিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার ১৮৩৫ সালে তাদের শিক্ষা নীতিতে (তথা রাজনীতিতে) এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করে। ইংরেজী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য তারা শিক্ষা উন্নয়ন খাতের যাবতীয় অর্থ ইংরেজী শিক্ষা খাতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৯৭] ইতোমধ্যে ১৮২২ সালে ড. লুমসদেনকে কলকাতা মাদরাসার সেক্রেটারী নিয়োগ করার পর মাদরাসার প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব ইউরোপীয়দের হাতে চলে যাওয়ায় তাদের ইচ্ছানুসারে মাদরাসা সিলেবাসে আমূল পরিবর্তন সাধন করতঃ তাতে ইংরেজী ও কিছু আধুনিক বিষয় সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয় (১৮২৩)। ১৮২৬ সালে উইলিয়াম বেন্টিং-এর নির্দেশে ইংরেজী শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারী লর্ড মেকলে (Lord Macaulay) এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর মিনিউট (Minute) প্রকাশ করেন এবং ঐ বছরই ৭ মার্চ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং তা পাশ করেন। এই মিনিউটে তিনি বলেন যে, এ দেশে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে যা গ্রহণ করলে এ দেশের মানুষের গায়ের রং ও রক্তের দিক দিয়ে ভারতীয় থাকলেও কৃষ্টি-কালচার ও চিন্তা-বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে পুরোপুরি ইউরোপীয়।[৯৮]

---

৯৪. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসংগ*, ঢাকা : ১৯৭৬, পৃ ৬৩-৬৪।

৯৫. Dr. Sekandar Ali Ibrahimy, *Reports on Islamic Education and Madrasha Education in Bengal, (1861-1977), Dhaka: IF B, 1987*, Vol. 4, Publisher's Note, p Viii.

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১২।

৯৭. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪।

৯৮. ড. সিকান্দর আলী ইব্রাহিমী, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : অতীত ও বর্তমান*, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর ১৯৩৭ সালে ২৯ নং এ্যাক্ট অনুসারে ফারসী ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে মর্যাদা হারায় এবং তদস্থলে ইংরেজী ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে অফিস আদালতে ব্যবহার করার নির্দেশ জারী করা হয়। অবশ্য মাতৃভাষা বাংলাকে ইংরেজীর অংগী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কলিকাতায় শিক্ষিত ও প্রতিপত্তিশালী মুসলমানগণ ৮৩১২টি দস্তখতসহ বড় লাটের কাছে প্রতিবাদ পেশ করেন। ১৮৩৯ সালে ঢাকা শহরের ৪৮১ জন বিশিষ্ট নাগরিক (যাদের মধ্যে ১৭৯ জন হিন্দুও ছিলেন) ফারসী ভাষাকে সরকারী ভাষা রাখার অনুরোধ করে আবেদন করেন। এ সময় সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মরিসন সুপারিশ করেন যে, ফারসী ভাষাকে আরও কিছুকাল ইংরেজীর সঙ্গে সরকারী কাজের ভাষারূপে ব্যবহৃত হওয়ার অনুমতি দেয়া হোক। এই সুপারিশ কার্যকরী হলে মুসলমান সমাজের অনেকটা সুরাহা হতো। অফিস-আদালতের ভাষার আকস্মিক পরিবর্তনই মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বনাশের মূল হেতু।[৯৯]

উপযুক্ত সময় না দিয়ে রাজভাষার আকস্মিক এই পরিবর্তন মুসলমানদের মনোবল ভেঙে দেয়। তারা সামাজিক ভাবে হতোদ্দম হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে এ যেন তাদের জাতিসত্ত্বার উপর এক কঠোর বজ্রাঘাত। তাদের উপলব্ধি হয় যে, ইংরেজী জ্ঞানশূন্য অবস্থা তাদের ভাগ্যাকাশে কত বড় সর্বনাশের ছায়া বিস্তার করেছে। তারা এও বুঝতে পারে যে, এই হঠকারী সিদ্ধান্তে মুসলমান সমাজ চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেমন রাতারাতি পেছনে পড়ে গেল, অপর দিকে হিন্দু সমাজ তেমনি এককভাবে এই সিদ্ধান্তের ফায়দা লুটে দ্রুত এগিয়ে গেল। ইংরেজদের এই একটি মাত্র সিদ্ধান্তে বাংলার মুসলমান সমাজ হিন্দুদের তুলনায় সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষা-দীক্ষায় কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে পড়ে।[১০০]

বদরুদ্দীন উমর এটিকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। রাজভাষার সম্মান হতে ফারসীর স্থানচ্যুত হওয়াকে মুসলমানরা দেখেছেন তাদের বিরুদ্ধে শাসক গোষ্ঠী এবং কলিকাতার ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে একটি ষড়যন্ত্র হিসেবে। তাঁদের আশঙ্কা হয়েছিল, ফারসী ত্যাগ করলে তাঁরা স্বাধীন মনেবৃত্তি হারিয়ে 'দাস মনোভাবাপন্ন' হয়ে পড়বে।[১০১] ড. ওয়াকিল আহমদ বদরুদ্দীন উমরের ব্যাখ্যার সমর্থনে বলেন :

> কারণটি একেবারে অমূলক ছিল না। কলিকাতার সাময়িক পত্রে এ নিয়ে আন্দোলন হয়। ১৮২৮ সালে ২৬ জানুয়ারী একটি বাংলা সাপ্তাহিকীতে লেখা হয়, 'ফার্সী বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে আদালতের ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা বিচারক, উকিল, বাদী, বিবাদী অথবা সাক্ষী কাহারই ভাষা নয়। আমরা মনে করি, যদি কোন বিদেশী ভাষাকে আদালতের ভাষারূপে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে ইংরেজী ভাষাই গ্রহণ করা উচিত। এতদিন ইংরেজীকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণের প্রধান আপত্তি ছিল এই যে, বাংগালী জাতি ইংরেজী জানে না। কিন্তু এখন সে আপত্তি টিকিতে পারে না। হিন্দু কলেজে ৪০০ ছাত্র ইংরেজী শিখিতেছে। কলিকাতার অন্যান্য স্কুলগুলিতে কমপক্ষে এক হাজার ছাত্র ইংরেজী শিক্ষা পাইতেছে। ইংরেজী ভাষায় তাহাদের যে জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে তাহাদের পক্ষে এই ভাষায় আদালতের কাজ চালান কিছু মাত্র কঠিন হইবে না। সরকার যাহাতে ফার্সীর জায়গায় ইংরেজীকে আদালতের ভাষারূপে প্রচলন করেন সেজন্য কলিকাতাবাসীর আবেদন করা উচিত। যদি এই আবেদন গ্রাহ্য করা হয় তাহা হইলে দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হইবে।

---

৯৯. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪।

১০০. কোম্পানীর শাসনের শুরু থেকে হিন্দু সম্প্রদায় যে সব সুযোগ গ্রহণ করে অগ্রসর হন, মুসলমান সম্প্রদায় প্রথমদিকে সেসব সুবিধা পরিহার করে পিছিয়ে পড়েন। তাঁরা নবযুগের পরিবর্তনের ধারাটিও উপলব্ধি করতে দেরি করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের চৈতন্যোদয় হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে। তখন থেকে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের পালা শুরু হয়। নবজীবনের দৌড়-পাল্লায় অন্যূন পঞ্চাশ বছরের এই ব্যবধান বাংলার দুটি সম্প্রদায়কে দুটি স্বতন্ত্র কক্ষে স্থাপন করে এবং পরস্পর স্বার্থে বিবদমান দুটি শিবিরের সূচনা করে। দ্র. ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা*, ১ম খ, দ্র. প্রস্তাবনা।

১০১. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট*, কলিকাতা : ১৯৭৯, পৃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৩৪ সালের ১১ মার্চ ঐ পত্রিকা সরকারের কাছে দাবী করে যে, সরকারী চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী জ্ঞানকে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।[১০২]

বাংলার হিন্দু সমাজ তাঁদের সে যোগ্যতা যা তাঁরা ইতোমধ্যে অর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ পরবর্তীতে যখন ফারসী রহিত হয়ে ইংরেজী-বাংলা সরকারী ভাষার মর্যাদা পায় (১৮৩৭) তখন সফলভাবে রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। কিছুদিন পর ১৮৪৪ সালে সরকার আদেশ জারী করে যে, অতঃপর সরকারী চাকরিতে ইংরেজীতে শিক্ষিতদের দাবী অগ্রগণ্য হবে।[১০৩] এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তিত হয়। এ সব সিদ্ধান্তে মূলত হিন্দুরাই লাভবান হয়েছে একচেটিয়াভাবে। কারণ, ইতোমধ্যেই হিন্দু সম্প্রদায় তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে তথা পাশ্চাত্য বিদ্যার্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে ছিল। অপর দিকে মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ফারসী ভাষার প্রতি তাদের মোহ ও জাত্যাভিমান কাটিয়ে ইংরেজী বিদ্যার প্রতি তাদের অবস্থা সবেমাত্র হাটি-হাটি পা পা। উপরোন্ত, ইংরেজী শিক্ষায় ধর্মীয় 'আকিদা বিনষ্টের যে ভীতি তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল, সে ভীতির লাগামও সম্পূর্ণ ঢিলে হয়ে যায় নি।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই খ্রীস্টান মিশনারীদের পাশ্চাত্য জ্ঞানলোক প্রচার করতে বলা হয়েছিল যার ফলে উইলিয়াম কেরী প্রমুখ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, কোম্পানী সরকার প্রথম দিকে মুসলমানদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় পাদ্রীদেরকে ঐ কাজ থেকে বিরত রেখে ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়, জেলা স্কুল প্রভৃতি ছাড়াও উচ্চ শিক্ষার জন্যে কলেজ বা মহাবিদ্যালয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তাতে তাদের একক প্রাধান্যবিস্তার পাশ্চাত্য বিদ্যা ও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি হিন্দু সমাজের ব্যাপক আগ্রহের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য তাদের এ সব উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারী ও মিশনারী উদ্যোগ তাদের ইংরেজী শিক্ষায় সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজকের দিনে শিক্ষার যে স্তরটিকে মাধ্যমিক স্তর নামে আখ্যায়িত করা হয় সে স্তরটি তখনকার দিনে শিক্ষার উচ্চ স্তরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৯২ সালে বানারসী সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮১৭ সালে রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ও বেথুন, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ ইংরেজদের সহায়তায় বাঙ্গালী হিন্দুদের উদ্যোগে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় ১৮২৪ সালে। এর পর কলকাতায় ফ্রি চার্চ ইন্সটিটিউশন (পরবর্তীতে নামান্তরিত ডাফ কলেজ) এবং শীলস কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৪৩ সালে। ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে আরও ছ'টি কলেজ এবং ১৮৪৬ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতায় হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ এবং বহরমপুর কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৫৩ সালে এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৫৪ সালে।[১০৪] ১৮২৫ সালে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ক্লাশ খোলা হয় এবং হিন্দু কলেজে উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা হয়। উল্লেখ্য যে, এ দু'টি প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্ররা পড়ার সুযোগ পেতো না। ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজে আইন পড়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয় ১৮৩৬ সালে।[১০৫] এবং ঐ সালেই মহসীন ফান্ডের টাকায় হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়। হুগলী কলেজে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্র পড়তে পারতো, তবে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা মুসলমান ছাত্রের তুলনায় বেশী ছিল। ১৮৪৪ সালে কতকগুলো জেলা স্কুল স্থাপন করা হয়। এবং মাতৃভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ৩৬ টি জেলায় ১০১ টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[১০৬] সুতরাং উনিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের এ সময়

---

১০২. ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, ২য় ও, পৃ ১০০, উদ্ধৃতি R. C Majumder, *Bengal in Nineteenth Century*. p 32-48.

১০৩. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫।

১০৪. শামসুল হক, *উচ্চ শিক্ষা : বাংলাদেশ*, ঢাকা : ১৯৮৯, পৃ ১১-১২।

১০৫. *উচ্চ শিক্ষা : বাংলাদেশ*' গ্রন্থে শামসুল হক কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হওয়ার সন উল্লেখ করেছেন ১৮৩৫ সাল।

১০৬. ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

কালটিকে বঙ্গে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সময় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে তা ছিল, হিন্দুদের জন্য একচেটিয়াভাবে। কারণ, ১৮৩৭ সালে ইংরেজী ও বাংলা সরকারী ভাষা সরকারী স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের ফারসী কেন্দ্রিক শিক্ষা বিষয়ক মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় নি। যখন তাদের মোহমুক্তি ঘটে তখন তারা বুঝতে পারলো যে, হিন্দু সমাজ তাদেরকে ছাড়িয়ে বহুদূর (৫০/৬০ বছর) এগিয়ে গেছে। এ ব্যাপারটি চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে আবদুস সালামের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। ১৯০৮ সালের ১৮ ও ১৯ এপ্রিল ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত 'প্রভিন্সিয়াল মোহাম্মাদান এডুকেশনাল কনফারেন্স' ইস্টার্ণ বেঙ্গল এন্ড আসাম-এর দ্বিতীয় সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট সালাম তার দীর্ঘ ভাষণের এক জায়গায় বলেন :

> The displacement of Persian by English about the forties dealt a severe blow to the peosperity of Mussalmans. The Massalmans who had continued to occupy high offcial positons in the early days of British rule, by virtue of diplomas of high proficiency in their own Law and Literature, failed to realise why English education should ever be necessary for their children. And when subsequently after the British occupation of the country fro nearly theree quarters of a century. Knowledge of English was held to be a prefernatial qualification for entry into the the public service and the professions, the Mohammadans natuarally felt a wrench in parting with the old ways and hold aloof generally from English education for more than one generation, owing to the pressure of historical associations and of intellectual attachment to their own law and Literature. In the meantime, their comparriots, the Hindus of Bengal, who had no similar historical traditions to encountar, quickly realized the situation, adapted themselves early to the requirements of modern life in india, by acquiring English language which in their case simply means the substitution of one foregin language for another. The difficulties of Mussalmans were further accentuated by reason of English education being available for the most part in those early days in missionaryschools and colleges. The Hindus, who had got over their prejudices owing to historical conditions, felt no seruples in attending such schools; whilst with the Muhammadans such seruples weighed as important factors, and operated to keep them back from those schools.[১০৭]

অবশ্য সেই সময়কার প্রেক্ষাপটে মুসলমান অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের ইংরেজ পাদ্রী পরিচালিত স্কুলগুলোতে না পাঠানোর আর একটি বড় কারণ ছিল এই যে, সে সকল ইংরেজী স্কুলে 'আরবী-ফারসী পড়ানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ মুসলিম সমাজে তখন 'আরবী ফারসী জ্ঞান ছিল উচ্চশিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। 'আরবী ফারসীর জ্ঞান ছাড়া অন্য বিদ্যায় যত পারদর্শীই হোক না কেন কাউকে তারা সুপণ্ডিত হিসাবে সম্মান দেখাতে প্রস্তুত ছিলেন না। 'Unless a Muslim is a Persian and Arabic Scholar, he can not attain a respectable position in Muslim society I. e. he will not be regarded or respected as as scholar, and unless he has such a position, he can have no influence in the Muslim community.'[১০৮] ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ও শিক্ষা প্রদানের সুযোগ-সুবিধা বিস্তৃত হওয়ার পরও মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজী শিক্ষা থেকে নিম্নোক্ত কারনে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখলেন:

---

১০৭. Mymensingh conference, p 11-12. উদ্ধৃত : ড. সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : অতীত ও বর্তমান*, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫-৫৬।

১০৮. Nawab Abdul Latif's Reports on Hoogly Madrasha, 1861, Para 13, উদ্ধৃত : প্রাগুক্ত, পৃ ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

১. মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল। তারা ভারতে ছয় শ' বছরেরও অধিককাল ধরে শাসন করে ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং ভগ্নহৃদয়ে দিন যাপন করতে আরম্ভ করে। এমতাবস্থায় নিজস্ব শিক্ষা-সংস্কৃতি বাদ দিয়ে অন্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করার মত মন-মানসিকতা তাদের ছিল না।[১০৯]

২. ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পেছনে ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করা।[১১০] ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিঃ উইলভার ফোর্স বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রস্তাব করতে গিয়ে বলেন : এ ভারতে প্রোটেস্ট্যান্ট মতের শিক্ষা ও উপাসনার উপকরণসমূহ সংগ্রহ করা হোক, শিক্ষিত হলে ভারতবাসীগণ খ্রীস্টান হয়ে যাবে। যেহেতু শিক্ষিত লোকেরা বিপ্লবের পরিবর্তে নিয়মানুবর্তিতা ও ব্যক্তিগত ক্রমোন্নতির পথকেই অধিকতর পছন্দ করেন, অতএব শিক্ষার ফলে ভারতে আমাদের সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।[১১১]

৩. মুসলমানদের আর্থিক দুরবস্থা : ১৭৫৭ সালে রাজ্যহারা হওয়ার পর মুসলমানগণ সর্বহারা হয়ে যায়। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে জমিদারিসমূহের নতুন বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মুসলমানগণ বর্ধিত হারে খাজনা দিতে অস্বীকার করায় তাদের নিকট থেকে জমিদারী ছিনিয়ে নেয়া হয়। তদুপরি মুসলমানদেরকে সৈনিক, পুলিশ এবং অফিস-আদালতের চাকরি থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। এতে করে মুসলমানগণ সর্বহারা হয়ে যায়। মুসলমানদের আর্থিক দুরবস্থার কারণে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি নিরুৎসাহ হয়ে যায়।

৪. মুসলমানদের ওয়াক্‌ফ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণ : মুসলিম শাসনামলে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বেতন নেয়া হতো না। অধিকন্তু বই-পুস্তক ও বাসস্থান দেয়া হতো। মুসলমান নওয়াবগণ স্বজাতির শিক্ষার জন্য যে সব লাখেরাজ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেছিলেন, ১৮২৮ সালে ইংরেজগণ সে সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে।[১১২] ফলে শিক্ষার প্রধান উপায় বন্ধ হয়ে যায়।

৫. শিক্ষা ক্ষেত্রে বেতন প্রথা প্রবর্তন : মুসলমানগণ থেকে জমিদারী ছিনিয়ে নেয়া, তাদের চাকরি থেকে বঞ্চিত করা এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পর শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বেতন গ্রহণ করার নীতি প্রবর্তন যেন মরার উপর খাড়ার ঘা। এ কারণে মুসলমানগণ ইংরেজদের ও তাদের শিক্ষাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে।

৬. নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার অভাব : ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমান ছেলে-মেয়েদের জন্য ধর্ম সম্পর্কীয় প্রাথমিক জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা ছিল না। তা ছিল তাদের জন্য অসহনীয় ব্যাপার। মুসলমানগণ সর্বহারা হয়ে বাঁচতে পারে, কিন্তু ধর্ম-হারা হয়ে বাঁচতে পারে না। জনৈক ইংরেজের মন্তব্য : 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমান যুবকদের ধর্মীয় শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।[১১৩] এ কারণে মুসলমানগণ তাদের শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

৭. নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় 'আরবী-ফারসী ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকা : 'আরবী-ফারসী ভাষা মুসলমানদের ঐতিহ্যের বাহন। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় সে ভাষাদ্বয়ের স্বীকৃতি ছিল না।[১১৪] তাই তারা ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণে বিরত থাকে।

৮. মাদ্রাসাসমূহে সরকারী সাহায্য বন্ধ করা : মুসলমানগণ তাদের মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন যাবত কোন কোন ক্ষেত্রে আমীর-উমরার সাহায্য পেয়ে আসছিলো। ইংরেজ আগমনের পর মুসলমানদের ঐসব প্রতিষ্ঠানে সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হয়।[১১৫] এ কারণে মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা তথা তাদের শিক্ষা গ্রহণে বিরত থাকে।

---

১০৯. এর সমর্থনে হান্টারের বক্তব্য : 'যদি মুসলমানদের সামান্য বুদ্ধি বিবেচনা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকিত এবং পরিবর্তিত অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইত। কিন্তু তাহা কি হয়। একটা পুরাতন বিজয়ী জাতি কি সহজে নিজেদের অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যকে ভুলিয়া যাইতে পারে। [*মাসিক মোহাম্মদী*, ৩২ বর্ষ, কার্তিক ১৩৬৭ আশ্বিন ১৩৬৮, পৃ ৪৬০]

১১০. স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ, *আসবাব-এ-বাগাওয়াত-এ হিন্দ*, *আয়না-এ আদব*, লাহোর : টওক মীনার, ১৯৬১, পৃ ১৬।

১১১. সৈয়দ তুফায়িল আহমদ, *মুসলমানুঁকা-রওশন মুস্তাকবিল*, বদায়ূন : নিযামী প্রেস, ১৯৩৮, পৃ ১২৯।

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭।

১১৩. *মাসিক মোহাম্মদী*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৬-৪৬৭।

১১৪. অবশ্য ১৮৭২ সালের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা বিবর্জিত ইংরেজী বিদ্যা মুসলমানদের ধর্মীয় 'আকীদা বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে পারে-এ আশঙ্কা অমূলক ছিল না। তারা জানতেন যে, প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের প্রাথমিক যুগের ইংরেজী শিক্ষিতদের অনেকে যেমন-মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, লাল বিহারী দে, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রমুখ স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। উপরন্তু, খ্রীস্টান মিশনারীগুলো ইসলাম বিরোধী প্রচার চালিয়ে মুসলমানদের এ আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করেছিল। ডিরোজিয়োর শিষ্যদের উচ্ছৃঙ্খলতাও মুসলমান সমাজকে ভাবিত করে তোলে।[১১৬]

এ সব কিছুকে উপচিয়ে বাংলার মুসলমানরা যখন ইংরেজী শিক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে পারলেন, অর্থাৎ যখন তারা বুঝতে পারলো যে, চাকরি বা অন্যান্য পেশার জন্যে-তথা তাদের জীবন-জীবিকা, সামাজিক প্রতিপত্তি ও অস্তিত্বের স্বার্থে ইংরেজী শিক্ষা করা প্রয়োজন, তখন অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হয়। পশ্চিম বঙ্গে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ও পূর্ববঙ্গে হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮০-১৮৪৯) ও দুদু মিঞা (১৭৯০-১৮৬২) ওয়াহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ শাসন-শোষণ বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলেন। তাঁদের আন্দোলন প্রথম দিকে ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রমে তাঁরা রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জিহাদে (সশস্ত্র সংগ্রাম) লিপ্ত হন। সৈয়দ আহমদ শহীদ প্রথমতঃ এ দেশকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন, পরে তাঁর অনুসারীদের সাথে কোম্পানীর সংঘর্ষ হয়।

তিতুমীর 'বাঁশের কেল্লা' নির্মাণ করে ইংরেজ সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে নিহত হন (১৮৩১)। শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে ঐ সময় সৈয়দ আহমদ শহীদ বালাকোটের যুদ্ধে শিখ সৈন্যদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন (১৮৩১)। তাঁর মৃত্যুর পরও জিহাদ আন্দোলন অব্যাহত ছিল। ১৮৪৯ সালে ইংরেজ পাঞ্জাব অধিকার করলে জেহাদীদের আন্দোলন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়।[১১৭] বাংলাদেশ থেকে মুজাহিদ ও অর্থ সংগৃহীত হয়ে সীমান্ত প্রদেশে এই জেহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হত। মালদহ, ঢাকা, রাজমহল প্রভৃতি অঞ্চলে জেহাদীদের প্রচার কেন্দ্র ছিল। সৈয়দ আহমদ শহীদের এ আন্দোলনের নাম ছিল 'তরিকায়ে মহম্মদীয়া' কিন্তু ভারতবর্ষে এই আন্দোলন 'ওয়াহাবি আন্দোলন' নামে আখ্যায়িত হয়। শরিয়তুল্লাহ ও তিতুমীর সৈয়দ আহমদ শহীদের আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাঁরাও নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে বৃটিশদের দমননীতির শিকারে পরিণত হন। অপর কোন জাতির ভাষা ও জ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের নীতিগত কোন বাধা ছিল না। কিন্তু ওয়াহাবী আন্দোলনের সমর্থকরা ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ ইংরেজী ভাষা বিদ্যার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে ঐ ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা 'হারাম' বলে প্রচার করেন। বাংলাদেশে ওয়াহাবী পন্থী ও গোঁড়া মোল্লা শ্রেণী ঐরূপ মনোভাব দ্বারা লালিত হয়ে ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। গ্রামদেশে এর প্রভাব পড়ে। কিন্তু শহরের অভিজাত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি কোন সংস্কার ছিল না। এসব আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রফেসর এ. আর মল্লিক বলেন :

> Thus this reform movement, instead a purifying the faith or aplofting the Muslims from their miseries, degenerated into a voilent reactionary one. As a result, the Muslims especially of rural Bengal and Bihar added to their existing poverty and ingnorance, Fantism and pregudice-two serious obstacls to the progress and development of any community.

---

১১৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬, পৃ ২২-২৩।

১১৬. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬৫; ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ ১০৩।

১১৭. হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রগ্রসরতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন :

> The Hindu community, under enlightened leaders like Ram Mohan Roy and Dwarkanath Tagore, had cast off its prejudice and had advanced by accepting western education. They had also fully and wholeheartedly co-operated with the ruling race. The Muslims it will seem upto 1835 at least, before this reform movement had degenerated, showed an equal desire for education, but the advantages of education under Government supervision were not then offered to the areas where they were in majority.[১১৮]

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা দরকার যে, এ দেশের 'আলিম সমাজ তখনকার সেই পরিস্থিতিতে ইংরেজী শিক্ষার বিরোধিতা করলেও তাঁরা ভালো করেই জানতেন যে, ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা হারাম নয়। যে কোন ভাষা শিক্ষা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হতে পারে না। এমনকি ইসলাম সুদূর চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞানার্জন করতে বলেছে। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টি যে কোন ভাষা শিক্ষা করা যেতে পারে। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যাঁরা ইংরেজী শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় 'আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ আবদুল আজীজ (র) হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পরিবেশ-পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এবং ইসলাম বিরোধী পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত রাখার জন্য তাঁরা ইংরেজী শিক্ষার বিরোধিতা করেন এবং প্রচলিত দওর-ই-নিজামী শিক্ষা পদ্ধতি জারী রাখার চেষ্টা করেন।[১১৯] ডাক্তার জেমস ওয়াইজ বলেছেন, ঢাকার শিক্ষিত মুসলমানরা তাঁদের সন্তানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাই দিতেন, ইয়ং বেঙ্গলদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাঁরা ইংরেজী শিক্ষার কথা ভাবতেন না।[১২০]

মুসলমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষার পশ্চাতৎপদতার কারণ হিসেবে তাদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্রকেও দায়ী করা হয়েছে। যখন ইংরেজী শিক্ষার আবশ্যকতা তাদের মধ্যে অনুভূত হয় তখন নানা কারণে তাদের মধ্যে দারিদ্র দেখা দেয়। প্রথম দিকে ইংরেজী বিদ্যালয়গুলো ছিল শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। শহরে পাঠিয়ে ব্যয়বহুল শিক্ষা গ্রহণ করার মতো সামর্থ তাদের ছিল না। গ্রামে যাদের সামান্য সামর্থ ছিল, তারাও বিদ্যালয়ের অভাবে ছেলেদের লেখাপড়া শিখাতে পারে নি। ২৬ এপ্রিল ১৮৫২ সালের এক মন্তব্য পত্রে সিসিল বিডন লিখেছেন :

> মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, তাঁরা তাদের সন্তানের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের উচ্চ ব্যয়ভার বহন করতে পারেন, হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সেরূপ অর্থদৈন্য ছিল না।[১২১]
>
> মুসলমান আমলে হিন্দুরা যে সুবিধা ভোগ করেছে, রাষ্ট্রশাসনে বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে নির্দিষ্ট স্থান তাদের ছিল, ইংরেজ আগমনের ফলে তা কিয়ৎ পরিমাণে আলোড়িত হলেও মূলত তা ধ্বংস হয় নি। ব্যবসায় বা শাসনক্ষেত্রে তারা শাসক শ্রেণীর একান্ত প্রয়োজনীয় সহকারীরূপে চিরকালই একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে। এক যুদ্ধকার্য ছাড়া ধনোৎপাদন ও ব্যবসায়ী হিসেবে পণ্য বিতরণ, সরকারী চাকরি ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেক জীবিকাই তাদের মুসলমান আমল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে এবং এর ফলে তাদের আর্থিক স্থায়িত্ব রয়েছে অক্ষত। সে জন্য নতুন শাসকশ্রেণীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা গেল ধ্বংস হয়ে।[১২২]

অপরদিকে প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাবো যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এক চরম সংকটপূর্ণ অবস্থায় নিমজ্জিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সব

---

১১৮. A R Mallick, Ibid, p 163-64

১১৯. ড. সিকান্দর আলী ইব্রাহিমী, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : অতীত ও বর্তমান*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

১২০. Dr. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal,* London : 1883, P 36.

১২১. A R Mallick, Ibid, *p 214-215.*

১২২. উদ্ধৃতিটিতে ড. আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহর একটি উক্তির অংশ বিশেষ। ড. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ ৭১-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল বিচার বিভাগে চাকরি করার জন্য একদল উপযুক্ত লোক তৈয়ার করা, ধর্মীয় শিক্ষা দান ছিল এগুলোর গৌণ উদ্দেশ্য। কিন্তু ১৯৩৭ সালে ফারসী রহিত হবার পর চাকরি ক্ষেত্রে মাদরাসার গুরুত্ব লোপ পায়। বিভিন্ন ভাষার প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করতেই যেখানে শিক্ষার্থীদের প্রাণান্তকর অবস্থা, সেখানে শিক্ষার অগ্রগতি যে কিরূপ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এ সময় মাদরাসায় 'আরবী, ফারসী, উর্দু, ইংরেজী, বাংলা এই পঞ্চভাষা শিক্ষা দেয়া হতো। ইংরেজীর মান ছিল তুলনামূলকভাবে দূর্বল; তাও কেবল কলকাতা মাদ্রাসায় সীমাবদ্ধ ছিল। উল্লেখ্য যে, প্রথম দিকে মাদরাসার সিলেবাসে ইংরেজীর স্থান ছিল না, ক্রমে 'ইংরেজীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে ১৮২৬ সালে মাদরাসা সিলেবাসে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষার তেমন আগ্রহ দেখা যায় নি, ফলে ১৮৫১ সালে তা পরিত্যক্ত হয়। পুনরায় ১৮৫৪ সালে এ্যাংলো এ্যারাবিক এর স্থলে এ্যাংলো-পার্সিয়ান ডিপার্টমেন্ট নামে স্বতন্ত্র একটি স্কুল খোলা হয়, কিন্তু মাদরাসার শিক্ষার সাথে এর কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। অবশ্য ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ১৯২৬ সালে পুনরায় মাদরাসা সিলেবাসে ইংরেজী শামিল করা হয়।[১২৩] মাদরাসায় প্রদত্ত ইংরেজী শিক্ষার উল্লেখ করে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেন :

> কেবল কলিকাতা মাদরাসায় প্রাথমিক মানের ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হতো, মাদরাসার ছেলেরা কলেজের উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারতো না।[১২৪]

আসলে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিদ্যমান অনীহার ভাব তখনো কাটে নি। 'ইংরেজী ভাষার প্রতি মুসলমানদের পূর্ব হতেই ভয়ানক ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ইংরেজী শিখিলেই নরকগামী হইতে হইবে এবং ইংরেজী পড়াইয়া খ্রীস্টিয় ধর্মে দীক্ষিত করা ইংরেজ গভর্নমেন্টের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। বহু কালের সংস্রবে এবং দেশের প্রচলিত ভাষার গতিকে বাঙ্গালার প্রতি বিদ্বেষের লাঘব হওয়াতে অনেকেই বাঙ্গালা শিখিতেছেন।'[১২৫]

বস্তুত মুসলমানরা রাজ-ক্ষমতা হারানোর মর্মবেদনা ভুলে উঠার আগেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত অকস্মাৎ পরপর কয়েকটি পদক্ষেপ যেমন- ফারসীর স্থলে ইংরেজীকে রাজভাষা করা, সরকারী চাকরিতে ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের অগ্রাধিকার দেয়া, চাকরি নিয়োগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেয়া ইত্যাদি এক দিকে যেমন তাদের মর্মপীড়া দ্বিগুণ করে তুলেছিল, অপরদিকে তেমনি জীবনের কাছে পরাজিত হয়ে ক্রমশ তারা নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। এরূপ অবস্থায় প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে পড়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর ছিল না। নইলে তারা সরকারী অর্থে পরিচালিত সর্ব প্রাচীন কলিকাতা মাদরাসাকে যুগোপযোগী শিক্ষার অঙ্গন করে আধুনিকতার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারতেন। কিন্তু কার্যত তা হয় নি।[১২৬] ১৮২৬ থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত (কারো কারো মতে ঐ সময়টি ১৮৫১ অথবা ১৮৫২ সাল পর্যন্ত) ২০ বছরের ইতিহাসে মাত্র দু'জন আবদুল লতিফ ও ওয়াহিদুন্নবী কলিকাতা মাদরাসা থেকে জুনিয়র স্কলারশীপ পরীক্ষা পাশ করতে সক্ষম হন, তাতে মোট ব্যায় হয়েছিল ১,০৩,৭১৪ টাকা। সৈয়দ ওয়ারেস আলী ছিলেন সৈয়দ আমীর আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। উক্ত চার ব্যক্তি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর হয়েছিলেন।[১২৭]

উল্লেখ্য যে, ১৮৫৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত ভারত সচিব স্যার চার্লস উড যে নিদের্শনামা জারী করেন তাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কলিকাতা মাদরাসার কারিকুলামের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে উক্ত বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনা হোক। কিন্তু দু:খের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশের প্রতি দৃষ্টি দিলেন না। অন্যদিকে মাদরাসা কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব

---

১২৩. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬, পৃ ২৭০-২৭১।

১২৪. ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ ৫৬।

১২৫. সৈয়দ আবদুল আসফর, *তরফের ইতিহাস*, কলিকাতা : ১৯৯৪, পৃ ১১।

১২৬. ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ ৫৬।

১২৭. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

পোষণ করতেন। কারণ, তারা মনে করেছিলেন যে কলিকাতা মাদরাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে আসলে তাদের নিজেদের কর্তৃত্বের হানি হবে।[১২৮]

আসলে ঐতিহ্যবাহী এ মাদরাসাটি, যা মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে দিকপাল হিসেবে পরিচিত হয়ে থাকে এবং যাকে কেন্দ্র করে মুসলমানের শিক্ষার ইতিহাস প্রায় দু'শ বছর ধরে আবর্তিত হয়ে আসছে, তা ছিল নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। মাদরাসার সিলেবাস যেমন ছিল ত্রুটিপূর্ণ, যুগের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ অন্যদিকে তেমনি ছিল প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম ও অব্যবস্থার শিকার। মাদরাসার অভ্যন্তরে এসব ত্রুটি ও অনিয়ম না থাকলে হয়তো আজ বাঙালী মুসলমানের শিক্ষার ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। প্রফেসর এ. আর মল্লিক কলিকাতা মাদরাসার বিরাজমান এসব ত্রুটি ও অনিয়মের উল্লেখ করেছেন এভাবে :

> This defective management and indiscipline were accompanied by ineffective teaching. Only two students in the whole history of the Madrasha up to 1952 attained the junior scholarship standard.[১২৯]

অপরদিকে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ইংরেজী ভাষাকে একটি স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে সিলেবাসভুক্ত না করে অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে খাপছাড়াভাবে শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হবার প্রয়াস পেয়েছেন-এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ড. এস এ হোসাইন :

> Again instead of incorparating English in the course of studies a somewhat unwise attempt was made to introduce English as an additional subject, thus throwing an undue burden upon the students.[১৩০]

বস্তুত এরই অনিবার্যভাবে পরিণতি হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে যখন কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয় (১৮৩৬) তখন যেখানে ভর্তি হওয়ার মত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন একজন মুসলমান ছাত্রও পাওয়া যায় নি। যদিও কলিকাতা মাদরাসায় ১৮২৬ সাল থেকেই মেডিক্যাল ক্লাস চালু ছিল।[১৩১]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সরকারী ও শিক্ষা দীক্ষায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা যে পঞ্চাশ/ষাট বছর (কারো কারো মতে একশত বছর) পিছিয়ে পড়লেন তার প্রধান কারণ তাদের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ না করা। ড. ওয়াকিল আহমেদ, ড. আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহর একটি প্রাসঙ্গিক উক্তিও উল্লেখ করেছেন :

> আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান কেমন করে দ্রুত গতিতে শ্রেণীচ্যুত হয়ে গেল সে কাহিনীর উল্লেখ হয়তো নিষ্প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে প্রায় একশ' বছর ধরে বাঙ্গালার হিন্দু যে অর্থনৈতিক ধারার ভেতর দিয়ে এসেছে, বাঙালী মুসলমানের জীবনে সে অবস্থা এসেছে মাত্র সেদিন উনিশ শতকের শেষের দিকে।[১৩২]

এই শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণ হিসেবে আমরা ইতিপূর্বে তাদের অনীহার কথা উল্লেখ করেছি। যে অনীহার মূলে ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস বিনষ্টের ভয়, এক শ্রেণীর 'উলামার ইংরেজী বিরোধী মনোভাব, মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্রতা ও শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের একপেশে নীতি সরকারের শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে প্রফেসর মল্লিক বলেন :

> Without ascribing any motive, whatsoever, it can also be said that the policy of the government in respect of education was often faltering and, in most cases, though well intentioned, it served to benefit the Hindus rather than Muslims.[১৩৩]

---

১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫।

১২৯. A R Mallick, Ibid, p 218.

১৩০. Dr. S M Husain. *'Islamic Education in Bengal'*, *Islamic Culture*, July, 1934, p 440.

১৩১. A R Mallick, Ibid, p 258.

১৩২. ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, ১ম খ, পৃ ৭১।

১৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২২১।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে দেখা যায় যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার প্রথম দিকে কলিকাতা কেন্দ্রিক যে শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী হাতে নেয় তাতে-হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ এ দু'টি প্রতিষ্ঠান হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত ছিল যেখানে মুসলমান ছাত্রের প্রবেশাধিকার ছিল নিষিদ্ধ। মিশনারী, সরকারী স্কুলগুলোও ছিল হিন্দু প্রধান এলাকায়। সুতরাং সে সব স্কুল থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ মুসলমানদের বড় একটা হয় নি। অন্যদিকে মহসীন ফান্ডের টাকায় স্থাপিত হুগলী কলেজে কোন প্রকার সংরক্ষণ নীতি গৃহীত না হওয়ায় সেখানে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু ছাত্রদেরই প্রাধান্য বিরাজমান ছিল। এমনকি কলিকাতা মাদরাসায় ইংরেজী ক্লাস চালু হওয়ার পর সেখানেও তারা ভর্তির সুযোগ করে নেয় এবং এ ব্যবস্থা ১৮৩২ সাল পর্যন্ত চালু থাকে (from the report of the general committee it is learnt that Hindu boys had been admitted to the Madrasha until the end of 1832)।[১৩৪] সুতরাং এটাও পরিষ্কার যে, সরকারী একপেশে শিক্ষানীতি ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে পর্যাপ্ত সরকারী সহায়তার অভাব ইসলামী শিক্ষার অধোগতির অধপতনের অন্যতম প্রধান কারণ। অপরদিকে রাজস্ব ও বিচার বিভাগে যোগ্য সরকারী কর্মচারী তৈয়ার করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হলেও কলিকাতা মাদরাসা পরবর্তীতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে গোটা বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে পারতো কিন্তু বাস্তবে তা হয়ে ওঠে নি। এর প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, মাদরাসার সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। ফলে সেখানে মুসলমানদের জাতীয় প্রয়োজনের স্বার্থে কোন প্রকার সংস্কারমূলক বা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব ছিল না। বরং এক পর্যায়ে ১৮৫৮ সালে গর্ডন ইয়ং নামক এক ডি. পি. আই-এর রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বাংলার তদানীন্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ফেডারিক হ্যালিডে কলিকাতা মাদরাসাকে 'রাজদ্রোহের লালনক্ষেত্র' আখ্যা দিয়ে তা বিলুপ্তির প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এ প্রস্তাবে রাযী না হওয়াতে মাদরাসার অস্তিত্ব রক্ষা পায়।[১৩৫]

ইংরেজী বিরোধিতার উত্তরণ

কলিকাতা 'আলীয়া মাদরাসার অন্যতম ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র নওয়াব আবদুল লতীফ (১৮২৮-১৮৯১) এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল গফুর স্বীয় সমাজের বিরুদ্ধবাদী ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অবস্থান করেও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ইংরেজ সরকারের অধীনে উচ্চ পদে চাকরি গ্রহণ করেন। যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে তিনি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলকাতা মাদরাসায় এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ স্থাপিত হয় যা এন্ট্রান্স সমমানের মর্যাদাপ্রাপ্ত ছিল, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বা কাযীর পদ সৃষ্টি করিয়ে বহু বেকার 'আরবী শিক্ষিত মুসলমানের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া মুহসীন ফান্ডের টাকা বাঁচিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও হুগলীতে তিনটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন এবং মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তির সুযোগ করেন। এতদসত্ত্বেও সরকারের সাথে 'তোষণ নীতি'র কারণে তাঁকে গঞ্জনাও কম সহ্য করতে হয় নি।

বস্তুত নওয়াব আবদুল লতীফ এবং স্যার সৈয়দ আহমদ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজের বৈরিতা ত্যাগ করে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার মধ্যেই ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং সে পথেই মুসলিম সমাজ উন্নতি লাভ করে নিজেদের হৃত গৌরব ও ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে। আবদুল লতীফ তাঁর এ নীতির ভিত্তিতেই মুসলিম সমাজের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। ইংরেজী শিক্ষাকে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ সালে তিনি 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন।[১৩৬]

---

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২১৬।

১৩৫. আবদুল হক ফরিদী, মাদরাসা *শিক্ষা : বাংলাদেশ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ ৪৯।

১৩৬. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

স্যার সৈয়দ আহমদ খান আলীগড় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন। কিন্তু আবদুল লতীফের প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের উল্লেখযোগ্য ফলাফল বয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয় না। কারণ 'আলিম সমাজ, রক্ষণশীল সমাজপতিগণ ও গ্রামে বসবাসকারী সরল ধর্মপ্রাণ মুসলিম নরনারী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, যে ইংরেজ ছলে বলে কৌশলে মুসলমানদের রাজ্য হরণ করেছে, একে একে সুপরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের জায়গীর, লাখেরাজ ও আওকাফ সম্পত্তি কুক্ষিগত করেছে, মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ ইত্যাদির আয়ের উৎস বন্ধ করে তাদের ধ্বংস করেছে, 'আরবী-ফারসীকে স্থানচ্যুত করে ইংরেজী ভাষা চাপিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করলে কোন লাভ হবে। বরং তা করতে গেলে ইহকাল পরকাল দুই-ই বিনষ্ট হবে।[১৩৭] সুতরাং শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের সামগ্রিক চিত্রে তেমন কোন পরিবর্তন আসে নি।

তবে এটা সত্য যে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মুসলমানদের মধ্য থেকে গুটিকয়েক যাঁরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সে সব মুসলিম তরুণ অমুসলিম শিক্ষকদের প্রভাবে শিক্ষিত হয়েও ইসলামী ভাবধারা ও ইসলামী আচরণ ও ঐতিহ্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, উদাসীন বা বিরোধী হয়ে পড়েন নি। এতে মুসলিম সমাজের আশংকা সম্ভবত কিছুটা দূর হয়েছিল। তাছাড়া, কর্মক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম তরুণগণ ভালো চাকরি, অর্থ ও মান সম্মান অর্জনের সুযোগ লাভ করায় ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের বিরোধিতার তীব্রতা ধীরে, অতি ধীরে প্রায় অজ্ঞাতসারে হ্রাস পেতে থাকে। আবার কেউ কেউ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার জন্য যথেষ্ট কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন এবং কেউ কেউ ইংরেজী ভাষায় ইসলামের শিক্ষা, সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।[১৩৮]

১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা মুসলমানদের আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় 'আরবী বা ফারসীর কোন স্থান ছিল না। তবে সত্য বটে যে, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের পর থেকেই মুসলমানরা বাধ্য হয়ে কিছু কিছু করে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। যদিও বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান সমাজে শিক্ষা-দীক্ষায় সাড়া জাগানো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় নি। কিন্তু এটা ঠিক যে, উনবিংশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে মাদরাসা ও মুসলিম শিক্ষার উন্নয়ন কল্পে কতিপয় কমিটি গঠিত হয়, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে অনেক পত্র বিনিময় হয় এবং সরকার বেশ কয়েকটি রেজিলিউশন, ডেসপ্যাচ ও মিউনট জারী করেন। এতে অনেক মূল্যবান সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মাদরাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও অংক, ভূগোল এবং দেশীয় ভাষা শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মুসলমান ছাত্রদের জন্য অনেকগুলো বৃত্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়।[১৩৯] এসব ব্যবস্থাও মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে কিছুটা সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। তবে সার্বিক পরিস্থিতির তেমন কোন উন্নতি সাধিত হয় নি। ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা সম্পর্কে মুসলমানদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মাদরাসা শিক্ষায় সংস্কার সাধনের চিন্তা ভাবনা, সামাজিক চড়াই-উৎরাইর মধ্য দিয়েই উনবিংশ শতাব্দী গত হয়। পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই মাদরাসা ও মুসলিম শিক্ষায় সত্যিকার জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। এ জাগরণের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে নওয়াব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫), নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদা (১৮৬২-১৯২২), নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯), শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) ও সর্বোপরি শামসুল 'উলামা আবূ নসর ওহীদ (১৮৭২-১৯৫৩) প্রমুখের অবদানের কথা বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

---

১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৪১।

১৩৮. আবদুল হক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১-৪২।

১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬; ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য,* ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫, ২য় সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ শাসনামলে ইসলামী শিক্ষার অবস্থা

মুসলিম শাসনামলে দেশের শহরে, নগরে বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার জন্য অসংখ্য মক্তব মাদরাসা ও শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ম্যাক্স মুলারের দাবী মতে ১৭৫৭ সালে শুধু বাংলাদেশেই আশি হাজার বিদ্যালয় ছিল। স্যার জন্য এডামের রিপোর্ট অনুযায়ী তখন বাংলা ও বিহারে একলক্ষ স্কুল ছিল। প্রতি ৪০০ জনের জন্য গড়ে একটি ও প্রায় প্রতিটি গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় ছিল।[১৪০]

এডাম পাক-ভারত-বাংলাদেশে আট রকম বিদ্যালয়ের কথা বলেছেন। তিনি "আরবী, নতুন ও পুরাতন ফারসী মাদরাসা, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত এবং বালিকা বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মুর্শিবাদ, বীরভূম ও দক্ষিণ বিহার জেলায় প্রতি ২৫০ জনের জন্য গড়ে একটি করে বিদ্যালয় ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪১] তাঁর এ বিবরণী প্রাক-বৃটিশ যুগের অগ্রসর শিক্ষা ব্যবস্থা ও জীবন পদ্ধতির এক উজ্জ্বল নিদর্শনের সাক্ষ্য।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করার পর যে সীমাহীন অত্যাচার চালাতে থাকে, তার ফলে মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষা ব্যবস্থা। বলা যায় ইংরেজ শাসনের প্রথম এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত মুসলিম জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের প্রায় সমস্ত জমিদারী হিন্দুদের দখলে চলে যায়। ফলে শিক্ষা সংস্কৃতিকে তরতাজা রাখা আর মুসলমানদের সহজ সাধ্য থাকল না। কারণ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তাদের সাহায্য সহযোগিতায় চলত।[১৪২]

১৮৩৫ সালে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করে আইন পাশ করা হয় এবং ১৮৩৭ সালে পহেলা এপ্রিল থেকে সরকারিভাবে ইংরেজীর ব্যবহার শুরু হয়। ইংরেজরা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও ইংরেজী ভাষার প্রচলন করে।

ইংরেজ কোম্পানী, বৃটিশ মিশনারী সবাই বরাবরই মুসলমানদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিল। তারা মুসলমানদের দুশমন মনে করতো এবং হিন্দুদের মনে করতো বন্ধু। মুসলমানদের ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাৎ করে সে অর্থ দিয়েও ইংরেজ বেনিয়ারা হিন্দুদের শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।[১৪৩]

১৮৫৩ সালে পার্লামেন্টের সাব-কমিটিতে প্রদত্ত বিবরণে বলা হয়েছিল দেশের বর্তমান প্রচলন এবং রেওয়াজ অনুযায়ী মুসলমানরা আমাদেরকে অভিশপ্ত কাফির এবং বিধর্মীদের দলভুক্ত মনে করে। তারা আরও মনে করে যে, আমরা বলপূর্বক একটি সমৃদ্ধশালী ইসলামী সাম্রাজ্যে আধিপত্য কায়েম করে বসেছি। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ আমরা হরণ করেছি। এমতাবস্থায় তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের অর্থ দাঁড়াবে তাঁদের মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়া।[১৪৪]

ইংরেজ বণিকদের পেছনে পেছনে মিশনারীরাও এদেশে আগমন করে এবং খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত হয়। কোম্পানী শাসন প্রবর্তনের পর থেকেই মিশনারীরা উৎসাহী হয়ে ওঠে। তারা ভারতে মিশনারী কার্যের সুবিধার্থে ইংরেজী শিক্ষা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। মিশনারীদের মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষার আকর্ষণ বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো হয়। খ্রীস্টান হলেই চাকরি পাওয়া মিশনারীদের এ প্রলোভনে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার বাড়তে

---

১৪০. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও এ এস এম আলাউদ্দীন, *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামী এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৯, পৃ ৪৯।

১৪১. অধ্যাপক মুহাম্মদ মোমিন উল্লাহ, *শিক্ষার ইতিহাস*, ঢাকা : রহমান আর্ট প্রেস, ১৯৮০, পৃ ৩৪১-৩৪২।
শিক্ষার ইতিহাস, পৃ ৩৪১-৩৪২।

১৪২. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও এ এস এম আলাউদ্দীন, প্রগুক্ত, পৃ ৫০; সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়া, *ওলামায়ে হিন্দ-কা শানদার মাজী*, দিল্লী : কিতাবিস্তান, তাবি, পৃ ৫৮১।

১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৫১; এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য দ্র. মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস কাসেমী সংকলিত, *সাইয়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানীর রচনাবলী*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৩।

১৪৪. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ ৭৪-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

থাকে।[১৪৫] এ ছাড়াও জনগণের মনমানসিকতার পরিবর্তন এবং বিপ্লবী চেতনা দমনও পাশ্চাত্য শিক্ষা চালুর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৩১ সালের শিক্ষা কমিটির রিপোর্টে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়, এ শিক্ষার প্রসার হলে ক্রমান্বয়ে তারা আমাদের আর জবরদস্তী শাসনকারী হিসেবে মনে করবে না। বরং তারা আমাদের বন্ধু এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জ্ঞান করবে। মনে করবে তাদের হিফাজতে থেকে আগামীতে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারব। বৃটিশদের প্রবর্তিত এ শিক্ষার ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য ছিল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন ইউরোপীয় ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন এবং এ দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নির্ভর করে গড়ে তোলা।[১৪৬] শিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজদের এ নীতি ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ১৭৮০ সালে ইংরেজদের সহায়তায় 'আলীয়া মাদ্রাস প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর তারা মুসলিম মিল্লাতকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দেয়। একভাগ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজদের শিক্ষা দর্শন গ্রহণ করে সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করবে। অপর দল মাদরাসায় পড়ে আখিরাতে যাওয়ার আশায় অপেক্ষা করবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী শিক্ষার প্রতি জনগণের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে যায়। এমনকি ইসলামী শিক্ষার মূল বুনিয়াদ মক্তবগুলোর সংখ্যাও কমতে শুরু করে। নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে খুব সহজেই এ বাস্তবতা উপলব্ধি করা যায়।

ছাত্র সংখ্যা[১৪৭]

সন	মকতব	অন্যান্য প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট
১৮৯১-৯২	৭০,৩৬০	২৩,২৮০	৯৩,৬৪০
১৮৯৬-৯৭	৫৯,৭৯০	১৯,৬৭৫	৭৯৪৬৫
১৯০১-০২	৬৩,০৯৯	২১,৭৩৬	৭৪,৮৩৫

বঙ্গে দরসে নিযামী মাদরাসা

মুসলমানগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ জয় করেছেন এবং বিজিত দেশে শিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দেন। বাংলাদেশ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শাসক ও উলামা সম্প্রদায় বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেন। প্রথম মুসলমান বঙ্গ বিজয়ী মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী সম্পর্কে ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ বলেন, যে স্থানে এখন লখনৌতি অবস্থিত সেখানে (অর্থাৎ লখনৌতিতে) তিনি (মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী) রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ দেশের বিভিন্ন অংশ নিজের অধীনে আনয়ন করে তিনি প্রত্যেক খিত্তায় (শহরে) খোতবা পাঠের ব্যবস্থা করেন এবং মুদ্রাজারী করেন। তাঁর এবং তাঁর আমীরদের প্রশংসনীয় উদ্যোগের দ্বারা মসজিদ, মাদরাসা এবং খানকা সমূহ তৈরী হয়।[১৪৮] সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইওজ খিলজী সম্পর্কে মিনহাজ বলেন, ঐ দেশে (বাংলায়) তাঁর মহৎ কাজের অনেক নিদর্শন রয়েছে। তিনি জামে মসজিদ এবং অন্যান্য মসজিদ তৈরী করেন এবং 'উলামা মাশায়েখ ও সৈয়দদের মত পূণ্যবান লোকদের বেতন ভাতা দান করেন। আনুমানিক ১২০০ সাল থেকে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত প্রায় পৌনে চারশত বৎসর কালকে সুলতানী আমল বলা হয়। এ সময়ে নির্মিত কোন মাদরাসা এখন আর টিকে নেই। কালের কুটিল চক্রে এগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। বাংলাদেশের আবহাওয়াই এগুলো ধ্বংস হওয়ার প্রধানতম কারণ। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ শিলালিপি আবিস্কৃত হওয়ার ফলে এবং কিছু কিছু লিখিত প্রমাণের দ্বারা আমরা কয়েকটি মাদরাসার অস্তিত্বের কথা জানতে পারি।

---

১৪৫. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও এ এস এম আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪।

১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫।

১৪৭. A K M Ayub Ali, History of traditional Islamic Education in Bengal, Ibid, p 78.

১৪৮. ড. আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

এর পরে আসে সোনার গাঁও-এ মাওলানা শায়খ শরফ উদ্দীন আবূ তাওয়ামার মাদরাসা। মাওলানা আবূ তাওয়ামা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সোনার গাঁও-এ আগমন করেন এবং মাদরাসা স্থাপন করেন।[১৪৯] শিলালিপি সূত্রে বেশ কয়েকখানি মাদরাসার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ কর্তৃক নির্মিত আর একখানি মাদরাসার কথা জানা যায়। এই সুলতানের ৮৩৫ হিজরীর (১৪৩২) সুলতানগঞ্জ শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু শিলালিপির ভাষা দৃষ্টে আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এই মসজিদ সংলগ্ন একখানি মাদরাসাও ছিল।[১৫০] সুলতান 'আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এর দুখানি শিলালিপিতে মাদরাসা নির্মাণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।[১৫১] ১৩১৩ সালের শিলালিপিতেও মাদরাসা নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এই মাদরাসা দার-উল-খয়রাত নামে পরিচিত। ইহা জাফর খানের আদেশে নির্মিত হয়।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সুলতানী আমলের মাদরাসাসমূহের বা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না, তবে শিলালিপির এবং অন্যান্য সূত্রে যা কিছু তথ্য পাওয়া যায়, তাও অত্যন্ত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই সব তথ্যে সুলতানী আমলের মাদরাসা শিক্ষার এবং মাদরাসা সমূহের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। সুলতানী আমলের বাংলাদেশের মাদরাসা সমূহের পাঠ্যসূচীর বিষয়ে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। জাফর খানের শিলালিপিতে মাদরাসা স্থাপনের উদ্দেশ্য হিসেবে لتدريس علم الشرع এবং لاظهار دين الله আলা-উদ্দীন হোসেন শাহের প্রথম শিলালিপিতে لتدريس علوم الدين وتعليم علم اليقين বলা হয়েছে।

উপরোক্ত শিলালিপিগুলো পাঠে মনে হয়, মাদরাসাগুলো উচ্চতর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে 'ইলমে দ্বীন বা 'ইলমে শরা শিখে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত আলিম-এ পরিণত হতে পারতেন। এগুলো ছাড়াও নিম্নস্তরে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আরো যে ফোরকানিয়া মাদরাসা বা মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।[১৫২]

দরসে নিযামী-এর সূচনা

ইসলামের সূচনালগ্ন হতেই চলে আসছে দরসে নিযামী শিক্ষার ধারা এর নামকরণের সূত্রপাত হয় দ্বাদশ শতকে উপমহাদেশে সুলতানী শাসনামলে। এ যুগে মোল্লা নিজামুদ্দীন সাহলুবী (মৃ ১১৬১) ছিলেন একজন স্বনাম ধন্য আলেম ও বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি।[১৫৩] এ সময়ে তিনি ইসলামী শিক্ষার যে মজবুত ভিত্তি রচনা করেছেন কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পর আজও তার ধারা বিদ্যমান রয়েছে।[১৫৪] মূলত শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি সুদূর

---

১৪৯. মাওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ*, ঢাকা : সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯২, পৃ ১৮৫; Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal*, 2nd edition. p 96-100.

১৫০. Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol 1. 1963. p 55-66.

১৫১. মাওলানা মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬।

১৫২. ড. আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৬।

১৫৩. মোল্লা নিজামুদ্দীন সাহলুবী ফিরিঙ্গী মহল্লীর পিতার নাম মোল্লা কুতুবুদ্দীন সাহলী। মোল্লা কুতুবুদ্দীন সাহলী গ্রামে 'উসমানী সুয়ুখদের সাথে বাস করতেন। একবার ক্ষেতে পানি দেয়ার ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হওয়ায় 'উসমানীয়া রাতে এসে উক্ত আনসারী মোল্লা কুতুবুদ্দীনকে শহীদ করে দেয়। মোল্লা সাহেবের চার সন্তান ছিল। উসমানীরা তার ঘর ও জ্বালিয়ে দেয় এ কারণে বাদশা আওরঙ্গজেব লাক্ষ্ণৌর নিকটে একটি খালি স্থান 'যেখানে পূর্বে কোন সময় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাস করতো' - মোল্লা শহীদের বংশধরদেরকে দান করেন। উপমহাদেশের এই একমাত্র খান্দান যাঁদের মধ্যে প্রায় দু'শত বছর শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বংশানুক্রমে চলে আসে। এ বংশের বহু হাজার 'উলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদ জন্মগ্রহণ করেন। আর শিক্ষা বিস্তারের দিক দিয়ে উপমহাদেশের প্রত্যেক প্রদেশে ও জিলায় এ বংশের অবদান ও উপকারিতা অসংখ্য লোক প্রত্যেক যুগে গ্রহণ করে আসছে।
দ্র. *মাদরাসা-ই- আলিয়া ঢাকা : অতীত ও বর্তমান*, ১৭৮০-১৯৮০, ঢাকা : মাদরাসা-ই-আলিয়া, ১০৮১, পৃ ২৬।

১৫৪. সে যুগের পাঠ্যসূচী : মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা : *অতীত ও বর্তমান* দেখা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসারী প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর সুযোগ্য ওস্তাদগণের সূত্রে, বিশেষ করে মীর ফতহুল্লাহ সিরাজীর[১৫৫] সূত্রে লাভ করেছিলেন 'ইলমে মাকুলিয়াতের জ্ঞান। মীর ফতহুল্লাহ থেকে মোল্লা নিজামুদ্দীন পর্যন্ত মধ্যবর্তী ছয়জন ওস্তাদ। তাঁরা সকলেই ছিলেন হিকমত এবং ফালসাফা শাস্ত্রে দক্ষ পণ্ডিত।[১৫৬] ফলে মোল্লাহ নিজামুদ্দীনের প্রণীত পাঠ্যসূচীতে এ দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, দরসে নিজামী মাদরাসার শিক্ষা পদ্ধতিতে মীর ফতহুল্লাহ সিরাজীর জ্ঞানের প্রভাব ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়ে মোল্লা নিজামুদ্দীনের আমলে তার নামানুসারে এ পদ্ধতির নাম হয়েছে 'দরসে নিজামী'।[১৫৭]

১৯২২ সালে মিশর থেকে প্রকাশিত 'মুবহুল আশা' গ্রন্থের বর্ণনানুসারে রাজধানী শহরে দিল্লীতেই এক হাজার (দরসে নিজামী) মাদরাসা ছিল।[১৫৮] প্রফেসর মার্কমিলসের বর্ণনানুসারে বৃটিশ শাসনের পূর্বে শুধু বাংলাদেশেই ৮০ হাজার মাদরাসা ছিল। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কুট ষড়যন্ত্রের ফলে এই সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়েছিল। শুধুমাত্র দিল্লীর রাহিমিয়্যার মত মাত্র দু'চারটি প্রতিষ্ঠান স্ব-উদ্যোগে টিকে থাকলেও ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর এগুলোকেও বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে ভারতে মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষার আর কোন প্রতিষ্ঠানই অবশিষ্ট থাকলো না।[১৫৯] তবে ইংরেজগণ নিজেদের অনুগত আমলা তৈরীর উদ্দেশ্যে ১৭৮১ সালে কলকাতায় 'আলীয়া মাদরাসা স্থাপন করে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৭৯০ পর্যন্ত পাঠ্য তালিকায় দরসে নেজামিয়াকেই অনুসরণ করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নেসাব থেকে তাফসীর ও হাদীস বিহীন দ্বীনি শিক্ষা চালু রাখে। ১৯০৮ সালে দীর্ঘ ১১৮ বছর পর টাইটেল শ্রেণীর নামে পুনরায় তাফসীর ও হাদীস শিক্ষা চালু করা হয়। সরকার পরিচালিত এ মাদরাসার নিয়মনীতি অনুযায়ী তখন বঙ্গদেশে আরো কিছু সরকারি মাদরাসা চালু হয়েছিল। ঢাকার প্রসিদ্ধ মুহসিনিয়া মাদরাসা, হুগলী মাদরাসা ইত্যাদিই তখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অবশ্য লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পর এসব সরকারী মাদরাসাগুলিই তখন মুসলমানদের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে অবশিষ্ট থাকে।[১৬০] কিন্তু দরসে নেজামীর মাধ্যমে ওহীর জ্ঞান ও মহানবী সা.-এর শিক্ষার আলোকে খোদাভীরু আদর্শ মানুষ সৃষ্টির যে প্রয়াস চলছিল তা তাৎক্ষণিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এ বিষয়টি তদানিন্তনকালের জ্ঞানানুরাগী সকল 'আলিম 'উলামাদেরকেই ভাবিয়ে তুলেছিল নিঃসন্দেহে। ভারতে ইসলামী শিক্ষার (দরসে নিজামী) ধারাকে টিকিয়ে রাখার বিকল্প কি পন্থা অবলম্বন করা যায় এই চিন্তা তখন সকলের ভাবনার জগৎকে আন্দোলিত করেছিল। এ থেকেই উৎপত্তি হয় দেওবন্দ মাদরাসার ধারণা।[১৬১]

দেওবন্দ মাদরাসার সূচনা

দেওবন্দ এর দেওয়ান মহল্লায় ছিল হযরত কাশেম রা. (মৃঃ ১৮৮০) নানূতবী এর শ্বশুরালয়। তিনি এখানে বেড়াতে আসলে সংলগ্ন ছাত্তা মসজিদের ইমাম হাজী 'আবিদ হোসাইন রা. (মৃঃ ১৩২৮ হি./ ১৯২২) এর সঙ্গে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থান করতেন। হযরত নানূতবী তাঁর কাঙ্খিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালালে হাজী 'আবিদ হোসাইনসহ স্থানীয় বুজুর্গগণ তাতে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। হযরত নানূতবীর পরামর্শ অনুযায়ী

---

১৫৫. মীর ফতুহুল্লাহ ছিলেন তাঁর সমসাময়িক যুগে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের ইমাম, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬।

১৫৬. শিক্ষকদের ধারাবাহিক তালিকা : মীর ফতহুল্লাহ সিরাজী>মোল্লা আবদুস সালাম লাহুরী>মোল্লা আবদুস সালাম দেউভী>মোল্লা দানিয়াল চৌরাসী>মোল্লা কুতুবুদ্দীন সাহলী>আমানুল্লা বেনারসী>মোল্লাহ কুতুবুদ্দীন শামস আবাদী>মোল্লা নিজামুদ্দীন সাহলভী/ ফিরিঙ্গী মহল্লী (দরসে নিযামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা)। দ্র. মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা : অতীত ও বর্তমান, পৃ ২৭।

১৫৭. আবদুস সাত্তার তারীখ-ই মদ্রাসা-ই-আলিয়া, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬-২৭।

১৫৮. সাইয়্যেদ মাহবুব রেজবী, *তারিখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, দেওবন্দ : ইদারা ইহতিমাম দারুল 'উলুন, ১৯৯২, ১ম খ, পৃ ৭৪।

১৫৯. আবুল ফাত্তাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান*, ঢাকা : আল আমিন রিসার্চ একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ ১৩৬-১৩৭।

১৬০. মাওলানা মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬।

১৬১. আবুল ফাত্তাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, পৃ ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

হাজী 'আবিদ রা. সর্বসাধারণের নিকট থেকে চাঁদা গ্রহণের উদ্যোগ নেন। প্রথম যাত্রায়ই আশাতীত সুফল দেখা দেয়।[১৬২] ফলে মাদরাসা স্থাপনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়। হযরত নানূতবী মীরাঠ থেকে মাওলানা মোল্লা মাহমুদ সাহেবকে ১৫ টাকা বেতনে শিক্ষক নিয়োগ পূর্বক দেওবন্দে পাঠিয়ে দেন। এভাবে অবশেষে ১৮৬৬ সালের ৩০ মে বুধবার ছাত্তা মসজিদের বারান্দায় একটি ডালিম গাছের নিচে মোল্লা মাহমুদ সাহেব তাঁর সর্বপ্রথম ছাত্র মাহমুদুল হাসান (শায়খুলহিন্দ)-কে সামনে নিয়ে দারুল 'উলূমের সর্বপ্রথম সবক উদ্বোধন করেন।[১৬৩] তখন থেকে দেওবন্দে ''আরবী মাদরাসা' নামে হযরত নানূতবীর গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। অধ্যাপক ড. শফিকুল্লাহর এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, 'ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের শাসন ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ দেশে মুসলমানগণের শিক্ষাই ছিল ইসলামী শিক্ষা। অমুসলিমদের শিক্ষা ছিল তাদের ধর্মানুসারে। উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর তারা এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ তারা বঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার গোড়াপত্তন করে। স্যার সৈয়দ আহমদ এ সময় আলীগড় মোহামেডান কলেজ স্থাপন করেন। এ সময়ই আল্লামা কাসেম নানূতবী (রা.) সহ কিছু সংখ্যক আলেমে দ্বীন নেযামিয়া মাদরাসার অনুকরণে দেওবন্দ মাদরাসা স্থাপন করেন।'

দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছয় মাস পরে সাহারানপুর ও অন্যান্য অঞ্চলেও এ নতুন পরিকল্পনা বাস্ত বায়িত হতে থাকে। মাদরাসায় শুরুর বছরে প্রায় ২১ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। বছরের শেষ প্রান্তে শিক্ষার্থীদের এই সংখ্যা ৭৮ জনের কোটায় গিয়ে পৌঁছে।[১৬৪]

দেওবন্দ মাদরাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দেওবন্দ মাদরাসার মূল গঠনতন্ত্রে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

১. এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিকতা সৃষ্টি এবং একটি ব্যাপকতার শিক্ষা সিলেবাসের মাধ্যমে শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন করে তোলা। শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করণের মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করা।

---

১৬২. একদিন ছাত্তা মসজিদের ইমাম হাজী আবিদ হুসাইন ফজরের নামাযান্তে ইশরাকের নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে মুরাকাবা রত ছিলেন। হঠাৎ তিনি ধ্যানমগ্নতা ছেড়ে দিয়ে নিজের কাঁধের রুমালের চারকোণ একত্রিত করে একটি থলি বানালেন এবং তাতে নিজের পক্ষ থেকে তিন টাকা রাখলেন। অতঃপর তা নিয়ে তিনি রওনা হয়ে গেলেন মাওঃ মাহতাব আলীর কাছে। তিনি সোৎসাহে ৬ টাকা দিলেন এবং দু'আ করলেন, মাওলানা ফজলুর রহমান দিলেন ১২ টাকা, হাজী ফজলুল হক দিলেন ৬ টাকা। সেখান থেকে উঠে তিনি গেলেন মাওলানা জুলফিকার আলীর নিকট; জ্ঞানানুরাগী এই ব্যক্তিটি দিলেন ১২ টাকা, সেখান থেকে উঠে এই দরবেশ সম্রাট 'আবুল বারাকাত' মহল্লার দিকে রওনা হলেন, এভাবে দুইশত টাকা জমা হয়ে গেল এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনশত টাকা জমা হয়ে গেল। দ্র. আবুল ফাত্তাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭, *সাইয়্যেদ মাহবুব রেজবী*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ ১৫০)।

১৬৩. তারিখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ' গ্রন্থের ভূমিকায় একথা উল্লেখ আছে যে, আকাবিরে সিত্তাহ পরস্পর পরামর্শ করে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর একে অপরকে বলতে লাগলেন, এরূপ প্রতিষ্ঠান বানানোর প্রয়োজনীয়তা আমি দীর্ঘদিন যাবত অনুভব করে আসছিলাম, কেউ বললেন, স্বপ্নে আমাকে এরূপ দেখানো হয়েছিল। আবার কেউ বললেন কাশ্ফের মাধ্যমে আমিও এমনটি অনুভব করেছিলাম। এতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এ কাওমী মাদরাসা হচ্ছে খালিস ইলহামী মাদরাসা। শুধু তাই নয়, পূর্বেকার বুজুর্গানে দ্বীন থেকেও অনুরূপ ইশারা বিদ্যমান রয়েছে। একদা হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. দেওবন্দ এলাকা হয়ে সীমান্ত প্রদেশের দিকে যাচ্ছিলেন, মাদরাসার এ স্থানটিতে পৌছার পর তিনি বলছিলেন, 'এ স্থান হতে আমি ইলমের সুঘ্রাণ পাচ্ছি'। এমনিভাবে এর ইমারতও ইলহামী। মাদরাসার প্রথম ইমারত তথা নওদারার (নতুন ঘর) ভিত্তি স্থাপনের সময় মাটি কেটে নির্ধারিত স্থানে ভিত্তি রাখা হয়। ঐদিনই রাত্রে মুহতামিম হযরত মাওলানা শাহ্ রফী উদ্দীন রহ. স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. তাশরীফ এনেছেন এবং তিনি তাকে বর্তমান নওদারার স্থানটি লাঠি দিয়ে চিহ্নিত করে দেন। তৎপর তিনি তাকে বললেন, পূর্বের জায়গা যথেষ্ট নয়। এ স্থানে ভিত্তি স্থাপন কর। ভোরে তিনি ঐ স্থানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর লাঠি মুবারকের স্পষ্ট দাগ দেখতে পান। দ্র. *মাসিক তাকবীর*, ১৯৯৮, পৃ ৩০; *তারিখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, পৃ ৪৬।

১৬৪. তাহরীকে দেওবন্দ, পৃ ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

২. আ'মাল ও আখলাকের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনে ইসলামী ভাবাদর্শের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো।

৩. ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সমাজের চাহিদার নিরিখে যুগ সম্মত কর্মপন্থা অবলম্বন এবং খায়রুল কুরুনের (সাহাবীগণের যুগের) ন্যায় আখলাকী ও আমলী চেতনা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া।

৪. সরকারী প্রভাব মুক্ত থেকে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখা।

৫. দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সেগুলোকে দারুল উলূমের সাথে সংশ্লিষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[১৬৫]

সরকারী অনুদান ছাড়াই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং ইসলামী তাহজীব ও তামুদ্দুনকে টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি তৎকালীন 'আলিমগণ নিজেদের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের যে অভিনব ধারার সূচনা করলেন, তা জাতির ইতিহাসকে এক নতুন ধারায় পরিচালিত করে। এ ব্যাপারে যে ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিত্ব অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদেরকে বলা 'আকাবিরে সিত্তা' বা প্রতিষ্ঠাতা ছয় মনীষী। তাঁদের নাম-

নাম	জন্ম তারিখ	প্রতিষ্ঠাকালে বয়স	মৃত্যু তারিখ
১. মাওলানা যুলফিকার আলী	১৮১৯ খ্রী./১২৩৭ হি.	৪৫ বৎসর	১৯০৪ খ্রী./১৩২২ হি.
২. মাওলানা ফজলুর রহমান	১৮২৯ খ্রী./১২৪৭ হি.	৩৫ বৎসর	১৯০৭ খ্রী./১৩২৫ হি.
৩.মাওলানা কাসেম নানুতবী	১৮৩২ খ্রী./১২৪৮ হি.	৩৪ বৎসর	১৮৮৪ খ্রী./১৩০২ হি.
৪. হাজী আবেদ হুসাইন	১৮৩৩ খ্রী./১২৪৯ হি.	৩৩ বৎসর	১৯১২ খ্রী./১৩২৮ হি.
৫. মাওলানা রফী উদ্দীন	১৮৩৪ খ্রী./১২৫০ হি.	৩২ বৎসর	১৯১২ খ্রী./১৩২৮ হি.
	১৮৩৬ খ্রী./১২৫২ হি.	৩০ বৎসর	১৮৯০ খ্রী./১৩০৬ হি.[১৬৬]

বাংলাদেশে দারুল 'উলূম দেওবন্দের আদর্শ, উদ্দেশ্য, নিসাব ও শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসরণে স্থাপিত সর্বপ্রথম কাওমী মাদরাসা হল 'মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসা'। চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাটহাজারী থানায় ১৯০১ সালে এই মাদরাসা স্থাপিত হয়। তারপর থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও একই প্রক্রিয়ায় আরো অসংখ্য মাদরাসা স্থাপিত হয়। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এ দেশে প্রায় ৪৪৩টি কাওমী মাদরাসা স্থাপিত হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রায় ৫১টি ছিল দাওরা হাদীস মাদরাসা। সে মতে, ১৯২০ সালে ইসলামিয়া আরাবিয়্যা জিরী মাদরাসা, ১৯২৫ সালে ঢাকা ইসলামিয়া মাদরাসা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদরাসা ১৯৩৬ সালে আশরাফুল 'উলূম বড় কাটরা মাদরাসা ঢাকা, ১৯৪৪ সালে চট্টগ্রাম চারিয়া কাসেমুল 'উলূম মাদরাসা, ১৯৪৬ সালে জামিরিয়্যা কাসেমুল 'উলূম মাদরাসা পটিয়া, ১৯৪৮ সালে হুসাইনিয়া আরাবিয়্যা রানাপিং মাদরাসা সিলেট, ১৯৪৯ সালে দারুল 'উলূম খাদেমুল ইসলাম গাওহার ডাঙ্গা মাদরাসা কুমিল্লা, ১৯৫০ সালে 'আযীযুল 'উলূম বাবু নগর মাদরাসা চট্টগ্রাম, ১৯৫০ সালে জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ মাদরাসা ঢাকা, ১৯৫১ সালে আশরাফুল 'উলূম বালিয়া মাদরাসা মোমেনশাহী, ১৯৫৪ সালে দারুল 'উলূম কানাইঘাট মাদরাসা, ১৯৫৫ সালে জামেয়া এমদাদিয়া মাদরাসা কিশোরগঞ্জ, ১৯৫৮ সালে হোসাইনিয়া দারুল 'উলূম উলামা বাজার মাদরাসা নোয়াখালী, ১৯৫৯ সালে এজাযিয়া দারুল 'উলূম রেলওয়ে স্টেশন মাদরাসা যশোর, ১৯৬০ সালে মিফতাহুল 'উলূম মাদরাসা নেত্রকোনা ও ১৯৬২ সালে দারুল সালাম সোহাগী ময়মনসিংহ মাদরাসার প্রতিষ্ঠা লাভ বিশেষভাবে

১৬৫. আবুল ফাত্তাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪১; *সাইয়্যেদ মাহবুব রেজভী, প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪৩।

১৬৬. আবুল ফাত্তাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭-১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য। অতঃপর ১৯৬৪ সালের পরে এ সংখ্যা উত্তরোত্তর আরো বহুগুণে বৃদ্ধি লাভ করে। বর্তমানে ছোট বড় সকল কাওমী মাদরাসার সংখ্যা চার সহস্রের অধিক বলে ধারণা করা হয়।[১৬৭]

ইসলামী বিশ্বকোষ দেওবন্দ দারুল 'উলূম প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাওলানা কাশেম নানুতবী এ মাদরাসার জন্য আটটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়ে ছিলেন। এগুলিই উসূল-ই 'হাশত গানা' অর্থাৎ অষ্ট মূলনীতি রূপে প্রসিদ্ধ। বর্তমানেও ঐ মূলনীতি অনুসৃত হয়ে আসছে।[১৬৮] ধর্ম বিমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন ও সংস্কৃতির অনিষ্টকর প্রভাব হতে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির হিফাজতের ক্ষেত্রে বিশেষ আযাদী আন্দোলনে এই দারুল 'উলূমের অবদান অনস্বীকার্য।

শায়খুলহিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান (মৃ ১৯২০), শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (মৃ ১৯৫৭), হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহরানপুরী (মৃ ১৯২৭), হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর রহ. (মৃ ১৯৪৩), হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (মৃ ১৮১৫), হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (মৃ ১৯৪৯), কুতুবে আ'লম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (মৃ ১৯৫৭), শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা জাকারিয়া, হযরত মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী, মুফতী 'আজম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী (মৃ ১৯৭৬), হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ, হযরত মাওলানা আতাহার আলী (মৃ ১৯৭৬), হযরত মাওলানা শায়খুল হক ফরীদপুরী (মৃ ১৩৮৮), হযরত মাওলানা তাজুল ইসলাম, হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ প্রমুখ ওলামা মাশায়িখ, শিক্ষাবিদ, লেখক, সমাজ সংস্কারক ও রাজনীতিক এই দারুল 'উলূমেরই উজ্জ্বল কতিপয় রত্ন।[১৬৯]

'আলীয়া মাদরাসা ও এর ক্রমবিকাশ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৭৫৭ সাল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজয় বরণ করেন। পরাজিত মুসলিম শাসক ও নাগরিকদের উপর নেমে আসে বিজয়ী ইংরেজদের জুলুম ও অত্যাচার নিষ্পেষণ। ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি ও তাহজীব তমদ্দুনের উপর নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। বিলুপ্ত হতে থাকে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রগুলো। দু'এক যুগের মধ্যেই সকল মসজিদ ও মাদরাসার লালনক্ষেত্র ওয়াক্ফ স্টেটগুলো রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেহাত হতে থাকে। ফলে শান্তিকামী মুসলিম জনতা কাঙ্গাল শ্রেণীতে পরিণত হয়।[১৭০]

এ সময় মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজনে ইংরেজদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না। ফলে ১৭৮০ সালে কলকাতার কতিপয় মুসলিম শিক্ষাবিদ ও নাগরিকের এক প্রতিনিধি দল তৎকালীন ভারতের বড়লাট স্যার ওয়ারেন হেস্টিংস এর সাথে সাক্ষাত করেন। এ সাক্ষাতকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বয়ং লর্ড হেস্টিংস এর জবানীতে পেশ করা যেতে পারে।

> ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল আমার সাথে সাক্ষাত করে এবং আমাকে অনুরোধ করে যে, প্রেসিডেন্সিতে মোল্লা মাজদুদ্দীন[১৭১] নামক জনৈক ব্যক্তিকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে রাখার জন্য আমি যেন সচেষ্ট হই, যাতে এখানকার মুসলমান ছাত্ররা প্রচলিত ইসলামী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে। এ প্রতিনিধি দল আমাকে অবহিত করে যে, এই ব্যক্তি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ বুৎপত্তি সম্পন্ন, এ ধরনের গুণীলোক সচরাচর পাওয়া যায় না।
>
> বলা বাহুল্য, কলকাতা এখন একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নগরপীঠ হিসেবে উন্নীত হয়েছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্য অঞ্চল হতেও লোকেরা এই শহরে চলে আসছে। অন্যান্য প্রাচ্য দেশীয় রীতি অনুযায়ী ভারত এবং ইরানের জন্য এটি খুবই গৌরবের বিষয় যে, এ ধরনের

---

১৬৭. *সাইয়্যেদ মাহবুব রেজবী*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭।

১৬৮. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাপ, ১৯৯২, ১৩তম খ, পৃ ৫৫২।

১৬৯. ইসলামী *বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, ১৩তম খ, পৃ ৫৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লোকেরা তাদের মানসিক উন্নতির প্রয়াস পাচ্ছে। ভারতে মোগল সাম্রাজ্য পতনের পর এখানকার শিক্ষা দীক্ষার অবনতি ঘটেছে এবং এই লুপ্ত প্রায় শিক্ষা পদ্ধতিকে পুনরুজ্জীবিত করার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

তাছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সরকারেরও এমন অসংখ্য অফিসারের প্রয়োজন যাদের প্রচুর যোগ্যতা রয়েছে। কেননা অভিজ্ঞতা হতে দেখা গিয়েছে যে, ফৌজদারী আদালতে এবং দেওয়ানী আদালতে এ সময় জজ নিয়োগের ব্যাপারে খুবই যোগ্যতা সম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য লোকের প্রয়োজন। এই গণ্যমান্য মুসলমান প্রতিনিধিরা মনে করেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি যথার্থ যোগ্য লোকদের মর্যাদা দিতে জানি। এই জন্য তাঁরা এই ধরনের আবেদন নিয়ে আমার নিকট এসেছে। মোটামুটিভাবে তাদের দরখাস্তের বিষয়বস্তু এটিই ছিল। সম্মিলিতভাবে পেশকৃত এই দরখাস্তের আসল বক্তব্য উদ্ধার করতে গিয়ে আমাকে স্মৃতি শক্তির উপর জোর দিতে হয়েছে।

আমি এ প্রতিনিধি দলকে এই আশ্বাস দিয়ে বিদায় করেছি যে, যতটুকু সম্ভব আমি এ ব্যাপারে চেষ্টা করব। আমি উক্ত মোল্লা মাজদুদ্দীনকে অতঃপর ডেকে পাঠাই এবং জিজ্ঞেস করি যে, মুসলমানদের আকাঙ্খা অনুযায়ী তিনি এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কিনা। তিনি আমার কথায় সম্মত হলেন এবং ১৭৮০ সালে প্রস্তাবিত মাদরাসার জন্য কার্যক্রম শুরু করে দিলেন।[১৭২]

আজ সারাদেশে যে ওল্ড-স্কীম মাদরাসা প্রচলিত রয়েছে তার আদি সুতিকাগৃহ হল এ কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসা যাকে ঘিরে সকল মাদরাসা কার্যক্রম যুগ যুগ ধরে আবর্তিত হয়ে আসছে, এভাবেই বৃটিশ আমলে ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

মোল্লা মাজদুদ্দীন ছিলেন দরসে নিজামী মাদরাসার ছাত্র, তাই তিনি কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসায় দরসে নিজামী মাদরাসার শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। যা যুগের পরিবর্তনশীল চাহিদার তাগিদে সময় সময় কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে আজও চালু রয়েছে। বিভিন্ন সংস্কার ও পরিবর্তনের পরও শিক্ষা সূচীর মুল কাঠামো দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত ছিল, বিশেষকরে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ-এর মত বিষয়গুলো আজও মূল ধারার উপর বিদ্যমান।[১৭৩] যেসব শিক্ষাসূচী ও পাঠ্যপুস্তক তখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত ছিল তা নিম্নরূপ :

নং	বিষয়	পাঠ্য পুস্তক
১.	সরফ (শব্দ প্রকরণ)	নিযান মুনশাইব, পাঞ্জেগাঞ্জ, যুবদাহ, সরফমীর, দাস্তরুল মুবতাদী ও ফসূলে আকবরী ইত্যাদি।
২.	নাহউ (বাক্য প্রকরণ)	নাহুমীর, শারহে মিয়াতে 'আমিল, হিদায়াতুন্নাহু, কাফিয়া ও শারহে যামী ইত্যাদি।
৩.	বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র)	মুখতারাসারুল মায়ানী, মুতাওয়াল ও তালখীসুল মিফতাহ ইত্যাদি।

---

১৭০. *মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

১৭১. *আবদুস সাত্তার*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪।

১৭২. *আবদুস সাত্তার*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫; ১৭৮০ সালে লর্ড হেস্টিংস-এর বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী-এর নিকট লিখিত উক্ত চিঠির পূর্ণ বিবরণ আবদুস সাত্তারের *তারীখ-ই মাদ্রাসা আলিয়া*-এর ২৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ পৃষ্ঠায় দেখা যেতে পারে।

১৭৩. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪; *মাদরাসা-ই আলীয়া, ঢাকা : অতীত ও বর্তমান* প্রাগুক্ত, পৃ ৫। A K M Ayub Ali, p 35.

Dhaka University Institutional Repository

নং	বিষয়	পাঠ্য পুস্তক
৪.	আদব ('আরবী সাহিত্য)	নুফহাতুল ইয়ামান, সাব'আহ মুয়াল্লাকাহ, দীওয়ানে হামাসা, দীওয়ানে মুতানাব্বী ও মাকামাতে হারীরী।
৫.	ফিক্‌হ (ইসলামী আইন)	কুদূরী, শারহে বিকায়াহ ও হিদায়াহ ইত্যাদি।
৬.	উসূলে ফিক্‌হ (আইন শাস্ত্রের নীতিমালা)	নূরুল আনওয়ার, তাওযীহ-তালবীহ ও মুসাল্লাম ইত্যাদি।
৭.	মানতিক (তর্কশাস্ত্র)	সুগরা, কুবরা, মীযান, আল-মানতিক, কুত্‌বী, শরহে তানবীর ও মোল্লা হাসান ইত্যাদি।
৮.	হিকমত (প্রাকৃতিক দর্শন)	মাযবুযী, সাদ্‌রা ও শামসে বাযেগা ইত্যাদি।
৯.	কালাম (ধর্মতত্ত্ব)	শরহে 'আকায়িদুন নাসাফী, খেয়ালী, মীরযাহিদ ও উসূলে 'আম্মাহ ইত্যাদি।
১০.	ফারাইয (অংশীদারিত্ব)	সিরাজী ও শরীফিয়াহ ইত্যাদি।
১১.	রিয়াযী ও হায়াত (গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা)	খুলাসাতুল হিসাব, তাহরীর-ই ওকলদিস, তাহরীর, শরহে চুগমানি, তাসরীহ ইত্যাদি।
১২.	মুনাযিরা (প্রতিযোগিতা)	রশীদিয়াহ
১৩.	তাফসীর (কুর'আনের ব্যাখ্যা)	তাফসীরে জালালাইন বায়দাবী।
১৪.	হাদীস (রাসূল সা.-এর বাণী)	বুখারী শরীফ, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও ইবন মাজা।

শিক্ষার মাধ্যম : কলকাতা মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যম ছিল মূলত 'আরবী ভাষা। তবে ক্ষেত্র বিশেষে উর্দু ও ফারসী ভাষা ব্যবহারেরও সুযোগ ছিল।[১৭৪]

'আলীয়া মাদরাসায় টাইটেল ক্লাস প্রবর্তন : মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নকল্পে ও কলকাতাবাসীদের দাবীর প্রেক্ষিতে আলো শিক্ষা কমিশনের সুপারিশক্রমে উচ্চ শ্রেণীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হিসেবে ১৯০৭ সালে কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসায় টাইটেল কোর্স খোলা হয়। টাইটেল ক্লাস খোলার পর প্রয়োজনীয় শিক্ষক সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। প্রথমে এ টাইটেল ক্লাসের মেয়াদ ছিল তিন বছর। এ তিন বছর মেয়াদী টাইটেল (কামিল) কোর্স সমাপ্তির পর পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে 'ফখরুল মুহাদ্দেসীন' ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। তখন কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেতে নম্বর লাগত ৬৬% এবং দ্বিতীয় শ্রেণী পেতে প্রয়োজন ৫০% নম্বর।[১৭৫]

'আলীয়া মাদরাসায় পরীক্ষা প্রবর্তন : ১৮২০ সাল পর্যন্ত সাধারণ পরীক্ষা গ্রহণের কোন নিয়ম এদেশে ছিলো না। মাদরাসা কমিটি শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। সর্বপ্রথম ১৮২১ সালে মাদরাসার শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষা কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। এ নতুন পদ্ধতির পরীক্ষা কেন্দ্র দেখার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ পদস্থ ও অনেক অফিসার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরীক্ষাকেন্দ্রে ভীড় করতে দেখা

---

১৭৪. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪।

১৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

যেতো। কারণ এ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি স্থানীয় লোকের কাছে ছিল তখনকার দিনে অপরিচিত ও এক নতুন ঘটনা।[১৭৬]

'আলীয়া মাদরাসায় ইংরেজী প্রবর্তন : ১৯২১ সালে গঠিত নওয়াব স্যার শামসুল হুদা কমিটির সুপারিশক্রমে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ১৯২৬ সালে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। মুসলমান শিক্ষার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মাদরাসা প্রাঙ্গনে এবং মাদরাসার অধ্যক্ষ মিঃ এ. এইচ হার্লের তত্ত্বাবধানে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তার উপরই প্রথমে উভয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার অর্পন করা হয়।[১৭৭]

'আলীয়া মাদরাসায় কোর্সের মেয়াদ : কলকাতা মাদরাসায় ভর্তির মেয়াদ ছিল তের থেকে পনের বছর। মক্তবে বা অন্য শিক্ষকের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থী মাদরাসার জুনিয়র বিভাগে হাশতুম বা অষ্টম জামায়াতে ভর্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হতো। সাত বছর শিক্ষা সমাপ্তির পর তাদের সনদ দেয়া হতো। ১৮৭১ সালে মাদরাসার শিক্ষাকাল আট বছর করা হয়। জুনিয়র শ্রেণী চার বছর এবং সিনিয়র শ্রেণী চার বছর। ১৮৭৭ সালে জুনিয়র শ্রেণীর শিক্ষাকাল পাঁচ বছর করা হয়, যা ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চালু থাকে।[১৭৮]

মাদরাসা শিক্ষা থেকে হাদীস, তাফসীর পরিহারের সিদ্ধান্ত : মাদরাসা শিক্ষাক্রম থেকে হাদীস, তাফসীর বাদ দিয়ে আইন প্রণীত হয়। যার ফলে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদরাসার বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। পরে শিক্ষার্থীদের জোর প্রতিবাদের মুখে বিষয়গুলো আবার শিক্ষা সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৭৯]

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড

১৯২৮ সালে সর্বপ্রথম 'বোর্ড অব সেন্ট্রাল এগজামিনেশন' নামে একটি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়। তৎকালীন সময়ে মাদরাসায় প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন শামসুল ওলামা খাজা কালামুদ্দীন আহমদ। তাকেই পদাধিকার বলে বোর্ডের প্রথম রেজিস্ট্রার ও সহ-সভাপতি হিসেবে সার্বিক প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া হয়। ওল্ড স্কীম মাদরাসাসমূহের পরীক্ষা পরিচালনার কতিপয় নিয়ম কানুন প্রবর্তন করা হয়। এ বোর্ডের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই মাদরাসা-ই-'আলীয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[১৮০]

---

১৭৬. *আবদুস সাত্তার*, প্রাগুক্ত, পৃ ৬১।

১৭৭. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬; পৃ ৭৩।

১৭৮. *তারিখে মাদরাসা আলিয়া*, পৃ ২৬।

১৭৯. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬।

১৮০. মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা : *অতীত ও বর্তমান*, প্রাগুক্ত, পৃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা সংস্কার কমিটি ও সুপারিশ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর সাত দশক পর্যন্ত শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য বহু কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছিল। তন্মধ্যে যে সব কমিশন মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছিল, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটির নাম এখানে প্রদত্ত হলো :

১. ১৮৮২ সালের ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার কমিশন

২. ১৯০৭-০৮ সালের আর্ল কনফারেন্স

৩. ১৯০৯-১০ সালের মাদরাসা কমিটি

৪. ১৯১০ সালের হার্লী কমিটি মোহামেডান এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি

৫. ১৯২১ সালের শামসুল হুদা কমিটি (বাটলার কমিটি)

৬. ১৯৩১ সালের মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি বা মোমেন কমিটি

৭. ১৯৩৮-৪০ সালের মাওলা বখশ কমিটি

৮. ১৯৪৭ সালের সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসাইন কমিটি

উপযুক্ত প্রত্যেকটি কমিটি ও কমিশন মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের নানাবিধ উপায় সুপারিশ করে। তন্মধ্যে ২য় নম্বরে বর্ণিত আর্লকমিটি ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন ও উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ৩য় ও ৪র্থ নম্বরে বর্ণিত কমিটির সুপারিশক্রমে মাদরাসা শিক্ষা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি পুরাতন মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতি ওল্ড স্কীম নামে পরিচিত। আর অপরটি শামসুল ওলামা আবূ নসর ওয়াহিদ (মৃঃ ১৯৫৩) কর্তৃক উদ্ভাবিত নিউ স্কীম মাদরাসা নামে অভিহিত। এতে 'আরবী শিক্ষার সাথে ইংরেজী, বাংলা, অংক ইত্যাদি বিষয়গুলো সাধারণ শিক্ষা সমমানে সংযুক্ত করা হয়।

সকল জুনিয়র ও সিনিয়ার ওল্ড স্কীম মাদরাসাকে এটা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এমনকি নিউ স্কীম মাদরাসাতে সরকারী সাহায্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করেও তার প্রতি ছাত্র-শিক্ষকদের আকৃষ্ট করা হয়। ফলে নিউ স্কীম মাদরাসার খবর অল্পদিনের মধ্যেই দেশের প্রত্যন্তাঞ্চলে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেশের মধ্য ও নিম্নবিত্ত ধর্মপ্রাণ লোকদের মধ্যে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হয়।[১৮১]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসা স্থাপনের পর থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই একের পর এক কমিটি তৈরী করে ইসলামী শিক্ষার সার্বিক সমস্যা সমাধান করার প্রয়াস চালিয়েছে, কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ নিরলস পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে মূল্যবান সুপারিশ প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার এসব সুপারিশ মালার সাথে একমত হতে পারে নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মুসলিম শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বৃটিশ সরকার ১৯০৭ সালে আর্ল কমিটি, শার্প কমিটি, নাথন কমিটি এবং ১৯১৫ সালে হার্ল কমিটি নিয়োগ করে মূল্যবান সুপারিশ জমা করে। কিন্তু এ সকল সুপারিশের আলোকে কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি, বরং ১৯২১ সালে পুনরায় নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদাকে প্রেসিডেন্ট করে আবারো একটা কমিটি গঠন করা। এতে বুঝা যায় ইংরেজ সরকারের এ কমিটির গঠন ছিল ইসলামী শিক্ষার প্রতি প্রহসন মাত্র। এছাড়া ইংরেজদের দোসর হিন্দুদেরও ইসলামী শিক্ষার প্রতি কোন সহানুভূতি ছিল না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্ট প্রণয়ন কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি এর স্কীম সমর্থনে উল্লেখ করা হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও মুসলমান ছাত্রদের সুবিধার্থে ইসলামী শিক্ষা অনুষদ থাকবে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৮১. প্রাগুক্ত, পৃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিষয় খোলার ব্যাপারে বিমাতাসুলভ আচরণ করে সেখানে মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষার পথ চিরতরে বন্ধ করে রাখে।[১৮২]

১৯১২ সালে ৪ এপ্রিল এক পত্রের মাধ্যমে ভারতের ইংরেজ সরকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান কর্মসূচীতেও যে কয়টি অনুষদ থাকবে তন্মধ্যে ইসলামী শিক্ষা হবে একটি আবশ্যিক অনুষদ। পরে মিঃ নাথান এ অনুষদকে বিভাগে রূপান্তরিত করেন আর এ বিভাগের সাথে জুড়ে দেয়া হয় 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগটিকে। পরে অবশ্য ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সে বিভাগটিকে পৃথক করে 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ নামে দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগে রূপদান করেন।[১৮৩]

১৯২১ সালে গঠিত শামসুল হুদা কমিটির সুপারিশ ক্রমে 'আলীয়া মাদরাসার শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর ফলে মাদরাসা শিক্ষার মান উন্নতি লাভ করে। এ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতেই কামিল শ্রেণীতে ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ্ গ্রুপ খোলা হয়।[১৮৪]

মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারী (মুমিন কমিটি) ১৯৩১-৩৪ সাল খান বাহাদুর মৌলভী আবদুল মোমেনের নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে বেশ কয়েকটি গঠনমূলক সুপারিশ পেশ করেন। যেমন : 'আলীয়া মাদরাসায় 'আরবী সাহিত্য, ইতিহাস তর্কশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রে কামিল ক্লাস খোলা, সাধারণ ইংরেজী স্কুলের ন্যায় মাদরাসায় ইংরেজী বাংলা ও গণিত সমমান করা। কলকাতা মাদরাসায় মেডিসিন বিভাগ খোলা, স্কুলগুলোতে ৪র্থ শ্রেণীতে 'আরবী সিলেবাসভুক্ত করা, মাতৃভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা, হুগলী মাদরাসা স্থানান্তরের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করা।[১৮৫]

এ কমিটির সুপারিশের শেষদিকে উল্লেখ করা হয় যে, সমাজের কিয়দংশ বিশেষ করে যুব শ্রেণীভুক্তরা চিন্তা করে যে, মাদরাসা কর্মক্ষম কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। তাই এগুলোর বিলুপ্তি সাধন করাই তাদের কামনা। কমিটি মনে করে যে, এটা অপরিপক্ক বয়সের বিভ্রান্ত ধারণা। তারা এর গভীরে প্রবেশ না করেই বাহ্যিক দিক থেকে এসব অবাস্তব মন্তব্য করেছে। তাই কমিটি এ ব্যাপারে ভিন্ন মতপোষণ করে। কমিটি আরো মত পোষণ করে যে, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা দানের গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। এতে প্রয়োজন হবে কারিকুলামের কিছু পরিবর্তন করা।[১৮৬]

এ কমিটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কি নীতি অবলম্বন করা যায়, সে বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করা।

ইংরেজ আমলে মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে সর্বশেষ কমিশন গঠিত হয় ১৯৪১ সালে। এ কমিটির দীর্ঘদিন পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় করে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও সমস্যাদি চিহ্নিত করে একটি বড় ধরনের সুপারিশমালা পেশ করেন। এ কমিটির নাম ছিল মাদরাসা শিক্ষা (মাওলা বক্স) কমিটি, ১৯৪১ সালে এ সুপারিশমালা কার্যকরী হলে ইসলামী শিক্ষার মান উন্নত পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হতো। এক ডজন সংসদ সদস্য ও অনেক দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদের সমন্বয়ে গঠিত এ কমিটির মূল্যবান রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয় নি। তাদের এ সুপারিশমালা ইসলামী শিক্ষার ইতিহাসে এক মূল্যবান দলিল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[১৮৭]

মাওলা বখ্শ কমিটি তার ব্যাপক প্রতিবেদনে ৬৮টি সুপারিশ সন্নিবেশিত করেন। এগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল দেশের উভয় ধরনের মাদরাসার (ওল্ড ও নিউ স্কীমভুক্ত) সার্বিকভাবে উন্নয়ন সাধন।

---

১৮২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৭।

১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৩।

১৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯২।

১৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৩।

১৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৬।

১৮৭. *আবদুস সাত্তার*, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলা বখ্‌শ কমিটির আর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল :

> That the lowest classes of Old and New Scheme Madrasahs be treatede as equivalent in status to ordinary Primary schools and maktabs established under the Primary Education Act and be allowed the same rights and privileges as are or may be enuoyed by other free primary schools.

কমিটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে সুপারিশ করা হয় যে, ওল্ড ও নিউ স্কীমভুক্ত মাদরাসাগুলোর সর্বনিম্ন চারটি শ্রেণীকে এবং যেসব মক্তব 'প্রাথমিক শিক্ষা এ্যাক্ট'-এর অধীনে স্থাপিত হয়েছে, সেগুলোকে একইভাবে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানের সমতুল্যভাবে গণ্য করতে হবে এবং অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

ইংরেজ আমলে মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাস সম্পর্কে সর্বশেষ কমিটি গঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। এ কমিটি মাদরাসা সিলেবাস (সৈয়দ মুয়াযযামুদ্দীন হোসেন) কমিটি ১৯৪৭ সাল নামে খ্যাত। কমিটির সুপারিশমালা ছিল ইসলামী শিক্ষার ইতিহাসে এক বাস্তব ধর্মী পদক্ষেপ। এটি একান্ত যুগোপযোগী ও বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে ও প্রণীত হয়েছিল।[১৮৮]

রিপোর্ট বাস্তবায়ন

এ কমিটিতে যেহেতু শুধু শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন না তিনি নিজেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বেও ছিলেন। তাই তিনি আগ্রহভরে নিজেই এর সফল বাস্তবায়ন কামনা করেছিলেন। তাই যখন কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুতকরতঃ প্রথানুসারে সরকারের কাছে পেশ করা হলে অবিলম্বেই ৪ জুলাই, ১৯৪৭ সালে তা অনুমোদন করেন। সরকার কমিটি কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্টের ওল্ড স্কীম মাদরাসা সিলেবাস সংক্রান্ত সুপারিশ অনুমোদন করেছে। আরো উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত সিলেবাস ১৯৪৭ সালের ১ জুলাই থেকে সংশ্লিষ্ট মাদরাসায় চালু করা হবে।

সরকারী ঘোষণা অনুসারেই ১৯৪৭ সালের ১ জুলাই থেকেই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক নতুন সিলেবাস কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসাসহ অন্যান্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদরাসাগুলোতে চালু করা হয়।

পাকিস্তানের অভ্যুদয় ও কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তর

ইতোমধ্যেই পাকিস্তানের জন্য যে সংগ্রাম চলছিল তা সফলতা লাভ করে। ফলে পৃথিবীর বুকে পাকিস্তান নামে একটি নতুন রাষ্ট্র ভারতবর্ষের বুক চিরে বেরিয়ে আসে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। ভারতবর্ষ বিভক্তির সময় ভারত ও বাংলাদেশের পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা দু'ভাগে বিভক্ত হয়। কলকাতা শহর পশ্চিমবাংলার ভাগে পড়ে যায়। পূর্ববাংলার রাজধানী হয় ঐতিহাসিক ঢাকা শহর।

দেশ বিভাগের পর বিভিন্ন দফতর ভাগাভাগির জন্য অনেকগুলো কমিটি গঠন করা হয়। ঠিক তেমনি গঠন করা হয় শিক্ষাক্ষেত্রে। এ কমিটির উপরই কলকাতা মাদরাসা বন্টনের দায়িত্ব পড়ে। কলকাতা মাদরাসার তদানীন্তন অধ্যক্ষ জিয়াউল হক অনেক চেষ্টার পর কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসার 'আরবী বিভাগকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরে রাজি করান। আর এ অংশের ফারসী বিভাগকে কলকাতার মূল মাদরাসায় রাখার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়।

---

১৮৮. *আবদুস সাত্তার*, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : তিন
পাকিস্তান শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা
[১৯৪৭-১৯৭১ খ্রী.]

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর ২৪ বছর চার মাস এদেশের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন পাকিস্তানী শাসকবর্গ। পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এর নেতৃবৃন্দ ইসলামী সমাজ কায়েম, ন্যায় বিচার ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তারা পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেন নি। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে পরিবর্তন দরকার ছিল তা করা হয় নি।

পাকিস্তানের আদর্শানুযায়ী শিক্ষার সমন্বিত উন্নয়নের পরিবর্তে বাস্তব ক্ষেত্রে বস্তুগত ভোগ বিলাসী মানসিকতা প্রাধান্য পেল।[১৮৯] বৃটিশ শাসনামলেও 'আরবী ভাষা আবশ্যিক হিসেবে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সিলেবাসভুক্ত ছিল। অথচ পাকিস্তান আমলে জাতীয় শিক্ষানীতিতে 'আরবী ভাষাকে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে রাখা হয়।[১৯০] ফলে অনেক স্কুলে 'আরবী শিক্ষকের পদ বিলুপ্ত হয়।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও নতুন শিক্ষানীতি নির্ধারণ কমিটি মাদরাসা শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র অক্ষুণ্ন রেখে এ শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করেছিলেন।[১৯১] শেষ পর্যন্ত সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগও নিয়েছিলেন। নতুন শিক্ষানীতিতে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষার কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা এবং সাধারণ শিক্ষায় ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনার সুপারিশ করা হয়েছিল। পাকিস্তানের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শ অনুযায়ী ইসলামই জাতীয় ঐক্যের মূল ভিত্তি, উন্নতির সোপান এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামাজিক ন্যায় বিচারের উৎস-এসব বিষয় শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যক্রম ও পুনর্বিন্যাস করার সুপারিশ করা হয়েছিল।[১৯২]

উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলার সুপারিশ করা হয়েছিল। এ বিভাগের ছাত্ররা শুধু ইসলামই শিক্ষা করবে না তারা যেন প্রতিযোগিতায় বিশ্বে সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবেলাও করতে পারে, সে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এ লক্ষ্যে কয়েকটি নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী, গবেষণা ও প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠারও সুপারিশ করা হয়েছিল।[১৯৩] পাকিস্তানের চব্বিশ বৎসরে কোন কর্তৃপক্ষই এ মহৎ উদ্যোগ ও সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন

---

১৮৯. The Pakistan commission on National Education declared that our educational system must play a fundamental part in the Preservation of the ideals, which led to the creation of Pakistan and strengthen the concept of it as a unified nation. (দ্র. Dr. Akm Ayub Ali. *History of traditional Islamic Education in Bangal, Dhaka : IFB, 1983* p 180.

১৯০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮১।

১৯১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৬-১৭৭।

১৯২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮১।

১৯৩. At the higher level the Islamic studies Departments of the universities should be strengthened in order to produce men. Who are not only well versed in religion but also fully responsive to the challenges of the contemporary world in selected universities full-feidged. Institutes of Islamic studies with programes of teaching research and publication should be developed. (দ্র. Dr. Akm Ayub Ali. Ibid, p 181.

Dhaka University Institutional Repository

করেন নি, সরকারী মাদরাসার সংখ্যাও বৃদ্ধি করেন নি। মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য কোন প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থাও করা হয় নি। পাকিস্তান আমলে নতুন করে যে তিনটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তাতেও ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে কোন ব্যবস্থা করা হয় নি।[১৯৪] প্রস্তাবিত ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নেয়া হয় নি। সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফোরকানিয়া, হাফিজিয়া, কাওমী ও দরসে নিযামী মাদরাসার উন্নয়নেও কোন ভূমিকা রাখা হয় নি। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে নিউস্কীম মাদরাসাগুলো বন্ধ করে দিয়ে অধিকাংশ নিউ স্কীম মাদরাসাগুলোকে স্কুলে পরিণত করা হয়।

সার্বিক কথা, পাকিস্তান আমলে ইংরেজদের রেখে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হলেও এ ভূখণ্ডের জনগণের চাহিদা মোতাবেক উন্নতি সাধিত হয় নি। সুদূর প্রাচীনকাল হতেই স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় যেসব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে; সেসব প্রতিষ্ঠান এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাট অবদান রাখে।[১৯৫]

১৭৮০ খ্রী. কলিকাতা 'আলীয়া মাদরাসা।96 প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক মাদরাসা শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। বৃটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের মনোরঞ্জনের জন্য এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন; পাকিস্তান আমলে এসে এটি নিয়মতান্ত্রিক মাদরাসা শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। এই মাদরাসাকে অনুসরণ করে পূর্ব পাকিস্তানে মাদরাসা শিক্ষার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ। বাংলাদেশের প্রত্যন্তাঞ্চলে যে সকল 'আলীয়া মাদরাসা রয়েছে সেগুলো মূলতঃ এ ধারারই।

ওল্ড ও নিউ স্কীম মাদরাসা

১৯১৪ খ্রী. 'মাদরাসা সংস্কার পরিকল্পনা'১৯৭ নামে একটি পরিকল্পনা (Reformed Madrasha Scheme) গ্রহণ করা হয়। ১৯১২ খ্রী. ঢা বি প্রতিষ্ঠা লাভ করলে এখানকার পাঠ্য বিভাগে একটি বিভাগ 'ইসলামী শিক্ষা' (Department of Islamic Studies) নামে চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী যোগান দেয়ার জন্য 'ফিডার প্রতিষ্ঠান' হিসেবে তার পাঠ্যক্রমের সঙ্গে মাদরাসাসমূহের পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তদানীন্তন হাইস্কুল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ভুক্ত করে হাই মাদরাসা ও জুনিয়র মাদরাসা নামে নতুন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়। এসব মাদরাসাই 'নিউ স্কীম মাদরাসা' (New Scheme Madrasha) নামে অভিহিত হয়। অপর দিকে কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসার আদলে পূর্ব থেকে প্রচলিত মাদরাসাগুলো নতুন সংস্কারকৃত পাঠ্যক্রম অনুসরণ না করে পূর্ববর্তী পাঠ্যক্রম ও নিয়মে থেকে যায়। এ মাদরাসাগুলো 'ওল্ড স্কীম মাদরাসা' (Old Scheme Madrasha) নামে অভিহিত হয়।

পরবর্তীতে ১৯৫৯ খ্রী. 'আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশনের' আলোকে 'নিউ স্কীম মাদরাসা' গুলো উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয়ে হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। আর ওল্ড স্কীম মাদরাসাগুলো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সহকারে আজও 'আলীয়া মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে চালু আছে।[১৯৮]

---

১৯৪. পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত তিনটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় :
১. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৩ খ্রী. ২. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫ খ্রী. ৩. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০ খ্রী. (দ্র. *মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮৪)।

১৯৫. মাওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ*, ঢাকা : ১৯৯২ খ্রী. পৃ ৩৬-৪০

১৯৬. বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে এটাই ছিল সর্বপ্রথম সরকারী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মুসলিম আমলে কোন সরকারী মাদরাসা ছিল না। তখন ইসলামী শিক্ষা গড়ে উঠেছিল মসজিদ মক্তবকে কেন্দ্র করে। আলীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার আগে আমীর, ফকীরদের দানে ছোট বড় ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ওয়াকফ সম্পত্তির আয়, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নিজস্ব তহবিল থেকে মাদরাসাসমূহের ব্যয় নির্বাহ করা হতো। আবদুস সাত্তার, *তারীখ-এ-মাদ্রাসা-এ-আলীয়া*, ঢাকা : ১৯৫৯ খ্রী. পৃ ৫২।

১৯৭. Dr. Sekender Ali Ibrahimi, Riport on Islamic education and Madrasha in Bengali, IFB, 1947, Vol. IV, p 32-37.

১৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী আলীয়া মাদরাসা

পুরাতন স্কীমের আওতায় পরিচালিত মাদরাসাসমূহের মধ্যে পাকিস্তান আমলে দুটি মাদরাসা সরকারী হিসেবে চালু হয়। মাদরাসা-ই-আলীয়া ঢাকা ১৯৪৭ খ্রী. এবং ১৯১৩ হতে সিলেট আলীয়া মাদরাসা সরাসরি সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য, মাদরাসা-ই-আলীয়া ঢাকা কলিকাতা আলীয়া মাদরাসা নামে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হলেও পাক-ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৭ খ্রী. ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়ে আসে এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।

পরীক্ষা পদ্ধতি

পাকিস্তান আমলের প্রথমদিকে মাদরাসা শিক্ষার দাখিল বা মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন পাবলিক পরীক্ষা ছিল না। আলিম, ফাযিল ও কামিল পর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৫০ খ্রী. থেকে দাখিল পরীক্ষা নামে একটি পাবলিক পরীক্ষা শুরু হয়। তাই পাকিস্তান আমল থেকেই মাদরাসা শিক্ষার জন্য পাঁচটি স্তর চালু হয়। স্তর গুলোর মেয়াদ নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয়

ক্রমিক	স্তরের নাম	স্তরের মেয়াদ
১.	ইবতিদায়ী	৪ বছর মেয়াদী
২.	দাখিল	৬ বছর মেয়াদী
৩.	আলিম	২ বছর মেয়াদী
৪.	ফাযিল	২ বছর মেয়াদী
৫.	কামিল	২ বছর মেয়াদী[১৯৯]

মাদরাসা শিক্ষা এ দেশের বহু ভাংগাগড়ার ইতিহাসের সাথে জড়িত। শিক্ষা ব্যবস্থার বহু অভিজ্ঞতার সাথে মাদরাসা শিক্ষা জড়িত। ১৯১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত নিউ স্কীম মাদরাসার প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা দশম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্তিতে দাখিল/ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত, তখন ঢাকা বোর্ড বা ঢা বি কোনটিই ছিল না বিধায় তদানীন্তন সরকারের শিক্ষা বিভাগ প্রথম পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এ পরীক্ষার নাম দেয়া হয় 'ইসলামিক ম্যাট্রিকুলেশন'। এ পরীক্ষায় যারা পাস করে তাদের ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে শিক্ষা দানের জন্য সরকারী কলিকাতা মাদরাসায় ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশ শুরু হয়। এসব ক্লাশে পরবর্তীতে ঢা বি কমিটির সুপারিশকৃত শিক্ষাক্রম অনুসৃত হয়। দ্বিতীয় বর্ষ সমাপনান্তে যে পরীক্ষা নেয়া হয় প্রথমে তার নাম ছিল ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা।[২০০]

পূর্ব পাকিস্তানে (১৯৪৭-৪৮ খ্রী.) পুরাতন স্কীমের মাদরাসার সংখ্যা[২০১] নিম্নরূপ ছিল :

মাদ্রাসার ধরন	মাদ্রাসার সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
সরকারী সিনিয়র মাদ্রাসা	২	৩০১ জন
অনুমোদিত সিনিয়র মাদ্রাসা	১৮৯	২৩,৫৫২ জন
অনুমোদিত জুনিয়র মাদ্রাসা	৯১	৮,৩৯৩ জন
অনুমোদন বহির্ভূত সিনিয়র মাদ্রাসা	৩৩	৩,৫৭৩ জন
অনুমোদন বহির্ভূত জুনিয়র মাদ্রাসা	৬৩	৩, ৬৯৩ জন
	মোট= ৩৭৮	= ৩৯৫১৫ জন

১৯৯. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৩ - ৩৪৫।

২০০. Dr. Sekander Ali, Ibid, p 48-52

২০১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬-৪৭ খ্রী. মুয়াজ্জেম হোসাইন কমিটির সুপারিশের আলোকে হাই মাদরাসা পরীক্ষার সিলেবাস[২০২] নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয় :

ক. বাধ্যতামূলক

১.	বাংলা/উর্দূ	১০০ নম্বর
২.	ইংরেজী	২০০ নম্বর
৩.	অংক (গণিত)	১০০ নম্বর
৪.	ইতিহাস ও ভূগোল	১০০ নম্বর
৫.	আরবী (২য় পত্র)	২০০ নম্বর
৬.	ফিকহ ও 'আকাঈদ	১০০ নম্বর

খ. ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি) ১০০ নম্বর

ইংরেজী, গণিত, ইসলামের ইতিহাস, লোক প্রশাসন, সাধারণ বিজ্ঞান, পদার্থ/রসায়ন, হাতের কাজ ও সেলাই (মহিলাদের জন্য), গার্হস্থ্য অর্থনীতি (মহিলাদের জন্য), ব্যবসায় পদ্ধতি এবং যোগাযোগ (টাইপ সহ), উর্দূ ও ফারসী।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা (সি গ্রুপ) এর জন্য নিম্নরূপ সিলেবাস নির্ধারণ করা হয় :

ক. বাধ্যতামূলক

ক্রমিক নং	বিষয়	মানবিক	বিজ্ঞান
১.	বাংলা/উর্দূ	১০০	১০০
২.	ইংরেজী	১০০	১০০
৩.	আরবী	১০০	১০০
৪.	কুর'আন/হাদীস	১০০	১০০
৫.	ফিকহ ও উসূল	১০০	১০০

খ. ঐচ্ছিক : মানবিক বিভাগের জন্য ১টি ২০০ নম্বর ও বিজ্ঞানের জন্য ২০০ নম্বর।

মানবিক বিভাগ	বিজ্ঞান বিভাগ
আল্ কালাম,	গণিত
আরবী যুক্তি বিদ্যা	পদার্থ
ইসলামের ইতিহাস	রসায়ন
ইংরেজী সাহিত্য পৌরনীতি	জীব বিজ্ঞান
ভূগোল	প্রাণী বিজ্ঞান
যুক্তি শাস্ত্র	
সাধারণ ইতিহাস[২০৩]	

২০২. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭।

২০৩. Sekender Ali Ibrahimi, Ibid, p 58.

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড

১৯২৮ খ্রী. সেন্ট্রাল বোর্ড অব মাদরাসা এক্সামিনেশন নামে আট সদস্যের একটি বোর্ড গঠন করা হয়।[২০৪] এই বোর্ড পরবর্তিতে 'পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড', যা তদানীন্তন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২৪ জন কর্মচারী/কর্মকর্তা নিয়ে এবং নন অফিসিয়াল মেম্বার নিয়ে বোর্ড গঠন করা হয়। এদের মধ্যে ঢাকা হাই কোর্টের একজন মুসলিম জর্জ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঢাকা 'আলীয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে বোর্ডের রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর সাথে সার্বক্ষণিকভাবে একজন সহকারী রেজিস্ট্রার নিয়োগ করা হয়।

এই বোর্ডের কার্যপরিধি ছিল পুরাতন স্কীমের মাদরাসাসমূহের 'আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। (টাইটেল, মুহাদ্দিস ও ফিকহ ইত্যাদি)। পরবর্তীতে দাখিল পরীক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্বও বোর্ডের উপরই ন্যাস্ত হয়। তবে মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নের জন্য এই বোর্ডকে কোন অর্থনৈতিক ক্ষমতা দেয়া হয় নি।

বোর্ড গঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ১০৯১টি মাদরাসা এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সকল মাদরাসার ৯৭৮০ জন শিক্ষক কর্মরত এবং ১,৪৩,৬২৩ ছাত্র অধ্যয়নরত ছিলেন।

অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ৫০০টি কাওমী মাদরাসা পরিচালিত ছিল। যে সব মাদরাসায় শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২৬০৮ জন এবং ছাত্র ৫৬,৫৭৭ জন। কাওমী মাদরাসা সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূতভাবে ও নিজস্ব সিলেবাসে পরিচালিত হতো। যার ধারাবাহিকতা বর্তমান পর্যন্ত চালু রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টসমূহে ইসলামী শিক্ষা [১৯৪৭-১৯৭০ খ্রী.]

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর ইসলামী শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য বেশ কিছু শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনগুলো ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে তাদের যেসব সুপারিশ ও মন্তব্য রাষ্ট্র বা সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করেন, তা এখানে তুলে ধরা হলো :

মওলানা আকরম খাঁ শিক্ষা কমিটি [১৯৪৯-৫১]

মওলানা আকরম খাঁ কমিটি (পূর্ব বঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পনর্গঠন) নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়।[২০৫] ১৯৪৭ খ্রী. নভেম্বর মাসে জাতীয় পর্যায়ে সারা দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সমম্বয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে করাচিতে একটি শিক্ষা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সে অধিবেশনের সুপারিশমালার আলোকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের আশা আকাংখার সাথে সংগতি রেখে সময়োপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য তৎকালীন সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৪৯ খ্রী. ১৬ মার্চ শিক্ষা সমস্যাকে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশদানের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সভাপতিত্বে ১৭ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করেন।[২০৬] সভাপতির নামানুসারে এটি 'আকরাম খান শিক্ষা কমিটি' নামে পরিচিত।

---

২০৪. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, ৫৩৪-৫৩৫।

২০৫. Report East Bengal Education sytem Reconstruction Committee 1949-1951.

২০৬. **পূর্ণাঙ্গ কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী :** ১. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ; [সভাপতি] বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক। **সদস্যগণ হলেন :** ২. ড. মোয়াজ্জাম হোসেন [ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢা বি]; ৩. মোলবী ইব্রাহিম খান [প্রেসিডেন্ট ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড]; ৪. মাওলানা জাফর আহম্মদ ওসমানী [হেড মোলবী, মাদরাসা-ই-'আলীয়া, ঢাকা]; ৫. মাওলানা রোকন উদ্দিন [এম এল এ]; ৬. মৌলবী আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী [এম এল এ]; ৭. খান বাহাদুর আবদুল হাকীম [সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা]; ৮. এ এফ এম আবদুল হক [সহকারী পরিচালক, মুসলিম শিক্ষা]; ৯. মৌলবী আলী নূর [পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা]; ১০. এস. এম. কিউ জুলফিকার আলী [বিদ্যালয় পরিদর্শক, বাকেরগঞ্জ জেলা রেঞ্জ]; ১১. শামসুল হক [অধ্যক্ষ, প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ]; ১২. মিসেস রাবেয়া খাতুন [প্রধান শিক্ষিকা, সরকারী গার্লস হাইস্কুল, সিলেট]; ১৩. মৌলবী মোঃ সোলায়মান চৌধুরী [প্রফেসর, এন. সি কলেজ, সিলেট]; ১৪. এল আসাদ [ডাইরেক্টর অব ইসলামিক রিকন্সট্রাকশন, পশ্চিম পাঞ্জাব]; ১৫. বাবু

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির কর্মপরিধির মধ্যে মাদরাসা শিক্ষায় সর্বোত্তম পদ্ধতি নিরূপণ করে পুরাতন স্কীম মাদরাসা, পুনর্গঠিত মাদরাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পাঠ্যসূচীর সকল উপাদান সুসমন্বিত করে ইসলামী ভাবধারা ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত করার কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পরবর্তীতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি দিকের উপর একটি করে সাবকমিটি গঠন করা হয়। মাদরাসা শিক্ষা সাব কমিটির সদস্যবৃন্দ নিম্নরূপ ছিলেন :

১. মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক[২০৭]

২. মাওলানা জাফর আহম্মদ উসমানী, হেড মোলভী, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা

৩. ড. এম এ হোসাইন-এমএডিফিল (অক্সন), ভাইস চ্যান্সেলর, ঢা বি

৪. ড. মোঃ সেরাজুল হক-এমএ, পিএইচ ডি (লন্ডন)
প্রধান, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ঢা বি, ঢাকা।

৫. মাওলানা রোকনুদ্দীন এম এল এ

৬. মৌলভী এস শরফুদ্দীন -এমএবিএল, অধ্যক্ষ, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা।

৭. ড. এফ এম আবদুল হক

৮. মৌলবী এ এস মাহমুদ

সাব কমিটি সমূহের রিপোর্ট প্রাপ্তির পর মূল কমিটি সেগুলো পর্যালোচনা পূর্বক সরকারের চূড়ান্ত বিবেচনার জন্য ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ খ্রী. একটি সুপারিশমালা দাখিল করেন।

সুপারিশমালা

১. বিশেষ বিশেষ ইসলামী বিষয়সমূহের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের ব্যবস্থা রেখে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার সকল গ্রুপের জন্য একান্ত আবশ্যিক বিষয়সমূহ পুনর্গঠিত মাদরাসা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

২. পুরাতন স্কীমের মাদরাসার স্বীকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত প্রচলিত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়াদী মাদরাসা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

৩. মাদরাসার ইবতেদায়ী ও দাখিল কোর্সের বিষয়বস্তুকে সাধারণ শিক্ষার সমস্তরে সমন্বিত করার সুপারিশ করা হয়। যাতে নিম্নমাধ্যমিক স্কুল থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা মাদরাসার 'আলিম কোর্সে ভর্তি হতে পারে।

৪. মাদরাসার শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কোর্সের সময়কাল হবে নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	মেয়াদ কাল
১.	দাখিল	৪ বছর
২.	আলিম	৪ বছর
৩.	ফাজিল	৪ বছর
৪.	কামিল	৪ বছর

এন এস সেন গুপ্ত [অধ্যক্ষ, বি. এম কলেজ, বরিশাল]; ১৬. বাবু রাজকুমার দাস [বিশেষ কর্মকর্তা, সিডিউল কাষ্ট এডুকেশন, গভর্নমেন্ট অব ইস্টবেঙ্গল]; ১৭.বেভারেন্ড ব্রাদার জুড [প্রধান শিক্ষক, সেন্ট গ্রেগরীজ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]।

২০৭. মাওলানা আকরম খাঁ এই কমিশনের আহবায়ক ও মাদরাসা সাব-কমিটির আহবায়ক হওয়ায় তিনি সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষা উভয়টির সমন্বয়ের ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর এ কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসা শিক্ষা বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার মাধ্যম ও পরীক্ষাদানের ভাষা হবে নিম্নরূপ :

ক্রমিক	শিক্ষাস্তর ও পরীক্ষার নাম	শিক্ষার মাধ্যম	কোর্সের মেয়াদ ও পরীক্ষার ভাষা
১.	দাখিল[২০৮]	মাতৃভাষা	জুনিয়র স্কুলের মাধ্যম
২.	আলিম[২০৯]	উর্দূ	শেষ দুই বছর
৩.	ফাযিল[২১০]	উর্দূ	পূর্ণ কোর্স
৪.	কামিল[২১১]	আরবী	পূর্ণ কোর্স

৬. মাদরাসার কামিল স্তরে ৬টি গ্রুপে / বিষয়ে পাঠদান করা হবে এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে গ্রুপ ভিত্তিক। গ্রুপভুক্ত বিষয়গুলোর যথাযথ পাঠদানের জন্য উপযুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়গুলো হবে নিম্নরূপ :

ক. হাদীস ও তাফসীর;

খ. ফিকহ্ ও উসূল;

গ. আদব (আরবী সাহিত্য);

ঘ. ইসলামী দর্শন ও সূফীবাদ;

ঙ. কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন ও

চ. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

৭. কামিল পরীক্ষায় পৃথক ১০০ নম্বরের গবেষণামূলক দীর্ঘ নিবন্ধ সম্পর্কিত একটি বিষয় থাকবে। যাতে শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা ও মূল চিন্তাশক্তির পরিমাপসহ তাদের নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গির যোগ্যতা নিরূপন করা যায়।

৮. মাদরাসার আলিম ও ফাযিল পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে তিনটি ভোকেশনাল বিষয় যথা- ক্যালিওগ্রাফি, কমপোজিটর শিপ ও সাংবাদিকতা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। তবে সমাপনী পরীক্ষায় সেগুলো অন্তর্ভূক্ত হবে না।

৯. মাদরাসার বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে উৎসাহ দানের জন্য সরকার বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করবেন। যাতে করে এ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ বৃত্তি দানের ওপরও জোর দেয়া হয়।

---

২০৮. **দাখিল :** আরবী শব্দ। সাধারণ শিক্ষা ধারায় প্রবেশিকা স্তরের সঙ্গে মিল করে নামকরণ করা হয় দাখিল। পাকিস্তান মাদরাসা বোর্ড গঠিত হওয়ার পর এ পরীক্ষা চালু করা হয়।

২০৯. **আলিম :** আরবী শব্দ। বাংলা অর্থ শিক্ষিত, বিদ্বান। কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায় প্রথম দিকে একে ছুয়াম হিসেবে অভিহিত করা হতো। পরবর্তীতে একে মাদরাসার দ্বিতীয় স্তরের ডিগ্রী হিসেবে চালু করা হয়।

২১০. **ফাযিল :** এটিও 'আরবী শব্দ। উচ্চ স্তরের জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তিদের উপাধি হিসেবে 'আরবীতে এর ব্যবহার করা হয়। দাখিল ও আলিম স্তরের পরবর্তী ডিগ্রী হিসেবে চালু করা হয়।

২১১. **কামিল :** এটিও 'আরবী শব্দ। এর অর্থ পরিপূর্ণ। 'আলীয়া মাদরাসার শিক্ষা ধারায় বাংলাদেশে এটি সর্বোচ্চ ডিগ্রী। ১৯০৭ খ্রী. কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায় ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে টাইটেল ক্লাশ চালু করা হয়। পরবর্তীতে এটিই কামিল ডিগ্রী হিসেবে চালু হয়। কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায় প্রথমে এ স্তর উত্তীর্ণ হলে 'ফখরুল মুহাদ্দেসীন হিসেবে অভিহিত করা হতো। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড হওয়ার পর এ ডিগ্রী লাভকারীকে 'মমতাজুল মুহাদ্দেসীন' হিসেবে অভিহিত করা হয়, যা বর্তমান পর্যন্ত চালু আছে। (দ্র. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, পৃ ২৫- ২৬ দ্র.)।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশের বাস্তবায়ন

মাওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে 'পূর্ব বঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পূনগঠন কমিটির; সুপারিশের আলোকেই ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দ হতে প্রচলিত ও লালিত 'নিউ স্কীম মাদরাসা'গুলো ক্রমান্বয়ে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই কমিটির কিছু কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়। অবশ্যই এ কমিটির সুপারিশমালার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয় নি। যা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের জন্য দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।

পূর্ববঙ্গ মাদরাসা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি রিপোর্ট ১৯৫৬ খ্রী. [আশরাফুদ্দীন চৌধুরী কমিটি]

পূর্ববাংলার মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে ২৯ নভেম্বর ১৯৬৫ খ্রী. তদানীন্তন সরকার একটি কমিটি গঠন করেন।[২১২] এ কমিটির সভাপতির নাম অনুসারে এটি আশরাফুদ্দীন চৌধুরী কমিটি নামে খ্যাত।[২১৩]

এই কমিটির কর্মপরিধি তথা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ :

১. পূর্ব পাকিস্তানের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে চিহ্নিত করে তা দূরীকরণ এবং দেশের জন্য একটি যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রনয়ণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পন্থা উদ্ভাবন।

২. দেশে দ্বি-ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষার কোন স্তর প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরের সমান হবে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা।

৩. মাদরাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রমে কিভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমাবেশ ঘটানো যায়, সে ব্যাপারেও সুপারিশ করা, যাতে এ ধারার শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সমাপনান্তে সম্মানজনকভাবে জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা লাভে সক্ষম হয়।

এই কমিটির প্রথম সভা ১৮ ডিসেম্বর ১৯৫৫ খ্রী. ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভা মাওলানা আমিমুল ইহসান কর্তৃক কালামেপাক তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে কমিটির সভাপতি বিস্তারিত আলোচনার পর কাজের সন্তোষজনক ফলাফল লাভের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আলাপ আলোচনার পর এই জন্য একটি সাবকমিটি[২১৪] গঠন করা হয়।[২১৫]

---

২১২. Dr. Sekander Ali Ibrahimi, Ibid, p 316-317.

২১৩. এ **কমিটির সদস্যগণ ছিলেন নিম্নরূপ** : ১. আশরাফুদ্দীন চৌধুরী, *চেয়ারম্যান*, [শিক্ষামন্ত্রী, পূর্ব বঙ্গ]; ২. মৌলভী সৈয়দ মুবারক উদ্দিন হোসেন, *ভাইস চেয়ারম্যান* [পরিচালক, জনশিক্ষা পূর্ব বঙ্গ]। **সদস্যগণ হলেন** : ৩. মাওলানা উবায়দুল হক [জামিয়াতুল মোদার্রেসীন]; ৪. এফ এম আবদুল হক; ৫. মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী; ৬. মাওলানা সিদ্দিক আহমদ [এম এল এ]; ৭. মৌলবী মকবুল আহমদ [অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা]; ৮. প্রফেসর এ এম আহমেদ [আহসানুল্যাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঢাকা]; ৯. এ এ আজম [অধ্যক্ষ, তেজগাঁও পলেটেকনিক ইনসিটিটিউট, ঢাকা]; ১০. ড. এ কে এম আইউব আলী [এম এ; পি এইচ ডি]; ১১. মাওলানা মুফতী আমীমুল ইহসান [হেড মৌলভী, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা]; ১২. ড. সিরাজুল হক [এম, এ; পি, এইচ, ডি বিভাগীয় প্রধান, আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ ঢা বি]; ১৩. মাওলানা আশরাফ আলী ১৪. মাওলানা জিয়াউল হক [প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা]; ১৫. মাওলানা বেলায়েত হোসাইন [হেড মৌলভী, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা]; ১৬. মাওলানা এ এইচ এম মুহসেন উদ্দিন [এম এল এ]; ১৭. মাওলানা এস শরফুদ্দীন [এম এ; বি, এল]; ১৮. মাওলানা মিয়া মোহাম্মদ কাসেমী [অধ্যক্ষ, সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ] ২০. মৌলভী এ এ মাহমুদ [সেক্রেটারী]।

২১৪. **সাব কমিটি** : ১. মৌলভী সৈয়দ মুয়াযযামুদ্দীন, *চেয়ারম্যান*। **সদস্যগণ হলেন** : ২. মৌলভী এ এফ এম আবদুল হক ৩. মৌলভী মকবুল আহমদ ৪.মাওলানা সৈয়দ আমীমুল ইহসান ৫.মাওলানা বেলায়েত হোসাইন ৬.মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী ৭. এস এ আযম ৮. মৌলবী এস শরফুদ্দীন ৯. ড. এ কে এম আইউব আলী ১০. মাওলানা সিদ্দিক আহমদ এম এল এ ১১.মাওলানা মুহাম্মাদ আযম ১২.মাওলানা উবায়দুল হক ১৩.মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন ১৪. মৌলভী এস এ মাহমুদ।

২১৫. মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৪-২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

কাজের পরিধি বিবেচনা করে পরবর্তীতে আরও ৫ (পাঁচ) জন সদস্যকে কো-অপারেট[২১৬] করা হয়। কমিটি একটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করে দাখিল করেন।

সুপারিশমালা

১. উর্দূকে কামিল স্তরে বাধ্যতামূলক করা হবে। ফার্সি/ইংরেজীর বিকল্প বিষয় হিসেবে সর্বস্তরে থাকবে।

২. মাদরাসা সিলেবাসে সাধারণ বিষয় যেমন, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যশিক্ষা অন্তর্ভুক্তি থাকবে।

৩. কামিল কোর্সে বর্তমানে ৪টি গ্রুপ রয়েছে, যথা ক. হাদীস খ. তাফসীর গ. ফিকহ ঘ. আরবী সাহিত্য। এ স্তরে আরো নিম্নের দু'টি গ্রুপ অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়।

ক. তুলনামূলক ধর্ম (Comparative Religion)

খ. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (Islamic History and Culture).

৪. প্রাথমিক স্তরে আরবী গ্রামার শেখানো হবে। তারপূর্বে দু'বছর ব্যাকরণ ছাড়া আরবী সাহিত্য পড়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৫. ফাযিল স্তরে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি, বাংলা ও গণিত সাধারণ শিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষার মানের সমতুল্য হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা ফাযিল পাশ করার পর প্রয়োজনে সাধারণ শিক্ষার ইন্টারমিডিয়েট কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতে পারে।

৬. মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাস এমনভাবে সংস্কার করা উচিত যাতে মাদরাসা শিক্ষার মূল কিতাব থেকে উচ্চমানের শিক্ষা দানের অভীষ্ট লক্ষ্য অব্যাহত থাকে এবং সাথে সাথে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়াদী কোর্স ভূক্ত করা নিশ্চিত হয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা শেষে যেন দেশের অর্থকরী কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে।

৭. মাদরাসার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে নিম্নরূপ :

ক. দাখিল স্তরে পাঠদান হবে বাংলায় তবে পরীক্ষায় বাংলা অথবা উর্দূতে লিখতে পারবে।

খ. আলিম স্তরে বাংলা অথবা উর্দূ ব্যবহৃত হবে।

গ. ফাযিল স্তরে বাংলা অথবা উর্দূ ব্যবহৃত হবে।

ঘ. কামিল স্তরে বাংলা অথবা উর্দূ ব্যবহৃত হবে।

৮. বর্তমানের ন্যায় মাদরাসায় ৪টি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। যথা- দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল।

৯. মাদরাসা শিক্ষকদের যারা ফাযিল স্তরে বাংলা, ইংরেজী ও গণিত পড়াবেন, সে সব শিক্ষক নূন্যতম স্নাতক পাশ হতে হবে।

১০. যেহেতু মাদরাসা ছাত্রগণ অধিকাংশই গরীব ও দরিদ্র পরিবার থেকে আগত, তাই ছাত্র বেতনে যা সংগৃহীত হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগন্য বিধায় সরকারকে মাদরাসাগুলোতে অধিক হারে গ্রান্ট-ইন-এইড দিতে হবে।

---

২১৬. **তাঁরা হচ্ছেন :** ১. মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব [সেক্রেটারী] হাটহাজারী মাদরাসা, চট্টগ্রাম ২. মাওলানা মুফতী আযীযুল হক [সেক্রেটারী, জামিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম]; ৩. মাওলানা কোরবান আলী [হেড মৌলবী ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ত্রিপুরা] ৪. মাওলানা তাজুল ইসলাম [মাদরাসা-ই-আলীয়া, বি, বাড়ীয়া, ত্রিপুরা]; ৫. মাওলানা শামছুল হক [অধ্যক্ষ, লালবাগ মাদরাসা, ঢাকা]।

Dhaka University Institutional Repository

১১. বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির প্রতিবেদনে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য জোর সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আজও কোন বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয় নি। তাই এ ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোর সুপারিশ করা হয়। আপাততঃ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও পি, টি আই গুলোতে মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করণার্থে অন্ততঃ ৩০% সিট সংরক্ষণ করার জন্য সুপারিশ করা হল।

১২. পি টি আইগুলোতে ধর্মীয় ও ইসলামিয়াত শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন ১৯৫৭ খ্রী.
[আতাউর রহমান খান কমিশন]

১৯৫৭ খ্রী. ৩ জানুয়ারী তৎকালীন চীপ মিনিস্টার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খানকে চেয়ারম্যান[২১৭] করে সাত সদস্য[২১৮] সমন্বয়ে এ কমিশন গঠিত হয়।

এ কমিশন মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা দাখিল করেন। এখানে তা উপস্থাপিত হ'লো :

১. নিউ স্কীম মাদরাসা

নিউ স্কীম মাদরাসা বা সংস্কার সাধিত মাদরাসা হাই মাদরাসা ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ বিশেষ ইসলামিক বিষয় (যথা- 'আরবী, ফিকহ, ফারায়েজ ও আকাইদ) সমূহের একটি স্বতন্ত্র বিভাগের ব্যবস্থা রেখে প্রচলিত সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ 'নিউ স্কীম মাদরাসা' শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

২. ওল্ড স্কীম মাদরাসা

ক. ১৯৫৫-৫৬ খ্রীস্টাব্দের 'মাদরাসা এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি' ও ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের 'এডুকেশনাল রিকনস্ট্রাকশন কমিটি" এর সুপারিশের ভিত্তিতে 'আরবী ও উর্দূ' উভয় বিষয়ই বাধ্যতামূলক পাঠ্য হিসেবে 'ওল্ড স্কীম মাদরাসার' চালু থাকবে।

খ. 'ওল্ড স্কীম মাদরাসায়' বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ইংরেজি, বাংলা ও গণিত একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাসভুক্ত করা হয়। যাতে উপযুক্ত শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটে ভর্তি হতে পারে।

গ. শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা এবং সবার জন্য সুনির্দিষ্ট একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বাধ্যতামূলক থাকবে।

ঘ. মাদরাসায় শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষা ধারায় গমনাগমনের সুযোগ অবশ্যই থাকবে।

ঙ. উপরোল্লেখিত সুপারিশমালার আলোকে শিক্ষাক্রম আধুনিকীকরণের বাস্তব রূপদানের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ দিতে হবে।

চ. যেখানে শিক্ষা ধারায় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোর্স সমাপনে ৬ বছর সময় লাগে, অথচ ওল্ড স্কীমের মাদরাসায় সমপর্যায়ের কোর্স সম্পন্ন করতে সময় লাগে দশ বছর। তাই ওল্ড স্কীম মাদরাসা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সময় সীমা ২ বছর বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা যায়।

---

২১৭. এ কমিশনের আলোকেই আলীয়া মাদরাসার পাঠ্যক্রমে সাধারণ শিক্ষার বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

২১৮. এ **কমিশনের সদস্যবৃন্দ ছিলেন নিম্নরূপ** : ১. আতাউর রহমান খান, *চেয়ারম্যান*, [চীফ মিনিস্টার অব পূর্ব পাকিস্তান]। **সদস্যগণ হলেন** : ২. ড. মাহমুদ হাসান [চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন,পূর্ব পাকিস্তান]; ৩. ড. কুদরত-ই-খুদা [রিজিওনাল ল্যাবরেটরীজ তেজগাঁও, ঢাকা]; ৪. আখতার হামিদ খান [অধ্যক্ষ, ভিকটোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা]; ৫. আবু লাইস [প্রাক্তন জনশিক্ষা পরিচালক, আসাম ও হুগলী]; ৬. ড. গোবিন্দ চন্দ্র দে [প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, ঢা বি, জনশিক্ষা পরিচালক, ডি. পি. আই পূর্ব পাকিস্তান]।

ছ. অদক্ষভাবে পরিচালিত 'ওল্ড স্কীম মাদরাসায়, সরকারি সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত হবে না।

জ. বর্তমানের ওল্ড স্কীমের মাদরাসাওলোর অবস্থা বর্তমান মাদরাসা বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতার আলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে মনযোগের সাথে নিরীক্ষণ করে দেখা দরকার। যাতে করে আযোগ্য ও অপ্রয়োজনীয় মাদরাসাগুলোকে চিহ্নিত করে বন্ধ করা সম্ভব হয় এবং উপযুক্তগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে অধিকতর উন্নত করা যায়।

ঝ. ঢাকার মাদরাসা-ই-আলীয়াতে পর্যাপ্ত গবেষণার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে মিশর ও আধুনিক মুসলিম বিশ্বের ন্যায় শীর্ষ স্থানীয় একটি অন্যতম উচ্চমান সম্পন্ন ইসলামী শিক্ষাদান কেন্দ্র হিসেবে উন্নীত করা প্রয়োজন।

৩. মাদরাসা শিক্ষার অগ্রগণ্যতা

ক. পুনর্গঠিত মাদরাসাগুলোকে ১৯৫৮ খ্রী. থেকে সাধারণ শিক্ষার সাথে একীভূত করতে হবে এবং সকল সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রাখতে হবে।

খ. পুরানো স্কীম মাদরাসাসমূহের ইবতেদায়ী শাখাগুলো বন্ধ করে তা সাধারণ শিক্ষার সাথে একীভূত করতে হবে।[২১৯]

গ. প্রতি জেলায় অবস্থিত মাদরাসাগুলোর অবস্থান ও সংখ্যা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ কল্পে মাদরাসাগুলোর প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জেলা শিক্ষা সার্ভে কমিটি গঠন করে মাদরাসার প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করতে হবে।

ঘ. এলাকায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও মহাবিদ্যালয়গুলোতে মাদরাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

চ. ঢাকার মাদরাসা আলীয়াকে উন্নত মানের গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে ও মানসম্পন্ন ইসলামী শিক্ষাদানের বিদ্যাপীঠ হিসেবে উন্নীত করা দরকার।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৫৯ খ্রী.
[এস এম শরীফ কমিশন]

১৯৫৮ খ্রী. ৩০ ডিসেম্বর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক এই কমিশন গঠিত হয়।[২২০] ৫ জানুয়ারী ১৯৫৯ খ্রী. প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইউব খান এ কমিশনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে প্রেসিডেন্ট আধুনিক সুযোগ সুবিধাকে নিশ্চিত করে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা দাখিলের জন্য কমিশনকে অনুরোধ জানান।

---

২১৯. এই কমিশনের রিপোর্টের আলোকেই নিউ স্কীম মাদরাসাসমূহ সাধারণ শিক্ষা ধারার সঙ্গে একীভূত করে দেয়া হয়।

২২০. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৪-২৮৬; এ **কমিশনের সদস্যবৃন্দ ছিলেন নিম্নরূপ** : ১. এস এম শরীফ, *চেয়ারম্যান* [সেক্রেটারী, শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিম পাকিস্তান]। **সদস্যগণ হলেন** : ২. ড. রাজি উদ্দিন সিদ্দিকী [সদস্য আনবিক শক্তি কমিশন]; ৩. কর্নেল এম কে আফ্রিদী [ভাইস চ্যান্সেলর পেশওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়]; ৪. বি এ হাশমী [ভাইস চ্যান্সেলর, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়]; ৫. ড. মমতাজদ্দীন আহমদ [ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী, বিশ্ববিদ্যালয়]; ৬. এ এফ এম আবদুল হক [প্রেসিডেন্ট, সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা]; ৭. প্রফেসর আতোয়ার হোসেন [ঢা বি]; ৮. ড. আবদুর রশীদ [অধ্যক্ষ, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ]; ৯. ড. আর এম ইউইং [ফরম্যান, ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, লাহোর]; ১০. কর্নেল মোহাম্মদ খান [পরিচালক, সামরিক শিক্ষা (প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিনিধি)]; ১১. ব্রিগেডিয়ার এস হামিদ শাহ [ডাইরেক্টর অব অর্গানাইজেশন, জেনারেল (২৬ কোয়ার্টার)]।

Dhaka University Institutional Repository

এই কমিশন দীর্ঘ দিন কাজ করার পর সরকারের নিকট একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। যাতে মক্তব ও মাদরাসা শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে মন্তব্য ও সুপারিশ দাখিল করেন।

মন্তব্য

১. মাদরাসা, মক্তব এবং দারুল 'উলূম[২২১] সমূহ একটি ঐতিহ্যগত শিক্ষা ধারার অন্তর্গত। ইসলামী বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদানের মধ্যেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় একেবারে প্রারম্ভ হতে আরবী শিক্ষা দেয়া যায়। আল-কুর'আন, তাফসীর, হাদীস এবং ফিকহ শিক্ষাদানও এ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। এর উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সহায়তা কমই দেয়া হয়।

২. এইসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত। এগুলোকে মাদরাসা বলা হয়। এগুলো নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এদের নির্দিষ্ট শিক্ষাসূচী রয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পাবলিক পরীক্ষায় এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থী প্রেরণ করা হয়। এ শিক্ষার কয়েকটি পর্যায় রয়েছে- যেমন ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল। নিম্নস্তর অতিক্রম করার পর উচ্চ স্তরে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। পাবলিক পরীক্ষার প্রথম স্তর হচ্ছে দাখিল ও সর্বশেষ স্তর হচ্ছে কামিল।

৩. ১৯১৫-১৬ খ্রী. সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসমূহের বিষয়সমূহ মাদরাসায় পাঠ্যভূক্ত করা হয়। এ সংস্কার কর্মসূচী বহু মাদরাসায় অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু অনেকগুলো মাদরাসায় পূর্বের ন্যায় পুরাতন শিক্ষা সূচীর অনুসরণ করতে থাকে। ফলে মাদরাসাসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যথা 'ওল্ড স্কীম মাদরাসা' এবং 'নিউ স্কীম মাদরাসা'। শেষোক্ত শ্রেণীর মাদরাসাগুলো ক্রমে ক্রমে পূর্ব পাকিস্তানে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি হওয়ায় সম্প্রতি সরকার প্রচলিত স্কুলের সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

৪. ওল্ড স্কীম মাদরাসাসমূহেও আধুনিক জীবনের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ইংরেজি ও বাংলাকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে ওল্ড স্কীম মাদরাসাসমূহে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব বেশী দিয়ে থাকে। অন্যান্য বিষয়ের গুরুত্ব কমই স্থান পাচ্ছে। ইসলাম এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য শতকরা ৭৫ ভাগ সময় নির্দিষ্ট করা হয়। ফলে মাদরাসা শিক্ষার স্তর সমূহেও অন্যান্য বিষয় অর্জিত জ্ঞান প্রবেশিকা স্তরের বেশী হয় না। মাদরাসা শিক্ষার উচ্চতর স্তরসমূহ অতিক্রম করতে ১৫-১৭ বছর সময়ের প্রয়োজন হয়।

৫. যে সময়ে ধর্মীয় শিক্ষায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, সে সময়ে মাদরাসা, মকতব[২২২] এবং দারুল 'উলূমে'র মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য মুসলমানদের একটি প্রচেষ্টা। এরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় মাদরাসা এবং 'দারুল 'উলূম' কারিকুলাম ধর্ম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আধিক্যে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

৬. মাদরাসা মাকাতিব এবং দারুল 'উলূমসমূহের শিক্ষা পদ্ধতি একদেশদর্শী। কেননা সকল ছাত্রকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের শিক্ষা প্রদান করা এদের লক্ষ্য। প্রয়োজন বোধেই প্রাথমিক স্তরের শ্রেণীসমূহে বিষয়গুলো ব্যাপক করতে হবে। বহুমুখী প্রতিভার ছাত্র ছাত্রী সৃষ্টির লক্ষ্যে এখানে পাঠক্রমের গুরুত্ব দিতে হবে।

---

২২১. **দারুল 'উলূম :** কাওমী মাদরাসা সমূহ তখন 'দারুল 'উলূম' মাদরাসা হিসেবে অভিহিত করা হতো। কারণ দারুল 'উলূম দেওবন্দের অনুসরণে এসব মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২২২. **মকতব :** 'আরবী শব্দ। 'আরবীতে স্থান বাচক বিশেষ্য হিসেবে লিখার স্থানকে মকতব বলে। যেহেতু ছোট শিশুদের বোর্ডে লিখে মুখস্থ আকারে মশক করানোর মাধ্যমে আরবী শিক্ষা দেয়া হতো, সাথে সাথে প্রয়োজনীয় দু'আ-দরুদ যেসব গৃহে শিখানো হতো তাকে মকতব নামে অভিহিত করার প্রথা চালু হয়ে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. উচ্চতর পর্যায়ে মাদরাসা ও দারুল উলূম সমূহে ইসলামকে এরূপ একটি গতিশীল ও প্রগতি পন্থী আন্দোলন রূপে উপস্থাপিত করতে হবে। যাতে সময় এবং মূল্যবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে টিকে থাকতে সক্ষম হয়। যুগে যুগে বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থশাস্ত্র ও সমসাময়িক ইতিহাসের আধুনিকতম অগ্রগতির আলোকে ইসলামকে উপস্থাপিত করতে পারলেই তার গতিশীলতার তাৎপর্য ছাত্ররা উপলব্ধি করতে পারবে।

ধর্মীয় শিক্ষার পরিসর

ক. ১ম শ্রেণী হতে সপ্তম শ্রেণী

১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল মুসলমান ছাত্রের জন্য ইসলামিয়াত একটি বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয় হওয়া প্রয়োজন। যার সিলেবাস শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ :

ক. সকল ছাত্র পবিত্র কুর'আন শরীফ পাঠ করা শিখবে।

খ. নামাযে ব্যবহৃত সূরা শিক্ষা করা সকল মুসলিম ছাত্রের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। কুর'আন শরীফ হতে আরও কিছু সূরা-আয়াত মুখস্থ করবে।

গ. পবিত্র কুর'আন শরীফ, মুহাম্মদ সা. এর জীবনী, ইসলমের ইতিহাস, শিক্ষা ও সাহিত্য হতে গৃহীত উপখ্যান ও উপদেশ পূর্ণ গল্প ইসলামিয়াত সম্পর্কিত বিষয়াদী পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবেশ করতে হবে। এসকল বিষয় আকর্ষনীয় করে উপস্থাপন করতে হবে এবং সহজ সরল আকারে ব্যাখ্যা করতে হবে।

ঘ. পবিত্র কুর'আন শরীফ হতে সামাজিক সৎকর্ম ও বাস্তব ক্ষেত্রে সাধুতা শিক্ষামূলক আয়াতের সংগ্রহ পাঠ্যভুক্ত করতে হবে এবং তরজমাসহ তা শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এরূপ 'আয়াত' শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. শিক্ষার প্রথম দিকের বছরগুলোতে শিক্ষককে দায়িত্ববোধ সততাবোধ, সচ্চরিত্রতা ও মানবিক মর্যাদার দিক দিয়ে আদর্শবান হতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের তা অনুকরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩. প্রত্যেক প্রাথমিক স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষককে ইসলামিয়াত পাঠ দানের যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। ইসলামিয়াতকে প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং এর বিষয়ভুক্ত করতে হবে।

খ. ৯ম - ১২শ শ্রেণী

১. ৯ম ও দশম শ্রেণীতে ধর্ম শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে প্রবর্তন করতে হবে।

২. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ধর্মশিক্ষা ইসলামিক সটাডিজ-এর অঙ্গীভূত হবে এবং তা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে শিক্ষা দিতে হবে।

গ. উচ্চ শিক্ষা

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হল জ্ঞান বৃদ্ধি ও গবেষণার উন্নয়ন। সুতরাং অন্যান্য দিকের শিক্ষার সাথে সাথে এ দিকেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর আলিম সৃষ্টির কাজ করতে হবে এবং পাণ্ডিত্যের মান অন্য স্থানের সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাণ্ডিত্যের মানের সমকক্ষ হতে হবে।

২. ইসলাম সম্পর্কে গবেষণার দায়িত্ব গ্রহণ এবং একে এর সত্যিকাররূপে ছাত্রদের সমক্ষে তুলে ধরতে হলে তুলনীয় অন্যান্য ধর্ম এবং বিশ্বের ইতিহাস সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পুরোপুরি জ্ঞান থাকতে হবে। তাহলেই মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা তারা পরিচ্ছন্ন ও শক্তিশালী ভাবে পেশ করতে সক্ষম হবেন। তাদেরকে ইসলামের ব্যাখ্যা দানে এবং আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা ও আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজের প্রয়োজন মিটাবার উপযোগী চিন্তাধারা হিসেবে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হতে হবে। ইসলামের সার্বিক উদার ও যুক্তিবাদী রূপের যথাযথ বিশ্লেষণ করতে হবে এবং আধুনিক জীবনের সমস্যার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ছাত্রদের পবিত্র কুর'আন শরীফ ও হাদীস পুরোপুরি বুঝিয়ে দিতে হবে। ইসলামী আইন, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম দর্শন সিলেবাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে।

৪. ইসলামিয়াতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও শিক্ষকগণকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হবে। স্ব স্ব বিষয়ের বিভিন্ন শাখার পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়াও ইসলামিক স্টাডিজ-এর শিক্ষকদের সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের একটিতে অর্থাৎ অর্থনীতি, দর্শন, সমাজতত্ত্ব , রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে অন্তত একটি বিষয়ের যুগোপযোগী জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়। তাদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মর্ম ও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নীতি অনুধাবনে সক্ষম হতে হবে।

ঘ. গবেষণা

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দান বিভাগ ছাড়াও দেশের উভয় প্রদেশে একটি করে ইসলামিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউট থাকা প্রয়োজন। এসব ইনস্টিটিউটের প্রত্যেকটির নিজস্ব আধুনিক লাইব্রেরী, গবেষণা কেন্দ্র এবং শিক্ষাদানের উপযোগী অধ্যাপক ও গবেষণা সংক্রান্ত প্রকাশনার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. ইসলামের বিভিন্ন দিকে গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে বহু সংখ্যক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একই সময়ের চিন্তাধারার চলতি গতি প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আহরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ এর শিক্ষকগণকে মুসলিম ও অমুসলিম দেশে সফরে প্রেরণ করতে হবে।

৩. ইসলামী শিক্ষাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগের সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। প্রাকৃতিক ধর্ম ইসলামের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। কুর'আনের প্রকৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত চিন্তাশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামী ভাবধারার প্রয়োজনে নতুন রূপ ও নতুন উপলব্ধির সন্ধান করতেই হবে।

৪. ইসলামী বিষয়ের আলিমগণের উপর ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ ও আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব বর্তেছে। আধুনিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াকিফহাল হতে হবে। বাস্তব জীবনের পরিবর্তনশীল প্রয়োজন মিটাবার উদ্দেশ্যে যুগের চাহিদাকে ক্রমাগত বিশ্লেষণ করতে হবে। মানুষের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে আধুনিক বাস্তব সমস্যায় ইসলামকে জীবন্ত পথ প্রদর্শক হিসেবে পরিণত করতে হবে।

৫. ইসলামী চিন্তাধারা, ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগতে যথেষ্ট সচেতন মনোভাব বিরাজ করছে। এসব বিষয়ে অধ্যয়নের ব্যাপারে পাকিস্তান নিজেকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত দেশরূপে তাদের সামনে পেশ করতে পারে। সুতরাং অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিদেশীদের আকর্ষণের জন্য আমাদের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা ইন্সটিটিউটের সাফল্যের উচ্চমানের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন।[২২৩]

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি [১৯৬৩ - ৬৪ খ্রী.]

মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে দেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবীতে দেশের মাদরাসা ছাত্র ও ইসলাম দরদী জনতার আন্দোলন দিন দিন তীব্রতর হতে থাকে। আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সরকার ১৯৬৩ খ্রী. ৩১ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এস এম হোসাইনকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করেন।[২২৪] সভাপতির নামানুসারে এ কমিটি হোসাইন কমিটি নামে খ্যাত।[২২৫] কমিটি দীর্ঘ সময় কাজ করার পর ১৯৬৪ খ্রী. ২৭ সেপ্টেম্বর সুপারিশমালাসহ সরকারের নিকট রিপোর্ট জমা দেন।

---

২২৩. Dr. Sekander Ali Ibrahimee, Ibid, p 326-327.

২২৪. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৩ - ২৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি প্রস্তাবিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ সমূহকে নিম্নরূপভাবে বিন্যস্ত করার প্রস্তাব করেন :

১. আরবী ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদ

২. কলা ও বাণিজ্য অনুষদ

৩. বিজ্ঞান অনুষদ

৪. শিক্ষা অনুষদ

কমিটির সুপারিশমালা

১. যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্থায়ী অনুষদ ও প্রয়োজনীয় বাসস্থান, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতিসহ আনুষাঙ্গিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু আরবী ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের কার্যক্রম ঢাকা মাদরাসা-ই-আলীয়ায় তাৎক্ষনিকভাবে শুরু করে চালু রাখতে হবে। বাকী তিনটি অনুষদ নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে খুলতে হবে।

২. সুপারিশ করা হয় যে, মাদরাসা শিক্ষার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. মাদরাসার প্রচলিত নিম্নমানের শিক্ষার উন্নয়নকল্পে বর্তমান শিক্ষার ব্যাপ্তি আরো দু'বছর বাড়ানো প্রয়োজন। ফলে মাদরাসার শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের ব্যাপ্তি হবে নিম্নরূপ :

ক্রমিক	স্তরের নাম	মেয়াদকাল	সমমান
১.	দাখিল (আপার)	২ বছর	মাধ্যমিক স্তরের অষ্টম শ্রেণী
২.	আলিম	২ বছর	মাধ্যমিক স্তর
৩.	ফাযিল	২ বছর	উচ্চ মাধ্যমিক
৪.	কামিল	২ বছর	বি, এ পাশ
৫.	কামিল (সম্মান)	৩ বছর	বি এ (সম্মান)
৬.	তাখাসসুস	১ বছর	এম, এ

৪. ডিগ্রী স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা বাংলা। আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের উচ্চস্তরে শিক্ষার মাধ্যম আরবী কিংবা বাংলাও হতে পারে।

৫. বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

৬. দেশে প্রচলিত তিনটি সরকারী মাদরাসায় বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগ চালু করতে হবে।

---

২২৫. **কমিটির গঠন ছিল নিম্নরূপ :** ১.ড. এস এম হোসাইন, *চেয়ারম্যান*। [ডি, ফিল (অক্সন) বিভাগীয় প্রধান, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ঢা বি]; **সদস্যগণ হলেন :** ২. ড. এম এ গনী [পিএইচ ডি; (লন্ডন) ভাইস চ্যান্সেলর, রা বি]; ৩. ড. মমতাজ উদ্দিন [ভাইস চ্যান্সেলর রা বি]; ৪. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ [ডি, লিট (প্যারিস), প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ ঢা বি]; ৫. [অধ্যক্ষ, মাদরাসা আলীয়া ঢাকা ও রেজিষ্ট্রার, পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড]; ৬. আলহাজ্ব শাহ সূফী আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ [পীর সাহেব, ছারছীনা]; ৭. সাইফুদ্দীন ইয়াহইয়াহ [এম, এ]; ৮. মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন [প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সিলেট আলীয়া মাদরাসা]।

Dhaka University Institutional Repository

৭. মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত মাদরাসায় দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরী ও শিক্ষা পরিদপ্তরের ন্যায় মাদরাসা শিক্ষার জন্য পৃথক ডাইরেক্টরেট স্থাপন করতে হবে।

৮. মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে অতীতের যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা নানা কারণে প্রশ্নাতীত ছিল না। ফলে তার থেকে সুফল পাওয়া যায় নি। প্রায় দু'হাজারের অধিক মাদরাসা লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর জন্য ইসলামী শিক্ষার সাথে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় সমন্বয় ঘটিয়ে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার দ্বার উন্মোচনের জন্য ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন একান্ত অপরিহার্য।

৯. এ বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি পাঠদানকারী, আবাসিক ও অনুমোদন দানকারী বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পাঠ্য পুস্তক জার্ণাল ও অন্যান্য ডকুমেন্ট নিয়মিতভাবে ছাপার জন্য 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ডিপার্টমেন্ট' থাকবে। তদুপরি সেখানে লেখক, সংকলক ও অনুবাদকের একটি ভিন্ন ব্যুরোও থাকবে।

১১. প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এবং মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রমের সাথে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে ও যোগসূত্র রক্ষার্থে পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কীয় হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট ১৯৬৬ খ্রী.

১৯৬২ খ্রী. সরকার পাকিস্তানব্যাপী ছাত্রদের প্রচণ্ড আন্দোলনের কারণে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৫ সেপ্টেম্বর ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কীয় একটি কমিশন গঠন করেন।[২২৬] বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের, ধারা উপধারাসমূহকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতঃ ছাত্রদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করণের প্রয়োজনীয় সুপারিশ দাখিল করার জন্য ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট[২২৭] এই কমিশন গঠন করা হয়।

পরবর্তীতে ১৯৬৪ খ্রী. ২৪ ডিসেম্বর খাজা মঞ্জুর হোসেনকে কমিশনের সচিব হিসেবে নিয়োগদান করেন। কমিশন অন্যান্য সুপারিশের সাথে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে কতিপয় সুপারিশ দাখিল করেন যা নিম্নরূপ :

ক. মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ, বৈজ্ঞানিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে হবে।

খ. কেন্দ্রীয় ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের ও ইসলামী একাডেমীর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানে যোগ্য বিশেষজ্ঞ ও রিসার্চ স্কলার নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাকিস্তানের নতুন শিক্ষানীতি ১৯৬৯ খ্রী.
[এয়ার ভাইস মার্শাল এম নূর খান কমিশন]

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের নির্দেশনায় ১৯৬৯ খ্রী. জুলাই মাসে 'নিউ এডুকেশন পলিসি' বা 'নতুন শিক্ষানীতি' প্রণয়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।[২২৮] তৎকালীন শিক্ষা

---

২২৬. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৭-৩২৪।

২২৭. **কমিশনের সদস্যগণ নিম্নরূপ** : ১.জাস্টিস হামদুর রহমান, *চেয়ারম্যান* [বিচারপতি, পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট]; **সদস্যগণ হলেন:** ২. জাষ্টিজ এস এ মাহমুদ [বিচারক, হাইকোর্ট, পশ্চিম পাকিস্তান]; ৩.কাজী আনোয়ারুল হক [চেয়ারম্যান, সেন্ট্রাল পাবলিক সার্ভিস কমিশন]; ৪. ড. মমতাজুদ্দীন [ভাইস চ্যান্সেলর, রা বি]; ৫.নাসির আহম্মদ [চেয়ারম্যান, পশ্চিম পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন]।

২২৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল এম নূর খানের নেতৃত্বে কেন্দ্র ও উত্তর প্রদেশের কয়েক ব্যক্তি সমন্বয়ে বিভিন্ন স্টাডি গ্রুপ নিয়োগ করে এ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়।

এই কমিশন মাদরাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের নিকট কতিপয় সুপারিশ পেশ করেন। যথা :

১. মাদরাসা শিক্ষাকে দেশের সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বিত করতে হবে এবং তবে তা ইসলামী ভাবধারার চাহিদার নিরিখে হতে হবে।

২. সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজ বাধ্যতামূলক থাকবে। এরপর তা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৩. শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মাদরাসা শিক্ষা অঙ্গীভূত হবে এবং এর সর্বস্তরের সাথে সাধারণ শিক্ষার স্তর ভিত্তিক সমতা বিধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. পূর্ব পাকিস্তানে মাদরাসা, দারুল উলূম ও মক্তব ধরনের অনেক মাদরাসা প্রচলিত আছে। যেখানে প্রায় ৬ লক্ষ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। এ শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্তরে যথা দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পর্যায়ে পড়াশোনা করে।

   পূর্ব পাকিস্তানে সরকার ইতিমধ্যে মাদরাসা শিক্ষার জন্য পৃথক মাদরাসা বোর্ডও স্থাপন করেছেন। এসব মাদরাসার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর সমন্বয় সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মাদরাসাসমূহের সহযোগিতা একান্ত ভাবে কাম্য। সাথে সাথে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে এর দায় দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৫. মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সাথে মাদরাসা শিক্ষার স্তরসমূহ যথা দাখিল, আলিম, ফাযিল ইত্যাদি স্ত রকে সমতা বিধান করতে হবে। এরজন্য অতিরিক্ত কোর্স ও মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হতে পারে। একাজ এজন্য করা হবে যাতে মাদরাসা শিক্ষিত যা সাধারণ শিক্ষিতদের মত সমসুযোগ সুবিধা ও চাকরী লাভের সুযোগ পায়।

৬. পশ্চিম পাকিস্তানে মাদরাসা শিক্ষা ধারার কোন ধারাবাহিক পরিসংখ্যান নেই। আর ধর্মীয় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কোন ব্যবস্থাও গড়ে উঠে নি। নতুন শিক্ষানীতির আলোকে পূর্ব পাকিস্তানের মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আলোকে একটি বোর্ড স্থাপন করে মাদরাসা শিক্ষাকে একটি নিয়মিত শিক্ষা ধারায় দাঁড় করানো যেতে পারে।

পাকিস্তান সরকারের নতুন শিক্ষানীতি ১৯৭০ খ্রী.
[শামসুল হক কমিটি]

১৯৬৯ খ্রী. ২৬ মার্চ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যা নিরসনে শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূরীকরণ ও জাতীয় চাহিদার পূরণে এবং সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটি নিবিড় পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করার লক্ষ্যে কেন্দ্রে এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে কয়েকটি অনুধ্যান কমিটি (Study group) গঠন করেন।[২২৯] সারা দেশের সর্বস্তরের জনগণের মতামত নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রনালয় প্রায় ১৫ হাজার প্রশ্ন মালা প্রেরণ করে জনগণের মতামত সংগ্রহ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সকল দিক-বিভাগ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য ১৯৭০ খ্রী. ১ জানুয়ারী শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

নতুন এই শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি দেশের অন্যান্য দিকের মত মাদরাসা তথা ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে কতিপয় সুনির্দিষ্ট সুপারিশ দাখিল করেন, যা নিম্নরূপ :

---

২২৯. Dr. Sekender Ali Ibrahimi, Ibid, V. 3, p 591.

Dhaka University Institutional Repository

মন্তব্য

পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় চার হাজার মাদরাসা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় তিন হাজার প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রায় এক হাজারের মত মাদরাসা আলিম, ফাযিল ও কামিল (কলেজ স্তর) স্তরের শিক্ষা নিয়োজিত। এসব মাদরাসার শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষের মত। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় সাতশত মক্তব প্রকৃতির মাদরাসা রয়েছে। আর স্বল্প সংখ্যক মাদরাসা উচ্চতর পর্যায়ে পাঠদান করে থাকে।

পুনর্গঠনের প্রস্তাব

প্রচলিত মাদরাসাগুলোর পুনর্গঠন ও সংস্কার সম্পর্কে জনগনের মতামত ও প্রস্তাবনা কি তা দেখা প্রয়োজন। দেশের উভয় অংশের প্রখ্যাত 'আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষবৃন্দ, এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষাকে সংস্কার ও পুনর্গঠিত করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে গ্রহণ করত উভয় প্রদেশে একটি করে মাদরাসা শিক্ষা প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা, স্বীকৃতি প্রদান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নসহ পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদানের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মাদরাসার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখে মাদরাসার পাঠ্যক্রমকে সুবিন্যস্ত বাস্তব সম্মত ও যুগপোযোগী করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে মাদরাসাগুলোর প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য সহযোগিতা করবে। মাদরাসা শিক্ষাধারার শিক্ষা সমাপনান্তে যাতে তারা সাধারণ শিক্ষাধারার শিক্ষিতদের ন্যায় অঙ্গীভূতভাবে জাতীয় জীবনে আর্থ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। মাদরাসা শিক্ষা ধারায় শিক্ষিতদের এমনভাবে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা যাতে তারা জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডটিকে সুসংগঠিত, শক্তিশালী ও সংবিধিবদ্ধ বোর্ড হিসেবে উন্নীত করা যায়। সাথে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানেও এ উদ্দেশ্যে একটি বোর্ড স্থাপন করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষায় ইসলামী শিক্ষা তথা মাদরাসা শিক্ষার ব্যাপারে প্রস্তাব

জাতীয় একতা, সংহতি ও সহিষ্ণুতা এবং উন্নতি ও গণতন্ত্র, পরমত সহিষ্ণুতা বিকাশের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। পাকিস্তানের স্বাধীনতার মূল এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার উপযুক্ত শিক্ষাক্রম তৈরী করতে হবে।[২৩০]

উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে এমন ভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে যাতে এ বিষয়ের শিক্ষার্থীরা শুধু ধর্মীয় বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করবে না, আধুনিক বিশ্বের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ সহজে ও পুরোপুরি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

নির্বাচিত কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইন্সটিটিউট ফর ইসলামিক স্টাডিজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেখানে পাঠদান কার্যক্রমসহ গবেষণা ও প্রকাশনার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

এককথায় পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রচলন করে পাকিস্তান আমলের বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠন করে এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত কমিশন ও কমিটিগুলোর সুপারিশ যদিও কখনো পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয় নি তথাপি তাদের সুপারিশসমূহ ইসলামী শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে এবং শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো তৈরী, সিলেবাস কারিকুলাম প্রস্তুত, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও শ্রেণী বিন্যাসে সাহায্য করে।

---

২৩০. উচ্চ শিক্ষা ধারায় ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের জন্য এ কমিটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ দাখিল করেছিল। আর কোন কমিশন উচ্চস্তরে গবেষণার ও উন্নত শিক্ষার ব্যাপারে এরূপ সুপারিশ দাখিল করে নি।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : তিন

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা

[১৯৭১–২০০০ খ্রী.]

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : এক

ইসলামী শিক্ষার প্রসার

পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানে যেভাবে ইসলামী শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতি হওয়ার কথা ছিল বস্তুত তা হয় নি। ইসলামী শিক্ষা এদেশের মানুষের চিন্তা চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে যে ধরনের কাঠামোর উপর দাঁড়ানোর দাবী করা হয়েছিল তা উপেক্ষিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, তৎকালীন সামরিক শাসক আইউব খানের দশ বছর শাসনামলে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত এসেছিল। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারেও বৈষম্যমূলক আচরণ করেছিল। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এক রকম নতুন করেই ইসলামী শিক্ষা এদেশে বিস্তার লাভ শুরু করে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই সাধারণ শিক্ষায় যে ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, ইসলামী শিক্ষার বেলায় তা হয় নি। স্বাধীনতার এক বছর পর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্য ড. কুদরত-ই-খুদাকে চেয়ারম্যান করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট যে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়, তাতে ইসলামী শিক্ষা তথা মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে কোন গুরুত্ব দেয়া হয় নি। এ লক্ষ্যে কোন সুপারিশ দাখিল করা হয় নি। প্রকারান্তরে ইসলামী শিক্ষাকে সংকোচিত করার জন্য এ কমিশন কাজ করেছে। অবশ্য এ কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হয় নি। পরবর্তীতে ১৯৭৬ খ্রী. যে শিক্ষা কমিটি গঠিত হয় তাতে বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কমিটি কাজ করেন। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সকল শিক্ষা কমিশন ও কমিটিগুলো ইসলামী শিক্ষার জন্য যে ধরনের সুপারিশ করেছিল তার সিকি ভাগও বাস্ত বায়িত হয় নি। যদি সকল কমিটির সুপারিশসমূহ কার্যকরী হতো, তাহলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ একটা অবস্থানে এসে দাঁড়াতে সক্ষম হতো। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সরকারগুলো তাদের শিক্ষা নীতিতে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিমাতা সুলভ আচরণ করেছে। ইসলামী শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণার বিষয়টি নিতান্ত জরুরী হলেও তা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার।

তবুও সত্তুরের দশকে এবং আশির দশকে ইসলামী শিক্ষার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। এ সময় এ শিক্ষার কেন্দ্র তথা মাদরাসার সংখ্যা বেড়ে যায় অনেক গুণ। *ইসলাম ধর্ম শিক্ষা* প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যকীয় করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ে *ইসলামী শিক্ষা* ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে যথাক্রমে ২০০ ও ৩০০ নম্বরের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে *ইসলামী শিক্ষা* ও *আরবী*র জন্য পৃথক বিভাগ চালু করণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে *ইসলামী শিক্ষা* বিষয়টি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই খোলা হয়।

স্বাধীনতার আগের ও পরের অবস্থা যদি আমরা তুলনামূলক হিসেব করি, তাহলে পরিসংখ্যানে দেখা যাবে, স্বাধীনতার পর মাদরাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তুলনামূলক ছক

(মাদরাসার সংখ্যা)

সন	দাখিল	আলিম	ফাযিল	কামিল	মোট
১৯৬০	৫০০	২৫০	১৭৪	১৭	৯৫১
১৯৭২-৭৩	৫২৮	২৯৮	৪৮২	৪৩	১৩৫২
১৯৮০	১৪০২	৪১২	৫৯৬	৫৬	২৪৬৬
১৯৮৫	২০৬৮	৬৩৫	৬১৫	৬৯	৩৩৮৭
১৯৯০	৪৩০৬	৭৬০	৭১৭	৯১	৫৮৭৩
১৯৯৮	৪৭৯৫	৯৬৯	৯৫৬	১১৮	৬৮৩৮[১]

ইসলামী শিক্ষার জন্য যে সকল বিভাগ ও স্তরগুলো বাংলাদেশে চালু আছে, এর ওপর এখানে ধারাবাহিক আলোচনা উপস্থাপন করা হচ্ছে :

ক. মসজিদ ভিত্তিক ফোরকানিয়া মাদরাসা

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার অন্যতম হচ্ছে, মসজিদ ভিত্তিক ফোরকানিয়া মাদরাসা। এসব মাদরাসায় মূলত কুর'আনুল কারীম বিশুদ্ধভাবে পড়া এবং দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের ছোট খাঁট মাস'আলা মাসায়িল শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব পালন করে।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে মসজিদের শহর বলা হয়। এর ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বাংলার মুসলমান সুলতান, পাঠান, সম্রাট ও মুঘল শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছিল। এসব শাসকদের সুবাদার, সেনাধ্যক্ষ, প্রশাসক, নায়িব, নাজিমগণ মসজিদ, মাযার, কাটিয়া, প্রসাদ, কেল্লা, পুল, রাস্তা ঘাট ইত্যাদি নির্মাণের মধ্য দিয়ে ঢাকাকে একটি প্রসিদ্ধ শহরে পরিণত করে। সেই স্বাধীন সুলতানী আমল থেকে ঢাকা শহরে মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়। আজ পর্যন্ত সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

মুঘল আমলের পূর্বে ১৪৫৭ খ্রী. ঢাকার নারিন্দায় প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়। সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহর রাজত্ব কালে প্রতিষ্ঠিত এই মসজিদের পূর্বে ঢাকায় আর কোন মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে সন্ধান পাওয়া যায় না।[২]

১৬১০ খ্রী. মুঘল সুবাদার ইসলাম খান কর্তৃক ঢাকার নাম জাহাঙ্গীর নগর নাম করণের মাধ্যমে সুবাহ বাংলার রাজধানী করা হয়। ১৬১৩ খ্রী. ঢাকার আওলাদ হোসেন লেন মসজিদ মুঘলদের সর্বপ্রথম মসজিদ। ১৬৪২ খ্রী. ধানমণ্ডি ঈদগাহ মসজিদ ও হোসেনী দালান, ইমামবাড়া, চুরিহাট্টা মসজিদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে মসজিদের সংখ্যা হয়ে যায় অগণিত। ঢাকা নগরীর মসজিদগুলো প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইবাদতের সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা। ফলে প্রতিটি মসজিদের সঙ্গে এক বা একাধিক ফোরকানিয়া মাদরাসা, মকতব, হাফিজিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে।

মসজিদ কেন্দ্রিক মাদরাসা ও মাদরাসা কেন্দ্রিক মসজিদ উভয়টির অস্তিত্ব ঢাকা শহরসহ সারা দেশে পাওয়া যায়। মসজিদ কেন্দ্রিক মাদরাসাগুলোর পাঠদান মসজিদের অভ্যন্তরেই হয়। অবশ্য পুরাতন ঢাকার কতিপয় এলাকায় ফ্রি ফোরকানিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সন্ধান পাওয়া যায়। আজও এধরনের দু'চারটি ফোরকানিয়া

১. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ ৩৫০।

২. মোঃ আবদুর রশীদ সম্পাদিত, *ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ ১৪- ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসা মকতব পুরাতন ঢাকায় বিদ্যমান রয়েছে। কোন কোন মাদরাসার সঙ্গে ফোরকানিয়ার সাথে হাফিজিয়া মাদরাসা এবং সিনিয়র মাদরাসাও রয়েছে।

ঢাকা শহরে বেশ কিছু মাদরাসা কেন্দ্রিক মসজিদ রয়েছে, কোন কোন স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 'ইবাদতের জন্য বা ছাত্র-শিক্ষকদের নামাযের জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেসব মসজিদের নাম মাদরাসার নামের সাথে যুক্ত করেই নামকরণ করা হয়েছে। যেমন বড় কাটরা জামেয়া-ই-আশরাফুল 'উলূম জামে মসজিদ, ফরিদাবাদ জামেয়া 'আরাবিয়া জামে মসজিদ, মারকাজে এশায়াতে ইসলাম দারুস সালাম জামে মসজিদ ইত্যাদি। ফলে মসজিদগুলোতে মূলত কুর'আনুল কারীম বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াতকরণ ও ইসলামের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের বন্দোবস্ত করার তাগিদেই ফোরকানিয়া বা মকতব প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা শহরের অনুকরণে দেশের অন্যান্য শহর বন্দর, গ্রামে গঞ্জেও একই ধারায় মসজিদ ও মাদরাসার সংখ্যা অগণিত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠি হয়েছে। এগুলোর প্রকৃত হিসেব পাওয়া যায় নি।

এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে ১,০১,০৫৭টি মসজিদে কোন সংযুক্ত মকতব বা ফোরকানিয়া মাদরাসা নেই। ২১,৫৮৬টি মসজিদে সংযুক্ত ফোরকানিয়া মাদরাসা রয়েছে। ৫৮,১২৪টি স্বতন্ত্র মকতব রয়েছে। এদের মোট শিক্ষক সংখ্যা ৭৪,৭১৬ জন এবং ছাত্র সংখ্যা ৮,৯৮,২০২ জন।[৩]

ফোরকানিয়া মাদরাসা ও মকতবগুলো সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তবে জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত কিছু কিছু ফোরকানিয়া রয়েছে। এদের অনুমোদন দেয়া হলেও তারা সরকারী কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। এ ধরনের সকল মাদরাসাগুলোই বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। জন সাধারণের দান/অনুদান/ চাঁদা/বেতন ইত্যাদি দ্বারাই এ সকল প্রতিষ্ঠান চলে। বাংলাদেশ তা'লিমুল কুর'আন বোর্ড ও বাংলাদেশ তা'লিমুল কুর'আন ওয়াকফ এস্টেট নামে দুটি সংগঠন 'নূরাণী মাদরাসা' নামে ফোরকানিয়া মাদরাসা সমমানের কিছু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছে। যাদের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০। শিক্ষক সংখ্যা লক্ষাধিক। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক।[৪]

খ. 'আলীয়া মাদরাসা শিক্ষা

১৯৯১ সালে দাখিল মাদরাসায় সরকারী অনুদানের আওতায় ৫৪,০১৭ জন শিক্ষককে আনা হয়। এ সময় দাখিল মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ৬,১৪,২১৩ জন।

'আলিম মাদরাসার শিক্ষক সংখ্যা ১২,৮২৪ জন এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১,৭৯,০৪৮ জন। ফাযিল মাদরাসার শিক্ষক সংখ্যা ১৫,২৯৮ জন এবং ছাত্র-ছাত্রী ২,১৩,৫৭৫ জন। কামিল মাদরাসার শিক্ষক সংখ্যা ২,৩৭৫ জন এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৪৪,৪২৪ জন। অপর দিকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুমোদন প্রাপ্ত ইবতিদায়ী মাদরাসার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫,৯৮৬টি। এদের শিক্ষক সংখ্যা ৫৭,৬৯৮ জন এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১৭,৩০,৪৯১ জন।[৫]

স্বাধীনতাত্তোর দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন ঘটলেও মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় নি। ১৯৮৪ খ্রী. সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদরাসা শিক্ষাকে সমমান নির্ধারণের উদ্যোগ নেয়া হয়। দাখিল ও আলিম পরীক্ষাকে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি'র সমমান প্রদান করা হয়।[৬] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপন বলে ১৯৮৫ সালের দাখিল পরীক্ষাকে এসএসসি ও ১৯৮৭ সালের আলিম পরীক্ষাকে এইচএসসি'র সমমান প্রদান করা হয়।

---

৩. *Bangladesh Mosque Census 1983,* Dhaka : Bangladesh Bareau of Statistics, March 1985.

৪. *নূরানী শিক্ষা পরিচিতি*, ঢাকা : তালিমুল কুর'আন ওয়াকফ এস্টেট, ১৯৮৮, পৃ ৯-১০।

৫. Bangladesh Educational Statistics 1991, Dhaka :Banbais, March 1992.

৬. ১৯৮৫ সালের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শা/৯/৬ এস সি-১৩/৮৪/ ৭৪১ (১১) ইবতিদায়ী স্তরকে প্রাথমিক, দাখিলকে মাধ্যমিক, আলিমকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর মান দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দেশে মাদরাসা শিক্ষার অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছরই দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পর্যায়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিসেব অনুযায়ী ১৯৮৩ সালে দাখিল, আলিম ফাযিল ও কামিল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯১৯৮, ৮৫২০, ৪৯৯৫ ও ২৪৭৮ জন। ১৯৯৯ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৭৯০১, ৩১২৫১, ১৩৩১৭ ও ৮০৯৬ জন। অর্থাৎ প্রতিটি স্তরে এক দশকের বেশী সময়ে ছাত্র সংখ্যা প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ধারায় পুরুষের পাশাপাশি নারী শিক্ষারও আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, এর অধীনে নিচের ক্রমবর্ধমান পরীক্ষার্থীনির সংখ্যা এ ধারণা প্রদান করে :

ক্রমবর্ধমান ছক

খ্রীস্টাব্দ	দাখিল	আলিম	ফাযিল	কামিল
১৯৯১	৭১০৯	–	–	–
১৯৯২	–	১৩৫৬	২৫৯	৫১
১৯৯৩	–	১৭৫১	৩১৮	৭১
১৯৯৬	১৭১৪২	–	৯৪৫	১০৩
১৯৯৭	২৭৬৯২	৬২৭৩	১২৪৪	১৮৪
১৯৯৮	৩৯০৫৪	৮৩৮৪	২০২১	২৯৩[৭]

মাদরাসা শিক্ষা এক রাশ সমস্যা বুকে ধারণ করে সংখ্যাগতভাবে কিছুটা উন্নতি লাভ করলেও সম্ভাবনার তুলনায় তা কম। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, মাদরাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষা বাংলাদেশে একটি সম্ভাবনাময় শিক্ষা ব্যবস্থা, যা সামগ্রিকভাবে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট অবদান রাখতে পারে।

গ. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতির একটি বিরাট দিক হচ্ছে, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা। এই বোর্ড প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। এই বোর্ডের প্রতিষ্ঠার সাথে দু'শ বছর আগের ইতিহাস জড়িত।

১৭৮০ খ্রী. থেকে ১৯২৭ খ্রী. পর্যন্ত ১৪৭ বছর ইংরেজ অধ্যক্ষদের দ্বারাই কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসা পরিচালিত হয়। ১৭৯১ খ্রী. কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসায় মোল্লা নিজাম উদ্দিন প্রবর্তিত সিলেবাস চালু থাকে। এ সাল থেকেই বৃটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত তাফসীর ও হাদীস বাদ দিয়ে ইংরেজী চালু করা হয়। ১৮৭১ খ্রী. থেকে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ৮ (আট) বছরের কোর্স চালু করা হয়। ১৯২৮ খ্রী. পর্যন্ত তা চালু ছিল। এ সাল থেকে ৬ বছর জুনিয়র, ৪ বছর সিনিয়র, ২ বছরের টাইটেল কোর্স সহ মোট ১২ বছরের কোর্স প্রবর্তন করা হয়। কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড়শত বছর পর অধ্যক্ষ হিসেবে প্রথম বারের মতো শামসুল 'উলামা কামাল উদ্দিন আহমদ নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তাঁর সময় হতে প্রথম 'আলীয়া মাদরাসার অনুসরণে দেশে অপরাপর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা শুরু হয়।

তখন প্রশ্ন উঠে এসব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, মঞ্জুরী, সিলেবাস ও পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব পালন করবে কে? ১৯২৮ খ্রী. 'সেন্ট্রাল বোর্ড অব মাদরাসা এক্সামিনেশন' নামে ৮ সদস্য দ্বারা একটি বোর্ড গঠিত হয়। মূলত এই বোর্ড ১৯২৮ খ্রী. কলকাতা মাদরাসায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার পর এই বোর্ড কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসার অনুকরণে মাদরাসা সমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে। অতপর

---

৭. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন সালের প্রকাশিত ফলাফল বহি থেকে গৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে শামসুল হুদা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। একই সাথে বোর্ডের লোকবল ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসার অধ্যক্ষকে এর বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য বিধান রাখা হয়। ১৯৪৭ খ্রী. পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। সে বছর মোয়াজ্জম হোসেন কমিশন প্রবর্তিত সিলেবাস চালু করা হয়।[৮] ১৯৪৭ খ্রী. দেশ (পাক-ভারত) বিভক্ত হওয়ার পর 'আলীয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। একই সাথে বোর্ডও ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এখানে মাদরাসা-ই-'আলীয়ার অধ্যক্ষকে বোর্ডের রেজিস্ট্রার ও সার্বিক দায়িত্বশীল রাখা হয়। বোর্ডের কার্যাদী পরিচালনার জন্য বিসিএস গেজেটেড পদ মর্যাদার একজন সহকারী রেজিস্ট্রার, কিছু অফিস সহকারী টাইপিষ্ট ও পিয়নের পদ সৃষ্টি করা হয়। এই নব সৃষ্ট সহকারী রেজিস্ট্রার পদে সর্বপ্রথম মাওলানা ইয়াকুব শরীফকে নিয়োগ করা হয়।[৯]

মাদরাসা বোর্ডকে ঢাকায় স্থানান্তর, পুণর্গঠন ও সংস্কার সাধনের বিষয়ে তৎকালীন মাদরাসা-ই-'আলীয়া ঢাকার অধ্যক্ষ আলহাজ্ব খান বাহাদুর মুহাম্মদ জিয়াউল হকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতা সাফল্যজনক অবদান রাখে। বোর্ডের সকল রেকর্ডপত্র মাদরাসা লাইব্রেরীর মূল্যবান কিতাব পত্র এবং বোর্ড ও মাদরাসার যাবতীয় আসবাবপত্র ঢাকায় নিয়ে আসায় তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সে সময় অবিভক্ত বাংলার সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক নোয়াখালী নিবাসী খান বাহাদুর বদিউর রহমান এসব আসবাবপত্র ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যাপারে সরকারী অর্থ অনুমোদন এবং যানবাহন জাহাজ ইত্যাদির ব্যবস্থায় অভাবণীয় সহায়তা প্রদান করেন। জনাব ইয়াকুব শরীফ অধ্যক্ষ জিয়াউল হক সাহেবের অধীনে থেকে তাঁর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী নব প্রতিষ্ঠিত এই বোর্ডের যাবতীয় কাজকর্ম সুচারুভাবে সম্পন্ন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। সহকারী রেজিস্ট্রারের পদে জনাব ইয়াকুব শরীফ দীর্ঘ নয় বছর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ খ্রী. পর্যন্ত মাদরাসা 'আলীয়া ঢাকার অধ্যক্ষ শায়খ শরফুদ্দীন[১০] ও ড. এ কে এম আইয়ূব আলী অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করার কারণে পদাধিকার বলে তারাই বোর্ডের সার্বিক দায়িত্বশীল ছিলেন। মাঝে কিছু সময় জনাব ইয়াকুব শরীফ এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সনে ড. এ কে এম আইয়ূব আলী মাদরাসা-ই-'আলীয়া ঢাকার অধ্যক্ষের পদ হতে অবসর গ্রহণ করেন। ১ এপ্রিল ১৯৭৯ খ্রী. তারিখে পুনরায় জনাব ইয়াকুব শরীফ মাদরাসা-ই-'আলীয়া ঢাকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার কারণে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্ব ও তাঁর উপর ন্যাস্ত হয়।

এসময় মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডর কাজের পরিধি এত বৃদ্ধি পেল যে, মাদরাসা-ই-'আলীয়া ঢাকার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে বোর্ড পরিচালনা অসম্ভব হয়ে উঠে। তাছাড়া মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, একটি স্বায়ত্বশাসিত ও এফিলিয়েটেড ক্ষমতা সম্পন্ন বোর্ড হিসাবে রূপান্তর ও পুনর্গঠন সময়ের দাবী ছিল। স্বাধীনতার পর বোর্ডকে স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা প্রদানের বিষয় সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বিবেচনাধীন ছিল। কিন্তু সিদ্ধান্তহীন ভাবে দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের[১১] গোচরীভূত হলে তিনি ২ মার্চ ১৯৭৮ খ্রী. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড অর্ডিন্যান্স সরকারী গেজেটে তা প্রকাশ করার

---

৮. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১।

৯. মাওলানা নুর মোহাম্মদ সম্পাদিত, *জীবনের জল ছবি*, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ ১৬-১৭।

১০. অধ্যক্ষ শায়খ শরফুদ্দীন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. আল-মুতী শরফুদ্দীনের পিতা ছিলেন। দ্র. মাওলানা নুর মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

১১. **মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান** : বগুড়া জেলার বাগবাড়ীর সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তার ডাকনাম ছিল 'কমল'। পিতার নাম মোঃ মনসুরুর রহমান, মাতার নাম জাহানারা খাতুন। বাল্যকালে তিনি চাচা মমতাজুর রহমানের সঙ্গে কলকাতায় হেয়ার স্কুলে লেখাপড়া করেন। পরে বগুড়া থেকে মেট্রিক পাশ করে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন এবং সামরিক বাহিনীর বিভাগীয় নিয়ম অনুযায়ী উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘোষনাপত্র পাঠ করেন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে। মুক্তিযুদ্ধের একটি সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে. সিপাহী জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি প্রথমে সামরিক প্রশাসক, সেনা সর্বাধিনায়ক এবং পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে সেনা বাহিনীর একদল বিপদগামী কর্মকর্তার হাতে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে শাহাদাৎ বরণ করেন। তাঁকে ঢাকার শেরে বাংলা নগরে দাফন করা হয়। দ্র. *দৈনিক মিল্লাত*, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা নেন।[১২] 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড অর্ডিন্যান্স' নামে এর নামকরণ করা হয়। স্বায়ত্বশাসন লাভ করার পরও কয়েক মাস মাদরাসা-ই-'আলীয়া'র অধ্যক্ষ বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড অর্ডিন্যান্সটিতে বাংলাদেশের মাদরাসা সমূহের স্তর বিন্যাস, মঞ্জুরী প্রদান, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও মাদরাসা শিক্ষার যাবতীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট বিধান রাখা হয়। অর্ডিন্যান্সে মাদরাসা শিক্ষা (Madrasha Education) বলতে ইবতিদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল স্তরকে নির্ধারণ করা হয়েছে।[১৩]

বোর্ডের অর্ডিন্যান্সে নিম্নরূপ বিষয়াদী পাঠ্য তালিকায় উল্লেখ করা হয় :

১. কুর'আনুল কারীম পঠণ

২. ইসলামিয়াত, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, কালাম, উসূল, ফারায়িয ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

৩. মানবিক বিষয়, 'আরবী সাহিত্য ও ভাষা, ইসলামের ইতিহাস, সাধারণ ইতিহাস, বাংলা সাহিত্য ও ভাষা।

৪. বিজ্ঞান

৫. বাণিজ্য

৬. কৃষি

৭. শিল্প

৮. সামরিক বিজ্ঞান

৯. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শারিরীক শিক্ষা

১০. সরকারের অনুমোদন স্বাপেক্ষে টেকনিক্যাল বা বিশেষ শিক্ষা।

অর্ডিন্যান্সে এর কার্যাবলীর ব্যাপারে বলা হয়ঃ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, নীতি নির্ধারণ, পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন এবং মাদরাসা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব এ বোর্ড পালন করবে।[১৪]

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড নিম্নোক্ত প্রতিনিধি/ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হয় :

১. একজন চেয়ারম্যান - বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োগকৃত।

২. সহকারী পরিচালক (মাদরাসা শিক্ষা) পদাধিকার বলে।

৩. ডাইরেকটর টেকনিক্যাল শিক্ষা অথবা সহকারী পরিচালকের নিচে পদমর্যাদা নয় এমন একজন কর্মকর্তা।

৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সমূহের একজন প্রতিনিধি (সরকার কর্তৃক মনোনীত)।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধি সরকার কর্তৃক মনেনীত।

৬. একজন সরকারী মাদরাসার অধ্যক্ষ সরকার কর্তৃক মনোনীত।

৭. ২ জন বেসরকারী মাদরাসার অধ্যক্ষ সরকার কর্তৃক মনোনীত।

---

১২. Ordinance No IX, Dhaka end March 1978. Ministry of Law and Parliamentary affairs (No. 237 Pub-The following ordinance made by President of the people's Repulic of Bangladesh on 27 February 1978.

১৩. The Madrasha Education Ordinance 1978, Chapter 1, Para 'O' I, p 2.

১৪. প্রাগুক্ত, Chapter II, Section 2

Dhaka University Institutional Repository

৮. ২ জন বেসরকারী মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট, সরকার কর্তৃক মনোনীত।

৯. ১ জন পরিদর্শক কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক মনোনীত।

১০. ২ জন বিশেষ ব্যক্তি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত।[১৫]

১৩ সদস্য বিশিষ্ট এই বোর্ড কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। কমপক্ষে প্রতি তিন বছর পর পর এই বোর্ড কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। অডিন্যান্স কর্তৃক বোর্ডের জন্য চারটি সার্বক্ষণিক কর্মকর্তার পদবী নির্ধারণ করা হয়েছে।[১৬] পদবীগুলো হচ্ছে, চেয়ারম্যান, রেজিষ্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও মাদরাসা পরিদর্শক।

বোর্ডকে সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে।[১৭] ১. একাডেমিক কমিটি; ২. অর্থ কমিটি; ৩. সিলেকশন কমিটি; ৪. রেজুলেশন কমিটি; ৫. আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি; ৬. কারিকুলাম এন্ড শিক্ষাক্রম কমিটি; ৭. বিজ্ঞান শিক্ষা কমিটি; ৮. টেকনিক্যাল শিক্ষা কমিটি; ৯. শিল্প বিষয়ক শিক্ষা কমিটি; ১০. কৃষি বিষয়ক কমিটি; ১১. বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষা কমিটি; ১২. শারীরিক শিক্ষা কমিটি; ১৩. বালিকা শিক্ষা কমিটি; ১৪. পরীক্ষা কমিটি; ১৫. বয়স ও নাম সংশোধন কমিটি; ১৬. মঞ্জুরী ও কেন্দ্র কমিটি; ১৭. শৃংখলা বিধান কমিটি; ১৮. এছাড়া বোর্ডের প্রয়োজনে অন্যান্য যেকোন কমিটি।

এছাড়া বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে ১৯৭৯ সালে 'Rules and Regulation notification' নামে একটি গেজেট প্রকাশিত হয়। যাতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, তহবিল, শিক্ষক নিয়োগ, ছুটি, অবসর, চাকুরিচ্যুতি, বরখাস্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ের বিধান উল্লেখিত হয়েছে। ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি গঠন প্রক্রিয়ার বিধানও তাতে বর্ণিত হয়েছে।

১৯৭৯ সালের ৪ জুন জনাব বাকী বিল্লাহ খান বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। মাদরাসা-ই-'আলীয়া ঢাকা'য় এক অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বোর্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত জনাব ইয়াকুব শরীফ তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, বখশী বাজারস্থ মাদরাসা-ই-'আলীয়া ভবনের পশ্চিম পাশে অবস্থিত ভূতপূর্ব অনাথ আশ্রমের খালি জায়গা ও দালানকোঠা কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী নিবাস হিসেবে ব্যবহৃত হতো। জনাব ইয়াকুব শরীফ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের স্বতন্ত্র কার্যালয় হিসেবে এটা ব্যবহার শুরু করেন।[১৮]

স্বাধীনতার পর সরকার নিয়ন্ত্রিত এফিলিয়েটিং বোর্ড হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিছু সময় বাংলাদশের খ্যাতনামা ইসলামী শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ[১৯] বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রতিকূল পরিবেশে মাদরাসা শিক্ষার জন্য নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালান।

---

১৫. প্রাগুক্ত, Section 4, Clauses a-j.

১৬. প্রাগুক্ত, Section 6.

১৭. প্রাগুক্ত, Section 18, clauses A-R.

১৮. মাওলানা নুর মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২-৩৩।

১৯. **মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ :** দেশের স্বাধীনতা, ভাষা আন্দোলন, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনসহ ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। তাঁর পিতার নাম মাওলানা আবূ ইসহাক। ১৯০০ সালের ২৭ নভেম্বর (১৩০৭ বাং সালের ১১ অগ্রহায়ণ) তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার তারাভিটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা একজন প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন। ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান হিসেবে ছোট বেলা থেকে ঐতিহ্যগতভাবেই বড় হন। তাঁর পূর্বপুরুষ বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী রহ. এর বংশধর ছিলেন। শাহ সৈয়দ দরবেশ মাহমুদ নামক তাঁর এক পূর্বপুরুষ বাদশাহ 'আলাউদ্দিন খিলজীর আমলে বাংলাদেশে এসে অত্র এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। বাল্য বয়সে মাওলানা পিতৃহারা হন। পিতার নিকট থেকেই তিনি ইসলামী প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। পরে তিনি গাজী বাংগাল অনল প্রবাহের কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় কাটান। গান, কবিতা লেখায় এবং সাহিত্য চর্চায় তিনি তাঁর কাছ থেকে বিরাট জ্ঞান লাভের সুযোগ পান। তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন মাওলানা লেখাপড়ায় কোন ত্রুটি করেন নি। তিনি দেশের ইসলামী শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করার পর দেওবন্দ গমন করেন। সেখানে তিনি মাওলানা শিব্বির আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান যেখানে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যালয় অবস্থিত সেখানে কয়েকটি টিন সেড বিল্ডিং-এর মধ্যে বোর্ডের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম দিকে বোর্ডের নিজস্ব কোন আসবাব পত্র ছিল না। তৎকালীন কামরুন্নেসা গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী নিবাস এর সুপারিনটেনডেন্ট এর বাসভবনটি বোর্ডের ব্যাংক করার জন্য দেয়া হয়। আর তৎকালীন মাদরাসা-ই-আলীয়ার অধ্যক্ষ জনাব ইয়াকুব শরীফ বোর্ডের জন্য মাদরাসার পক্ষ থেকে কিছু আসবাব পত্র ফেরত দেয়ার শর্তে দান করেন। বৈদ্যুতিক পাখাসহ জরুরী সকল আসবাব পত্র ধীরে ধীরে যোগাড় করা হয় এবং খালি জায়গা ও পুকুর ভর্তি করে স্থায়ীভাবে গৃহ ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো হয়। জনাব বাকী বিল্লাহ বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে যথারীতি সকল রেকর্ডপত্র প্রতিস্থাপন পূর্বক এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুনভাবে তৈরী করে বোর্ডকে নতুন উদ্যোগে চালু করতে স্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন। এই বোর্ড জনাব ইয়াকুব শরীফ, জনাব বাকী বিল্লাহ খান, জনাব আবদুল খালেক প্রমূখ ব্যক্তিত্বগণের অকৃত্রিম ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২০] ১৯৯৫ সালে পর্যন্ত বোর্ডে ডিপুটেশন/প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যতিত ১৩৩ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

১৯৮৪ সাল থেকে বোর্ড ইবতিদায়ী হতে কামিল পর্যন্ত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য বই রচনার ব্যবস্থা করে। তবে এসব পাঠ্য বই নির্দিষ্ট কারিকুলাম ব্যাতিতই প্রণীত হয়। ১৯৯৪ খ্রী. বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ১ম-৫ম শ্রেণীর জন্য একটি কারিকুলাম তৈরী করা হয়। এর আলোকে ১৯৯৯ শিক্ষা বর্ষ হতে বোর্ডের নিজস্ব প্রকাশনায় প্রথম বারের মতো ইবতিদায়ী স্তরে পাঠ্য বই প্রণীত হয়। যুগের চাহিদা অনুসারে পুরাতন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর যথাযথ পরিবর্তন করে বিভিন্ন স্তরের মাদরাসার জন্য পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা হয়েছে। সরকারের শিক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষায় নির্ধারণ করা হয়েছে। বোর্ডের 'টেক্সট বুক উইং' বই প্রণয়ন অনুমোদন দান ও কারিকুলামের দায়িত্ব পালন করছে। বোর্ড দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পর্যায়ের কোন কারিকুলাম এখনও প্রণয়ন করতে পারে নি। বোর্ডের পরিকল্পনায় যত দ্রুত

ওসমানীর নিকট হাদীস ও তাফসীর বিষয় অধ্যয়ন করে সনদ প্রাপ্ত হন। দেওবন্দ মাদরাসায় থাকাকালে তিনি হিন্দী, ফারসী ও উর্দূ ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি বাংলা, ইংরেজী, ফারসী, উর্দূ হিন্দীসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় সুপাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

লেখাপড়ার প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন বিধায় দেওবন্দ থেকে বের হয়েই এশা'য়াতুল ইসলাম কলেজ, লাহোরে ভর্তি হন। মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও খাজা কামাল উদ্দিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলেজে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল বিধায় তিনি সেখানে অধ্যয়নের জন্য মনস্থ করেন। তিনি ছিলেন এই কলেজের প্রথম বাংগালী ছাত্র। তৎকালীন সময়ে এই কলেজে অন্যান্য বিষয়ের সাথে তর্কশাস্ত্র পড়ানো হতো। মাওলানা সাহেব অন্যান্য বিষয় সমাপ্ত করার পর এই তর্কশাস্ত্র বিষয়ে অধ্যয়ন করে ডিগ্রী লাভ করেন। 'এশায়তুল ইসলাম কলেজে অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হওয়ার পর তিনি তর্কশাস্ত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবস্থানে পৌছাতে সক্ষম হন। শিক্ষকগণ তাঁর প্রতি বিশেষ নজর দেন। এক পর্যায়ে অধ্যাপকগণের মধ্যে দু'ভাগ করে 'বাহাস' বা তর্ক মঞ্চ তৈরী করে অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এতে অংশ গ্রহণ করতেন। প্রখ্যাত ভাষাবিদ মাওলানা আবদুস সাত্তার এতে সভাপতিত্ব করতেন। সে সময় মুসলমানদের সাথে হিন্দু, খ্রীস্টান, ইত্যাদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতো। মাওলানা তর্কবাগীশকে এসব বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত করা হয়। পর পর এগারটি বিতর্ক সভায় তিনি জয় লাভ করার পর ঐ কলেজ থেকে তাঁকে 'তর্কবাগীশ' উপাধীতে ভূষিত করা হয়। প্রসংগতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁর লাহোরে অবস্থান কালে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার হীন ষড়যন্ত্র শুরু হলে তিনি 'শেষ প্রেরিত নবী' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে তিনি কুর'আন ও হাদীসের যুক্তি দ্বারা কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলমান নন এবং গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মিথ্যাবাদী ও মুসলমানদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে মুসলমানদের পক্ষে জোর প্রচারণা চালান।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাদরাসা শিক্ষাকে বাস্তবমুখী ও বিজ্ঞান সম্মত করার জন্য তিনি তাঁর প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেন। বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন ও কমিটিতে কাজ করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে স্বাধীনতার পর জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাতে তার প্রসংশনীয় অবদান রয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে মাওলানা ছিলেন এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৮৬ সালের ১৫ আগস্ট তিনি ইন্তিকাল করেন। দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৬ ২য় খ)।

২০. মাওলানা নুর মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব কামিল স্তর পর্যন্ত কারিকুলাম প্রণয়ন করে পাঠ্য পুস্তক রচনা করার পরিকল্পনা রয়েছে।[২১] বোর্ডের টেক্সট বুক উইং'-এ লোকবল, সার্বিক কাঠামো এতই দুর্বল যে, একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য তা মোটেই যথার্থ নয়। এনসিটিবির প্রায় সমান কর্মপরিধি হলেও লোকবল ও অফিস কাঠামোর তারতম্যের কোন অনুপাত উল্লেখ করার মতো নয়।[২২]

সরকারী বৃত্তি

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দাখিল, আলিম ও ফাযিল পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের বিধান চালু করে আসছে। প্রতি বছর দাখিল পরীক্ষার জন্য ১২৫ টাকা হারে ৩৬ টি (বিভাগ ওয়ারী) টেলেন্টপুল, ৪০ টাকা হারে ২৩০ টি সাধারণ বৃত্তি, আলিম পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মাসিক ২০০ টাকা হারে ৫টি টেলেন্টপুল, ৬০ টাকা হারে ১০৮টি সাধারণ বৃত্তি এবং ফাযিল পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ৩০০ টাকা হারে ৫টি টেলেন্টপুল, মাসিক ৮০ টাকা হারে ১০৫টি সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সংগে সংগে বৃত্তির কোটা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা বোর্ড অনুভব করে সরকারের নিকট এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত যোগাযোগ করা হচ্ছে।[২৩] ইবতিদায়ী ও নিম্নমাধ্যমিক বৃত্তি অত্র বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বাকী বিল্লাহ'র নামে ইবতিদায়ী স্তরের ৫ম শ্রেণীতে ইবতিদায়ী বৃত্তি পরীক্ষা ও ৮ম শ্রেণীতে নিম্ন মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষা চালু করেছে। ১৯৮৫ সাল হতে এ দু'টি বৃত্তি পরীক্ষা চালু করা হয়। মাদরাসায় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদানে এ দু'টি পরীক্ষা আশানুরূপ ফল দিতে শুরু করেছে। আশা করা যায়, এর ফলে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে।[২৪]

বোর্ডের প্রশংসনীয় কয়েকটি কর্মসূচী

লাম্প গ্রান্ড প্রদান : মাদরাসা শিক্ষার মান উন্নয়নে ও ছাত্র-ছাত্রীদের সুকুমার বৃত্তির পরিস্ফুটনের জন্য বোর্ড ১৯৮১ সাল হতে নিজস্ব তহবিল থেকে (সরকারী বৃত্তির বাইরে) এককালীন লাম্প গ্রান্ড প্রদান করে আসছে। মেধানুযায়ী ৯০% ছাত্রদের আর ১০% ছাত্রীদের মধ্যে দেয়ার বিধান রয়েছে। দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের উপর ৫০০ জনকে ৮০ টাকা, আলিম পরীক্ষার জন্য ৩০০ জনকে ১০০ টাকা এবং ফাযিল পরীক্ষার জন্য ২০০ জনকে ২০০ টাকা হারে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

ফিল্ড গ্রান্ড : মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও খেলাধুলার মানোন্নয়নে বোর্ড মঞ্জুরী প্রাপ্ত মাদরাসার খেলার মাঠ উন্নয়নের জন্যে ১৯৮৩ সাল হতে নির্বাচিত মাদরাসাসমূহে ফিল্ড গ্রান্ড প্রদান করছে।

লাইব্রেরী গ্রান্ড : শিক্ষার্থীদেরকে অধ্যয়নে মনোযোগী ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে মঞ্জুরী প্রাপ্ত মাদরাসসমূহে লাইব্রেরী গ্রান্ড প্রদানের জন্য একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৮৩ সাল থেকে এই গ্রান্ড চালু করা হয়।

---

২১. *ইবতিদায়ী স্তরের কারিকুলাম রিপোর্ট*, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ১৯৯৪, ভূমিকা দ্র.।

২২. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালার রিপোর্ট ও অভিমত, ৫ জুন ১৯৯৬।

২৩. মোঃ আবদুল আজিজ, প্রবন্ধ : বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড : অতীত ও বর্তমান, *স্মরণিকা*, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ১৯৮৫, পৃ ৫।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৪ ও বোর্ডের অফিস রেকর্ড অনুযায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

অডিন্যান্স সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কথা

১৯৭৮ খৃস্টাব্দের ২ মার্চ বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড অডিন্যান্স নামে যে অডিন্যান্স জারী করা হয়েছে, এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করার প্রয়োজন রয়েছে। অর্ডিন্যান্সে অনেকগুলো কমিটি গঠনের কথা থাকলেও অধিকাংশ কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। ফলে এটা জটিলতার কারণও বটে।

তাছাড়া সরকার সময়ে সময়ে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেন, যা অর্ডিন্যান্সের অনেক ধারা/উপধারার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। ফলে স্বায়ত্বশাসনের জন্য এটা এক ধরনের বিব্রতকর অবস্থা। সময়ের চাহিদার আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থা যুগোপযোগী করার প্রয়োজনেই বোর্ডের সার্বিক কার্যক্রমকে সাবলীল করার জন্যও অডিন্যান্সের পরিমার্জন করা অপরিহার্য।[২৫]

ঘ. কাওমী মাদরাসা শিক্ষা

ইসলামী শিক্ষার প্রসারে সরকারী অনুদান বর্হিভূত কাওমী মাদরাসাগুলোর অবদান উল্লেখযোগ্য। এগুলো প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সরকারের কোন অনুমতি বা অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। জনসাধারণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জায়গা ও উপকরণ যোগাড় করে এসব প্রতিষ্ঠা করছে। এসব মাদরাসাগুলো দারুল 'উলূম দেওবন্দকে অনুসরণ করে তাদের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম পরিচালনা করে।

বাংলাদেশে দারুল 'উলূম দেওবন্দের আদর্শে একই উদ্দেশ্যে সিলেবাস ও শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে সর্বপ্রথম কাওমী মাদরাসা হলো, মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসা (১৯০১ খ্রী.)। ১৯৬৪ খ্রী. পর্যন্ত এ দেশে প্রায় ৪৪৩টি কাওমী মাদরাসা স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে ৫১টি দাওরায়ে হাদীস বা টাইটেল স্তর পর্যন্ত। ১৯২০ খ্রী. ইসলামিয়া 'আবারিয়া মাদরাসা, ১৯২৫ খ্রী. ঢাকা ইসলামিয়া মাদরাসা ও ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া মাদরাসা, ১৯৩৬ খ্রী. আশরাফুল 'উলূম বড় কাটরা মাদরাসা, ১৯৪৪ খ্রী. চট্টগ্রাম চকরিয়া কাসেমুল 'উলূম মাদরাসা, ১৯৪৬ খ্রী. জমিরিয়া কাসেমুল 'উলূম মাদরাসা পটিয়া, ১৯৪৮ খ্রী. হোসাইনিয়া 'আরাবিয়া সিলেট, ১৯৪৯ খ্রী. দারুল 'উলূম খাদেমুল ইসলাম ফরিদপুর ও দারুল 'উলূম মাদরাসা বরুড়া, কুমিল্লা, ১৯৫০ খ্রী. 'আযিযুল 'উলূম বাবু নগর মাদরাসা চট্টগ্রাম ও জামিয়া ফোরকানিয়া 'আরাবীয়া লালবাগ, ১৯৫১ খ্রী. আশরাফুল 'উলূম মাদরাসা মোমেনশাহী, ১৯৫৪ খ্রী. কানাঁইঘাট দারুল 'উলূম মাদরাসা, ১৯৫৫ খ্রী. জামি'আ এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ, ১৯৫৮ খ্রী. ওলামা বাজার হোসাইনিয়া দারুল 'উলূম মাদরাসা, নোয়াখালী, ১৯৫৯ খ্রী. এজাজিয়া দারুল 'উলূম যশোর, ১৯৬০ খ্রী. মিফতাহুল 'উলূম মাদরাসা নেত্রকোনা, ১৯৬২ খ্রী. কাওমী মাদরাসা বোর্ড মোমেনশাহী প্রতিষ্ঠিত কাওমী মাদরাসাসমূহের মধ্যে অন্যতম।[২৬]

১৯৭৮ খ্রী. এপ্রিল (১৩৯৯ হি.) মাসে ঢাকার একটি মিলনায়তনে তিন দিন ব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে বেফাকুল মাদারিসিল 'আরবিয়া বাংলাদেশ নামে কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়।[২৭]

কাওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা তিনটি স্তরে বিভক্ত :

প্রথম পর্যায় : আল্ মারাহালাতুল ইবতিদায়ীয়্যাহ বা প্রাথমিক স্তর। ৫ম শ্রেণীর মানে এখানে আরবী, ইসলামিয়াত বাংলা, ইংরেজী, অংক, সমাজ পাঠ ইত্যাদি পড়ানো হয়।

---

২৫. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ, ৫ জুন ১৯৯৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত মাদরাসা শিক্ষা বিষয়ক সেমিনারে এটি পেশ করা হয়। (মাদরাসা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত)

২৬. মাওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ*, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ ১২৮।

২৭. *সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কর্মসূচী*, ঢাকা : বেফাকুল মাদারিসিল 'আরাবিয়া বাংলাদেশ, ১৯৯৭, পৃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পর্যায় : এই পর্যায়ে ৫টি স্তরে বিভক্ত।

১ম স্তর : আল মারাহালাতুল মুতাওয়াসিতা (নিম্ন মাধ্যমিক স্তর), এর মেয়াদ ৩ বছর অর্থাৎ ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।

২য় স্তর :মারহালা সানুবিয়া আম্মাহ (মাধ্যমিক স্তর)। এর মেয়াদ ২ বছর। অর্থাৎ নবম ও দশম শ্রেণী।

৩য় স্তর : মারহালা সানুবিয়া উলইয়া (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, । এর মেয়াদ ২ বছর।

৪র্থ স্তর : মারহালাতুল ফাযিলাত (ডিগ্রী স্তর) এর মেয়াদ ২ বছর।

৫ম স্তর : মারহালাতুল তাকমীল (মাস্টার ডিগ্রী) এর মেয়াদ ২ বছর।

তৃতীয় পর্যায় : গবেষণামূলক শিক্ষা হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, 'আরবী সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস, 'ইলমুল কালাম, ইসলামী দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, পৌর বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা।[২৮]

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের পরিচালনায় ১৩৯টি মজলিশ বা কমিটি রয়েছে।[২৯] এগুলোর উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে :

১. **মজলিশে উমুমী :** বেফাকভুক্ত মাদরাসাসমূহের মুহতামিমবৃন্দ পদাধিকার বলে এর সদস্য।

২. **মজলিশে শু'রা :** মজলিশে উমূমীর সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত ১০০ জন এবং সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ১১ জন সহ মোট ১১১ জন সদস্য নিয়ে এ মজলিশ গঠিত হয়।

৩. **মজলিশে আ'মিলা :** একত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট এ মজলিশ।

প্রতি তিন বছর পর পর শুরা কমিটি ও আ'মিলা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই বোর্ডের কতগুলো বিভাগীয় কমিটি রয়েছে, যথা : মজলিশে 'ইলমী (শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক কমিটি), পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটি, অর্থনৈতিক কমিটি, ইকুইভ্যালেন্ট কমিটি, মারকাযী দারুল ইফতা কমিটি ও পাবলিকেশন্স কমিটি। বিভাগীয় কমিটির অধীনে অনেকগুলো সাব কমিটিও রয়েছে।

১৯৯৭ সনের হিসেব অনুযায়ী ১১৪৬টি মাদরাসা বেফাকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৫৪০ প্রাথমিক মানের, ৫০৭টি মাধ্যমিক উচ্চ স্তর মানের, ৯৭টি মাধ্যমিক নিম্ন স্তর মানের ও ৯৭টি হিফজ এবং ৮টি বালিকা মাদরাসাও রয়েছে।

পরীক্ষা পদ্ধতি : ৭টি স্তরের বালক/পুরুষের এবং ৪টি স্তরের বালিকা/মহিলাদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বোর্ড এদের জন্য প্রশ্ন পত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে।[৩০]

সনদ বিতরণ ও বৃত্তি প্রদান : প্রতিটি স্তরে উত্তীর্ণদের সনদ দেয়া হয়।[৩১] এবং মেধা তালিকার ভিত্তিতে চারটি স্তরে বৃত্তি ও ৩টি স্তরে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রকাশনা : 'বেফাক পাবলিকেশন্স' নামে বোর্ডের একটি প্রকাশনা বিভাগ রয়েছে। এ বোর্ড মাসিক 'আল বেফাক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করারও উদ্যোগ নিয়েছে।

---

২৮. তৃতীয় পর্যায়ের ডিগ্রীর কোন নাম দেয়া হয় নি বা মেয়াদ কাল উল্লেখ করা হয় নি। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬।

৩০. প্রাগুক্ত ।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : দুই

শিক্ষা কমিশন ও কমিটিসমূহে ইসলামী শিক্ষা

[১৯৭১–১৯৯৭ খ্রী.]

কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪

কুদরত-ই-খুদা কমিশন[৩২] ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের ৮ জুন একটি অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। সুচিন্তিত মতামতসহ পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ৩০ মে ১৯৭৪ খ্রী. তারিখে সরকারের নিকট দাখিল করেন। এই কমিশন[৩৩] ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট মতামত পেশ করে নি। ধর্মীয় শিক্ষাকে ঐচ্ছিক ও বৃত্তিমূলক বিষয় হিসেবে দেখানো হয়েছে।

এ কমিশন রিপোর্ট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ একমাস ব্যাপী ভারত সফর করে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর সম্যাক ধারণা লাভ করে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই এই কমিশন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সমূহ উন্নয়নের জন্য গঠিত হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আশা আকাংখার সাথে সংগতিপূর্ণ ও চাহিদা মাফিক ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে কোন সুপারিশ দাখিল করেন নি, পরোক্ষভাবে এই কমিশন ইসলামী শিক্ষাকে শুধু উপেক্ষাই করেন নি, রহস্যজনক কারণে অবজ্ঞাও করেছেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট ১৯৭৬

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বিভিন্ন কমিটি কমিশন যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে তা-ই এখনও চালু আছে। স্বাধীনত্তোর জাতীয় আশা আকাংখার সামগ্রিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচীকে পুংখানুপুংখ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ উপযুক্ত পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বাস্তব পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

---

৩২. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ ৪৩২-৪৩৭।

৩৩. **এই কমিটির সদস্যগণ হলেন** : ১. ড. কুদরত-ই-খুদা [সভাপতি], ২. ড. সুরত আলী [সহসভাপতি], ৩. অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ৩১ জুলাই ১৯৭৩ থেকে ১ আগস্ট ১৯৭৩ পর্যন্ত [সদস্য সম্পাদক], পরবর্তীতে ফেরদৌস খান [প্রাক্তন জন শিক্ষা পরিচালক] সদস্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং এ **কমিটির অন্যান্য সদস্য গণ হলেন** : ৪. এম ইউ আহমেদ [অবসর প্রাপ্ত সদস্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশন], ৫. মোহাম্মদ মোকাররম হোসেন [অধ্যক্ষ, দিনাজপুর কে বি এস মহাবিদ্যালয়], ৬. নুরুস সাফা [প্রাক্তন চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা], ৭. এম এ সাত্তার [প্রাক্তন কারিগরী শিক্ষা পরিচালক, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান (১৯৭৩ এর নভেম্বর থেকে)], ৮. অধ্যাপক আবদুর রাজজাক [অধ্যক্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢা বি], ৯. ড. ফজলে হালীম চৌধুরী [অধ্যক্ষ, ফলিত রসায়ন শাস্ত্র বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়], ১০. ড. আবদুল হক [অধ্যক্ষ, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়], ১১. ড. আনিসুজজামান [অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়], ১২. ড. বিদেশ রঞ্জন বসু [গবেষণা পরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন অর্থনীতি ইনস্টিটিউট, ঢাকা], ১৩. ড. নুরুল ইসলাম [পরিচালক, স্নাতকত্তোর চিকিৎসা ইনস্টিটিউট, ঢাকা], ১৪. ড. এম শামসুল ইসলাম [অধ্যক্ষ, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়], ১৫. ড. আঃ জহরুল হক [অধ্যক্ষ, তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়], ১৬. ড. সিরাজুল হক [অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ঢা বি], ১৭. শ্রীমতি বাসন্তি গুহ ঠাকুরতা [প্রধান শিক্ষয়ত্রী, মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা], ১৮. অধ্যক্ষ আবু সুফিয়ান [অধ্যক্ষ, সরকারী মহাবিদ্যালয় চট্টগ্রাম], ১৯. ড. মাযহারুল ইসলাম [মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী], ২০. ড. এ এম শরফুদ্দীন [পরিচালক, শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র], ২১. ড. মোঃ হাবিবুল্যাহ [অধ্যক্ষ, বাণিজ্য বিভাগ, ঢা বি], ২২. শ্রীমতি হেনা দাস [প্রধান শিক্ষয়ত্রী, নারায়নগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়], ২৩. আশরাফ উদ্দিন আহমদ [সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি]।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, জ্ঞানী, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমন্বয়ে ৩৫ সদস্য[৩৪] বিশিষ্ট এই কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিত্বকে জোরদার করার জন্য আরও ১২ জনকে সংযোজিত করা হয়। ফলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭ জনে।[৩৫]

৪৭ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় এই মূল কমিটির সভায় কাজের সুসমাপ্তি ও সুসমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন স্তর ও বিষয় ভিত্তিক উপ-কমিটি গঠন করা হয়। ১০টি উপ-কমিটি ও ২৭টি বিষয় কমিটি গঠন করা হয়। এসব কমিটির মধ্যে মাদরাসা শিক্ষা ধারার 'কারিকুলাম সাব কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ৫ (পাঁচ) সদস্য[৩৬] বিশিষ্ট এ সাব কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ড. এ কে এম আইউব আলী, অধ্যক্ষ মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা। এই উপ কমিটি মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও এদের বিস্তারিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করে সরকারের নিকট সুপারিশমালা দাখিল করেন। নিম্নে পূর্ণাঙ্গ সুপারিশকৃত পাঠ্যক্রমটি উপস্থাপিত হলো :

---

৩৪. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৯-৪৭০।

৩৫. **কমিটির নাম ও পদবী** : ১. প্রফেসর মুহাম্মদ শামস-উল-হক [চেয়ারম্যান] **এবং সদস্য হিসেবে ছিলেন**: ২. ড. আবদুল করিম [উপাচার্য, চ বি, চট্টগ্রাম], ৩. ড. মফিজউল্যাহ কবীর [প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ঢা বি], ৪. ড. এ এম শরফুদ্দীন [যুগ্মসচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ], ৫. ড. মোহাম্মদ সরকার [বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা], ৬. মোহাম্মদ নুরুস সাফা [জনশিক্ষা পরিচালক], ৭. এম এ সাত্তার [পরিচালক, কারিগরী শিক্ষা], ৮. প্রফেসর এ কে রফিকউল্যাহ [ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢা বি, ঢাকা], ৯. প্রফেসর স হ খ ইউসুফ [পুরোকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়], ১০. প্রফেসর শ ম আজিজুল হক [গণিত বিভাগ, ঢা বি], ১১. প্রফেসর হারুন অর রশীদ [পদার্থ বিজ্ঞান (তাত্ত্বিক), ঢা বি], ১২. প্রফেসর শেখ গোলাম মাহবুব [কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ], ১৩. প্রফেসর এ কে এম নুরুল ইসলাম [উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢা বি], ১৪. প্রফেসর মুহাম্মদ মুহিয়্যদ্দীন [পরিচালক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢা বি], ১৫. প্রফেসর মোহাম্মদ মাহবুবুল হক [রসায়ন বিভাগ, ঢা বি], ১৬. প্রফেসর আবদুল লতিফ মিয়া [প্রধান এগ্রোনমী বিভাগ, কৃষি বিদ্যালয় ময়মনসিংহ], ১৭. প্রফেসর এম এ রকিব [ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যলয়], ১৮. প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক [পরিচালক শিক্ষা, গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢা বি], ১৯. প্রফেসর আমানুল্লাহ আহমদ [প্রফেসর, ইংরেজী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়], ২০. সৈয়দ আহমদ [চেয়ারম্যান, এন সি টি বি], ২১. ড. শামসুদ্দীন মিয়া [চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা], ২২. ড. খলিলুর রহমান [চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী], ২৩. ড. মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীন [চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা], ২৪. ড. মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ [চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর], ২৫. আবদুর রশীদ [চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড], ২৬. মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ [চেয়ারম্যান, মাদরাসা এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা], ২৭. ড. আবদুল হামিদ লতিফ [নির্বাহী পরিচালক, জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা], ২৮. ড. মুহাম্মদ নুরুল হক [পরিচালক, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা], ২৯. মীর এনায়েত হুসাইন [উপসচিব, শিক্ষামন্ত্রণালয়, ঢাকা], ৩০. ড. এ এইচ এম করিম [ডীন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়], ৩১. ড. এ কে এম আইউব আলী [অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা], ৩২. হামিদ আলী শাহ [অধ্যক্ষ, কারিগরী শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা], ৩৩. খোদা বক্স [অধ্যক্ষ, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা], ৩৪. ড. আলিম উল্যাহ খান [প্রকৌশলী সংসদ, ঢাকা], ৩৫. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম [সহঃ অধ্যক্ষ, মোমেনশাহী ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল], ৩৬. মিসেস হোসেনে আরা শাহেদ [অধ্যক্ষা, শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা], ৩৭. মাওলানা মোহাম্মদ সালেহ [অধ্যক্ষ, আলীয়া মাদরাসা, খুলনা], ৩৮. মোঃ খলিলুর রহমান [সভাপতি, বেসরকারী শিক্ষক সমিতি], ৩৯. খোন্দকার আলী আজম [চীফ ইন্সট্রাক্টর, কাউণ্ডী এন্ড মেটালজী পলেটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম], ৪০. রজব আলী [সুপারিটেনডেন্ট, পি. টি. আই, খুলনা], ৪১. হাফিজ উদ্দিন আহমদ [প্রধান শিক্ষক, সরকারী ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা], ৪২. মিসেস শামসুন্নাহার [প্রধান শিক্ষয়ত্রী, সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা], ৪৩. মিসেস আনোয়ারা মনসুর [প্রধান শিক্ষয়ত্রী, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয় ঢাকা], ৪৪. আবদুর রশীদ সরদার [প্রধান শিক্ষক, ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল], ৪৫. জসীম উদ্দিন আহমদ [প্রধান শিক্ষক, ঝিগাতলা, প্রাইমারী স্কুল, ঢাকা], ৪৬. মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার [পরিচালক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী প্রণয়ন কমিটি, বাংলাদেশ, ঢাকা]।

৩৬. **মাদরাসা কারিকুলাম সাব কমিটি ছিল** : ১. এ কে এম আইউব আলী, *চেয়ারম্যান* [অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলীয়া ঢাকা], **সদস্য হিসেবে ছিলেন** : ২. মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ [চেয়ারম্যান, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা], ৩. মাওলানা আলাউদ্দিন আযহারী [শিক্ষক, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা], ৪. ড. এম ইসহাক [চেয়ারম্যান, আরবী ও ইসলাম শিক্ষা বিভাগ, ঢা বি], ৫. একে এম বোরহানুদ্দীন [বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস কমিটি, ঢাকা]।

Dhaka University Institutional Repository

স্তরের নাম ও মেয়াদ	পাঠ্য বিষয়ের নাম	মোট নম্বর
ইবতেদায়ী (প্রাইমারী) ৪ বছর	১. কুর'আন তাজবীদসহ উর্দূ পঠন	১০০
	২. দীনিয়াত	১০০
	৩. 'আরবী	১০০
	৪. বাংলা	১০০
	৫. গণিত	১০০
	৬. ইতিহাস	১০০
	৭. ভূগোল	১০০
	৮. সাধারণ বিজ্ঞান	১০০
	৯. শারিরীক শিক্ষা	১০০
	১০. আর্টস এন্ড ক্রাকটস (চারু ও কারু)	১০০
২. দাখিল (মাধ্যমিক) ৬ বছর	১. কুর'আন মাজীদ তাজবীদসহ পাঠভ্যাস	১০০
	২. নির্বাচিত সূরার অনুবাদ	১০০
	৩. আকাইদ	১০০
	৪. আল-ফিকহ	১০০
	৫. উসূলে ফিকহ	১০০
	৬. 'আরবী সাহিত্য	১০০
	৭. 'আরবী ব্যাকরণ ও অনুবাদ	১০০
	৮. বাংলা	১০০
	৯. গণিত	১০০
	১০. সমাজ বিজ্ঞান (ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরনীতি)	১০০
	১১. সাধারণ বিজ্ঞান	১০০
	১২. ইংরেজী	১০০
	১৩. শারীরিক শিক্ষা ও আর্টস এন্ড ক্রাফট্স	১০০
	১৪. ফারসী অথবা উর্দূ	১০০
	ক. মানবিক বিভাগ	
৩. আলিম উচ্চ মাধ্যমিক ২ বছর	১. পবিত্র কুর'আন (অনুবাদ)	১০০
	২. আল-হাদীস ও উসূলে হাদীস	১০০
	৩. আরবী সাহিত্য	১০০
	৪. আল-ফিকহ	১০০
	৫. উসূলে ফিকহ	১০০
	৬. 'ইলমুল মীরাস	১০০
	৭. ইলমুল মানতিক	১০০
	৮. ইসলামের ইতিহাস	১০০
	৯. বাংলা	১০০
	১০. নিম্নের বিষয়ের যে কোন দুটো (ঐচ্ছিক) ১. ইংরেজী, ২. উর্দূ, ৩. ফারসী ৪. সাধারণ বিজ্ঞান	২০০

Dhaka University Institutional Repository

আলিম উচ্চ মাধ্যমিক ২ বছর	খ. বিজ্ঞান বিভাগ	পূর্ণমান
	১. আল-কুর'আন এর অনুবাদ	১০০
	২. আল-হাদীস ও উসূলে হাদীস	১০০
	৩. 'আরবী সাহিত্য	১০০
	৪. আল-ফিকহ	১০০
	৫. 'ইলমুল মীরাস	১০০
	৬. বাংলা	১০০
	৭. ইংরেজী	১০০
	৮. সাধারণ গণিত	১০০
	৯. পদার্থ বিজ্ঞান	১০০
	১০. রসায়ন বিজ্ঞান	১০০
	১১. উদ্ভিদ বিজ্ঞান	১০০
	১২. ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন দু'টি) ১. গণিত, ২. উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ৩.উচ্চতর ইংরেজী, ৪. উর্দু, ৫. ফারসী ৬. উচ্চতর বাংলা, ৭. কৃষি, ৮. ইসলামের ইতিহাস, ৯. উসূলে ফিকহ, ১০. তর্ক শাস্ত্র।	২০০

৪. ফাযিল ২ বছর	ক. কলা বিভাগ	পূর্ণমান
	১. তাফসীরুল কুর'আনুল কারীম ও উসূলে তাফসীর	১০০
	২. আল হাদীস ও উসূলে হাদীস	১০০
	৩. 'আরবী সাহিত্য (পদ্য, গদ্য, ব্যাকরণ ও অনুবাদ)	১০০
	৪. আল-ফিকহ	১০০
	৫. উসূলে ফিকহ	১০০
	৬. 'উলূমুত তাওহীদ ওয়াল আকাঈদ	১০০
	৭. ইসলামের ইতিহাস	১০০
	৮. বাংলা	১০০
	৯. ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন দু'টি) ১. ইংরেজী ২. উর্দু, ৩. ফারসী, ৪. তর্ক শাস্ত্র ৫.আত্ তাসাউফ, ৬. অর্থনীতি, ৭. ইসলামী দর্শন, ৮. আল আখলাক ওয়াল আদাবুল ইসলামী, ৯. কৃষি, ১০. আধুনিক অর্থনীতি	২০০

Dhaka University Institutional Repository

	খ. বিজ্ঞান বিভাগ	পূর্ণমান
	১. আত-তাফসীর	১০০
	২. আল-হাদীস	১০০
	৩. 'আরবী সাহিত্য (গদ্য ও পদ্য)	২০০
	৪. বাংলা	১০০
	৫. ইংরেজী	১০০
	৬. পদার্থ বিজ্ঞান	১০০
	৭. রসায়ন বিজ্ঞান	১০০
	৮. জীব বিজ্ঞান/গণিত	১০০
	৯. ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন দু'টি) ১. গণিত, ২. প্রাণী বিজ্ঞান, ৩. উচ্চতর বাংলা, ৪. উচ্চতর ইংরেজী, ৫. কৃষি, ৬. আল-ফিকহ ও আল উসূলে ফিকহ ৭. ইসলামের ইতিহাস,	২০০

৫. কামিল (২ বছর)	ক. হাদীস বিভাগ	পূর্ণমান
	১. হাদীস (৬টি পত্র সিয়াহ সিত্তাহ ও উসুলে হাদীস)	৬০০
	২. তাফসীর (২টি পত্র আল-কাশশাফ ও আল বায়যাবীর নির্বাচিত অংশ এবং উসুলে তাফসীর)	২০০
	৩. ইসলামের ইতিহাস (২টি পত্র)	২০০
	খ. তাফসীর বিভাগ	
	১. তাফসীর ৪টি পত্র (কাশশাফ ও বায়যাবী)	৪০০
	২. উসূলুত তাফসীর ৫টি পত্র	৫০০
	৩. আল হাদীস ১টি পত্র (কিতাবুত তাফসীর)	১০০
	৪. ফিকহুল কুর'আন (১টি পত্র)	১০০
	৫. ইজাযুল কুর'আন ও মায়ানিউল কুর'আন (১টি পত্র)	১০০
	৬. ইসলামের ইতিহাস (১টি পত্র)	১০০
	গ. ফিকহ বিভাগ	
	১. আল-হাদীস (জা'মিউল বুখারী)	২০০
	২. 'ইলমুত তাওহীদ ওয়াল কালাম	২০০
	৩. আল ফিকহুল ইসলামী	২০০
	৪. ইসলামের ইতিহাস	২০০
	ঘ. আল আদাবুল 'আরবী বিভাগ	
	১. 'আরবী সাহিত্য (ক্লাসিক্যাল গদ্য)	২০০
	২. 'আরবী সাহিত্য (ক্লাসিক্যাল পদ্য)	২০০
	৩. 'আরবী সাহিত্য (আধুনিক গদ্য)	২০০
	৪. 'আরবী সাহিত্য (আধুনিক পদ্য)	২০০
	৫. বালাগাত (অলংকার ও ছন্দ প্রকরণ)	১০০
	৬. সাহিত্য সমালোচনা	১০০
	৭. শিক্ষা ও কলা-কৌশল	১০০
	৮. 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস	১০০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্কীম [ড. এম এ বারী কমিটি ১৯৭৭]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে এ ভূখণ্ডে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী উঠে। পাক-ভারত বিভক্ত হওয়ার পর এ দাবী আরো প্রবল আকার ধারণ করে। বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন ও কমিটি এ ব্যাপারে সুপারিশও দাখিল করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুসলমানদের দাবীর প্রতি লক্ষ্য করে স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট (চীপ মার্শাল 'ল এডমিনিস্ট্রেটর) মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ঘোষণা করেন, দেশে একটি ইসলামী ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে।[৩৭] এই ইউনিভার্সিটি জাতির লক্ষ্য ও যুগের চাহিদার সাথে যুগপৎ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে প্রধান ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি ঘোষণায় উল্লেখ করেন। এ ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ২৭ জানুয়ারী, ১৯৭৭ খৃ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. এম এ বারীকে চেয়ারম্যান করে সরকার ৭ সদস্য[৩৮] বিশিষ্ট একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করেন।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবূ সা'দাত মুহাম্মদ সায়েম ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বঙ্গভবনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ কমিটির কাজের শুভ সূচনা করেন। কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও তৎকালীন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত) প্রফেসর আবুল ফযলসহ অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই কমিটির রিপোর্ট ২০ অক্টোবর, ১৯৭৭ খ্রী. চীফ মার্শাল 'ল এডমিনিস্ট্রেটর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেয়া হয়।

এই কমিটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কতগুলো নীতিগত সিদ্ধান্তের সুপারিশ করেন। যথা :

১. এ বিশ্ববিদ্যালয় একটি রেসিডেন্সিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এর সাথে কোন এফিলিয়েটেড কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে না। এটা শুধু একমুখী বিশ্ববিদ্যালয় হবে, যা কেবল শিক্ষার্থীদের কাজে নিয়োজিত থাকবে।

২. সাধারণ শিক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রগণ এখানে ভর্তি হতে পারবেন, মাদরাসার ছাত্রগণের সমপর্যায় নির্ধারণ করে এখানে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. এ বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বিষায়াদীর উপর সম্মান ও স্নাতকোত্তর এবং পিএইচ ডি ডিগ্রী প্রদান করবে। অধ্যয়ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি সেমিষ্টার পদ্ধতিতে চলবে।

৪. দু'টি অনুষদের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম চালু করবে, যথা : ইসলামী বিষয় এবং কলা ও বিজ্ঞান অনুষদ।

৫. এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ধারণ ক্ষমতা হবে ২০০০ জন। যাদের সকলকে আবাসিক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের হলে রাখার সুযোগ করে দিতে হবে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট সম্পর্কে সুপারিশ

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব প্রশাসনিক আওতায় নিম্নে উল্লেখিত ইনস্টিটিউটসমূহ খোলার সুপারিশ করা হয়। যথা :

১. 'ইনস্টিটিউট অব ইডুকেশনাল রিসার্চ' নামে একটি ইনস্টিটিউট থাকবে। যেখানে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক এবং মাদরাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে।

---

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৫।

৩৮. **কমিটির পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি হলো :** ১. ড. এম এ বারী, *চেয়ারম্যান* [সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, রা বি] ২. আহমদ হোসাইন [প্রাক্তন ও এম ডি (লাইব্রেরী উন্নয়ন) শিক্ষাপরিদপ্তর ও প্রাক্তন পরিচালক, ইসলামী একাডেমী], ৩. আবদুল হাদী তালুকদার [প্রাক্তন রেজিস্ট্রার, ঢা বি], ৪. ড. এ মুক্তাদির [প্রধান, স্থাপত্য বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা], ৫. ড. ইখলাস উদ্দিন আহমদ [প্রফেসর, পদার্থ বিজ্ঞান, চ বি], ৬. ড. এ কে এম আইয়ূব আলী [অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা], ৭. মাওলানা আবদুস সালাম [অধ্যক্ষ, আহমদিয়া আলীয়া মাদরাসা, মাদারীপুর (ফরিদপুর)।

Dhaka University Institutional Repository

২. 'ব্যুরো অব ট্রান্সলেশন' নামে একটি ইনস্টিটিউট থাকবে। যার মাধ্যমে অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হবে এবং উপযুক্ত ও মান সম্পন্ন বই পুস্তক প্রকাশ করবে। রেফারেন্স, লিটারেচার, জার্নাল ও গবেষণামূলক বই পুস্তকের অনুবাদেরও এ প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব পালন করবে।

৩. 'মধ্যপ্রাচ্য শিক্ষা ইনস্টিটিউট' নামে অন্য একটি ইনস্টিটিউট থাকবে, যার মাধ্যমে মুসলিম দেশের ভাষা, অতীত ও বর্তমান অবস্থার ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কিত শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি ল্যাবরেটরী স্কুল কাম মাদরাসা স্থাপন করবে। সেখানে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের 'প্রাকটিচ টিচিং' এর ব্যবস্থা থাকবে। 'আরবী কথোপকথনের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এই মাদরাসা ব্যবহার করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পাঠ দানের জন্যও এটি ব্যবহৃত হবে।

রিপোর্টের বাস্তবায়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের ২১ নভেম্বর কুষ্টিয়া-যশোর সীমান্তের শান্তি ডাঙ্গায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৮০ খ্রী. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়। ১৯৮২ খ্রী. এক অর্ডিন্যান্স বলে এই আইনের সংশোধন আনা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মুসলিম দেশ যথা- সৌদী আরব, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া, মিসরসহ কয়েকটি দেশের সরকার প্রধান ও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। পরবর্তীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ঢাকার অদূরে গাজীপুরের বোর্ড বাজারে পুনরায় স্থাপন করা হয়। ১৯৮৩ খ্রী. ২১ জুলাই গাজীপুরের টঙ্গীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। এই গাজীপুরেই প্রশাসনিক ভবন, শ্রেণী কক্ষ, অডিটোরিয়াম, খেলার মাঠ, মসজিদসহ ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। যথারীতি এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের অজুহাতে আবার পূর্ব নির্ধারিত স্থান কুষ্টিয়ার শান্তি ভাঙ্গায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থানান্তরিত করা হয়। অদ্যাবধি কুষ্টিয়াতেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যে তিনটি অনুষদ নিয়ে তার কার্যক্রম শুরু করে, তার বিষয় ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ :

অনুষদের নাম	বিষয়ের নাম
১. ইসলামী শিক্ষা অনুষদ	১. আল কুর'আন ওয়া 'উলূমুল কুর'আন, ২. আল হাদীস ওয়া 'উলূমুল হাদীস, ৩. আল শরীয়াহ ওয়া উলূমুশ শরী'আহ, ৪. 'উলূমুত তাওহীদ ৫. আল ফালসাফাহ আত্ তাসাউফ ওয়াল আখলাক।
২. কলা অনুষদ	১. 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ৩. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ৪. অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতির থিওরী ও প্রাকটিস ৫. পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন তৎসহ থিওরী ও ইসলামী এডমিনিস্ট্রেশন ৬. তুলনামূলক ধর্ম, ৭. ভাষা শিক্ষা ও ৮. বাণিজ্য বিভাগ।
৩. বিজ্ঞান অনুষদ	১. গণিত, ২. পদার্থ বিজ্ঞান, ৩. রসায়ন বিজ্ঞান, ৪. উদ্ভিদ বিজ্ঞান ৫. প্রাণী বিজ্ঞান।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি ১৯৭৯ [জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি]

১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশ আমলের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটি সমূহের রিপোর্ট ও সুপারিশগুলোকে পর্যালোচনা করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ এজন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

প্রথম দিকে শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ এবং ১২ অক্টোবর '৭৮ খ্রী. হতে ৩ ফেব্রুয়ারী '৭৯ খ্রী. পর্যন্ত তৎকালীন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মুহাম্মদ আবদুল বাতেন এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।[৩৯]

এই কমিটির কার্যক্রমে মাদরাসা শিক্ষার ব্যাপারে নিম্নরূপভাবে সুপারিশ করা হয় :

১. মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও উৎপাদনমুখী করার প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে।

২. মাদরাসা শিক্ষার ইবতিদায়ী স্তরগুলোকে সার্বজনীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে। তবে উক্ত পাঠ্য তালিকায় মাদরাসা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একটি অতিরিক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৩. মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর তুলনায় চূড়ান্ত পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করতে দু'বছর সময় অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয় বলে সে সময় কমিয়ে ব্যয়িত সময়ের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। এর জন্য পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের জন্য মাদরাসা বোর্ড ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫. শিক্ষা দান পদ্ধতিকে আধুনিকায়ন করার জন্য অবিলম্বে 'বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট'-এর অধীনে মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করতে হবে।

---

৩৯. এ **কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ** : ১. ড. ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদ [উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়], ২. ড. মুসলেহ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী [উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়], ৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল বারী [উপাচার্য, রা বি], ৪. ড. ফজলুল হালীম চৌধুরী [উপাচার্য, ঢা বি], ৫. প্রফেসর এম আই চৌধুরী [অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, ঢা বি], ৬. ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী [অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢা বি], ৭. ড. মুহাম্মদ ইউনুস [অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চ বি], ৮. ড. সৈয়দ শফিউল্যাহ [ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশন], ৯. এম শরীফুল ইসলাম [প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি], ১০. ড. এ কে এম ওবায়দুল্লাহ [অধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঢাকা, প্রতিনিধি সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি], ১১. আবদুল খালেক [প্রধান শিক্ষক, বাড্ডা আলফাতুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা, প্রতিনিধি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি], ১২. মীর আবদুল বাতেন [সহকারী শিক্ষক, খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি], ১৩. আবদুল কাদের সরকার [ইনস্ট্রাক্টর, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিনিধি, পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি], ১৪. মাওলানা এম এ মান্নান [প্রতিনিধি, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেসীন], ১৫. আবদুল কালাম আজাদ [প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি], ১৬. হাজী মোঃ দানেশ [শিক্ষানুরাগী], ১৭. কামরুল হাসান [শিল্পী], ১৮. আনোয়ার হোসেন মঞ্জু [সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা], ১৯. আতাউস সামাদ [সাংবাদিক, দি বাংলাদেশ টাইমস], ২০. ফয়েজ আহমেদ [শিশু সাহিত্যিক], ২১. ড. এনামুল হক [পরিচালক, ঢাকা জাদুঘর], ২২. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান [সচিব, কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়], ২৩. এম এ সাত্তার [সচিব, পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়], ২৪. ড. মিজানুর রহমান শেলী [পরিচালক, সমাজ কল্যাণ বিভাগ], ২৫. কর্ণেল এ কে এম শামসুল ইসলাম [পরিচালক, সেনা শিক্ষা পরিদপ্তর], ২৬. জাহানারা ইমাম [শিক্ষানুরাগী], ২৭. হোসনে আরা শাহেদ [অধ্যক্ষ, শেরেবাংলা মহিলা কলেজ, ঢাকা], ২৮. ড. ইকবাল মোহাম্মদ [অধ্যাপক, কেমিকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়], ২৯. ড. আহমেদ শামসুল ইসলাম [অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ, ঢা বি], ৩০. ড. আশরাফ সিদ্দিকী [মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা], ৩১. ড. জাফর উল্লাহ চৌধুরী [গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা], ৩২. আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী [জেলা প্রশাসক, ঢাকা], ৩৩. মোহাম্মদ শাহজাহান [পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খুলনা], ৩৪. কাজী জাহানারা খান [পরিচালক, একাডেমী ফর ফান্ডামেন্টাল এডুকেশন, ময়মনসিংহ], ৩৫. মোঃ মজিদুল হক [সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২৬ জানুয়ারী '৭৯ পর্যন্ত)], ৩৬. কাজী ফজলুর রহমান [সচিব, [শিক্ষা মন্ত্রণালয় (৫ ফেব্রুয়ারী '৭৯ থেকে)], ৩৭. ড. আ ম শরফুদ্দীন [অতিরিক্ত সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়], ৩৮. ড. মোঃ সেলিম [উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়], ৩৯. ড. খলিলুরর রহমান [জনশিক্ষা পরিচালক], ৪০. আবদুর রাযযাক [ভারপ্রাপ্ত জনশিক্ষা পরিচালক], ৪১. আবদুস সাত্তার [পরিচালক, কারগিরী শিক্ষা], ৪২. কাজী মোহাম্মদ মনজুরে মাওলা [যুগ্মসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়]।

Dhaka University Institutional Repository

৬. মাদরাসা শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের পর দাখিল স্তরকে মাধ্যমিক, আলিম স্তরকে উচ্চ মাধ্যমিক, ফাযিলকে স্নাতক, এবং কামিল স্তরকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমর্যাদা প্রদান করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৭. মাদরাসা শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন কাঠামো ও সুযোগ সুবিধা, স্তর ও পদবী অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষার সাথে বৈষম্য দূর করার নিমিত্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮. যেসব ইবতিদায়ী মাদরাসাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে, সেগুলোর শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুসারে রূপান্তরিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি প্রদান করতে হবে।

৯. মাদরাসা শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম বেতনক্রম প্রণয়ন ও প্রবর্তন সম্পর্কিত কমিটির রিপোর্ট ১৯৭৯

১৯৭৮ খ্রী. তৎকালীন শিক্ষকদের যৌথসংগঠন 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন' বেসরকারী শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালা ও বেতনমালা নির্ধারনের জন্য আন্দোলন করছিলেন। আন্দোলনরত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে ৬ ডিসেম্বর ১৯৭৮ খ্রী. তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এক প্রেস নোটের আলোকে বেসরকারী শিক্ষকগণের বেতনক্রম প্রবর্তন ও প্রদানের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হককে সভাপতি করে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি[৪০] গঠন করেন। এ কমিটি ৮ মে ১৯৭৯ খ্রী. কাজ শুরু করে বলে এ কমিটিকে ১৯৭৯ খ্রী. কমিটি বলেই গণ্য করা হয়।

এই কমিটি তাদের প্রণয়ন কৃত রিপোর্টে দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ধারার বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত শিক্ষকদের মত মাদরাসার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের বেতনক্রমসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিধি ও নীতিমালা নির্ধারণ করেন।

ক. কামিল মাদরাসা

১. **শিক্ষার্থী সংখ্যা :** দাখিল, আলিম, ফাযিল শ্রেণীসহ এ স্তরের ন্যূনতম ছাত্র সংখ্যা হবে ৪০০ জন।

২. **শিক্ষক সংখ্যা :** অধ্যক্ষ ১ জন, মুহাদ্দিস/ফকিহ ইত্যাদি ১২ জন, প্রভাষক ২ জন, সহকারী মাওলানা ২ জন, জুনিয়র মাওলানা ৩ জন এবং বাংলা/ইংরেজী/গণিত বিজ্ঞান শিক্ষক ৪ জন, মোট = ২৪ জন।

৩. **অবস্থান :** এক মাদরাসা হতে অন্য নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সম পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব হবে অন্ততঃ ৬ কি. মি এবং সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪. **জমি :** গ্রামাঞ্চলে ১ একর এবং শহরাঞ্চলে ২ একর।

৫. **পরীক্ষার ফলাফল :** মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত বিগত ২ বছরের পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪০% ও প্রতিবছর ন্যূনপক্ষে ১০ জন পাস করতে হবে।

খ. ফাযিল মাদরাসা

১. **শিক্ষার্থী সংখ্যা :** দাখিল আলিম সহ ৩৫০ জন।

২. **শিক্ষক সংখ্যা :** অধ্যক্ষ ১ জন, প্রভাষক ২ জন, সহকারী মাওলানা ২ জন, জুনিয়র মাওলানা ৩ জন, বাংলা/ইংরেজী/গণিত/বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক ৪ জন, মোট ১২ জন।

৩. **অবস্থান :** এক মাদরাসা হতে অন্য নিম্ন মাধ্যমিক/ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব অন্তত ৬ কি. মি. হবে এবং সুষ্ঠু যোগাযোগের আওতায় থাকতে হবে।

৪. **জমি :** ক. গ্রামাঞ্চলে ২ একর, খ. শহরাঞ্চলে এক একর।

---

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯০- ৫০৮; **কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী :** ১. কাজী আনোয়ারুল হক, *চেয়ারম্যান* [রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী], ২. এম সাইফুর রহমান [বাণিজ্যমন্ত্রী], ৩. আবদুল বাতেন [শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী]।

Dhaka University Institutional Repository

৫. **পরীক্ষার ফলাফল :** মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত বিগত ২ বছর ফাযিল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪০% ও প্রতি বছর ন্যূনপক্ষে ১৫ জন ছাত্র/ছাত্রী পাস করতে হবে।

গ. আলিম মাদরাসা

১. **শিক্ষার্থী সংখ্যা :** দাখিলসহ আলিম মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ৩০০ জন।

২. **শিক্ষক সংখ্যা :** সুপারিনটেনডেন্ট ১ জন, সহকারী মাওলানা ২ জন, জুনিয়র মাওলানা ৩ জন, বাংলা/ইংরেজী/গণিত/বিজ্ঞান শিক্ষক ৪ জন।

৩. **অবস্থান :** এক মাদরাসা হতে অন্য মাদরাসার/মাধ্যমিক/নিম্ন মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব অন্তত ৬ কি.মি হবে এবং সুষ্ঠু যোগাযোগের আওতায় থাকতে হবে।

৪. **জমি :** ক. গ্রামাঞ্চলে ১ একর, খ. শহরাঞ্চলে এক-চতুর্থাংশ একর।

৫. **পরীক্ষার ফলাফল :** মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত বিগত ২ বছর আলিম পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪০% ও প্রতি বছর ১০ জন শিক্ষার্থীকে পাস করতে হবে।

ঘ. দাখিল মাদরাসা

১. **শিক্ষার্থী সংখ্যা :** গ্রামাঞ্চলে ২০০ জন, শহরাঞ্চলে ২৫০ জন।

২. **শিক্ষক সংখ্যা :** সুপারিনটেনডেন্ট ১ জন, সহকারী মাওলানা ১ জন, জুনিয়র মাওলানা ৩ জন, বাংলা/ইংরেজী/গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষক ৩ জন।

৩. **অবস্থান :** এক মাদরাসা হতে অন্য নিম্ন মাধ্যমিক/মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব অন্তত ৪ মাইল হবে।

৪. **জমি :** গ্রামাঞ্চলে ১ একর শহরাঞ্চলে এক চতুর্থাংশ একর।

৫. **পরীক্ষার ফলাফল :** মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত দাখিল পরীক্ষার বিগত দু'বছরে কমপক্ষে ৪০% ও প্রতি বছর ন্যূনপক্ষে ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পাস করতে হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৮৮ [মফিজ উদ্দিন কমিশন]

২৩ এপ্রিল ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৮/১০/এম-৮/৮৬/২৭৮/(১৫০) প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা ও বর্তমান পরিস্থিতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ দাখিল করার নিমিত্তে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এই শিক্ষা কমিশন[৪১] গঠন করা হয়। সভাপতির নামানুসারে এ কমিশন 'মফিজ উদ্দিন কমিশন' নামে খ্যাত।

---

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ ৫০৯-৫১৪; **কমিশনের বিস্তারিত বিবরণ :** ১. অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহম্মদ, *চেয়ারম্যান*, [প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর], ২. মোমিন উদ্দিন আহম্মদ [জাতীয় সংসদ সদস্য], ৩. প্রিন্সিপাল মোঃ আজহারুল হক [জাতীয় সংসদ সদস্য] ৪. এ কে এম শামসুল হুদা [জাতীয় সংসদ সদস্য], ৫. মুহাম্মদ আয়েন উদ্দিন [জাতীয় সংসদ সদস্য], ৬. অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার [জাতীয় সংসদ সদস্য], ৭. কাজী ফজলুর রহমান [সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন], ৮. ড. নুরুল ইসলাম [জাতীয় অধ্যাপক], ৯. অধ্যাপক এ মান্নান [ভাইস চ্যান্সেলর, ঢা বি], ১০. অধ্যাপক এম এ রকীব [ভাইস চ্যান্সেলর, রা বি], ১১. ড. মোমতাজ উদ্দিন [ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়], ১২. অধ্যাপক মোশারফ হোসেন খান [ভাইস চ্যান্সেলর, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়], ১৩. অধ্যাপক জেড এইচ ভূঞা [কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়], ১৪. আবদুর রশীদ [রেজিস্ট্রার, চ বি], ১৫. ড. মুহাম্মদ ইউনুস [ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীন ব্যাংক], ১৬. বোরহান উদ্দিন আহমদ [প্রাক্তন সচিব, বাংলাদেশ সরকার], ১৭. ড. আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন [প্রাক্তন সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ], ১৮. নুরুস সাফা [প্রাক্তন জনশিক্ষা পরিচালক], ১৯. ড. নুরুল হক [প্রাক্তন মহাপরিচালক, নিয়েয়ার], ২০. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ২১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ২২. মহাপরিচালক, কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর, ২৩. মোঃ আবুল কাশেম [অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ], ২৪. এ কে এম শহীদুল্লাহ [প্রিন্সিপাল, শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজ], ২৫. মিসেস কিউ এ মনসুর [প্রধান শিক্ষিকা, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়], ২৬. মোহাম্মদ নুরুল হক [প্রধান শিক্ষক, গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা], ২৭. আবুল হোসেন [প্রধান শিক্ষিকা, নবাবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়], ২৮. অধ্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

কমিশন গঠনের পর ৯ মে ১৯৮৭ খ্রী. অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় একটি স্টিয়ারিং কমিটি, ১২টি অনুধ্যান কমিটি এবং দুটি শাখা কমিটি গঠন করা হয়। অনুধ্যান কমিটিসমূহের মধ্যে মাদরাসা শিক্ষা কমিটি নামে একটি কমিটি[৪২] গঠন করা হয়।

কমিটি বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য, পটভূমি, সমস্যা, অবস্থার পর্যালোচনা, স্তর বিন্যাসসহ সার্বিক বিষয়ের ওপর একটি যুগান্তকারী সুপারিশমালা সরকারের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন। ক্রমানুসারে এখানে তা উল্লেখ করা হলো :

মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য

মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন ও আল হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শরি'আতে আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাস এবং সর্বোপরী মানবিক সকল কার্যাবলী আল্লাহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত করার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের গৌরবময় যুগে অবিনশ্বর ও নশ্বর দুটি দিকের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করার জন্য ধর্মীয় এবং জাগতিক শিক্ষাকে পৃথকরূপে না ভেবে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে সমন্বিত ইসলামী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপই হচ্ছে মাদরাসা শিক্ষা।

পটভূমি

বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাস আলোচনায় এর পেক্ষাপট আলোচনা করা দরকার। ১৭৮০ খ্রী. কলকাতা আলীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হওয়ার মধ্যদিয়েই এ দেশে মাদরাসা শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। সরকারী অফিস আদালতে বিচারকর্ম ও কেরানীর কাজ করার জন্য মূলতঃ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজরা বাধ্য হয়েছিল। কারণ মুসলিম আইন কানুনগুলো আদালতে চালু করা তাদের দেশ শাসনের জন্য প্রয়োজন ছিল। ১৮৩৫ খ্রী. মাদরাসা শিক্ষায় ইংরেজী প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু যখনই ১৮৩৭ খ্রী. ইংরেজীর পরিবর্তে ফার্সী চালুর আদেশ দেয়া হয়। তখনই মাদরাসা গুলো 'সরকারী কর্মচারী প্রস্তুতির ক্ষেত্র' বিবেচিত না হয়ে গুরুত্বহীন হতে বাধ্য। কিন্তু মুসলমানদের ধর্মচর্চা ও ঐতিহ্যগত কারণে মাদরাসা পুনর্গঠন ও পরিচালনার তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পে মাদরাসা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় মুসলমানরা তাতে অনুকূল সাড়া না দিয়ে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা ধারা হিসেবে মাদরাসা শিক্ষা ধারা গড়ে তোলার জোরদার আন্দোলন সৃষ্টি করে। সে কারণে তৎকালীন সরকার ঢাকা চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আরো তিনটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে। এই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে বেসরকারী উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ শতকের প্রথমদিকে কলকাতা মাদরাসা কেন্দ্রিক 'নিউস্কীম মাদরাসার' উদ্ভব ঘটে।

'নিউস্কীম মাদরাসা'র শিক্ষাক্রমের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষাসহ উর্দূ বাংলা, 'আরবী, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজী, অংক, হাতের কাজ, শরীর চর্চা ইত্যাদি চালু করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ মাদরাসা শিক্ষার এ ধারায় চালু করা হয়। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের মাওলানা

শামসুল হক [সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন], ২৯. অধ্যাপক ইউনুস শিকদার [অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা], ৩০. নুরুদ্দীন আল-মাসুদ, সদস্য সচিব, [অতিরিক্ত সচিব শিক্ষা বিভাগ]।

৪২. **মাদরাসা কমিটির সদস্যগণ হচ্ছেন** : ১. ড. মমতাজ উদ্দিন আহমদ, *আহবায়ক*, [উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়], **সদস্যগণ হলেন** : ২. মোঃ ইউনুস শিকদার [অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা], ৩. মোঃ আয়েন উদ্দিন [সংসদ সদস্য], ৪. এম এ সোবহান [মহাপরিচালক, ইফাবা], ৫. অধ্যাপক এ বি এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী [ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ঢা বি], ৬. অধ্যাপক মোঃ মজিবুর রহমান [আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, রা বি], ৭. ড. মুস্তাফিজুর রহমান [আরবী বিভাগ, ঢা বি], ৮. অধ্যাপক আবদুর রকিব, [চেয়ারম্যান, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা], ৯. ড. মোঃ ইসহাক [সাবেক অধ্যাপক, ঢা বি], ১০. মাওলানা আবদুস সালাম [অধ্যক্ষ, দুর্বাটি আলীয়া মাদরাসা, গাজীপুর], ১১. খন্দকার নাসির উদ্দিন [চান্দিনা ফাযিল মাদরাসা], ১২. মাওলানা ফখরুদ্দীন [মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা], ১৩. মাওলানা ওয়াজিউল্যাহ [মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা], ১৪. ড. মোঃ নুরুল হক [প্রাক্তন মহাপরিচালক নিয়েবার, ঢাকা], ১৫. আবু বকর রফিক আহমদ [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়], ১৬. তমিজ উদ্দিন [বিশেষজ্ঞ, এন সি টি বি], ১৭. মাওলানা উবায়দুল হক [প্রাক্তন হেড মাওলানা, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা]।

Dhaka University Institutional Repository

আকরম খাঁ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের আলোকে এই ধারার মাধ্যমিক ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্তরকে সাধারণ কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। সাথে সাথে কমিশন 'নিউ স্কীম' মাদরাসা চালু করার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণীতে *ইসলাম ধর্ম* নামে একটি বাধ্যতামূলক বিষয় এবং *ইসলামিয়াত* নামে একটি পৃথক শাখার ব্যবস্থা করা হয়।

মাদরাসা শিক্ষার সমস্যা পর্যালোচনা

কমিশন মাদরাসা শিক্ষার সমস্যাসমূহকে চিহ্নিত করে। প্রথমতঃ যোগ্য ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের এ জাতীয় মাদরাসাসমূহে অভাব রয়েছে। অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের শিক্ষকগণের উপর এ স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ভার ন্যাস্ত। নিয়মিত পরিদর্শন বা তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য সমস্যার মধ্যে শ্রেণীকক্ষ আসবাব পত্র ও শিক্ষা উপকরণের সমস্যা এ জাতীয় শিক্ষা ধারায় বিদ্যমান।

এই কমিশন মাদরাসা শিক্ষার ইবতিদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল স্তরের ব্যাপারে সুপারিশ দাখিল করেন। একই সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা প্রশাসনের উপরও সুপারিশ পেশ করেন।

ইবতিদায়ী স্তর সম্পর্কে সুপারিশ

১. ইবতিদায়ী স্তরের মেয়াদকাল হবে ৫ বছর এবং এ স্তরে অনুর্ধ ৬ বছরের শিশুরা ভর্তি হবে।

২. ইবতিদায়ী মাদরাসাসমূহ বেসরকারী প্রচেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠেছে। তবে অপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যহীনভাবে স্থাপন না করে প্রয়োজন ও অবস্থান বিবেচনা করে স্থাপন করার নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৩. এ স্তরে শিক্ষার মান উন্নীত করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ হওয়া বাঞ্চনীয়। 'আরবী ও দীনিয়াত শিক্ষাদানের জন্য 'আলিম পাশ শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। পৃথক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন সাপেক্ষে আপাততঃ প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বেতনক্রম ও চাকরির শর্তাবলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরূপ হওয়া উচিত।

৪. প্রতিটি মাদরাসায় শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষ, শিক্ষা উপকরণ, আসবাব পত্র ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় জনসাধারণ ও সরকারকে যৌথ উদ্যোগে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীনে উপজেলা পর্যায়ে ইবতিদায়ী মাদরাসাসমূহের নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ইবতিদায়ী মাদরাসাসমূহের জন্য স্বতন্ত্র পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

৬. দীনিয়াত ও 'আরবী শিক্ষার বিষয়সমূহ ছাড়া সাধারণ শিক্ষার বিষয়সমূহের (বাংলা, গণিত, সমাজ পাঠ ইত্যাদি) জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য পুস্তকসমূহ ইবতিদায়ী মাদরাসাসমূহে পঠিত হবে।

৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণের যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা ইবতেদায়ী মাদরাসার ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮. প্রত্যেকটি ইবতিদায়ী মাদরাসার সার্বিক পরিচালনা ও উন্নতির জন্য মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতায় একটি পরিচালনা কমিটি থাকবে। এ কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে :

ক.	ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি	চেয়ারম্যান
খ.	মাদরাসার প্রধান শিক্ষক	সদস্য-সচিব
গ.	একজন শিক্ষক প্রতিনিধি	সদস্য
ঘ.	একজন অভিভাবক	সদস্য
ঙ.	একজন দাতা প্রতিনিধি	সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

৯. **শিক্ষা উপকরণ :** বোর্ডের যে সব মাদরাসায় বিজ্ঞান পড়ান হয়, সে সব মাদরাসায় বিজ্ঞান সরঞ্জাম প্রদান করা উচিত।

১০. ইবতিদায়ী স্তরের ৫ম শ্রেণীর শেষে বর্তমান বৃত্তি পরীক্ষা চালু থাকবে।

১১. ইবতিদায়ী স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নরূপ হবে :[৪৩]

পদবী	যোগ্যতা	বেতন
সুপারিনটেনডেন্ট	ফাযিল সিএড	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অনুরূপ
সহকারী মৌলবী	আলিম সিএড	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের অনুরূপ
সহকারী শিক্ষক	আলিম/উচ্চ মাধ্যমিক সিএড	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের অনুরূপ
ক্বারী মুজাব্বিদ	মাহির সিএড,	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের অনুরূপ

দাখিল ও আলিম স্তর সম্পর্কে সুপারিশ

১. দাখিল ও আলিম এ দু'টি স্তরের মেয়াদ হবে যথাক্রমে ৫ ও ২ বছর। দুটি স্তরেই দুটি প্রান্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দাখিল নবম শ্রেণী হতে মানবিক, বিজ্ঞান, মুজাব্বিদ ও হিফজুল কুর'আন এ চারটি বিভাগ থাকবে এবং আলিম স্তরে মানবিক, বিজ্ঞান ও মুজাব্বিদ এ তিনটি শাখা প্রবর্তিত হবে।

২. দাখিল ও আলিম চূড়ান্ত পরীক্ষা বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, পরিচালনা করবে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে মাদরাসা শিক্ষা অফিসার পদ সৃষ্টি সাপেক্ষে আঞ্চলিক ভিত্তিতে জুনিয়র বৃত্তি পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বও পালন করবে।

৩. শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত সুপারিশমালা অনুযায়ী দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় সংস্কারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সাধারণ শিক্ষার মত মাদরাসা শিক্ষায়ও রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষিত হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা হ্রাস করে জেলা পর্যায়ে সংকোচিত করা উচিত।

৪. দাখিল ও আলিম মাদরাসা স্থাপন ও মঞ্জুরী প্রদানের ক্ষেত্রে মাদরাসা বোর্ডকে অবশ্যই পালনীয় শর্ত আরোপ করতে হবে। এ শর্তগুলো হচ্ছে :
ক. ভূমির পরিমাণ কমপক্ষে এক একর
খ. একই পর্যায়ের দুটি মাদরাসার দূরত্ব কমপক্ষে ৮ কিলোমিটার
গ. ছাত্র সংখ্যা (দাখিল-২০০ ও আলিম -২৫০জন)
ঘ. বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার থাকতে হবে
ঙ. সুনির্দিষ্ট মানের গ্রন্থাগার
চ. প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ

৫. দাখিল ও আলিম উভয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। তবে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে 'আরবী।

৬. এ স্তরে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা দান করে কারিগরী ও উৎপাদনমূখী কাজে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী মাদরাসাসমূহে নিম্ন লিখিত কর্মসূচী শিক্ষা কোর্স চালু করা যেতে পারে :

---

৪৩. শিক্ষাগত যোগ্যতার ন্যূনতম স্তর হিসেবে দেখা হয়েছে, এর বেশী হতে পারবে, কম হতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ক. **কারিগরী :** কাঠের কাজ, ধাতব পদার্থ, বিদ্যুৎ, রেডিও ও টেলিভিশন মেরামত, গৃহ নির্মাণ ও তাঁত জাতীয় কাজ।

খ. **কৃষি :** ভূমি কর্ষণ, কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনা ও মেরামত শষ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি।

গ. **বাণিজ্য :** পত্র বিনিময়, টাইপ রাইটিং শর্ট হ্যান্ড, হিসাবরক্ষণ ও সেলসম্যান শিপ ইত্যাদি।

ঘ. **অন্যান্য :** বাঁশের কাজ, বেতের কাজ ও বই বাঁধাই ইত্যাদি।

৭. শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করতে হবে। দাখিল স্তরের শিক্ষকরা অবশ্যই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে। টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহে মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। এ ছাড়া কর্মকালীন স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। নিয়েরার ও আই ই আর-এ জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ করবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অধীনে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গঠন করে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা বাঞ্চনীয়। উক্ত ব্যবস্থার বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যকর শিক্ষাদান ও গবেষণা কার্য পরিচালনা সম্ভব হবে।

৮. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী যাতে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন করা যায়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা একটি কমিটি গঠন করতে হবে। আপাততঃ বর্তমান শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী চালু থাকবে।

৯. আলিম ও ফাযিল মাদরাসাসমূহের জন্য গভর্নিং বডি গঠন করা উচিত।

ফাযিল ও কামিল স্তর সম্পর্কিত সুপারিশ

১. ফাযিল ও কামিল মাদরাসাসমূহ অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি এফেলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য অর্ডিন্যান্সের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। যাবতীয় কার্যক্রম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হবে।

২. ফাযিল (পাস ও অনার্স) এবং কামিল (১ম পর্ব ও শেষ পর্ব) ডিগ্রীর বিস্তারিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারণ করবে।

৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় হিসেবে পদার্থ, রসায়ন, জীব ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য মাদরাসাসমূহে ল্যাবরেটরী ও সাজ-সরঞ্জাম থাকবে।

৪. এ স্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে একটি গতিশীল বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

৫. এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এ রিপোর্টের 'শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক' সুপারিশ মালার আলোকে 'পরিদপ্তর'গুলোর সংশিষ্ট বিভাগ ও শাখা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

৬. শিক্ষাক্ষেত্রে একই ধারা প্রবর্তনের জন্য মাদরাসা শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বিত করতে হবে।

মাদরাসা শিক্ষা প্রশাসন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সুপারিশ

১. মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও উৎপাদনমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে।

২. মাদরাসা ও স্কুল কলেজের শিক্ষকদের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণের জন্য স্কুল কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অনুরূপ বেতন কাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা সমযোগ্যতার ভিত্তিতে মাদরাসা শিক্ষক ও শিক্ষক কর্মচারীদের প্রদান করা যেতে পারে।

৩. মাদরাসাগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা, উন্নয়ন ও তদারকি ইত্যাদির জন্য প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ও কলেজ স্তরের ন্যায় ইবতিদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল স্তরে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. বাংলাদেশে প্রায় ১৩ হাজারের বেশী ইবতিদায়ী মাদরাসা, আড়াই হাজারের মত দাখিল মাদরাসা, প্রায় সাড়ে ছয়'শ আলিম মাদরাসা, সমসংখ্যক ফাযিল মাদরাসা এবং ৭৫টি কামিল মাদরাসা রয়েছে। এ বিপুল সংখ্যক মাদরাসার প্রশাসনিক এবং আর্থিক উন্নয়ন তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। সেজন্য মাদরাসা শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন। অঞ্চল, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যোগ্যতা সম্পন্ন মাদরাসা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা দরকার।

৫. মাদরাসার অধ্যক্ষ, সুপারিনটেনডেন্ট ও প্রধানদের সাধারণ প্রশাসনিক এবং আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন স্তরের মাদরাসা শিক্ষকদের জন্যও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। মাদরাসা শিক্ষাদান পদ্ধতির আধুনিকীকরণের জন্য অবিলম্বে দেশের পিটিআই ও ট্রেনিং কলেজগুলোতে এবং বাংলাদেশ শিক্ষা প্রশাসন, সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (নিয়েরার) মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

৬. বর্তমানে ফাযিলকে স্নাতকোত্তর হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। যদিও চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে এর বিভিন্নতা রয়েছে। ফাযিল ও কামিলকে এর জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়া উচিত। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বর্তমানে এসব মাদরাসায় শিক্ষা দান নিয়ন্ত্রণ করে। তাই ফাযিল ও কামিল মাদরাসার অনুমোদন ও পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বও এই বোর্ড পালন করবে। দেশের ডিগ্রী স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা যেহেতু বিশ্ব বিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে যে কারণে ফাযিল ও কামিল স্তরকে মাদরাসা বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করার যৌক্তিকতা নেই। বিশেষ করে দেশে যখন একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষা [ড. এম এ বারী] কমিটি ১৯৮৯

দেশের মাদরাসা শিক্ষার সার্বিক অবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৯-৩-৯৬/২৪-৭-৮৯ তারিখের স্মারক নং শা. ১৪/৩ পি-১১/৮৯/১৪৯ শিক্ষা প্রজ্ঞাপন মূলে মাদরাসা শিক্ষা কমিটি নামে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কমিটি গঠন করে। ১/১১/৮৯ ইং তারিখে আরেকটি প্রজ্ঞাপন বলে ২ জন এবং সর্বশেষ আরেকটি প্রজ্ঞাপন বলে আরো ৩ জন সর্বমোট ২০ জন সদস্য সমন্বয়ে কমিটিকে পুনর্গঠিত[৪৪] করা হয়।

মাদরাসা শিক্ষার বিরাজমান পরিস্থিতি ও সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা দাখিলের জন্য গঠিত এই কমিটির প্রথম সভা ১২/৮/৮৯ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহিদুল ইসলাম এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী এবং শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমেদ এতে উপস্থিত ছিলেন। এ অধিবেশনে পাঁচটি অনুধ্যান কমিটি গঠিত হয়। কমিটিগুলো হচ্ছে :

---

৪৪. **কমিটির সদস্যগণের নাম ও পদবী :** ১. ড. এম এ বারী, *চেয়ারম্যান*, [প্রকল্প উপদেষ্টা], ২. ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম [উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়], ৩. ড. মোঃ সিরাজুল হক [এমিরিটাস প্রফেসর, ঢা বি], ৪. ড. মোস্তাফিজুর রহমান [অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢা বি], ৫. ড. আ হ ম করিম [মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর], ৬. ড. এম এ জাব্বার [অধ্যক্ষ, সরকারী কারমাইকেল কলেজ, রংপুর], ৭. আবদুল্লাহ হারুন পাশা [যুগ্ম সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়], ৮. নাসির উদ্দিন আহমেদ [উপাধ্যক্ষ, এম এম কলেজ, যশোর], ৯. মোফাজ্জল হোসাইন খান [পরিচালক, ইফাবা], ১০. হাসান আবদুল কাইয়ুম [সম্পাদক, অগ্রপথিক ইফাবা], ১১. আ ত ম মুসলেহ উদ্দিন [আরবী বিভাগ, ঢা বি, ঢাকা], ১২. অধ্যাপক ড. মুজিবুর রহমান [আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রা বি], ১৩. অধ্যাপক ড. সেকান্দর আলী ইবরাহিমী [আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রা বি], ১৪. মাওলানা আবদুস সালাম [অধ্যক্ষ, দুর্বাটি 'আলীয়া মাদ্রাসা, গাজীপুর], ১৫. শরীফ আবুল কাদের [প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ছারছীনা দাঃ সুঃ 'আলীয়া মাদরাসা], ১৬. মাওলানা মোঃ ইউনুস শিকদার [অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-'আলীয়া, ঢাকা], ১৭. আবদুস সালাম খান [রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা], ১৮. মাওলানা ফরিদ উদ্দিন আত্তার [খতিব, আমিনবাগ জামে মসজিদ, ঢাকা], ১৯. আবদুল মান্নান, [চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা], ২০. হাসানুজ্জামান, *সদস্য-সচিব* [প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারী বি এল কলেজ, খুলনা, চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ, ব্যানবেইস, ঢাকা], কিছু দিন সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ক. স্টিয়ারিং কমিটি,[৪৫] খ. ব্যবস্থাপনা কমিটি,[৪৬] গ. কারিকুলাম কমিটি,[৪৭] ঘ. একাডেমিক কমিটি[৪৮] ও ঙ. অর্থ কমিটি।[৪৯]

সুপারিশমালা

বিভিন্ন সাব কমিটি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। স্টিয়ারিং কমিটি কাজের সমন্বয় সাধন করেন। ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে কমিটি তাঁদের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করেন। স্তর বিন্যস্ত ও সুপারিশমালা প্রদত্ত হলো :

ইবতিদায়ী স্তর

১. **কোর্সের মেয়াদ ও ভর্তির বয়স :** ইবতিদায়ী শিক্ষা হবে পাঁচ বছর মেয়াদী। এ পর্যায়ে ভর্তির বয়স হবে ৬ বছর। দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনে ৫ বছর বয়স হতে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে।

২. ইবতিদায়ী ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে করে ইবতিদায়ী স্তর উত্তীর্ণ হবার পর একজন শিক্ষার্থী সহজেই সাধারণ শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হতে পারে। অনুরূপভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে একজন শিক্ষার্থী মাদরাসার ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে।

৩. ইবতিদায়ী স্তরের স্বাতন্ত্রতা ও গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে ইবতিদায়ী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী যতদুর সম্ভব সমমানের ও পরস্পর সম্পৃক্ত হওয়া আবশ্যক।

৪. ইবতিদায়ী পাঠ্যক্রমের স্বাতন্ত্র রক্ষা করে ও প্রাথমিক পাঠ্যক্রমের সাথে সমমান ও সামঞ্জস্য বিধান কল্পে জাতীয় পর্যায়ে কমিটি থাকা আবশ্যক।

৫. ইবতিদোয়ী ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য নিম্ন লিখিত বিষয় ও সাপ্তাহিক পিরিয়ড নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করা হলো :

ক্রমিক নং	বিষয়	সাপ্তাহিক পিরিয়ড	শতকরা হার[৫০]
১.	কুর'আন মজীদ ও হাদীসে রাসূল	৫	১৯.২৩
২.	'আরবী	৫	১৯.২৩
৩.	'আকা'ইদ	৩	১১.৫৪
৪.	বাংলা	৬	২৩.০৭
৫.	গণিত	৫	১৯.২৩
৬.	শারীরিক শিক্ষা	২	০৭.৭০
	মোট=	২৬	১০০.০০

---

৪৫. **স্টিয়ারিং কমিটি :** ১. অধ্যাপক ড. এম এ বারী, সভাপতি। **সদস্যরা হলেন :** ২. ড. আ হ ম করিম, ৩. ড. সিরাজুল ইসলাম, ৪. ড. সিরাজুল হক, ৫. ড. মুস্তাফিজুর রহমান, ৬. আবদুল্লাহ হারুন পাশা, ৭. অধ্যাপক মোঃ আবদুল মান্নান [সদস্য-সচিব]।

৪৬. **ব্যবস্থাপনা কমিটি :** ১. ড. আ হ ম করিম, *আহবায়ক*, **সদসগণ হলেন :** ২. আবদুল্লাহ হারুন পাশা, ৩. ড. শফি উল্যাহ [ডীন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়], ৪. মাওলানা শরীফ আবদুল কাদের, ৫. মাহবুবুর রহমান।

৪৭. **কারিকুলাম কমিটি :** ১. আ ত ম মুসলেহ উদ্দিন, *আহবায়ক*, **সদস্যগণ হলেন :** ২. ড. মুজিবুর রহমান, ৩. ড. আবদুল জাব্বার, ৪. মাওলানা ইউনুস শিকদার, ৫. মাওলানা আবদুস সালাম, ৬. ড. সিদ্দিকুর রহমান।

৪৮. **একাডেমিক কমিটি :** ১. অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, *আহবায়ক*, **সদস্যগণ ছিলেন :** ২. অধ্যাপক ড. সেকান্দার আলী ইব্রাহিমী, ৩. অধ্যাপক ড. শফিউল্যাহ [ডীন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়], ৪. মাওলানা শরীফ আবদুল কাদের, ৫. আবদুল জাব্বার [প্রাক্তন পরিচালক, নিয়েরার]।

৪৯. **অর্থ কমিটি :** ১. অধ্যাপক ড. এম এ বারী, *আহবায়ক*, **সদস্যগণ :** ২. ড. আ হ ম করিম, ৩. অধ্যাপক আবদুল মান্নান, *সদস্য-সচিব*।

৫০. শতকরা হার নির্ণয়ের জন্য পুরো সপ্তাহের পিরিয়ডকে বিষয়ভিত্তিক মান হিসেবে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর জন্য নিম্নলিখিত বিষয় ও সাপ্তাহিক পিরিয়ড নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করা হয় :

নং	বিষয়	সাপ্তাহিক পিরিয়ড	শতকরা হার
১.	কুর'আন মজীদ ও হাদীসে রাসূল	৬	১৬.২১
২.	'আরবী	৬	১৬.২১
৩.	'আকা'ইদ ও ফিকহ	৩	০৮.১০
৪.	বাংলা	৬	১৬.২১
৫.	গণিত	৫	১৩.৫১
৬.	পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান সমন্বিত)	৫	১৩.৫১
৭.	ইংরেজী	৪	১০.৮১
৮.	শারীরিক শিক্ষা	২	০৫.০৪
	মোট=	৩৭	১০০.০০

৭. প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী পড়ানো বাঞ্ছনীয় নয়। তবে সাধারণ শিক্ষা ধারায় প্রাথমিক স্তরে ৩য় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত যদি ইংরেজী বাধ্যতামূলক থাকে, তবে সমতা বিধানের জন্য ইংরেজী আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখা সমীচিন হবে। ইংরেজী না থাকলে 'আকা'ইদ, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে একটি করে অতিরিক্ত বিষয় পড়ানো যেতে পারে।

৮. প্রাথমিক স্তরে ভর্তির ব্যাপারে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় ইবতেদায়ী স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৯. পাঠ্য পুস্তক, শিক্ষা উপকরণ এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরকারকে সরবরাহ করতে হবে।

১০. প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় ইবতিদায়ী শিক্ষা (নির্ধারিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে) জাতীয়করণের সুপারিশ করা হয়েছে।

১১. ইবতিদায়ী স্তরে মাতৃভাষা বাংলার ওপর বেশী গুরুত্ব দেয়ার সুপারিশ করা হয়।

১২. শিশুরা পাঁচ বছর বয়স হতে কুর'আন হিফজ শুরু করবে। পরবর্তী পাঁচ বছরে অর্থাৎ তাদের বয়স দশের কোঠায় পৌছার সময়কালের মধ্যে হিফজ শেষ করবে। তা করার জন্য এ জাতীয় ইবতিদায়ী মাদরাসায় শিক্ষক (হাফিজ) নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।

১৩. কুর'আনুল কারীম হিফজ শেষ করার পর দশ/এগারো বছর বয়সে শিক্ষার্থীরা ইবতিদায়ী পর্যায়ের ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। তাদেরকে ৪র্থ শ্রেণীর বিষয়াদী না পড়িয়ে বিশেষ চতুর্থ শ্রেণী হিসেবে এক বছরের (Intersive Course) পাঠদান করা হবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্য থাকবে :

ক্রমিক নং	বিষয়	পিরিয়ড
১.	কুর'আন মাজীদ ও হাদীস	৩
২.	'আকা'ইদ ও ফিকহ	৫
৩.	বাংলা	৮
৪.	গণিত	৬
৫.	'আরবী	৬
৬.	ইংরেজী	৬
৭.	শারীরিক শিক্ষা	২
	মোট=	৩৬

Dhaka University Institutional Repository

দাখিল স্তর

১. বর্তমান দাখিল স্তর (৬ষ্ঠ-১০ম) ৫ বছর মেয়াদী। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-১০ম) স্তরের মেয়াদও একই। অতএব সাধারণ শিক্ষার সাথে সমতা রেখে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মাদরাসা শিক্ষায়ও 'মুতাওস্‌সিতা' নামে একটি স্তর রাখা যেতে পারে।

২. এই স্তরে (মুতাওসসিতা) বৃত্তিমূলক ও পেশাভিত্তিক কোর্স থাকা আবশ্যক। যাতে কোর্স সমপণান্তে শিক্ষার সাথে জীবিকা অর্জন করতে পারে এবং বেকারত্বের অভিশাপ দূর হতে পারে।

৩. দাখিল স্তরে (নবম ও দশম) বর্তমান ব্যবস্থা (প্রচলিত) চালু থাকতে পারে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। বৃত্তিমূলক কোর্স এ স্তরেও চালু থাকবে। ইংরেজী ভাষাকে বাধ্যতামূলক না রেখে এ স্তরে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে রাখা সমীচিন হবে।

৪. সাধারণ শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মত মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়ও একাদশ ও দ্বাদশ দুটি শ্রেণী রয়েছে, এ মেয়াদ অব্যাহত থাকবে। এ স্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী এমনভাবে সুবিন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন, যাতে ইংরেজী বিষয় ঐচ্ছিক হিসেবে থাকে। এতে শিক্ষার্থীগণ আলিমস্তর সমাপণান্তে বাংলা ও 'আরবী ভাষা কথন ও লিখনে আপন মনোভাব প্রকাশ করতে পারে।

৫. দাখিল স্তরের পর মুজাব্বিদ বিভাগ চালু থাকার প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই কমিটি এ স্তরের পর কোন মুজাব্বিদ বিভাগ না রাখার সুপারিশ করে। প্রয়োজনে তাজবীদের বিষয় অতিরিক্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

৬. দাখিল ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণীর জন্য শিক্ষাক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়াদী এবং পিরিয়ড নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করা হয় :

নং	বিষয়	পূর্ণমান	সাপ্তাহিক পিরিয়ড	শতকরা হার
১.	কুর'আন মজিদ ও তাজবীদ (৭৫+২৫)	১০০	৬	
২.	হাদীস ও 'আরবী	২০০	৮	
৩.	'আকা'ইদ ও ফিকহ	১০০	৩	ধর্মীয় ৫০%
৪.	বাংলা	১০০	৫	সাধারণ ৫০%
৫.	ইংরেজি/উর্দু/ফারসী	১০০	৪	
৬.	গণিত	১০০	৫	
৭.	সমাজ বিজ্ঞান	১০০	৩	
৮.	বিজ্ঞান	১০০	৩	
	মোট=	৯০০	৪০	

৭. ৯ম ও ১০ম শ্রেণী পর্যায়ে প্রচলিত চারটি বিভাগের পরিবর্তে নিম্নোক্ত তিনটি বিভাগ সুপারিশ করা হয় :

ক. সাধারণ বিভাগ

খ. সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ

গ. বিজ্ঞান বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

৮. দাখিল ৯ম ও ১০ম শ্রেণী পর্যায়ের সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নলিখিত ৭টি আবশ্যিক বিষয় এবং ৮০০ নম্বরের সুপারিশ করা হয় :

ক্রমিক নং	বিষয়	পত্র	নম্বর
১.	কুর'আন মজীদ+ তাজবীদ (৭৫+২৫)	১	১০০
২.	হাদীস ও 'আকা'ইদ (৭৫+২৫)	১	১০০
৩.	'আরবী	২	২০০
৪.	ফিকহ ও উসূলে ফিকহ	১	১০০
৫.	বাংলা	১	১০০
৬.	ইংরেজী/উর্দু/ফারসী	১	১০০
৭.	গণিত	১	১০০
	মোট=	৮	৮০০

৯. সাধারণ, সমাজ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রতিটি বিভাগের জন্য দু'টি করে বিভাগীয় বিষয় নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়। নিম্নের ছকে তা দেখানো হল :

বিভাগের নাম	বিভাগীয় বিষয়ের নাম	নম্বর
সাধারণ	১. কুর'আন মজীদ ও হাদীস ২. ইসলামের ইতিহাস/ইসলামী অর্থনীতি/ ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা/পৌরনীতি	৫০+৫০=১০০
সমাজ বিজ্ঞান (যে কোন দু'টি)	১. ভূগোল ২. ইসলামের অর্থনীতি ৩. ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞান।	১০০+১০০=২০০
বিজ্ঞান	১. বিজ্ঞান ১ম পত্র (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) ২. বিজ্ঞান ২য় পত্র জীব বিজ্ঞান (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক)	৭৫+২৫=১০০ ৭৫+২৫=১০০

১০. প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষার্থীরা নিম্নের বিষয় হতে যে কোন একটি করে অতিরিক্ত বিষয় নিতে পারবে, যার পূর্ণমান হবে ১০০।

বিভাগ	অতিরিক্ত বিষয়ের নাম
সাধারণ	১. উর্দু, ২. ফারসী, ৩. উচ্চতর বাংলা, ৪. সাধারণ বিজ্ঞান (পদার্থ, রসায়ন জীব বিদ্যাসমন্বিত), ৫. গৃহ পরিচালনা ও পারিবারিক জীবন গার্হ্যস্থ অর্থনীতি) ছাত্রীদের জন্য।
সমাজ বিজ্ঞান	১. উর্দু, ২. ফারসী, ৩. সাধারণ বিজ্ঞান (পদার্থ, রসায়ন জীব বিদ্যা সমন্বিত), ৪. গৃহ পরিচালনা ও পারিবারিক বিষয়সমূহের মধ্যে নির্বাচন করা হয় নি এমন একটি বিষয়, ৫. বাণিজ্যিক গণিত ও হিসাব রক্ষণ।
বিজ্ঞান	১. উর্দু, ২. ফারসী, ৩. উচ্চতর গণিত, ৪. ভূগোল, ৫. গৃহ পরিচালনা ও পারিবারিক জীবন (গার্হ্যস্থ অর্থনীতি) ছাত্রীদের জন্য, ৬. ইসলামের ইতিহাস।

আলিম (একাদশ ও দ্বাদশ) স্তর

১. আলিম স্তরে তিনটি বিভাগ বিদ্যমান আছে। প্রচলিত বিভাগসমূহের সাথে নতুনভাবে বাণিজ্য বিভাগ যুক্ত হওয়া উচিত বলে কমিটি মনে করে।

Dhaka University Institutional Repository

২. আলিম (একাদশ-দ্বাদশ) পর্যায়ের সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক বিষয় নিম্নরূপ থাকবে :

ক্রমিক নং	বিষয়	পত্র	নম্বর
১.	কুর'আন মজীদ	১	১০০
২.	হাদীস ও উসূলে হাদীস	১	১০০
৩.	ফিকহ্	১	১০০
৪.	'আরবী	১	১০০
৫.	বাংলা	১	১০০
৬.	ইংরেজী/উর্দু/ফারসী	১	১০০
	মোট=	৬	৬০০

৩. আলিম সাধারণ বিভাগের জন্য নিম্নলিখিত বিভাগীয় বিষয় সুপারিশ করা হয় :

ক্রমিক নং	বিষয়	পত্র	নম্বর
১.	'আকা'ইদ ও ফারায়িয	১	৫০+৫০=১০০
২.	বালাগাত ও ইসলামী দর্শন	১	৫০+৫০=১০০
৩.	'আরবী ২য় পত্র	১	১০০
৪.	ইসলামের ইতিহাস/বাণিজ্য/দর্শন/অর্থনীতি	১	১০০
	মোট=	৪	৪০০

৪. আলিম সাধারণ বিভাগের শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিম্নের যে কোন একটি বিষয় (দুই পত্র ২০০ নম্বর) নিতে পারবে :

ক. উচ্চতর 'আরবী / উচ্চতর উর্দু / উচ্চতর বাংলা / উচ্চতর ইংরেজী

খ. ইসলামী অর্থনীতি / ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা / ইসলামী দর্শন।

৫. আলিম সামাজিক বিজ্ঞান : নিম্নের যে কোন দু'টি বিভাগীয় বিষয় থাকবে (প্রতি বিষয়ে দুই পত্র ২০০)

ক. ইসলামের ইতিহাস

খ. অর্থনীতি + ইসলামী অর্থনীতি

গ. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা ও

ঘ. হিসাবরক্ষণ ও কারবার ব্যবস্থাপনা।

৬. সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা নিম্নের যে কোন একটি অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় নিতে পারবে (দুই পত্র ২০০ নম্বর)

ক. ইসলামী দর্শন

খ. উচ্চতর উর্দু/ফারসী

গ. উচ্চতর বাংলা

ঘ. উচ্চতর ইংরেজী

Dhaka University Institutional Repository

৭. বিজ্ঞান বিভাগ : যে-কোন ২টি বিভাগীয় বিষয় (প্রতি বিষয়ে দুই পত্র ২০০ নম্বর থাকবে)
ক. পদার্থ বিদ্যা ১ম ও ২য় (প্রতি পত্রে তাত্ত্বিক ৭৫ + ব্যবহারিক ২৫)
খ. রসায়ন শাস্ত্র (প্রতি পত্রে তাত্ত্বিক ৭৫ + ব্যবহারিক ২৫)
গ. জীব বিদ্যা (প্রতি পত্রে তাত্ত্বিক ৭৫ + ব্যবহারিক ২৫) / গণিত অতিরিক্ত
ঘ. গণিত।

৮. অতিরিক্ত ঐচ্ছিক (যে-কোন একটি বিষয় দুই পত্র ২০০ নম্বর) বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় বিষয় হিসেবে নেয়া হয় নি এমন দুটি বিষয়ের মধ্যে যে-কোন একটি বিষয় (দুই পত্র ২০০ নম্বর) অতিরিক্ত ঐচ্ছিক হিসেবে নেয়া যাবে।

ফাযিল ও কামিল স্তর

১. বর্তমানে ফাযিল ও কামিল দু'বছর মেয়াদী। বর্তমানের প্রচলিত মেয়াদ ফাযিল ও কামিল স্তরে ২+২ বছর থাকতে পারে বলে কমিটি মনে করে। তবে কিছু কিছু নির্বাচিত মাদরাসায় ফাযিল ৩ বছর ও কামিল ১ বছর মেয়াদী কোর্স চালু করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে। পর্যায়ক্রমে সকল মাদরাসায় ৩ বছর মেয়াদী ফাযিল ও ১ বছর মেয়াদী কামিল কোর্স চালু করা বাঞ্চনীয়।

২. বর্তমানে ফাযিল স্তরে সাধারণ ও মুজাব্বিদ বিভাগ নামে ২টি বিভাগ চালু আছে। মুজাব্বিদ বিভাগের পরিবর্তে কমিটি বাণিজ্য বিভাগ চালু করার সুপারিশ করে।

৩. দেশে প্রচলিত কৃষি, প্রকৌশল, চিকিৎসা, সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষা ধারা প্রচলিত আছে। সকল শিক্ষাই জাতির বিভিন্নমূখী প্রয়োজন পূরণ করছে। সকল ধারায় শিক্ষার্থীরা সম-অধিকার পাওয়ার দাবী রাখে। এ যুক্তির নিরীখে ফাযিল ডিগ্রীধারীদেরতে ব্যাচেলর ডিগ্রীধারীদের সমমান প্রদান করা বাঞ্চনীয়। বিসিএস ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তাদের অংশগ্রহণের সমমানের সুযোগ থাকতে হবে।

৪. ফাযিল স্তরের প্রচলিত সিলেবাসকে পুনর্বিন্যাস করে ব্যাচেলর ডিগ্রীর মানের মান বিতরণ পূর্বক বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে বলে কমিটি মনে করে।

৫. সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের ন্যায় মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের সরকারী-বেসরকারী যে-কোন কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকা বাঞ্চনীয়।

৬. কামিল স্তরে বর্তমানে ৫টি বিভাগ চালু আছে। যথা - হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্, আদব ও তাজবীদ। কমিটি তাজবীদ বিভাগকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে এবং তদস্থলে ইসলামের ইতিহাস নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ চালুর সুপারিশ করে।

৭. বর্তমানে প্রচলিত ফাযিল ও কামিল স্তর সাধারণ শিক্ষায় স্নাতক পাশ ও স্নাতকোত্তর মানের। অথচ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী নির্ধারণ থেকে শুরু করে পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট পালন করে থাকে। কমিটি মনে করে যে, ঢাকা আলীয়া মাদরাসাকে অনুমোদন দানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় উন্নীত করে এ দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর প্রদান করা যেতে পারে।

৮. দেশের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা ও 'আরবী ইত্যাদি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিখন, লিখন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমগুলোকে মাদরাসা শিক্ষায় ফাযিল ও কামিল কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাস্তবায়িত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

১. ইবতিদায়ী ও দাখিল পর্যায়ে শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। শিক্ষা বিজ্ঞান ও শিক্ষা পদ্ধতি দেশের অপরাপর ধারায় উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাই মাদরাসা শিক্ষায় ইবতেদায়ী ও দাখিল পর্যায়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অবশ্যই ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব হলে ফাযিল ও কামিল পর্যায়েও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবতিদায়ী ও দাখিল পর্যায়ে দু'ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। ক. চাকুরী কালীন দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ ও (Fundamental Professional Training), খ. সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ (Refresher's Training)

৩. বর্তমানে প্রায় ৮০,০০০ শিক্ষক কর্মরত আছেন। দাখিল পর্যায়ে ৫০,০০০ শিক্ষক রয়েছেন। এ বিরাট সংখ্যক শিক্ষককে এক সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা কঠিন। তাই প্রস্তাবিত কোর্সে প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যা নিম্নরূপ হতে পারে :

ক. বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৫% শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। প্রশিক্ষণ বিহীন শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না বলেই শিক্ষক ছাড়া বহিরাগতদেরকেও ভর্তির সুযোগ দেয়া হচ্ছে। ৫৪টি পিটিআই-এর মধ্যে ২৪টি পিটিআইকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে রেখে অবশিষ্ট ৩০টি পিটিআইকে ইবতেদায়ী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ. বর্তমানে দাখিল পর্যায়ে ৫০,০০০ শিক্ষকের মধ্যে ১০,০০০ শিক্ষক স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী রয়েছে। এদের প্রশিক্ষণে জন্য ১০টি (TTC) টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহে ৫০ জন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে বছরে ৫০০ জন প্রশিক্ষণ লাভ করার সুযোগ পাবে। দাখিল পর্যায়ের অন্যান্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য খুলনা 'আলীয়া মাদরাসাসহ তিন বিভাগের সরকারী আলীয়া মাদরাসায় তিন মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪. **সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ** (Refresher's Training) : মাদরাসা শিক্ষা একাডেমীতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একদল ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষক থাকবেন। তারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ইবতিদায়ী ও দাখিল স্তরের শিক্ষকদের স্বল্প মেয়াদী (৫-৭দিন) প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন। একাডেমীতে প্রশিক্ষকের সংখ্যা এমন হবে যাতে করে ইবতিদায়ী ও দাখিল পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রতি তিন বছরে কমপক্ষে একবার করে সঞ্জীবনী কোর্সে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

৫. মাদরাসা শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও মাদরাসা শিক্ষার ওপর গবেষণা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি মাদরাসা একাডেমী থাকবে।

৬. ইসলামী শিক্ষা ও শিক্ষা বিষয়ে সর্বাধুনিক ধারণার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য এবং তদানুযায়ী দেশে বাস্তবায়িত করার জন্য মাঝে মাঝে প্রস্তাবিত মাদরাসা শিক্ষা একাডেমী আইইআর এবং মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের বিশেষজ্ঞগণকে মুসলিম দেশসহ অন্যান্য দেশে পাঠানো উচিত।

৭. ইবতিদায়ী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিটি বৃহত্তর জেলায় একটি করে স্বতন্ত্র ইবতিদায়ী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য কমিটি সুপারিশ করে। এর স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত পিটিআইগুলো কোটা নির্ধারণ করে ইবতিদায়ী শিক্ষকদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. দাখিল স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রতিটি বিভাগে দু'টি করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ স্থাপন করা প্রয়োজন। ফাযিল ও কামিল শিক্ষকদের জন্য প্রস্তাবিত অনুমোদন দানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি একাডেমীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রয়োজনবোধে বিষয় ভিত্তিক বিদেশী প্রশিক্ষক এনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত শিক্ষকদের মুসলিম দেশসমূহের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্বের ইসলামী শিক্ষা দানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য বা উচ্চ জ্ঞান ও ডিগ্রী লাভের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।

১০. মাদরাসা কর্মরত শিক্ষকদের মান, কর্মক্ষমতা, কর্মফল ও কৌশলগত দিক মূল্যায়নের বর্তমানে কোন ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। সাথে সাথে শিক্ষকদের কর্মদক্ষতার মূল্যায়নেরও কোন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া চালু নেই। তাই কমিটি এ কাজকে শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট দক্ষ লোকদের দ্বারা মাদরাসাসমূহ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা

মাদরাসা শিক্ষা ধারার কামিল ডিগ্রী প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের এম ফিল; ও পিএইচ ডি সহ মৌলিক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। উল্লেখিত গবেষণার বিষয়টি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা আলীয়া মাদরাসাসহ নির্বাচিত কয়েকটি উন্নত কামিল মাদরাসায় কিংবা প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় করার জন্য সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার।

মন্তব্য : স্বাধীনতার পর মাদরাসা শিক্ষার উপর যতগুলো শিক্ষা কমিশন বা কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং কাজ করেছিল, তন্মধ্যে এই কমিটি মাদরাসা শিক্ষার ব্যাপারে বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। সংশ্লিষ্ট সকল দিক ও বিভাগের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই রিপোর্ট প্রণয়ন করে সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য জমা দেয়া হলেও তা অনুমোদন লাভ করে নি। ফলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এ রিপোর্টটির কোন কার্যকারিতা মাদরাসা শিক্ষার বেলায় প্রযোজ্য হয় নি। অথচ সংশ্লিষ্ট সকলেই একথা বলেছেন যে, মাদরাসা শিক্ষার জন্য জরুরী এ রিপোর্ট অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। এর অনুমোদন ও বাস্তবায়নে ব্যবস্থা নেয়া একান্তই জরুরী।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৪/০১/৯৭ ইং তারিখে প্রশা-১/বিবিধঃ ৫/৯৬/৪৮৮ নং স্মারকে বাস্তব গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে সাবেক উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এম শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন।[৫১] সরকার ১৯৭৪ খ্রী. প্রস্তুতকৃত ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের উপর পর্যালোচনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য এই কমিটি[৫২] গঠন করেন।

---

৫১ মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪৯-৫৬৪।

৫২. **কমিটির পূর্ণাঙ্গরূপ :** ১. প্রফেসর এম শামসুল হক, *চেয়ারম্যান,* [সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা], **সদস্যগণ হলেন :** ২. মুহাঃ ফজলুর রহমান, সদস্য সচিব, [ভারপ্রাপ্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়], ৩. ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূইয়া [সংসদ সদস্য], ৪. মিসেস রাজিয়া মতিন চৌধুরী [সংসদ সদস্য], ৫. প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী [উপাচার্য, ঢা বি]। ৬. প্রফেসর আবদুল খালেক [ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, রা বি]। ৭. প্রফেসর আবদুল মান্নান [উপচার্য, চ বি]। ৮. প্রফেসর আমীরুল ইসলাম চৌধুরী [উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়], ৯. প্রফেসর মোহাম্মদ হোসেন [উপাচার্য, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়], ১০. প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ, উপাচার্য [প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়], ১১. প্রফেসর আমিনুল ইসলাম [উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়], ১২. প্রফেসর গোলাম আলী ফকির [উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়], ১৩. প্রফেসর সৈয়দ মহিবুদ্দীন আহমদ [উপাচার্য, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়], ১৪. প্রফেসর মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক [উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়], ১৫. প্রফেসর এম আমিনুল ইসলাম [উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়], ১৬. প্রফেসর হারুন অর রশীদ [রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢা বি], ১৭. প্রফেসর আবুল কালাম মোঃ আমীনুল হক [প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়], ১৮. ড. আবদুল্লাহ আল-মুতি শরফুদ্দীন [সাবেক সচিব], ১৯. ড. মোঃ ফরাস উদ্দিন [উপাচার্য, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি], ২০. প্রফেসর রশীদ উদ্দিন মাহমুদ [নিউরো সার্জারী বিভাগ, আই পি জি এম আর], ২১. প্রফেসর রশীদুল হক [প্রাক্তন অধ্যাপক, রা বি], ২২. প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী [পুরাকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়], ২৩. প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন [মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী], ২৪. প্রফেসর এস জেড হায়দার [রসায়ন বিভাগ, ঢা বি], ২৫. প্রফেসর আলমগীর মোঃ সিরাজউদ্দিন [ইতিহাস বিভাগ, চ বি], ২৬. প্রফেসর মোশারফ হোসেন খান [উপাচার্য, আহসান উল্যাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়], ২৭. প্রফেসর আনিসুজ্জামান [বাংলা বিভাগ, ঢা বি], ২৮. প্রফেসর এম আলী আসগর [পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢা বি], ২৯. প্রফেসর এ টি এম জহুরুল হক [অর্থনীতি বিভাগ, ঢা বি], ৩০. প্রফেসর মাযহারুল ইসলাম [প্রাক্তন উপাচার্য, রা বি], ৩১. কাজী ফজলুর রহমান [প্রাক্তন সচিব], ৩২. ইকবাল সোবহান চৌধুরী [সাংবাদিক], ৩৩. প্রফেসর আ আ ম স আরেফীন সিদ্দিকী [সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢা বি], ৩৪. প্রফেসর দুর্গাদাস ভট্টাচার্য [ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢা বি], ৩৫. ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন [সভাপতি, এফ বি সি সি আই, ঢাকা], ৩৬. ড. কাজী ফারুক আহমেদ [নির্বাহী পরিচালক, প্রশিকা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র], ৩৭. প্রফেসর এম কাদেরী [বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ], ৩৮. প্রফেসর আনোয়ার উল্যাহ চৌধুরী [বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন], ৩৯. প্রফেসর হামিদাবানু [মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর], ৪০. প্রফেসর আবদুর রফিক [মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর], ৪১. প্রফেসর আজিজ আহমদ চৌধুরী [মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর], ৪২. প্রফেসর

Dhaka University Institutional Repository

১৯/৩/৯৭ খ্রী. এর পর স্ব-স্ব বোর্ডের পরবর্তী চেয়ারম্যানগণ কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন। সরকার গঠিত কমিটির কর্ম পরিধি ও সময় সীমা নির্ধারণ করে দেন। ৩০ শে এপ্রিল, ১৯৯৭ খ্রী. এর মধ্যে রিপোর্ট প্রণয়ন করে সরকারের নিকট পেশ করার জন্য অনুরোধ করেন। পরবর্তীতে কমিটি কাজের সুবিধার জন্য উনিশটি সাব কমিটি গঠন করেন। এর মধ্যে মাদরাসা শিক্ষা সাব কমিটি[৫৩] নিম্নরূপভাবে গঠন করা হয় :

মাদরাসা শিক্ষার ব্যাপারে কমিটি নিম্ন লিখিত সুপারিশ নামা সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করেন :

১. বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। এ শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার, যাতে এ শিক্ষা ব্যবস্থা আরও নতুনত্ব লাভের মাধ্যমে উৎকর্ষিত হয়।

২. বর্তমানে দেশে ইবতিদায়ী পাঁচ বছর, দাখিল পাঁচ বছর, আলিম দুই বছর, কামিল দুই বছর মেয়াদী চালু আছে। একে পুনর্বিন্যাস করে ইবতেদায়ী ৮ বছর, দাখিল ২ বছর আলিম ২ বছর, ফাযিল ৩/৪ বছর ও কামিল ২/১ বছর মেয়াদী করতে হবে।

৩. সাধারণ শিক্ষা ধারার মত মাদরাসা শিক্ষা ধারায়ও নারী শিক্ষার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করতে হবে।

৪. মাদরাসা শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা। তবে ক্ষেত্র বিশেষে 'আরবী ভাষাও ব্যবহৃত হতে পারে।

৫. সাধারণ শিক্ষা ধারায় অনুসৃত মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া মাদরাসা শিক্ষা ধারায়ও অনুসরণ করতে হবে।

৬. সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সমভাবে উন্মুক্ত রাখতে হবে। এ উদ্দেশ্যে গাজীপুরে স্থাপিত মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্তরের মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কলেজ/ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।

৭. মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃত্তি ও কারিগরীমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা দেশে ও বিদেশে নিয়োগ ক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ উদ্দেশ্য অর্জনে দেশের নির্বাচিত মাদরাসাসমূহে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য

মোঃ খুরশীদ আলম [মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী], ৪৩. প্রফেসর মোঃ সারীদুল হক [চেয়ারম্যান, এন সি টি বি], ৪৪. প্রফেসর এম আমানুল্যাহ [চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (১৯/৩/৯৭ খ্রী. পর্যন্ত)], ৪৫. প্রফেসর শের মোহাম্মদ [চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী], ৪৬. প্রফেসর মোঃ শাহজাহান [ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা (১৯/৩/৯৭ খ্রী. পর্যন্ত)], ৪৭. প্রফেসর মোঃ নাজিম উদ্দিন [ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর (১৯/৩/৯৭ খ্রী. পর্যন্ত)], ৪৮. প্রফেসর এ এম এম আহসান উল্যাহ [চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম], ৪৯. প্রফেসর মোঃ সা'দুল্লাহ, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (১৯/৩/৯৭ খ্রী. পর্যন্ত)], ৫০. মোঃ শাহ আলম [ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, কারিগরী শিক্ষা বোর্ড], ৫১. প্রফেসর রফিকুল হক [প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর], ৫২. মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন [রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড], ৫৩. মোঃ কামরুজ্জামান [অধ্যক্ষ, জুবিলী স্কুল ও কলেজ, ঢাকা], ৫৪. মিসেস হেনা দাস [প্রাক্তন মহাসচিব, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি], ৫৫. শুদ্ধানন্দ মহাথের [অধ্যক্ষ, কমলাপুর বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ], ৫৬. প্রফেসর আহাম্মদ উল্যাহ সরকার [এগ্রোনমী বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়]।

৫৩. **মাদরাসা সাব কমিটি :** ১. প্রফেসর মোঃ ইউনুস শিকদার, *আহবায়ক*, [চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা], ২. প্রফেসর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, আরবী বিভাগ, ঢা বি], ৩. প্রফেসর আবদুর রফিক [মহাপরিচালক, কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর], ৪. প্রফেসর মোঃ রফিকুল হক [প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর], ৫. ড. আবুল কালাম মোঃ আমীনুল হক, প্রাক্তন.উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়], ৬. প্রফেসর মোঃ আবদুল মান্নান [প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা], ৭. মুহাম্মদ মনসুর-উর-রহমান [উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড], ৮. প্রফেসর মোঃ আবদুল খালেক [কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়], ৯. মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন [রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা], ১০. ইলিয়াস আলী [চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ, ব্যানবেইস, ঢাকা], ১১. মাওলানা মুফাজ্জল হোসাইন খান [পরিচালক, ইফাবা], ১২. গিয়াসুদ্দীন, প্রভাষক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়], ১৩. মাওলানা মোঃ আবদুল জব্বার [মহাসচিব, কাওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড]।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্তি দান বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. মাদরাসা শিক্ষার ইবতিদায়ী দাখিল ও আলিম স্তরে স্বীকৃতি দান, নবায়ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, পরিদর্শন, সনদ প্রদান ইত্যাদি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠন করে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে।

১০. মাদরাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ শিক্ষায় সর্বস্তরে একাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ শিক্ষা সুচারুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে পরিচালক (মাদরাসা) এর পদ থাকবে। মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে তত্ত্বাবধানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শাখা স্থাপন করা হবে। তবে মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে সমতা বিধানের দায়িত্ব থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের।

উল্লেখ্য, কমিটি রিপোর্টের ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা অংশে ইসলামী শিক্ষার বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ করা হয়। যা নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার্থীদের মনে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে।

২. ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

৩. সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জের তাৎপর্য বর্ণনাসহ যথার্থভাবে পঠন ও পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলী অর্জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করতে হবে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ : এ শিক্ষা নীতি কমিটি মাদরাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশমালা দাখিল করেছে। কিন্তু যেহেতু ড. কুদরত খুদা শিক্ষা নীতির উপর জোর দিয়ে এ কমিটি কাজ করেছে, সেহেতু জাতির আশা আকাংখার পূর্ণাঙ্গ অবকাঠামোগত সুপারিশমালা দাখিল করতে পারেন নি বলেই সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞজন মনে করেন।

মাদরাসা শিক্ষার কারিকুলাম সম্পর্কিত কমিটিসমূহ

১৯৯১ ও ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেসীন[৫৪] যুগান্তকারী একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জমিয়তের ২০ ও ২১ মে ১৯৯১ খ্রী. নির্বাহী কমিটির এক জরুরী সভায়[৫৫] দেশের 'আলিমগণের সমন্বয়ে একটি সিলেবাস কমিটি[৫৬] গঠন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল, কমিটি যে সিলেবাস প্রণয়ন করবে, তা বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস ও কারিকুলাম হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশসহ পেশ করা হবে।

---

৫৪ **জামিয়াতুল মোদার্রেসীন :** বাংলাদেশ জামিয়াতুল মোদার্রেসীন আলীয়া মাদরাসা তথা মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড নিয়ন্ত্রিত শিক্ষকদের একটি সমিতি। ১৯৫৬ খ্রী. ফেনী আলীয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা ওবায়দুল হক-এর প্রথম সভাপতি হিসেবে ফেনী থেকে এর কার্যক্রম শুরু করেন। নূর মোহাম্মদ আ'জমীসহ তৎকালীন 'আলিমগণ এর কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এ সংগঠন এখনও বিদ্যমান আছে।

৫৫. জমিয়াতুল মোদার্রেসীন এর অফিস রেকর্ড থেকে সংগৃহীত। জমিয়তের সেক্রেটারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত কমিটির আহবায়ককে কমিটির রূপরেখা সম্বলিত একটি পত্র ২২/৫/৯১ খ্রী. তারিখে জারী করেন।

৫৬. **জমিয়তের এ কমিটির সদস্যবৃন্দ ছিলেন :** ১. মাওলানা এম এ সালাম, আহবায়ক, [অধ্যক্ষ, দুর্বাটি আলীয়া মাদরাসা, গাজীপুর], ২. মাওলানা এম এ জলিল [অধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া মাদরাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা], ৩. মাওলানা আমিন উল্যাহ [অধ্যক্ষ, খলিলুর রহমান আলীয়া মাদরাসা, নোয়াখালী], ৪. মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন [অধ্যক্ষ, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা], ৫. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক [প্রাক্তন এম, পি; অধ্যক্ষ, পাবনা 'আলীয়া মাদরাসা], ৬. মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস [অধ্যক্ষ, মহাখালী কামিল মাদরাসা, ঢাকা], ৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হামিদ

Dhaka University Institutional Repository

এই কমিটি প্রায় ছয় মাস কাজ করে ইবতিদায়ী থেকে কামিল স্তর পর্যন্ত কারিকুলাম সম্পর্কিত রূপরেখা প্রণয়ন করে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য দাখিল করেন। বোর্ড ১৯৯২ খ্রী. ইবতিদায়ী স্তরের কারিকুলাম প্রণয়ন করে। অন্যান্য স্তরের কাজ অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষাক্রমে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় তেমন কোন সফলতা আসে নি। ১৯৭৯ খ্রী. বোর্ড স্বায়ত্ত্বশাসিত হওয়ার পর সিলেবাস ও পাঠ্যক্রম সংস্কারের জোর দাবী উঠে। অবস্থার আলোকে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আহবায়ক করে একটি সিলেবাস সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন এবং সমাধানের লক্ষ্যে এভাবে মন্তব্য করেন যে 'কারিকুলাম ছাড়া কোন শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে পারে না। বর্তমান মাদরাসা শিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন কারিকুলাম না থাকাই সবচাইতে বড় সমস্যা'। অপর দিকে ১৯৮৫ খ্রী. থেকে দাখিল পরীক্ষাকে এসএসসি ও ১৯৮৭ সাল থেকে আলিম পরীক্ষাকে এইচএসসি সমমান দেয়ায় সিলেবাসকে পুনর্বিন্যাস ও সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বয় সাধনের অতীব প্রয়োজন দেখা দেয়।[৫৭] সর্বশেষ ১৯৯২ সালে বোর্ড শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত সর্বাধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর আলোকে বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইবতিদায়ী স্তরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কয়েকটি কমিটি[৫৮] গঠন করা হয়।

[অধ্যক্ষ, গোপালগঞ্জ কামিল মাদরাসা, গোপালগঞ্জ], ৮. মাওলানা আ ন ম আবদুল কাইয়ূম খন্দকার [অধ্যক্ষ, আদমজী সিনিয়র মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ], ৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার [সাবেক এম, পি; খুলনা, উপদেষ্টা]।

৫৭. মাদরাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য সূচী প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট, ১৯৯৪, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ভূমিকা, পৃ ৫-৬।

৫৮. **কমিটিসমূহ নিম্নরূপে গঠন করা হয় : আরবী বিষয়ক কমিটি** : ১. ড. মুস্তাফিজুর রহমান [অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢা বি], ২. মোহাম্মদ আবদুল মা'বুদ [সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢা বি], ৩. মাওলানা ইব্রাহিম আলী [প্রভাষক, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা], ৪. মাওলানা গিয়াস উদ্দিন [তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা], ৫. মোঃ আবদুল মালেক [পরিদর্শক, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা]।

কুর'আন মাজিদ ও তাজবীদ এবং ফিকহ ও 'আকা'ইদ বিষয়ক কমিটি : ১. মাওলানা আবদুস সালাম [অধ্যক্ষ, দুর্বাটি আলীয়া মাদরাসা, গাজীপুর], ২. মাওলানা যাইনুল আবেদীন [অধ্যক্ষ, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা], ৩. মাওলানা আবদুল কাইয়ূম [অধ্যক্ষ, আদমজী সিনিয়র মাদরাসা, আদমজী, নারায়ণগঞ্জ], ৪. মুহাম্মদ তমিজ উদ্দিন উর্ধ্বতন [বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা], ৫. মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান খান [উপ-রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা]।

বাংলা বিষয়ক কমিটি : ১. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ [অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢা বি], ২. মাওঃ রুহুল আমীন [সহযোগী অধ্যাপক, ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ, গাজীপুর], ৩. মোঃ শফিউল আলম [বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা], ৪. খন্দকার আবদুল মোমেন [সহকারী অধ্যাপক, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা], ৫. শেখ আবু জাফর আহমদ [সহকারী পরিদর্শক, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা]।

ইংরেজী বিষয়ক কমিটি : ১. অধ্যাপক শামছুল হক [প্রধান সম্পাদক, জাতীয় শিক্ষক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা], ২. মাজহারুল হক [সহযোগী অধ্যাপক, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা], ৩. সৈয়দ আবদুস সেলিম [সহযোগী অধ্যাপক উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা], ৪. গিয়াস উদ্দিন আহমেদ [সহকারী অধ্যাপক, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা], ৫. মোঃ শফিকুর রহমান [সহকারী রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা]।

সমাজ পাঠ বিষয়ক কমিটি : ১. ড. কে এম মুহসীন [ডীন, কলা অনুষদ, ঢা বি], ২.মাওলানা আবদুল জলীল [অধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যবীয়া 'আলীয়া মাদরাসা, ঢাকা], ৩. মাহবুবুর রহমান [এম ডি এস নায়েম, ঢাকা], ৪. তবারক আলী [উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা], ৫. মোঃ আবদুল হালিম সরকার [রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা]।

বিজ্ঞান বিষয়ক কমিটি : ১. মুহাম্মদ ইউনুস শিকদার [অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা], ২. ড. গোলাম রসুল মিয়া [উপাধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা], ৩. ড. আবদুল ওহাব [উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা], ৪. ড. মোঃ নুর উদ্দিন আহমদ [প্রভাষক, মাদরাসা-ই-আলীয়া ঢাকা], ৫. মোঃ আবদুস সাত্তার [সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা]।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি ইবতিদায়ী পর্যায়ে তাদের প্রণীত কারিকুলাম ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের নীতিমালা সম্বলিত পৃথক পৃথক রিপোর্ট যথারীতি জমা দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ড ১৯৯৪ সাল থেকে প্রথম বারের মত ১ম শ্রেণী-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকসমূহ কারিকুলাম অনুযায়ী প্রণয়ন করে মাদরাসাসমূহে একক বই চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

গণিত বিষয়ক কমিটি : ১. এ এফ এম আবদুর রহমান [অধ্যাপক গণিত বিভাগ, ঢা বি, ঢাকা], ২. মোঃ আনওয়ার আলী [নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা], ৩. সালেহ মতিন [উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা], ৪. নাসির উদ্দিন [সহকারী শিক্ষক, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া 'আলীয়া মাদরাসা, ঢাকা], ৫. মোঃ মাহফুজুর রহমান [উপ-পরিদর্শক বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা]।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : তিন

পাঠক্রমে ইসলামী শিক্ষা

[১৯৭১-১৯৯০ খ্রী.]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এ দেশের অধিবাসীদের শতকরা ৮৫ ভাগের বেশি মুসলমান।[৫৯] তাই ইসলামী শিক্ষার আলোকে দেশের জনগণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন খুবই প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রমে ইসলামী শিক্ষার পাঠদান সুদীর্ঘ দিন ধরে অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে জানতে হলে এদেশের পাঠক্রমে ইসলামী শিক্ষার উপাদান সম্পর্কে

সবিস্তার জানা আবশ্যক। এ পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষাকে তিনটি স্তর যথা : **এক.** প্রাথমিক স্তর; **দুই.** মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর; **তিন.** উচ্চ স্তর–এ নিরিখে বিন্যস্ত করে পাঠক্রমে ইসলামী শিক্ষার যথার্থতা নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে।

এক.

প্রাথমিক স্তর

ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক স্তরকে আমরা ছয়টি পর্যায়ে আলোচনা করতে পারি :

১. মসজিদ ভিত্তিক মক্তব। ২. ফোরকানিয়া মাদরাসা। ৩. হাফিজিয়া মাদরাসা। ৪. ইবতিদায়ী মাদরাসা। ৫. দরসে নিযামী ইবতিদায়ী মাদরাসা। ৬. সরকারী প্রাইমারী স্কুল।

১. মসজিদ ভিত্তিক মক্তব

মসজিদ ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। এর সূচনা হয় মসজিদে নববী থেকে। মসজিদকে কেন্দ্র করেই ইসলামী শিক্ষার বহু উল্লেখযোগ্য ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যুগে যুগে। মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্তমান যুগেও সেই ধারা প্রবর্তিত রয়েছে। শহর-গ্রামাঞ্চল, সর্বত্র এ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মসজিদের ইমাম বিশেষ সময়ে মুসল্লিদের তা'লিম দিয়ে থাকেন। স্বাধীনতার সময়ে বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা ছিল ১,১৭৪৩৬। স্বাধীনতা পূর্বে ৭০-এর দশকে ২১,২১৭টি, ৮০-এর দশকে ২৭,২৪৮টি ও ৯০-এর দশকে ২৫,৭১৯টি মসজিদ বৃদ্ধি হয়ে বর্তমানে মসজিদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৯১,৬২০টি। অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ৭৪,১৮৪টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে।[৬০] এ সকল মসজিদে প্রতিদিন ৫২,০৯৪২৩ জন মুসল্লি নামায আদায় করে থাকেন। জুম'আর দিনে সমগ্র দেশে মুসল্লিদের সংখ্যা হয় ২,১১২৪৫৬৪ জন। জুম'আর খুতবার মাধ্যমে মুসল্লিগণ প্রতি সপ্তাহে ইসলামের বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে অবগত হন। এ ছাড়া অনেক মসজিদে নির্দিষ্ট সময়ে হাদীসের দরস এবং কুর'আন মজীদের তাফসীর অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের মসজিদভিত্তিক মক্তবের সংখ্যা ১০১৪৯০টি। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সময় এর সংখ্যা ছিল ৬৪৪৯০টি। অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভের পর ৩৭,০০০টি মক্তব নির্মিত হয়েছিল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান

---

৫৯. সোহরাব উদ্দীন আহমদ, *মুসলিম জাহান*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৯, পৃ ৯।

৬০. *বাংলাদেশ মসজিদ জরিপ*, ঢাকা : ইফাবা, (ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী), ২০০০, পৃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ষগ্রন্থ ১৯৯০-এর এক তথ্য থেকে দেখা যায়, ১৯৮৩ সালে সমগ্র বাংলাদেশে মসজিদ কেন্দ্রীক মক্তবের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৮,৯৮২০২ জন।[৬১]

মসজিদ কেন্দ্রীক এ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনরূপ সরকারী অর্থ ব্যয় হয় না। অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত চাঁদা, মুষ্টি চাউল, অথবা মসজিদ কমিটি এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। কখনও শুধু ইমাম, আবার কখনো গ্রামের কোন 'আলিমকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

মসজিদ অথবা মসজিদ কেন্দ্রীক মক্তবের জন্য কোন পাঠ্যসূচী থাকে না বরং প্রথমে কায়দায়ে বাগদাদী-এর মাধ্যমে ছাত্রদের 'আরবী অক্ষর ও যুক্তাক্ষরের শিক্ষা দেয়া হয়। এর পরে আমপারা ও পরে কুর'আন মজীদ পাঠ করানো হয়। এর সাথে সাথে কলেমা, নামায ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। এতে যোগ্য শিক্ষকের অভাবে কোন কোন সময় ছাত্ররা বিশুদ্ধ কুর'আন শিক্ষা লাভ করতে পারে না। এ জন্য অভিভাবক এবং মসজিদ বা মক্তব কমিটি সদস্যদের সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ একবার অশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা করলে পরে বিশুদ্ধ কুর'আন তিলাওয়াত শিক্ষা করানো জটিল হয়ে পড়ে। তবুও ইসলামী শিক্ষার এ প্রাথমিক ধারা ইসলামী শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশের জনগণের বিশেষ আন্তরিকতার প্রমাণ বহন করে।

২. ফোরকানিয়া মাদরাসা

ফোরকানিয়া মাদরাসা ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক ধারা হিসেবে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ফোরকানিয়া মাদরাসা কখনো মসজিদ কেন্দ্রীক হয়। আবার কখনো লোকালয়ের বিশেষ স্থানে জনগণের সাহায্যে মাদরাসা হিসেবে ঘর তৈরী করে পবিত্র কুর'আন ও ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। দেশের কোন কোন অঞ্চলে বাড়ীর বৈঠক খানাকে ফোরকানিয়া মাদরাসা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোন কোন ফোরকানিয়ার ছাত্রদের থেকে নাম মাত্র বেতন নেয়া হয়। আবার কখনো বেতন ছাড়াই শিক্ষা দেয়া হয়। ফোরকানিয়া মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থা মক্তব থেকে কিছুটা উন্নত। এখানে পবিত্র কুর'আন শিক্ষা ছাড়াও বেহেশতী জেওর, তা'লিমুল ইসলাম বা দ্বীনিয়াত থেকে কিছু কিছু শিক্ষা প্রদান করা হয়।

১৯৯০ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থে সমগ্র বাংলাদেশে মসজিদ কেন্দ্রীক ফোরকানিয়া মাদরাসার সংখ্যা ৩১০৪টি উল্লেখ করা হয়েছে।[৬২] বাস্তবে এ হিসেবের চেয়েও এ সংখ্যা অনেক বেশী হতে পারে বলে অনুমান করা যায়। ফোরকানিয়া মাদরাসায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই অধিক সংখ্যক লেখাপড়া করে। গ্রাম বাংলার গরীব ছেলে-মেয়েদের ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ফোরকানিয়া মাদরাসা বিশেষ সহায়ক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ শিক্ষা ধারার ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৩. হাফিজিয়া মাদরাসা

দেশে ইসলামী শিক্ষার অন্য একটি ধারা হলো কুর'আন মজীদ হিফজকরণ। যে সকল প্রতিষ্ঠানে হিফজ করানো হয় সে সব প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় হিফজ খানা বা হাফিজী মাদরাসা।

হিফজ শব্দটি 'আরবী। এর আভিধানিক অর্থ হলো মুখস্ত করা। এ পদ্ধতিতে পূর্ণ কুর'আন মুখস্ত করা হয় বলে একে হিফজ নামে অভিহিত করা হয়। আর যারা পবিত্র কুর'আনের হিফজ সম্পন্ন করে তাদেরকে বলা হয় 'হাফিজ'। রাসূল সা.-এর যুগ থেকে এর প্রচলন হয়ে আসছে। তৎকালীন সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাইলের মারফতে ওহী প্রক্রিয়ায় যে সব আয়াত সাহাবীদের শোনাতেন তা তারা বারংবার পুনরাবৃত্তি করে স্মৃতির পাতায় আবদ্ধ করে রাখতেন। পরবর্তীতে এ ধারার অনুকরণে বিভিন্ন মুসলিম দেশে হিফজ শিক্ষা একটি সুনির্দিষ্ট স্বীকৃত প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

---

৬১. *Statistical Yearbook of Bangladesh,* Bangladesh Bureau of statistics, Ministry of plan Bangladesh, 1990, p 546.

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

এর শিক্ষাক্রম বর্ষভিত্তিক সুনির্দিষ্ট থাকে না। হিফজকারীর মেধা, স্মৃতি শক্তি, মননশীলতা, অধ্যাবসায় ও সময়ের ওপরই তা নির্ভরশীল। তাই দেখা যায় একই সাথে যারা হিফজ শুরু করেন তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অধিক মেধাবীগণ অন্যদের তুলনায় অনেক আগেই তার হিফজ সমাপ্ত করতে পারে। গড়ে ৩-৪ বছর সময়ে হিফজ সমাপ্ত করা হয়ে থাকে। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোনরূপ বোর্ডের আওতাভুক্ত নয়। সম্পূর্ণ বেসরকারী। স্থানীয় জনগণের দান খয়রাতের উপরই এগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। হিফজ করার বয়স হলো বাল্যকাল। কারণ শিশুদের মেধা হিফজের জন্য অধিকতর কার্যকরী।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে হাফিজিয়া মাদরাসার এ রীতি পূর্বের ন্যায় চলে আসছে। ১৯৭১ সালে হাফিজিয়া মাদরাসার সংখ্যা কত ছিল, এর সঠিক বিবরণ জানা না গেলেও বাংলাদেশের আনাচে কানাচে হাজার হাজার হাফিজিয়া মাদরাসা পবিত্র কুর'আনের খিদমত করে আসছিল–এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ১৯৯৮ সালের বাংলাদেশ মসজিদ জরিপের এক তথ্যে জানা যায়, বর্তমানে মসজিদ কেন্দ্রীক হিফজখানার সংখ্যা ১৫৯১টি।[৬৩] এ ছাড়া স্বতন্ত্র হাফিজিয়া মাদরাসার সংখ্যাও কয়েক হাজার হতে পারে। আর এ সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। হাদীস শরীফে হিফজকারীর বহু ফযিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। ফলে কুর'আনের হাফিজ ও হাফিজিয়া মাদরাসার মর্যাদায় আসীন হয়েছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, ১৯৮৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে হিফজুল কুর'আন বিষয়কে দাখিল স্তরে একটি বিধিবদ্ধ বিভাগের মর্যাদা দিয়েছে এবং এর জন্য পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। যা মাধ্যমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত।

হাফিজিয়া মাদরাসার ক্রমবৃদ্ধি ওহীর শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আন্তরিকতার প্রমাণ বহন করে। এ ছাড়া প্রতি রমযান মাসে হাফিজগণের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষ পুরো কুর'আন একবার বিশুদ্ধভাবে তারাবীহের নামাযে শুনার সুযোগ পায়।

৪. ইবতিদায়ী মাদরাসা

মাদরাসা 'আলীয়ার ইবতিদায়ী মাদরাসাগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে জুনিয়র প্রথম বর্ষ, জুনিয়র দ্বিতীয় বর্ষ, জুনিয়র তৃতীয় বর্ষ, জুনিয়র চতুর্থ বর্ষ নামে অভিহিত ছিল।[৬৪] মাদরাসা শিক্ষার সূচনা থেকে চার বছরের ইবতিদায়ী কোর্সের ধারা চলে আসছে। কোন কোন মাদরাসায় ইবতিদায়ী ক্লাসের জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা ছিল। আবার যে সকল মাদরাসার সাথে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, সেখানে ইবতিদায়ী ক্লাসগুলোকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখা হতো। ইবতিদায়ী মাদরাসার জন্য কোনরূপ সরকারী অনুদান বা বেতন দেয়া হতো না। এমনকি ১৯৫৭ সালে শিক্ষা সংস্কার কমিটি ইবতিদায়ী মাদরাসাকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করার সুপারিশ করেছিল।[৬৫] ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সরকার সর্বপ্রথম ইবতিদায়ী মাদরাসার ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শিক্ষার সকল স্তর সম্পর্কে যথোপযুক্ত সুপারিশ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল সাঃ নং৮/১০এম-৮/৮৬/২১৭৬/(১৫০)-শিক্ষা নং বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষা কমিশন গঠন করে। কমিটি যথাসময়ে তাদের সুপারিশ পেশ করেন।[৬৬]

---

৬৩. *বাংলাদেশ মসজিদ জরিপ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪

৬৪. আবদুস সাত্তার, *তারীখ-ই-মাদরাসা আলীয়া*, ঢাকা : ১৯৫৯, ২য় খ, পৃ ৩১-৩২।

৬৫. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ ২৯১।

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৬-৫৮, ইবতিদায়ী স্তর সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশমালা এ অধ্যায়ের *পরিচ্ছেদ* : দুই-এর বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৮৮-এর বিবরণ দ্র.।

Dhaka University Institutional Repository

এ কমিটি ইবতিদায়ী মাদরাসা শিক্ষার ১৮টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর এ স্তর সম্পর্কে ১১টি সুপারিশমালা পেশ করেন।[৬৭] এতে ইবতিদায়ী প্রতিটি ক্লাসের জন্য সাপ্তাহিক পিরিয়ড এবং পাঠ্য বিষয় পাঠদানের নিয়মাবলী সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৮] বাংলাদেশের বর্তমান ইবতিদায়ী মাদরাসাগুলো অনেকাংশে এ সকল সিদ্ধান্তেরই প্রতিফলন।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ঢাকা-এর প্রণীত ইবতিদায়ী প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী নিম্নরূপ :

ইবতিদায়ী প্রথম শ্রেণী : পূর্ণমান ৫০০

- কুর'আন, 'আরবী, 'আকা'ঈদ ও ফিকহ, বাংলা, গণিত, ইংরেজী।

ইবতিদায়ী দ্বিতীয় শ্রেণী : পূর্ণমান ৫০০

- কুর'আন, 'আকা'ঈদ ও ফিকহ, 'আরবী, বাংলা, গণিত, ভূগোল ও সমাজ পাঠ, উর্দু, ইংরেজী।

ইবতিদায়ী তৃতীয় শ্রেণী : পূর্ণমান ৭০০

- কুর'আন, ফিকহ, 'আকা'ঈদ, 'আরবী, বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, অতিরিক্ত বিষয়।

ইবতিদায়ী চতুর্থ শ্রেণী : পূর্ণমান ৭০০

- কুর'আন, 'আকা'ঈদ, ফিকহ, 'আরবী, বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সমাজপাঠ, বিজ্ঞান, অতিরিক্ত বিষয়।

ইবতিদায়ী পঞ্চম শ্রেণী : পূর্ণমান ৫০০

- কুর'আন, 'আরবী ১ম পত্র, 'আরবী ২য় পত্র, 'আকা'ঈদ, ফিকহ, বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সমাজ পাঠ ও বিজ্ঞান।[৬৯]

মাদরাসা বোর্ড কর্তৃক ইবতিদায়ী পঞ্চম শ্রেণীতে তিনশত নম্বরের বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ার নিয়ম রয়েছে।[৭০] ইবতিদায়ী বৃত্তি পরীক্ষার মান নিম্নরূপ :

- 'আরবী ৭৫
- 'আকা'ঈদ ও ফিকহ ৭৫
- বাংলা ৭৫
- গণিত ৭৫

১৯৮৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত মাদরাসা শিক্ষার দাখিল স্তরটিও ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ এ স্তরটি তখন পর্যন্ত এসএসসি-এর সমপর্যায়ভুক্ত ছিল না। ১৯৮৫ সালে দাখিল এসএসসি-এর মর্যাদাভুক্ত হয়ে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়।

---

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৪-৫৬, এসব সুপারিশমালা *মাদরাসা শিক্ষা [ড. এম বারী] কমিটি* ১৯৮৯-এর বিবরণ এ অধ্যায়ের *পরিচ্ছেদ : দুই* দ্র.।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৫; এর জন্য দেখুন, এ অধ্যায়ের *পরিচ্ছেদ : দুই*-এর মাদরাসা শিক্ষা [ড. এম এ বারী] কমিটি ১৯৮৯-এর বিবরণ।

৬৯. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী থেকে গৃহীত, পৃ ৩-৮।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

৫. দরসে নিযামী ইবতিদায়ী মাদরাসা

দরসে নিযামী মাদরাসাগুলোর প্রাথমিক স্তর হচ্ছে ইবতিদায়ী মাদরাসা। ১৯৭৮ সালে সর্বপ্রথম বেফাকুল মাদারিসিল 'আরাবিয়া বাংলাদেশ বা কাওমী মাদরাসাসমূহের ঐক্য সংস্থা সংগঠিত হয়।[৭১] সংক্ষিপ্তভাবে একে বেফাক বলা হয়।

বেফাক গঠিত হওয়ার পর থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইবতিদায়ী মাদরাসাগুলো পরিচালিত হয়ে আসছে। কাওমী ইবতিদায়ী মাদরাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য[৭২] পাঠ্য তালিকা,[৭৩] ক্লাস রুটিন,[৭৪] পাঠদানের সময়,[৭৫] শ্রেণীভিত্তিক পরীক্ষার মান-বন্টন, ও পাঠদানের নিয়মাবলী সুনির্দিষ্ট আছে। একই নিয়মে বেফাকের উদ্যোগে মসজিদ কেন্দ্রীক ফোরকানিয়া মাদরাসা পরিচালিত হয়ে আসছে। এর জন্য পাঠ্য তালিকাও নির্ধারণ করা

---

৭১. মাওলানা ইসহাক ফরিদী, *দারুল উলুম দেওবন্দ : ঐতিহ্য ও অবদান*. কুমিল্লা : ইকরা রওজাতুল আতফাল, ১৯৯৭, পৃ ২।

৭২. কাওমী প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিটি শিশুকে দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া, একই সাথে পার্থিব সার্বিক জগতের জ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে আদর্শ মুসলিম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। দেশের সকল শিশুকে শিক্ষাদান, এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। (দ্র. *কাওমী প্রাইমারী পাঠ্য তালিকা*, পৃ ৮)।

৭৩. কাওমী প্রাইমারী শ্রেণীর পাঠ্যসূচী নিম্নরূপ (সংক্ষিপ্ত) :

শিশু শ্রেণী : ১. 'আরবী অক্ষর পরিচয় ও বানান শিক্ষা, ২. দ্বীনিয়াত, কালেমা ও নামাযের মাসুনন দোয়াসমূহ মুখস্ত করণ। এ ছাড়াও এ শ্রেণীতে বাংলা, বর্ণ শিক্ষা, ধারাপাত, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়।

প্রথম শ্রেণী : ১. 'আরবী, আমপারা পঠন ও সূরা ফীল পর্যন্ত মুখস্তকরণ, ২. দ্বীনিয়াত, দোয়া মাছুরাহ, অযু, তায়াম্মুম ও নামাযের তা'লিম। এ ছাড়াও রয়েছে বাংলা, ইংরেজী ও অংকে প্রাথমিক শিক্ষা।

দ্বিতীয় শ্রেণী : ১. 'আরবী, কুর'আনের তিলাওয়াত শিক্ষা প্রথম পাঁচ পারা সূরা ওয়াদ্দোহা পর্যন্ত মুখস্ত করান। 'ইলমে তাজবীদের নিয়মাবলী মৌখিক শিক্ষা। ২. দ্বীনিয়াত ও ইসলামী তাহজীব। এ ছাড়াও রয়েছে বাংলা, উর্দু, অংক ও ইংরেজীর নির্ধারিত পুস্তক।

তৃতীয় শ্রেণী : ১. 'আরবী, কুর'আন ছয় থেকে পনের পারা পঠন ও সূরা ওয়া-আল্লাইল পর্যন্ত মুখস্তকরণ ও তাজবীদের নিয়মাবলী শিক্ষা। ২. দ্বীনিয়াত, তা'লিমুল ইসলাম ১ম ও ২য় খণ্ড, ইসলামী তাহজীব নামক গ্রন্থ। এ ছাড়াও বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, গণিত, সমাজ পাঠ, ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজী ও উর্দু পাঠদান করা হয়।

চতুর্থ শ্রেণী : ১. 'আরবী, কুর'আন শরীফ শেষ ১৫ পারা পঠন এবং আমপারা মুখস্তকরণ ও তাজবীদ শিক্ষা। ২. দ্বীনিয়াত, তা'লিমুল ইসলাম ৩য় খণ্ড, বেহেশতী জেওর ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড। এছাড়াও বাংলা, ব্যাকরণ, গণিত, সমাজ পাঠ, ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজী ও ইংরেজী গ্রামার, নির্দিষ্ট পুস্তক এ শ্রেণীর পাঠ্য তালিকায় অর্ন্তভূক্ত।

পঞ্চম শ্রেণী : ১. 'আরবী, পূর্ণ কুর'আন শরীফ পঠন ও মশককরণ, সূরা ইয়াসিন, সূরা মুজাম্মিল মুখস্তকরণ। নুজাহাতুল ক্বারী নামক গ্রন্থের পাঠ। ২. দ্বীনিয়াত, তা'লিমুল ইসলাম ৪র্থ খণ্ড এবং বেহেশতী জেওর ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড, এছাড়া বাংলা ব্যাকরণ, গণিত, সমাজ পাঠ, ভূগোল উর্দু, উর্দু ব্যাকরণ, ফারসী ব্যাকরণ, ইংরেজী, ইংরেজী ব্যাকরণ বিষয়ে নির্দিষ্ট গ্রন্থ এ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত।

৭৪. শিশু শ্রেণী চারটি বিষয়ে ৪ ঘন্টা, ১ম শ্রেণী ৫টি বিষয়ের জন্য ৫ ঘন্টা, ২য় শ্রেণী ৭টি বিষয়ের জন্য ৬ ঘন্টা, ৩য় শ্রেণী ৮টি বিষয়ের জন্য ৬ ঘন্টা, ৪র্থ শ্রেণী ৮টি বিষয়ের জন্য ৬ ঘন্টা। ৫ম শ্রেণী ৯টি বিষয়ের জন্য ৭ ঘন্টা। (দ্র. *কাওমী প্রাইমারী পাঠ্যতালিকা*, পৃ ১৫-১৬)।

৭৫. প্রত্যহ রুটিন মাফিক প্রাইমারী ৩-৪ ঘণ্টা হতে হবে। এতদসঙ্গে রুটিনের ও নমুনা পেশ করা গেল :

- শিক্ষক সংখ্যা কমপক্ষে তিন জন আলিম ও তিন জন সাধারণ শিক্ষক থাকতে হবে। শিক্ষকবৃন্দকে শুধু প্রাইমারীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া জরুরী নয় বরং উপরস্থ উস্তাদগণের দায়িত্বেও প্রাইমারীর রুটিন বন্টন করা উত্তম।
- যথারীতি ঘন্টা বাজাবার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি মাদরাসা নিজ দায়িত্বে সকল শ্রেণীর তিনটি পরীক্ষা এবং ৫ম শ্রেণীর ত্রৈমাসিক ও ষান্মাষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবে। আর বেফাকের অধীনে ৫ম শ্রেণীর সেন্টার পরীক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হবে।
- সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে।[৭৬] এ ছাড়া কাওমী মাদরাসার উদ্যোগে বৈকালিন মাদরাসা ও নৈশকালীন মাদরাসাও পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৯৯০ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৮৩ সালে সমগ্র বাংলাদেশে দরসে নিযামী মাদরাসার মসজিদ কেন্দ্রীক ফোরকানিয়া মাদরাসার সংখ্যা ছিল ৯৬৮টি এবং স্বতন্ত্র মক্তবের সংখ্যা ছিল ১৯২৫টি।[৭৭]

আশির দশকে শিশুদের ইসলামী শিক্ষার জন্য কাওমী মাদরাসার খিদমত ক্রমশ উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ শিক্ষা প্রচেষ্টা বাংলাদেশের জন্য আরো অধিক কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হবে।

৬. সরকারী প্রাইমারী স্কুল

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি অতি সুপ্রাচীন। এর পাঠ্যসূচী কখন কি রকম ছিল তা জানা না গেলেও শিশুদেরকে ধর্মীয় শিক্ষাদানের নিয়ম মুসলিম শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আসছে।

১৯৫৯ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন শরীফ কমিটির এক সিদ্ধান্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদর জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক পাঠ্য হিসেবে সুপারিশ করা হয়। কমিটি কর্তৃক এ সকল ক্লাসের পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করে দেয়া হয়।[৭৮] এর আলোকে দেশের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ইসলামিয়াত আবশ্যক বিষয় হিসেবে পাঠ দান করানো হতো।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রাক্কালেও প্রাইমারী স্কুলে ইসলামী শিক্ষার এ পদ্ধতি বহাল ছিল।[৭৯] বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিশাল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বাল্যকাল থেকেই ইসলামী শিক্ষার সুযোগ পেয়ে আসছে। এখান থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার পাঠের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া বাল্য জীবনে শিশুরা ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়মিত আরবী অক্ষর জ্ঞান, কলেমা, আল্লাহর পরিচয়, ইসলামী চরিত্র ইত্যাদি মৌলিকভাবে শিক্ষা দেয়া হয়। এবং বছর শেষে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড কর্তৃক মুদ্রিত 'ইসলাম শিক্ষা' নামক পুস্তক পাঠ করানো হয়। এ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে 'আকা'ঈদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ইবাদত, তৃতীয় অধ্যায়ে আখলাক, চরিত্র, চতুর্থ অধ্যায়ে কুর'আন মজিদ শিক্ষা, পঞ্চম অধ্যায়ে নবী, রাসূলের কাহিনী পাঠ করানো হয়। 'ইসলামী শিক্ষা' প্রতিদিন বিদ্যালয়ের পাঠদান সময়ে থেকে ১০% সময় ব্যয় করার বিধিবদ্ধ নিয়ম রয়েছে।[৮০] বছর শেষে এদের ইসলামিয়াত বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

---

৭৬. **ক. দ্বীনিয়াত**
   ১. আল কুর'আন, দেখে দেখে পড়া, নির্দিষ্ট সূরা হিফজ করা ও তাজবীদ শিক্ষাকরণ।
   ২. ইসলামী তাহজীব, 'আকা'ঈদ, মাসায়েল, তাহারাত, সালাত ইত্যাদি।

   খ. সাধারণ জ্ঞান
   ১. বাংলা। ২. অংক। ৩. ভূগোল।

৭৭. *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ*, ১৯৯০, পৃ ৫৪৬।

৭৮. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৩; A K M Ayub Ali, Ibid, p 172.

৭৯. *প্রাথমিক শিক্ষা তথ্য*, ১৯৮১, পৃ ১৩৩।

৮০. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ শ্রেণীতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলাম শিক্ষা' চতুর্থ ভাগ পাঠ করানো হয়। এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে 'আকা'ঈদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ইবাদত, তৃতীয় অধ্যায়ে আখলাক, চতুর্থ অধ্যায়ে কুর'আন মজীদ শিক্ষা এবং পঞ্চম অধ্যায়ে নবী রাসূলের জীবন কাহিনী পাঠ করানো হয়।

একইভাবে পঞ্চম শ্রেণীতে 'ইসলাম শিক্ষা' পঞ্চম ভাগের প্রথম অধ্যায়ে আকা'ঈদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ইবাদত, তৃতীয় অধ্যায়ে আখলাক, চতুর্থ অধ্যায়ে কুর'আন পরিচিতি ও পঞ্চম অধ্যায়ে জীবন চরিত শিক্ষা দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষার এ পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একজন ছাত্র-ছাত্রী পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয়সমূহ অনায়াসে আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়।

১৯৯০ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বর্ষ গ্রন্থের এক তথ্যে দেখা যায়, ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ১৪ বৎসরের বাংলাদেশে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২৮৮টি এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে ৩৪০৫০০০ জন।[৮১]

দেশের প্রাইমারী স্কুলের ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যসূচী সীমিত হলেও শিশু শিক্ষার অন্য সকল প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা প্রাইমারী স্কুলের মাধ্যমেই বেশী সংখ্যক শিশুকে ইসলামী শিক্ষার ধারণা প্রদান করা সম্ভব হয়।

---

৮১. পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থের হিসেব নিম্নরূপ (সংক্ষিপ্ত) :

বছর	স্কুল সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা (+০০০)
১৯৭৫	৩৯৯১৪	৮৩৫০
১৯৭৬	৪০৩১৩	৮২৮১
১৯৭৭	৪১১২৯	৮৪১৮
১৯৭৮	৪১৭৮৭	৭৫৫৭
১৯৭৯	৪২৪৪৩	৭৭৩৩
১৯৮০	৪২৫৮৮	৮০২৭
১৯৮১	৪২৪৪৭	৮২৬০
১৯৮২	৪২৬৮৩	৮৬৫৬
১৯৮৩	৪৩২১৯	৮৯৫৫
১৯৮৪	৪৩৪৬৫	৯৬৪৩
১৯৮৫	৪৩৫৮৮	১০০৮২
১৯৮৬	৪৩৭১২	১০৭৭৩
১৯৮৭	৪৩৯৯২	১১২৬৩
১৯৮৮	৪৪২০২	১১৭৫৫

দ্র. *Bangladesh Bureau of Statistcs Division,* Ministry of Planning, Government of the Peoples Ripublic of Bangladesh, 1990. p 547.

Dhaka University Institutional Repository

দুই.
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর

ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বলতে নিম্নবর্ণিত তিনটি স্তরকে বুঝায়।

১. 'আলীয়া মাদরাসার দাখিল ও আলিম স্তর।
২. দরসে নিজামী মাদরাসার মারহালাতুস সানুবিয়্যাহ ও মারহালাতুস সানুবিয়্যা আল উলইয়া।
৩. সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর।

১. 'আলীয়া মাদরাসার দাখিল ও আলিম স্তর

উপনিবেশিক আমলে মাদরাসা শিক্ষা বহুলাংশে ধ্বংস করা হলেও কলিকাতা 'আলীয়া মাদরাসাকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত মাদরাসা সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তান আমলে এ ধারা অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশে আমলে মাদরাসা স্থাপনের গতি নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

শিক্ষাবর্ষ	দাখিল মাদরাসার সংখ্যা	আলিম মাদরাসার সংখ্যা
১৯৮৪-৮৫	২০৩৬	৬১৫
১৯৮৫-৮৬	২১৫০	৬১৫
১৯৮৬-৮৭	২৮৭২	৬৪৪
১৯৮৭-৮৮	৩৮৭৭	৬৩৪
১৯৮৮-৮৯	৩৬০৭	৬৫০
১৯৮৯-৯০	৪০০১	৭৩৮[৮২]

এ ছাড়া ফাযিল এবং কামিল মাদরাসার সাথেও দাখিল ও আলিম স্তর সংযুক্ত ছিল। এ সকল মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করার জন্য ১৯৭৫-৭৬ শিক্ষাবর্ষের একটি পরিসংখ্যান পেশ করা হলো।

দাখিল মাদরাসা	ছাত্র	ছাত্রী	আলিম মাদরাসা	ছাত্র	ছাত্রী
৪৫৯	১,১৭,৪৮৩	৬,৭১২	৪৩১	৫৬,৫৮০	২,৮৩৫[৮৩]

দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের জনসংখ্যার তুলনায় পরিসংখ্যানে উল্লিখিত মাদরাসা ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যথেষ্ট না হলেও এতে ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়।

'আলীয়া মাদরাসার দাখিল স্তর ৪ বছর
পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী

বাংলাদেশের সূচনালগ্নে 'আলীয়া মাদরাসায় পাকিস্তান আমলের পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত ছিল। সে সময়ে দাখিল শ্রেণীগুলোকে দাহম, নাহম, হাশতম ও হাফতম নামে অভিহিত করা হতো। হাফতম শ্রেণীতে একটি বোর্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার সাথে এর কোন মান নির্ধারিত ছিল না। দাখিল ও আলিম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী নিম্নরূপ :

---

৮২. *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ*, ১৯৮৯, পৃ ৫১৭; প্রাগুক্ত, ১৯৯০, পৃ ৫৪৫।

৮৩. *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ*, ১৯৭৯, পৃ ৩৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

- **দাহম/জুনিয়র ১ম বর্ষ**

আবশ্যিক বিষয়

১. ছরফ-মীযান, মুনশায়েব (পূর্ণ)।

২. ফারসী-ফারসী কী পয়লী কিতাব।

৩. উর্দূ-উর্দূ কী দোসরী কিতাব।

৪. অংক- জমা তাফরীক।

৫. তাজবীদ।

- **ঐচ্ছিক**

৬. ইংরেজী অথবা

৭. বাংলা।

- **নাহম/জুনিয়র দ্বিতীয় বর্ষ**

আবশ্যিক বিষয়

১. 'আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ-বাররাতুল আদব, ১ম খণ্ড, পাঞ্জেগাঞ্জ, নাহ্‌মীর, জুমাল, মিয়াতু আমিল।

২. ফারসী-ফারসী কী দোসরী কিতাব, সাফওয়াতুল মাসাদীর।

৩. উর্দূ-উর্দূ কী তেসরী কিতাব।

৪. অংক।

৫. তাজবীদ।

- **ঐচ্ছিক বিষয়**

৬. ইংরেজী।

৭. বাংলা।

- **হাশতম/জুনিয়র তৃতীয় বর্ষ**

আবশ্যিক বিষয়

১. 'আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ-কায়লুবী, ফুসূলে আকবরী, হিদায়াতুন্নাহু, তরজুমায়ে 'আরবী।

২. মানতিক-ইছাগুছী, মিযানুল মানতিক।

৩. ফারসী-গোলস্তা-১ম অধ্যায়, বোস্তা ২য় অধ্যায় মিফতাহুল কাওয়ায়িদ।

৪. উর্দূ-মুয়াল্লামাত তাহজীব, ২য় খণ্ড।

৫. অংক।

৬. ইতিহাস ও ভূগোল।

- **ঐচ্ছিক বিষয়**

৭. ইংরেজী অথবা

৮. বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

- **হাফতম/জুনিয়র, ৪র্থ বর্ষ**

আবশ্যিক বিষয়

১. 'আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ-ফুসূলে আকবরী, কাফিয়া।

২. মুনিয়াতুল মুসুল্লি।

৩. মানতিক-মেরকাত।

৪. ফারসী-আখলাকুল মুহসেনীন, মিফতাহুল কাওয়ায়েদ।

৫. উর্দূ-মুয়াল্লিমুত তাহজীব, (১ম অংশ)।

৬. অংক।

৭. ইতিহাস।

৮. ভূগোল।

- **ঐচ্ছিক**

৯. ইংরেজী অথবা

১০. বাংলা।

আলিম : উচ্চ মাধ্যমিক

২ বছর মেয়াদী	পত্র	মান
১. হাদীস ও তাফসীর	২টি	২০০
২. আরবী সাহিত্য পদ্য আরবী সাহিত্য গদ্য বালাগাত ইসলামের ইতিহাস	৪টি	২৫০
৩. ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ	২টি	১৫০
৪. মানতিক এবং হিকমত	২টি	১০০
৫. ইংরেজী অথবা ফারসী	যে কোন ১টি	১০০
৬. উর্দূ	ঐচ্ছিক	১০০
৭. ফারসী সাহিত্য		১০০[৮৪]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তান আমলের উক্ত পাঠ্যসূচী ১৯৭১ সালের পরও মাদরাসাগুলোতে বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। এ কমিশনের সুপারিশমালা পেশ করার পর এর বিচার বিশ্লেষণ ও পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে বাস্তব পরামর্শ দানের জন্য বাংলাদেশ সরকার রেজুলেশন নং শা-১৫৬০ শিক্ষা, তারিখ, ১১.১১.৭৫-এর মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হক। কমিটি দেশের মাদরাসা শিক্ষার কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের জন্য তৎকালীন 'মাদরাসা-ই 'আলীয়া' এর অধ্যক্ষ ড. এ কে এম আইয়ুব আলীকে চেয়ারম্যান করে একটি সাব কমিটি গঠন করেন।

সাব কমিটির রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন

উপরোক্ত সাব কমিটি মাদরাসা বোর্ড কর্তৃক ১৯৭৫ সালে সংশোধিত শিক্ষাক্রমের ত্রুটি বিচ্যুতি পর্যালোচনা করে সর্ব-সম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন। সাব কমিটির গৃহীত রিপোর্টটি জাতীয় শিক্ষাক্রম কমিটিতে পেশ করা হয়। পরবর্তীতে জাতীয় কারিকুলাম কমিটি সাব কমিটির উক্ত রিপোর্ট অনুমোদন করেন। এমনিভাবে

---

৮৪. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫২।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৭৫ সালের সংশোধিত পাঠ্য তালিকা জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়। এ পাঠ্য তালিকার প্রধান লক্ষ্য ছিল মাদরাসা শিক্ষাকে দেশের প্রচলিত শিক্ষার সাথে সমন্বিত করা।[৮৫]

কমিটি ১৯৭৬ সালে মাদরাসার পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার পর দাখিল ও আলিম স্তরের যে পাঠ্যসূচী অনুমোদন করে তা ছিল নিম্নরূপ :

দাখিল স্তর (মাধ্যমিক) ৬ বছর মেয়াদী	মানবিক বিভাগ	পূর্ণমান
১.	পবিত্র কুর'আন তাজবীদসহ পাঠ্যাভ্যাস	১০০
২.	নির্বাচিত সুরার অনুবাদ	১০০
৩.	আকাঈদ	১০০
৪.	আল ফিকহ্	১০০
৫.	উসূলুল ফিক্হ	১০০
৬.	'আরবী সাহিত্য	১০০
৭.	'আরবী ব্যাকরণ ও অনুবাদ	১০০
৮.	বাংলা	১০০
৯.	গণিত	১০০
১০.	সমাজ বিজ্ঞান (ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরনীতি)	১০০
১১.	সাধারণ বিজ্ঞান	১০০
১২.	ইংরেজী	১০০
১৩.	শারীরিক শিক্ষা ও আর্টস এন্ড ক্রাফটস	১০০
১৪.	ফারসী অথবা উর্দূ	১০০

আলিম স্তর (উচ্চ মাধ্যমিক) ২ বছর মেয়াদী	ক. মানবিক বিভাগ	পূর্ণমান
১.	পবিত্র কুর'আনের অনুবাদ	১০০
২.	আল হাদীস ও উসূলুল হাদীস	১০০
৩.	আরবী সাহিত্য	১০০
৪.	আল ফিকহ (ইসলামী আইন)	১০০
৫.	উসূলে ফিকহ (ইসলামী আইনের নীতিমালা)	১০০
৬.	ইলমুল মীরাস (স্বত্বাধীকার আইন)	১০০
৭.	ইলমুল মানতিক	১০০
৮.	ইসলামের ইতিহাস	১০০
৯.	বাংলা	১০০
১০.	নিম্নে যে কোন দুটি বিষয় ক. ইংরেজী, খ. উর্দূ, গ. ফারসী, ঘ. সাধারণ বিজ্ঞান।	২০০

৮৫. ড. সিকান্দর আলী ইব্রাহিমী, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : অতীত ও বর্তমান*, ঢাকা : ১৯৯১, পৃ ৮৯; Dr. A K M Ayub Ali, *History of the traditional Islamic Education in Bangl,* Dhaka : I F B, 1943, p 189.

Dhaka University Institutional Repository

আলিম	খ. বিজ্ঞান বিভাগ	পূর্ণমান
১.	আল কুর'আন এর অনুবাদ	১০০
২.	আল হাদীস ও উসূলুল হাদীস	১০০
৩.	'আরবী সাহিত্য	১০০
৪.	আল ফিকহ্	১০০
৫.	ইলমুল মীরাস	৫০
৬.	বাংলা	১০০
৭.	ইংরেজী	১০০
৮.	সাধারণ গণিত	১০০
৯.	পদার্থ বিজ্ঞান	১০০
১০.	রসায়ন বিজ্ঞান	১০০
১১.	উদ্ভিদ বিজ্ঞান/গণিত	১০০
১২.	ঐচ্ছিক বিষয়ে (যে কোন দুটি) ক. গণিত, খ. উদ্ভিদ, গ. উচ্চতর ইংরেজী, ঘ. উর্দূ, ঙ. ফারসী, চ. উচ্চতর বাংলা, ছ. কৃষি, জ. ইসলামের ইতিহাস, ঝ. উসূল ফিকহ্, ঞ. তর্ক-শাস্ত্র।[৮৬]	১০০

১৯৭৫ সালে গঠিত ও ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত মাদরাসা শিক্ষার উক্ত পাঠ্যসূচী ও কারিকুলাম মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড অনুমোদন করে নেয়। ফলে ১৯৭৬ সাল থেকে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা দাখিল ছয় বছরের ও আলিম দুই বছরের কোর্স চালু হয়। অন্যান্য স্তর যে ভাবে ছিল সেই ভাবেই থেকে যায়। এ কারিকুলাম ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১১ বছর কার্যকর ছিল।[৮৭]

১৯৭৯ সালে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ মাদরাসা শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশমালার ৬ষ্ঠ নম্বরে উল্লেখ করেছেন যে, 'মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের পর দাখিল স্তরকে মাধ্যমিক, 'আলিমকে উচ্চ মাধ্যমিক, ফাযিলকে স্নাতক, এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমর্যাদা প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।[৮৮]

এ সুপারিশের আলোকেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫/১১/১৯৮৫ তারিখের এক আদেশে মাদরাসা শিক্ষা ধারার দাখিল স্তরকে সাধারণ শিক্ষা ধারার মাধ্যমিক স্তরে এবং মাদরাসা শিক্ষার 'আলিম স্তরকে সাধারণ শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গণ্য করে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে, দাখিল স্তরের সমমান ১৯৮৫ সাল হতে এবং আলিম স্তরের সমমান ১৯৮৭ সাল হতে কার্যকর হবে।[৮৯] ফাযিল স্তরকে

---

৮৬. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮০-৪৮১, Dr. A K M Ayub Ali, Ibid, p 209, 210-212; ব. সিকান্দর আলী ইব্রাহিমী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯০-৯১।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৯০; বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রম, ১৯৮৪; পৃ ১।

৮৮. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০১।

৮৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৫-১১-১৯৮৫ তারিখের শা ৯/৬ এনসি-১৩-৮৪-৭৪১ (১১)-শিক্ষা নং আদেশ দ্র.।

Dhaka University Institutional Repository

স্নাতক ডিগ্রীর সমমান এবং কামিল স্তরকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ বিবেচনাধীনে থেকে যায়।[৯০]

দাখিল এবং আলিম সংক্রান্ত উক্ত সিদ্ধান্তের ফলেই একজন দাখিল শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ১ম বর্ষে স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়।

এসএসসি সমমান প্রাপ্ত দাখিল পরীক্ষা এবং এইচএসসি সমমান প্রাপ্ত আলিম পরীক্ষার জন্য যে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়েছিল তা নিম্নরূপ :

শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী
দাখিল (দুই বছর মেয়াদী)

বিভাগসমূহের নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
সাধারণ বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুর'আন মজীদ ও তাজবীদ	১০০
		২. হাদীস শরীফ	১০০
		৩. আরবী সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৪. আরবী সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৫. ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ	১০০
		৬. বাংলা	১০০
		৭. ইংরেজী	১০০
		৮. সাধারণ গণিত	১০০
		৯. ইসলামের ইতিহাস	১০০
		১০. ভূগোল ও অর্থনীতি	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. পৌরনীতি, ২. মানতিক, ৩. উচ্চতর ইংরেজী, ৪. উচ্চতর বাংলা, ৫. উর্দু, ৬. ফারসী, ৭. গার্হস্থ্য অর্থনীতি (শুধু মেয়েদের জন্য), ৮. কৃষি শিক্ষা, ৯. উচ্চতর গণিত, ১০. কম্পিউটার শিক্ষা, ১১. সাধারণ বিজ্ঞান, ১২. বেসিক ট্রেড।	১০০
		সর্বমোট =	**১১০০**

৯০. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগসমূহের নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
বিজ্ঞান বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুর'আন মাজীদ ও তাজবীদ	১০০
		২. হাদীস শরীফ	১০০
		৩. আরবী সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৪. আরবী সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৫. ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ	১০০
		৬. বাংলা	১০০
		৭. ইংরেজী	১০০
		৮. সাধারণ গণিত	১০০
		৯. সাধারণ বিজ্ঞান	১০০
		১০. সাধারণ বিজ্ঞান ২য় পত্র	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. উচ্চতর গণিত, ২. উচ্চতর বাংলা, ৩. উচ্চতর ইংরেজী, ৪. উর্দূ, ৫. ফারসী, ৬. কৃষি শিক্ষা, ৭. গার্হস্থ্য অর্থনীতি (শুধু মেয়েদের জন্য), ৮. ভূগোল ও অর্থনীতি, ৯. কম্পিউটার শিক্ষা, ১০. বেসিক ট্রেড, ১১. ইসলামের ইতিহাস, ১২. সামাজিক বিজ্ঞান।	১০০
		সর্বমোট =	১১০০

বিভাগসমূহের নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
মুজাব্বিদ বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুর'আন মজীদ ও তাজবীদ	১০০
		২. হাদীস শরীফ	১০০
		৩. 'আরবী সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৪. 'আরবী সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৫. ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ	১০০
		৬. বাংলা	১০০
		৭. ইংরেজী	১০০
		৮. ইসলামের ইতিহাস	১০০
		৯. তাজবীদ নসর ও নযম	১০০
		১০. কিরআতে তারতীল ও হাদর (মৌখিক)	১০০
	ঐচ্ছিক (যে কোন ১টি)	১. উর্দূ, ২. ফারসী, ৩. সাধারণ গণিত	১০০
		সর্বমোট =	১১০০

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগসমূহের নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
হিফজুল কুর'আন বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুর'আন মাজীদ	১০০
		২. হাদীস শরীফ	১০০
		৩. আরবী সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৪. আরবী সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৫. ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ	১০০
		৬. বাংলা	১০০
		৭. ইংরেজী	১০০
		৮. ইসলামের ইতিহাস	১০০
		৯. তাজবীদ	১০০
		১০. হিফজুল কুর'আন হাদর	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. উর্দু, ২. ফারসী, ৩. সাধারণ গণিত	১০০
		সর্বমোট =	১১০০

শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী
আলিম দু'বছর মেয়াদী

বিভাগসমূহের নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
সাধারণ বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুর'আন মজীদ	১০০
		২. হাদীস ও উসূলুল হাদীস	১০০
		৩. আল ফিকহ ১ম পত্র	১০০
		৪. আল ফিকহ ২য় পত্র	১০০
		৫. 'আরবী সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৬. 'আরবী সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৭. বাংলা	১০০
		৮. ইংরেজী	১০০
		৯. ইসলামের ইতিহাস	১০০
		১০. বাংলা ও মানতিক	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. ইসলামী অর্থনীতি, ২. পৌরনীতি, ৩. উচ্চতর ইংরেজী, ৪. উর্দু, ৫. ফারসী	২০০
		সর্বমোট =	১২০০

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগসমূহের নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
বিজ্ঞান বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুর'আন মজীদ	১০০
		২. হাদীস ও উসূলুল হাদীস	১০০
		৩. ফিকহ (সাধারণ বিভাগের ১ম পত্রের অনুরূপ)	১০০
		৪. 'আরবী সাহিত্য	১০০
		৫. বাংলা	১০০
		৬. ইংরেজী	১০০
		৭. ইসলামের ইতিহাস	১০০
		৮. পদার্থ বিজ্ঞান	১০০
		৯. পদার্থ বিজ্ঞান	১০০
		১০. রসায়ন বিজ্ঞান ১ম পত্র	১০০
		১১. রসায়ন বিজ্ঞান ২য় পত্র	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. জীব বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্র	২০০
		২. উচ্চতর গণিত ১ম ও ২য় পত্র	
		৩. আরবী সাহিত্য ১ম ও ২য় পত্র	
		সর্বমোট =	১২০০

বিভাগসমূহের নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
মুজাব্বিদ বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুর'আন মজীদ	১০০
		২. হাদীস ও উসূলুল হাদীস	১০০
		৩. ফিকহ (সাধারণ বিভাগের ১ম পত্রের অনুরূপ)	১০০
		৪. বাংলা	১০০
		৫. ইংরেজী	১০০
		৬. আরবী সাহিত্য (বিজ্ঞান বিভাগের অনুরূপ)	১০০
		৭. তাজবীদ ১ম পত্র	১০০
		৮. তাজবীদ ২য় পত্র	১০০
		৯. কিরআতে তারতীল	১০০
		১০. কিরআতে হাদর	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. ইসলামী অর্থনীতি, ২. পৌরনীতি, ৩. উচ্চতর গণিত, ৪. উচ্চতর ইংরেজী, ৫. উর্দূ, ৬. ফারসী	২০০
		সর্বমোট =	১২০০[৯১]

---

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৮-৪১০।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা

মাদরাসা শিক্ষার দাখিল ও আলিম এসএসসি ও এইচএসসির মান প্রাপ্তি মাদরাসার ছাত্রদেরকে সাধারণ শিক্ষার দিকে উৎসাহিত করেছে। ফলে ছাত্ররা অহরহ স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। কিন্তু স্কুল ও কলেজের পাঠ্যসূচীর কাছাকাছি নিয়ে আসা হলেও স্কুল ও কলেজের পাঠ্যসূচীতে মাদরাসার পাঠ্যসূচীর বিন্দু মাত্রও ছোঁয়া লাগে নি। ফলে উভয় শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের ধারণা অবাস্তব রয়ে গেছে। এতে মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ স্তর স্থবিরতার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। ইসলামী মনীষী সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হতে চলেছে। বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এবং বাস্তব পদক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।

২. দরসে নিযামী মাদরাসার মারহালাতুস্ সানুবিয়্যাহ আল উলইয়া

ইসলামী শিক্ষা ও তাহজীব তামাদ্দুনের প্রতি ইংরেজ সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ দেখে এ দেশের 'আলিমগণ সে যুগে দেওবন্দ মাদরাসার অনুকরণে বহু কাওমী মাদরাসা গড়ে তুলেছিলেন। কুর'আন, হাদীস, ফিকহ, উসূলুল ফিক্হ, মানতিক ও হিকমত ইত্যাদি ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয়গুলো এ সকল মাদরাসায় বেশী পড়ান হতো। আধুনিক যুগের চাহিদা মোতাবেক বাস্তব জীবনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এ সব মাদরাসায় প্রয়োজন মনে করা হতো না। ফলে এ সকল মাদরাসার অনেক শিক্ষার্থী নিজের মাতৃভাষায় পড়তে বা লিখতে অক্ষম ছিলো। তবে এ সব প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া করলে ইসলামী আদব কায়দা তাহজীব তামাদ্দুন এর অনুশীলন হবে, আখেরাতের অনন্তকালের কামিয়াবী হাসিল হবে, এ রকম চিন্তাভাবনা নিয়েই তারা এ সকল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতেন। এ ধারণার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে বহু মাদরাসা গড়ে ওঠে।[৯২]

এ সকল মাদরাসায় সরকারী অনুদানের কোন ব্যবস্থা নেই। সম্পূর্ণ জনগণের অনুদানেই এ সব মাদরাসা পরিচালিত হয়। অধিকাংশ কাওমী মাদরাসার আবাসিক ছাত্রগণ দরিদ্র। তাদের বেতন দেয়ার কোন ক্ষমতা না থাকায় মাদরাসা থেকে সাহায্য করতে হয়। এতদসত্ত্বেও এ সব মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী সকলের চাল-চলনের মাঝে ইসলামী ছাপ বিদ্যমান।[৯৩]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এ সব মাদরাসায় পূর্বের পাঠক্রম এবং কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদান অব্যাহত থাকে। দরসে নিযামী বা কাওমী মাদরাসার পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রম সকল মাদরাসায় এক রকম নয়। কেন্দ্রীয়ভাবে মাদরাসাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করারও ফলপ্রসূ কোন ব্যবস্থা ছিলো না। তবে দেওবন্দ মাদরাসাকে আদর্শ মনে করে এ সকল মাদরাসায় প্রায় একই ধরনের পাঠ্যসূচী অনুকরণ করা হয়।

বাংলাদেশের দরসে নিযামী বা কাওমী মাদরাসার শিক্ষাকে দ্বিধাবিভক্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করে একই সূত্রে গাঁথার উদ্দেশ্য নিয়ে বিগত ৮০ এর দশকে এ দেশের একদল শীর্ষস্থানীয় 'আলিম চিন্তাভাবনা করতেন। পরিশেষে ১৯৭৮ সালে আলিমদের এক শিক্ষা সম্মেলনে বাংলাদেশ কাওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বা বেফাকুল মাদারিস অস্তিত্ব লাভ করে। এ বোর্ড গঠিত হওয়ার পর কাওমী মাদরাসাসমূহে ইসলামী শিক্ষার প্রতিটি স্ত রকে সুবিন্যাস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অধিকাংশ কাওমী মাদরাসা বেফাকের আওতাভুক্ত হয়। এ সময় থেকেই কাওমী মাদরাসার জন্য বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয়ে আসছে। বেফাকের গবেষণা প্রসূত মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচী নিম্নরূপ :

মারহালাতুস সানুবিয়্যাহ (মাধ্যমিক স্তর) : ১ম বর্ষ

১. ফিকহ (আইন ও নীতিশাস্ত্র) কুদুরী। কিতাবুল অযূ থেকে শেষ পর্যন্ত।

২. উসূলুল ফিক্হ, উসূলুশ শাশী।

৩. 'আরবী সাহিত্য ও ইনশা, নাফহাতুল 'আরব অথবা মুফীদুত তালিবীন।

---

৯২. ড. সিকান্দর আলী ইব্রাহিমী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৬।

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪. 'ইলম নাহু, (ব্যাকরণ) কাফিয়া ও শরহে জামী।

৫. মানতিক, মিরকাত।

৬. আখলাক, তালিমুল মুতাআ'ল্লিম।

এ ছাড়া এ ক্লাসের জন্য বাংলা সাহিত্য, বাংলা ব্যাকরণ, ইতিহাস ও পৌরনীতি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মারহালাতুস সানুবিয়্যাহ (মাধ্যমিক স্তর) : ২য় বর্ষ

১. কুর'আনুল কারীম, অনুবাদ শেষ ১৫ পারা।

২. ফিকহ-কানজুদ দাকায়েক (১ম খণ্ড)।

৩. উসূলুল ফিক্হ, নূরুল আনওয়ার, সুন্নাত থেকে শেষ পর্যন্ত।

৪. আরবী সাহিত্য ও ইনশা, আলফিয়াতুল হাদীস লামিয়াতুল মু'জিযাত।

৫. 'ইলম্ নাহু, শরহু জা'মি।

৬. বালাগাত, দুরুসুল বালাগাত।

৭. মানতিক, শরহু তাহজীব।

এ ছাড়া বাংলা, বাংলা ব্যাকরণ, ইসলামের ইতিহাস ও পৌরনীতি এ ক্লাসের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

মারহালাতুস সানুবিয়্যাহ আল উলইয়া (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর) : ১ম বর্ষ

১. কুর'আনুল কারীম, প্রথম ১৫ পারার অনুবাদ।

২. ফিক্হ, শরহে বেকায়াহ (পূর্ণ অংশ)।

৩. উসূলুল ফিক্হ, নূরুল আনওয়ার, কিতাবুল্লাহ।

৪. 'আরবী সাহিত্য ও রচনা, মাকামাত প্রথম ১০টি।

৫. ফারায়েজ; সিরাজী।

৬. বালাগাত : মুখতাসারুল মা'য়ানী।

এ ছাড়া ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান এ ক্লাসের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মারহালাতুস সানুবিয়্যাহ আল উলইয়া (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর) : ২য় বর্ষ

১. ফিক্হ : হিদায়া প্রথম খণ্ড।

২. ফিক্হ : হিদায়া দ্বিতীয় খণ্ড।

৩. উসূলুল ফিক্হ : হুসামী, কিয়াস।

৪. 'আরবী সাহিত্য ও রচনা : মুতানব্বী মাফিয়া।

৫. 'ইলমুল আরুয, আরুযুল মিফতাহ।

৬. মানতিক : সুল্লাম।[৯৪]

এ ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান এ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

---

৯৪. বাংলাদেশ কাওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য তালিকা থেকে সংগৃহীত, পৃ ৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক তথ্যে দেখা যায় যে, সমগ্র বাংলাদেশ ১৯৮৩ সালে শুধু মসজিদ কেন্দ্রীক দরসে নিযামী মাধ্যমিক স্তরে মাদরাসার সংখ্যা ছিল ৯৬৮টি।[৯৫] বাস্তব হিসেব এর চেয়েও বেশী হতে পারে। *তাহরীকে দেওবন্দ* গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ১৯৯০ সালে সমগ্র বাংলাদেশে কাওমী মাদরাসা সংখ্যা ছিল ৪০০০ বেশী।[৯৬]

দরসে নিযামী মাদরাসার বর্তমান শিক্ষাসূচীর আলোকে সাধারণ শিক্ষার স্তরসমূহের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়টি চিন্তাভাবনার সময় এসেছে। আশা করা যায়, এর একটি সুব্যবস্থা হয়ে গেলে এ সকল মাদরাসা দ্বারা ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার এবং চরিত্রবান আদর্শ মানুষ গড়ার পথ তরান্বিত হবে।

৩. সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর

বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরকে তিন ভাগে ভাগ করা :

ক. নিম্ন মাধ্যমিক স্তর : ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী।

খ. মাধ্যমিক স্তর : নবম ও দশম শ্রেণী।

গ. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী।

ক. নিম্ন মাধ্যমিক স্তর : ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী

বাংলাদেশের সূচনা পর্বে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অনুসৃত পাঠক্রম নিম্নরূপ :

১. মাতৃভাষা বাংলা।

২. ইংরেজী।

৩. গণিত।

৪. সাধারণ বিজ্ঞান।

৫. সমাজ বিজ্ঞান।

৬. আরবী।

৭. সংস্কৃত।

৮. উর্দূ (ঐচ্ছিক)।

৯. ফারসী (ঐচ্ছিক)।

১০. পালি ভাষা (ঐচ্ছিক)।

১১. কর্মমূখী শিক্ষা।

১২. শারীরিক শিক্ষা।

১৩. চারু ও কারু কলা।

১৪. সঙ্গীত।

১৫. ইসলামিয়াত/হিন্দু/বৌদ্ধ ধর্ম/খ্রীস্টান ধর্ম।[৯৭]

---

৯৫. *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ*, ১৯৯০, পৃ ৫৪৬।

৯৬. মাওলানা মোহাম্মদ মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭।

৯৭. মোহাম্মদ আজহার আলী, *শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা : বাএ, ১৯৮৬, পৃ ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত তিনটি ক্লাসের পাঠ্যসূচীর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, প্রতিটি ক্লাসেই *'আরবী ও ইসলামিয়াত শিক্ষা* আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠ করানো হতো। প্রতিটি ক্লাসের জন্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা পুস্তকাদীও রচনা করা হয়েছিলো।[৯৮] ঐ সকল পুস্তকের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

ইসলাম শিক্ষা ৬ষ্ঠ শ্রেণী

১ম অধ্যায় : তাওহীদ–কালেমা তাইয়্যেবা, আল্লাহর সিফাত–আখেরাত, ইত্যাদি।

২য় অধ্যায় : ইবাদত–পবিত্রতা, গোসল, তায়াম্মুম, সালাত, ইত্যাদি।

৩য় অধ্যায় : কুর'আন ও হাদীস–কতিপয় সূরা ও মুনাজাতমূলক হাদীস ইত্যাদি।

৪র্থ অধ্যায় : আখলাক–তাকওয়া, সত্যবাদিতা, গীবত ও পরনিন্দা ইত্যাদি।

৫ম অধ্যায় : আদর্শ জীবন–চারজন নবী ও কতিপয় আদর্শ মানুষের জীবনী।

ইসলাম শিক্ষা সপ্তম শ্রেণী

১ম অধ্যায় : আকাঈদ–তাওহীদ, কুফর, শিরক, ঈমানে মুফাসসাল, রিসালাত, আখিরাত, সিরাত ও মিযান।

২য় অধ্যায় : ইবাদত–ইকামত, আস-সালাত, জামাত, জুমার সালাত, ঈদাইন, জানাযা, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, সাওম ইতেকাফ।

৩য় অধ্যায় : কুর'আন মজীদ ও হাদীস শরীফ, কতিপয় সূরা, হাদীসের পরিচয়, নীতিমূলক হাদীস।

৪র্থ অধ্যায় : আখলাক–ক্ষমা, পরোপকার, শালীনতা, আমানত, শ্রমের মর্যাদা, সততা, ক্রোধ, লোভ লালসা, পিতা মাতার আনুগত্য।

৫ম অধ্যায় : আদর্শ জীবন–চারজন নবী, চারজন সাহাবী ও চারজন ওলী আল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ইসলাম শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী

১ম অধ্যায় : ঈমান-ঈমানের ৭টি স্তম্ভ, নিফাক, আসমাউল হুসনা, রিসালাত খতমে নবুওয়াত, আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম।

২য় অধ্যায় : ইবাদত-যাকাত, হজ্জ, কুরবানী, আকীকা, মিরাস, জিহাদ, দেশ প্রেম।

৩য় অধ্যায় : কুর'আন মজীদ ও হাদীস শরীফ–তাজবীদ ও কতিপয় সূরা পাঠ, হাদীস পরিচিতি, মুনাজাতমূলক ও নীতিমূলক হাদীস।

৪র্থ অধ্যায় : আখলাক–আখলাকে হামীদা, ভ্রাতৃত্ব, নারীর মর্যাদা, দেশ প্রেম, সমাজ সেবা, জাতীয় ঐক্য, অহংকার, ঘৃণা, সুদ, ঘুষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি।

৫ম অধ্যায় : আদর্শ জীবন– চারজন নবী, চারজন সাহাবী ও চারজন ওলী আল্লাহর জীবনাদর্শ আলোচনা।[৯৯]

কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে অনুরূপ পাঠ্যক্রম এ তিনটি শ্রেণীতে পাঠ করানো হতো। সকল নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলগুলোতেই ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিলো এবং এখনও রয়েছে। 'আরবী কোন স্কুলে পড়ানো হতো, আবার কোন কোন স্কুলে পড়ানো হতো না। বিশেষ ধরনের নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বোর্ড

---

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২।

৯৯. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক মুদ্রিত বইয়ের আলোকে।

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক নির্ধারিত আরবী, ইসলামিয়াত ছাড়াও ইসলামী শিক্ষামূলক অতিরিক্ত গ্রন্থাদি এ সকল শ্রেণীর পাঠ্যভুক্ত ছিল।

ছাত্ররা শিক্ষা জীবনে কোন দিকে অগ্রসর হবে, সে দিক নির্দেশনা মূলত শিক্ষার এ স্তর থেকে শুরু হয়। এ ক্লাসগুলোতে ইসলামী শিক্ষার একটি সুন্দর কাঠামো অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বিদ্যালয়ে অথবা অভিভাবক মহলেও এ বিষয়টির প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হতো না। মনে করা হয় ব্যক্তি জীবনের প্রয়োজনে ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয় জানতে পারলেই যথেষ্ট। শিক্ষার একটি স্তর হিসেবে এ বিষয়কে প্রাধান্য দেয়ার মতো পরিবেশ ছিল না বললেই চলে। এর কারণ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি। ইংরেজ আমলে ধর্মীয় শিক্ষাকে যেভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিলো, পাকিস্তান আমলে তার ধারা কিছুটা উন্নত হলেও তা গুরুত্বহীন রয়ে গেছে। ফলে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং অবহেলিত মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যম ছাড়া ধর্মীয় শিক্ষার জন্য তেমন প্রচেষ্টা তখনও দেখা যায় নি। তবে বাংলাদেশে পরবর্তীকালে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. মাধ্যমিক স্তর : নবম ও দশম শ্রেণী

সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর বলতে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীকে বুঝায়। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্নে এ দুটো শ্রেণীতে মানবিক বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, বাণিজ্যিক বিভাগ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করতো।

১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীতে দেখা যায় যে, বাংলা, ইংরেজী ও সাধারণ গণিত সকল বিভাগের জন্য আবশ্যিক বিষয় ছিলো। নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহের মধ্যে *'আরবী এবং ইসলামী শিক্ষা* বিষয় উল্লেখ ছিল। কোন শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে *'আরবী এবং ইসলামী শিক্ষা* এর যে কোন একটি বিষয় বা দুটি বিষয়ই গ্রহণ করতে পারতো।

১৯৭৬ সালে নবম ও দশম শ্রেণীর *ইসলাম ধর্ম শিক্ষা* ও *'আরবী* বিষয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী নিম্নরূপ ছিল :

পাঠ্যসূচী : ইসলাম ধর্ম

১. **আল-কিতাব** : পটভূমি, সর্বশেষ কিতাব।

২. **আল কুর'আনের সূরা** : সুরা ফাতিহা এবং সুরা তাকাসুর থেকে সূরা আন নাস পর্যন্ত মোট ১৪টি সূরা।

৩. **আল হাদীস**

   ক. হাদীস সংগ্রহ, মুহাদ্দিসগণের সতর্কতা।

   খ. রাসূল সা.-এর ৪০টি হাদীস।

৪. **কালাম শাস্ত্র**

   আকাঈদ, ঈমান, তাওহীদ, ইসলাম, কুফর, শিরক, রিসালাত, খতমে নবুয়ত ও আখিরাত।

৫. **ফিকহ শাস্ত্র**

   ক. ফিক্‌হ শাস্ত্র ও মাযহাব।

   খ. ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল ভিত্তি।

   গ. মাযহাবের পার্থক্যের কারণ।

৬. **শরী'আতের আহকাম**

   ক. হালাল, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব।

   খ. হারাম, মাকরুহ তাহরীমি ও মাকরুহ তানযিহী।

৭. **পবিত্রতা** : অযূ, গোসল, তায়াম্মুম ও অযু ভঙ্গের কারণসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

৮. **নামায**

ক. নামাযের সময়।

খ. নামাযের মাকরূহ সময়।

গ. নামাযের শর্ত।

ঘ. নামাযের স্তম্ভ।

ঙ. নামাযের ওয়াজিব।

চ. নামাযের সুন্নাত।

ছ. যে সব কারণে নামায নষ্ট হয়।

জ. নামাযের দোষণীয় কাজ।

ঝ. ভুলের সিজদা।

৯. **রোযা**

ক. রোযার উদ্দেশ্য।

খ. রোযার প্রকারভেদ।

গ. রমযানের রোযার নিয়্যাত।

ঘ. সাদকাতুল ফিতর।

ঙ. যার উপর ফিতরা ওয়াজিব।

চ. ফিতনার পরিমাণ।

১০. **যাকাত**

ক. যে সব মালে যাকাত ফরয।

খ. যাকাতের হিসেব ও হার।

গ. যাকাতের খাত।

১১. **হজ্জ ও উমরা**

১২. **আদর্শ জীবন ব্যবস্থা**

ক. আদর্শ পরিচিতি ও আদর্শের প্রয়োজনীয়তা।

খ. ইসলামী আদর্শ সব মানুষের জন্য।

গ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উৎস।

১৩. **ইসলামী জীবনের উপকরণ**

ক. সত্যবাদিতা।

খ. ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা।

গ. শোক ও কৃতজ্ঞতা।

ঘ. চেষ্টা ও অধ্যাবসায়।

ঙ. ওয়াদা পালন।

Dhaka University Institutional Repository

চ. আমানত রক্ষা করা।

ছ. ইহসান প্রতিষ্ঠা।

জ. ইনসাফ কায়েম।

ঝ. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।

ঞ. ন্যায় নিষ্ঠা ও ধর্মাচরণে পরস্পরের সহযোগিতা।

ট. আজাদী।

ঠ. মানবতার ঐক্য।

১৪. **পারিবারিক জীবন ও পরিবেশ**

ক. পিতা মাতার প্রতি কর্তব্য।

খ. সন্তানের প্রতি কর্তব্য।

গ. স্বামী স্ত্রীর অধিকার।

ঘ. রক্তের সম্পর্ক রক্ষা।

ঙ. প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য।

মান বণ্টন

নং	বিষয়	নম্বর
১.	আল কুর'আন	২০
২.	আল হাদীস	২০
৩.	আকা'ঈদ ও কালাম	১৫
৪.	ফিক্‌হ শাস্ত্র	২৫
৫.	আদর্শ জীবন	২০
	মোট =	১০০

আরবী

পাঠ্য পুস্তক : আরবী সাহিত্য সংকলন বাংলাদেশ স্কুল টেকস্টবুক বোর্ড, [১৯৬৯] কর্তৃক প্রকাশিত।

পাঠ্যসূচী

গদ্য

১. সুরাতুল বাকারা। আয়াত ৩০-৩৯, ২৮৬-২৮৮, ১৯৪-১৯৫।

২. ফাজিলাতুল ইল্‌ম।

৩. রাসূলো কায়সারওয়া উমার ইবনুল খাত্তাব রা.। পৃ ২১।

৪. আল-হাকিমুজ জাকী। পৃ ৬০।

৫. আল-আমছালুছ ছায়েরা।

৬. রেসালাতুম মিন তিলমিজিন ইলা ছাদীকেহী। পৃ ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ইতায়াতুল উলিল আমর-অ-ইহতারামিহী। পৃ ৮৮।

৮. আত-তাইয়্যেবু লিত তাইয়্যেবে। পৃ ১১৮।

৯. আশ-শাররু বিশ শাররি। পৃ ১২২।

১০. হাদীস ১-২০ পর্যন্ত। পৃ ২২৭-২৪৩।

পদ্য

১. সিফাতুল্লাহি তা'আলা। পৃ ২৬৫।

২. তাকওয়াল্লাহি তা'আলা। পৃ ৬৭২।

৩. মাদহুন নবী সা. (প্রথম দুই স্তবক)। পৃ ২৬৯-২৭১।

৪. আল হিকামু ওয়াল আমসালু।

৫. কাসিদাতুন হেকামিয়াতুন (প্রথম অংশ)। পৃ ২৮৩-২৮৫।

৬. বিররুল ওয়ালে দাইন। পৃ ২৯১।

৭. আল আদলু ওয়াল ওফা। পৃ ৩৪৬-৩৪৭।

ব্যাকরণ

১. ইসম, ফে'ল, হরফ।

২. মুরাককাব ইযাফী, তাওসিফী, আদাদী।

৩. আল-আসমাউর মুসতাকাত।

৪. মাদ্দা।

৫. মুজাক্কার ও মুয়ান্নাস।

৬. ওয়াহিদ, তাসনিয়া ও জমা।

৭. আল-হুরুফুল জাররা।

৮. আল-হুরুফুল নাসিবা।

৯. আল-হুরুফুল জাযিমা।

১০. আল-ফায়েল, আল-মাফউল।

১১. আল-আফ-আলুন নাকিসাহ।

মান বণ্টন

ক. গদ্য মাতৃভাষায় অনুবাদ	৩০ নম্বর
খ. পদ্য মাতৃভাষায় অনুবাদ	২৫ নম্বর
গ. ব্যাকরণ মাতৃভাষায় অনুবাদ	৩০ নম্বর
ঘ. মাতৃভাষা হতে আরবীতে অনুবাদ	১৫ নম্বর
মোট	= ১০০ নম্বর

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালের পাঠ্যক্রমে দেখা যায় যে, এসএসসি পর্যায়ে মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখা ছাড়াও কৃষি বিভাগ, শিল্পকলা বিভাগ ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, একজন ছাত্র ইচ্ছা করলে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে মানবিক বিভাগে *আরবী* ও *ইসলামী শিক্ষা* এ উভয় বিষয় গ্রহণ করতে পারতো। তবে মানবিক বিভাগ ছাড়া অন্য পাঁচটি বিভাগে শুধু ইসলামিয়াত শিক্ষা গ্রহণ করা যেতো।

১৯৮৫ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ব্যাপারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই শ্রেণীর বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে একটি নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সকল বিভাগ একটি বিভাগে রূপান্তরিত হয়।

পাঠ্য তালিকায় একটি নৈর্বাচনিক বিষয় গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়।[১০০] এতে মানবিক বিভাগে *ইসলামী শিক্ষা* ও *আরবী* দু'টি বিষয় গ্রহণের যে সুযোগ ছিল তা রহিত হয়ে যায়।

১৯৮৮ সালের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে দেখা যায় যে, *আরবী* ও *ইসলামী শিক্ষার* পাঠক্রম বহুলাংশে পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে নৈর্বাচনিক বিষয় দু'টি গ্রহণের অনুমতি দেয়ার ফলে আবারও *ইসলামী শিক্ষা* ও *আরবী* বিষয় একসাথে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ পরিবর্তিত পাঠ্যসূচী এবং *ইসলামী শিক্ষা* ও *আরবী* সমভাবে গ্রহণের সুযোগ আর পরিবর্তন হয় নি। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার *ইসলামী শিক্ষা* ও *আরবী* বিষয়ের জন্য যে পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত ছিল তা নিম্নরূপ :

ইসলাম শিক্ষা (সংক্ষিপ্ত)

বিষয়

১. আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত।

২. মহানবী সা.-এর রিসালাত।

৩. শরী'য়াত বা ইসলামী জীবন বিধানের উৎস।

৪. কুর'আন পরিচিতি।

৫. পবিত্র কুর'আনের নির্দিষ্ট ৭টি সূরার অর্থ ও ব্যাখ্যা।

৬. আল কুর'আনের নির্দিষ্ট ২২টি আয়াতের অর্থ।

৭. হাদীস পরিচিতি ও ২০টি হাদীসের অনুবাদ।

৮. 'ইজমা ও কিয়াস।

৯. ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।

১০. ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদির সংজ্ঞা।

১১. ইসলামে মানবাধিকার।

১২. পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক অধিকার।

১৩. আখলাক।

১৪. সীরাতে রাসূল।

১৫. 'আরবী ভাষা শিক্ষা।

---

১০০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৪-১০-৮২ ইং তারিখের শা ১৮/৬ এন-সি-৮/৮২/৩১৮ শিক্ষা নম্বর বিজ্ঞপ্তি। দ্র. ১৯৮৫ সালে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী; মোহাম্মদ আজহার আলী প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

মান বণ্টন

১. আকাঈদ	১০ নম্বর
২. শরী'য়াত	২০ নম্বর
৩. হাদীস, 'ইজমা ও কিয়াস	২০ নম্বর
৪. ফিকহ শাস্ত্র ও মানবাধিকার	২০ নম্বর
৫. আখলাক	১০ নম্বর
৬. সীরাতে রাসূল	১০ নম্বর
৭. পাঠ্য সূচীর উপর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	১০ নম্বর
মোট =	১০০ নম্বর

আরবী (সংক্ষিপ্ত)

বিষয়

১. **গদ্য**

ক. কুর'আন : সূরা আল বাকারা ও লোকমান থেকে ১৫টি আয়াত।

খ. হাদীস : ১৫টি হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

গ. আরবী কথোপকথন।

২. **পদ্য**

ক. মুনতাখারাতুল আরাবিয়া থেকে ২টি কবিতা।

৩. **ব্যাকরণ**

ক. ইসম, ফে'ল, হরফ, আদত, জেন্‌স, ইযাফত, সিফত ও মাওসুফ, বাংলা থেকে আরবী অনুবাদ।

মান বণ্টন

গদ্য	৩০ নম্বর
পদ্য	৩০ নম্বর
ব্যাকরণ	৩০ নম্বর
অনুবাদ	১০ নম্বর
মোট =	১০০ নম্বর

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৯০ সালের পর বাংলাদেশ সরকার মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠ্যসূচীতে আমূল পরিবর্তন করে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য এ তিনটি শাখা পুনঃ প্রবর্তন করেন, এবং প্রতিটি শাখায় ইসলামী শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। যা বর্তমানেও প্রবর্তিত রয়েছে। বর্তমান পাঠ্যসূচী অনুসারে আরবীকে সকল শাখার নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ইসলামী শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশ সরকারের এটি বিশেষ এক অবদান।[১০১]

---

১০১. ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশে ৭১৯২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিলো। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিলো ১৮১টি আর স্বীকৃতি প্রাপ্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিলো ৭০১১টি। এ সমুদয় বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক

Dhaka University Institutional Repository

গ. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী

মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ স্তরকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর নামে অভিহিত করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় ইন্টার মিডিয়েট কলেজ। আবার ডিগ্রী কলেজগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৭৫-৭৬ সালে বাংলাদেশে ৫টি সরকারী ও ২৬৩টি বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছিল। এ সময় বাংলাদেশে ৩১ টি সরকারী ও ৩০৭টি বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ ছিল। সে সময় একদাশ ও দ্বাদশ শ্রেণী ডিগ্রী কলেজসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৭,৪৭৬ জন। এ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে ডিগ্রী কলেজের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী লেখা পড়া করতো।[১০২]

১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ সময় উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ৯টি শাখায় বিভক্ত ছিল।[১০৩] তন্মধ্যে একটি ছিল 'ইসলামী শিক্ষা শাখা' এ শাখার পাঠ্য বিষয় ছিল নিম্নরূপ :

১. ইসলামী শিক্ষা, ২. আরবী, ৩. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

উল্লেখ্য, বাংলা এবং ইংরেজী সকল শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়। এ ছাড়া অর্থনীতি, পৌরনীতি, সমাজ কল্যাণ, কৃষি বিজ্ঞান ও কুটির শিল্প এর যে কোন একটি বিষয় ইসলামী শিক্ষা শাখার জন্য ৪র্থ বিষয় হিসেবে নেয়া যেতো।

ইসলামী শিক্ষা শাখার পাঠ্যসূচী

প্রথম পত্র

১. **আল ফিকহ :** কুদুরী কিতাব হতে তাহারাত, সালাত, সাওম ও যাকাতের পরিচ্ছেদসমূহ।

২. **উসূলুল ফিকহ :** চারটি উসূল, কিতাব, সুন্নাহ 'ইজমা ও কিয়াস।

মানবণ্টন

১. আল ফিকহ	৭০ নম্বর
২. উসূলুল ফিকহ	৩০ নম্বর
মোট =	১০০ নম্বর

দ্বিতীয় পত্র

১. আল কুর'আন : সূরা আল বাকারা : আলিম লাম মিম ও সায়াকুলের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

২. আল হাদীস : মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবের কিতাবুল ঈমান থেকে কিতাবুল ইলম পর্যন্ত শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় ফসলগুলো।

শিক্ষিকার সংখ্যা ছিলো ৮৯২৫০ জন। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিলো ২২,৬৬,৭৬৫ জন। সমগ্র বাংলাদেশে এ সকল ছাত্র-ছাত্রীর একটি বিরাট অংশ স্কুল জীবনে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করছে। এ শিক্ষা দ্বারা ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারলে অবশ্যই তারা ইসলামী শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে লেখাপড়া করবে এবং জাতিকে ইসলামী আদর্শের পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে।

১০২. *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ*, ১৯৭৯, পৃ ৩৫১।

১০৩. ক. কলা শাখা, খ. বিজ্ঞান শাখা, গ. বিজ্ঞান শাখা, ঘ. বিজ্ঞান শাখা, (কারিগরী পূর্ব) ঙ. বাণিজ্য শাখা, চ. গার্হস্থ্য (অর্থনীতি শাখা), ছ. ইসলামী শিক্ষা শাখা, জ. সঙ্গীত শাখা, ঝ. কৃষি বিজ্ঞান শাখা। দ্র. উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

মান বণ্টন

১. আল কুর'আন	৭০ নম্বর
২. আল হাদীস	৩০ নম্বর
	মোট=১০০ নম্বর[১০৪]

ইসলামী শিক্ষা শাখার জন্য উক্ত দু'টি পত্র নির্দিষ্ট। এ শাখার অপর দু'টি আবশ্যিক বিষয় অর্থাৎ আরবী ও ইসলামের ইতিহাস অন্যান্য শাখার পাঠ্যসূচীর অনুরূপ। উল্লেখ্য, অন্যান্য শাখার জন্য ইসলামী শিক্ষার যে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী রয়েছে তা নিম্নরূপ :

ইসলামী শিক্ষা

প্রথম পত্র : ইসলামের সাংস্কৃতিক পদ্ধতি

১. **ব্যক্তিগত জীবন**

তাকওয়া, জিকর, সবর, শোকর, আফও, আদল, ইহসান, তাদাব্বুর, তাহাম্মুল খিদমতে খালক ও তালিবুল 'ইলম।

২. **পারিবারিক জীবন**

ক. পারিবারিক জীবনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য।

খ. মাতা-পিতা ও সন্তানের ভূমিকা।

গ. স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এবং কর্তব্য।

৩. **সাংস্কৃতিক জীবন**

ক. ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য।

খ. ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ।

গ. সমাজে মক্তব ও মসজিদের ভূমিকা।

৪. **মুসলিম সমাজে অধিকার ও কর্তব্য**

ক. আত্মীয় স্বজন।

খ. পাড়া প্রতিবেশী।

গ. নাগরিক।

ঘ. রাষ্ট্র।

৫. **ইসলামী জগৎ**

ক. উম্মাত।

খ. উখুয়াত।

গ. তাবলীগ।

ঘ. জিহাদ।

৬. মানব জীবনে উন্নতির উপায় ও অবনতির কারণ।

৭. নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব।

---

১০৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮০, পৃ ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

৮. আখিরাত সম্পর্কে ধারণা-কেয়ামত বেহেশত ও দোযখ।

৯. হযরত মুহাম্মদ সা.- এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার।

মান বণ্টন

১. ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সংস্কৃতি জীবন	৩০ নম্বর
২. হযরত মুহাম্মদ সা.	২০ নম্বর
৩. পাঠ্যসূচীর অবশিষ্টাংশ	৫০ নম্বর
মোট =	১০০ নম্বর

দ্বিতীয় পত্র : কুর'আন ও হাদীস

১. মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ : কুর'আন-পরিচয়, অবতরণ, সংরক্ষণ ও সংকলন।

২. কুর'আনের মাহাত্ম্য ও কুর'আন তিলাওয়াতের ফযীলত।

৩. জীবন যাত্রা এবং জীবন সমস্যার সমাধানে কুর'আনের ভূমিকা।

৪. সূরা আল বাকারা-প্রথম পারা (১-১০ রুকু এবং শেষ রুকু)।

৫. নিম্নলিখিত নামাযসমূহের বিবরণ ও ফযীলত :
   ক. জুমার নামায।
   খ. ঈদের নামায।
   গ. তারাবীহ নামায।
   ঘ. তাহাজ্জুদ নামায।
   ঙ. ইসতেগফার নামায।
   চ. ইশরাকের নামায।
   ছ. নামাযের কসর।

৬. পাঠ্যসূচীতে নির্দিষ্ট ৪০টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে।

মান বণ্টন

ক. আল কুর'আন-তথ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন	২০ নম্বর
খ. আল কুর'আন- অনুবাদ, ব্যাখ্যা	৩৫ নম্বর
গ. আল-হাদীস, অনুবাদ ব্যাখ্যা	৩০ নম্বর
ঘ. আল হাদীস-অনুবাদ, ব্যাখ্যা	১৫ নম্বর
মোট =	১০০ নম্বর

আরবী : প্রথম পত্র

ক. গদ্য

১. আল-কুর'আন।
   ক. সূরা-ফাতিহা।
   খ. সূরা আল-ইমরান (শেষ রুকু)।
   গ. সূরা লুকমান।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল হাদীস : প্রথম ৭টি হাদীস।

৩. মিন-দুরুসে তারিখুল ইসলামী মহানবীর জন্ম হতে শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত।

৪. মিন-সাজানিয়েল আদাব : ১ম নম্বর হতে ২০ নম্বর পর্যন্ত অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।

৫. মিন কিতাবিল নাওয়াদির-৪টি গল্প।

৬. মিন কিতাবিল হাদিকা :

ক. আল মাদরাসা।

খ. জামালুদ্দীন আফগানী।

গ. মুহাম্মদ আবদুহ।

খ. পদ্য

১. মিন দীওয়ান আলী ইবন আবী তালিব রা. পূর্ণ উদ্ধৃতাংশ।

২. মিন দীওয়ান হাসান বিন সাবিত রা. প্রথম কবিতা।

৩. মিন দীওয়ান হাতিম তায়ী (উদ্ধৃত কবিতাটি)।

গ. ব্যাকরণ : ইসম ফে'ল ইয়াফত, সিফাত।

ঘ. রচনা : ১. সাধারণ বাক্য গঠন, ২. শূন্যস্থান পূরণ, ৩. অশুদ্ধি সংশোধন।

ঙ. আরবীতে অনুবাদ।

মান বণ্টন

ক. গদ্য	৩৫ নম্বর
খ. পদ্য	২৫ নম্বর
গ. ব্যাকরণ	১৫ নম্বর
ঘ. রচনা	১৫ নম্বর
ঙ. অনুবাদ	১০ নম্বর
মোট =	১০০ নম্বর

আরবী : দ্বিতীয় পত্র

ক. গদ্য

১. আল কুর'আন : সূরা আল হাদীদ, সূরা আন নাবা।

২. আল হাদীস : বাবুল ঈমান ওয়াল ইসলাম ও বাবুল আদব।

৩. জাওয়াহিরুল আদব : হযরত আবূ বকর, ওমর বিন খাত্তাব।

৪. তারীখু আদাবিল লুগাতিল আবাবিয়্যা-সম্পূর্ণ উদ্ধৃতাংশ।

৫. কালিমা-ওয়াদিমনা।

খ. পদ্য

১. মিন দীওয়ানে আলী বিন আবী তালিব (রা) পূর্ণ উদ্ধৃতাংশ।

২. মিন দীওয়ানে ফারাযদক-পূর্ণ উদ্ধৃতাংশ।

৩. মিন কালামে আহমদ বিন শাওকী।

Dhaka University Institutional Repository

গ. ব্যাকরণ

জুমলা-ইসমিয়া, ফেলিয়া ও শরতিয়া, তরকীব আওয়ামীল, ইসতিসনা, নিদা।

ঘ. রচনা

১. পাঠ্য তালিকা ভিত্তিক আরবী প্রশ্নের জবাব আরবীতে। ২. বচন, লিঙ্গ। ৩. অশুদ্ধি শুদ্ধিকরণ।

ঙ. অনুবাদ : আরবী হতে মাতৃভাষায় অনুবাদ।

মান বণ্টন

ক. গদ্য	৩৫ নম্বর
খ. পদ্য	২৫ নম্বর
গ. ব্যাকরণ	১৫ নম্বর
ঘ. রচনা	১৫ নম্বর
ঙ. অনুবাদ	১০ নম্বর
মোট =	১০০ নম্বর[১০৫]

ইসলামী শিক্ষা ও 'আরবীর উল্লিখিত পাঠ্য তালিকা ১৯৮০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।[১০৬] এ পাঠ্যসূচী অনুসারে দেখা যায় যে, ইসলামী শিক্ষা শাখা ছাড়াও মানবিক শাখায় কোন ছাত্র-ছাত্রী ইচ্ছা করলে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে ইসলামী শিক্ষা অথবা আরবী গ্রহণ করতে পারতো। অনুরূপভাবে কৃষি বিজ্ঞান শাখায় ৪র্থ বিষয় হিসেবে ইসলামী শিক্ষা বা আরবী গ্রহণ করার সুযোগ ছিল। এ ছাড়া বাকি ৭টি শাখায় উক্ত বিষয় দুটি গ্রহণ করার কোন সুযোগ ছিল না।

১৯৮২ সালে প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে দেখা যায় যে, ইসলামী শিক্ষা ও আরবীর পাঠ্যসূচীতে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না করে প্রথম পত্রকে দ্বিতীয় পত্রের এবং দ্বিতীয় পত্রকে প্রথম পত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সাথে সাথে মানবিক শাখায় ইসলামী শিক্ষা বা আরবী নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে গ্রহণের নিয়ম বহাল রেখে অবশিষ্ট আটটি শাখায় ৪র্থ বিষয় হিসেবে ইসলামী শিক্ষা ও আরবী এর যে কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে এ নিয়মের আর কোন ব্যতিক্রম পরিক্ষিত হয় না।

উল্লেখ্য, ইসলামী শিক্ষা শাখার পাঠ্যসূচী ও একইভাবে ১৯৮২ সাল থেকে অন্য কোন পরিবর্তন না করে প্রথম পত্রকে দ্বিতীয় পত্র এবং দ্বিতীয় পত্রকে প্রথম পত্র উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হয় নি।[১০৭]

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার একটি শাখা থাকা ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি আশাব্যঞ্জক ব্যাপার ছিল। কিন্তু বাস্তবে অন্যান্য শাখার সাথে এ শাখার সমতা রক্ষা করা হয় নি। শিক্ষকের অভাবে অনেক কলেজ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি খুলতে পারেন নি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বহু ছাত্র-ছাত্রী এ বিষয়টি পড়তে পারে নি। তবে সীমিত সংখ্যক কলেজে ইসলামী শিক্ষা পড়ানো হতো। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। ফলে এ সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

---

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৫২-৫৪।

১০৬. ১৯৮০ সাল পূর্বে মুদ্রিত পাঠ্যসূচী সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তবে কলেজের রেকর্ড এবং প্রবীণ অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা বা আরবীর পাঠ্যসূচীতে কোনরূপ পরিবর্তন হয় নি।

১০৭. উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী, ১৯৮২-৯০ সাল পর্যন্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তিন.
উচ্চ স্তর

ইসলামী শিক্ষার উচ্চ স্তর বলতে নিম্নবর্ণিত তিনটি স্তরকে বোঝায় :

১. 'আলীয়া মাদরাসার ফাযিল ও কামিল।

২. দরসে নিযামী মাদরাসার মারহালাতুল ফযীলত ও মারহালাতুত তাকমীল।

৩. বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়।

১. আলীয়া মাদরাসার ফাযিল ও কামিল স্তর

মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচী অনুসারে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ফাযিল শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্যতা অর্জিত হয়। সাধারণভাবে ফাযিল ডিগ্রীকে মাদরাসা শিক্ষার উচ্চস্তর এবং কামিলকে বিশেষ স্তর মনে করা হয়। এ দুটি স্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠালাভের পর ১৯৮৪ সাল থেকে ফাযিল ও কামিল মাদরাসার সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল।[১০৮]

শিক্ষাবর্ষ	ফাযিল মাদরাসা সংখ্যা	কামিল মাদরাসা সংখ্যা
১৯৮৪-৮৫	৫৯৪	৬৭
১৯৮৫-৮৬	৬০১	৬৭
১৯৮৬-৮৭	৬২৯	৬৭
১৯৮৭-৮৮	৬২৭	৭১
১৯৮৮-৮৯	৬৫৪	৯০
১৯৮৯-৯০	৬৯২	৯১

এ সকল মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সম্পর্কে ১৯৭৫-৭৬ শিক্ষাবর্ষে নিম্ন বর্ণিত পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

ফাযিল মাদরাসা	ছাত্র-ছাত্রী	কামিল মাদরাসা	ছাত্র-ছাত্রী
৩৯৯	১,০৫,১৬৩/৩,৬৯৬	৪৩	১১,৯৬৫/৩৮ [১০৯]

আলিম, এইচএসসি-এর সমমান লাভ করার ফলে (১৯৮৫ সাল থেকে) ছাত্র-ছাত্রীরা মাদরাসা শিক্ষার উচ্চস্তরে অধ্যয়নের ব্যাপারে নিরুৎসাহ বোধ করছে। সম্ভবত এ কারণেই কর্তৃপক্ষ ফাযিল ও কামিল স্তরের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা অনিহা বোধ করছে। উপরের পরিসংখ্যান থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট। এ সকল মাদরাসার পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী উল্লেখ করা হলো :

১০৮. *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ*, ১৯৮৯, পৃ ৫১৭।

১০৯. *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ*, ১৯৭৯, পৃ ৩৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ক. ফাযিল স্তর
২ বছর মেয়াদী
পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী

১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে দেখা যায় যে, ফাযিল শ্রেণীতে সাধারণ ও বিজ্ঞান এ দুটি বিভাগই প্রবর্তিত ছিল। ফাযিল শ্রেণীতে পাঠ্যসূচীর বিষয়সমূহ ১ম ও ২য় বর্ষে পাঠদান করা হতো এবং বোর্ড পরীক্ষা হতো ২য় বর্ষের শেষে।

ফাযিল সাধারণ বিভাগ
পাঠ্যসূচী

ক্রমিক	বিষয়	মান
১.	পবিত্র কুর'আনের তাফসীর	১০০
২.	আল হাদীস	১০০
৩.	আরবী সাহিত্য (১ম পত্র)	১০০
৪.	আরবী সাহিত্য (২য় পত্র)	১০০
৫.	আল ফিকহ (১ম পত্র)	১০০
৬.	আল ফিক্হ (২য় পত্র)	১০০
৭.	'আকা'ঈদ	১০০
৮.	ইসলামের ইতিহাস	১০০
৯.	বাংলা	১০০
১০.	ইংরেজী	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিম্নের যে কোন একটি	
১.	সাধারণ অর্থনীতি ও ইসলামের অর্থনীতি	২০০
২.	পৌরনীতি সূত্রাবলী ও বাংলাদেশ পৌরনীতি	২০০
৩.	মুসলিম দর্শন ও তাসাউফ	২০০
৪.	উর্দূ	২০০
৫.	ফারসী	২০০[১১০]

১১০. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ফাযিল পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮৪, পৃ ২৩-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

ফাযিল বিজ্ঞান বিভাগ
পাঠ্যসূচী

ক্রমিক	বিষয়	মান
১.	তাফসীর ও হাদীস	১০০
২.	আরবী সাহিত্য	১০০
৩.	বাংলা	১০০
৪.	ইংরেজী	১০০
৫.	পদার্থ বিজ্ঞান	২০০
৬.	রসায়ন	২০০
৭.	অংক	২০০
অথবা	বায়োলজী	২০০
ঐচ্ছিক বিষয় নিম্নের যে কোন একটি		
১.	অংক	২০০
২.	বায়োলজী	২০০
৩.	ইসলামী দর্শন	২০০
৪.	অর্থনীতি	২০০

বায়োলজী বা অংক এর যে বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হবে তা ঐচ্ছিক হিসেবে করা যাবে না।[১১১]

ফাযিল পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী

পরীক্ষাবর্ষ : ১৯৮৭ ও ১৯৮৮

ফাযিল ১৯৮৪ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচীর সাথে ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের পাঠ্যসূচীর উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য নেই। তবে ফাযিল সাধারণ বিভাগের তাফসীর ও হাদীসের সাথে উসূলুত তাফসীর ও উসূলে হাদীস যোগ করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে গণিত/জীববিদ্যা সংযোজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রকাশিত ১৯৮৭-৮৮ সালের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৮৭ সালে আলিম পরীক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক মানের হবে বিধায় ১৯৮৯ সাল হতে ফাযিল শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ থাকবে না।[১১২]

এ বিজ্ঞপ্তির আলোকে ১৯৮৯ সাল থেকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ফাযিল পরীক্ষার জন্য যে পাঠক্রম পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেছে তা নিম্নরূপ :

---

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ ২৪।

১১২. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী গ্রন্থের উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি স্মারক নং-পাঠ্য/১১৫৬০/৫০০০ তাং-৬/৮/১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীর নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
ফাযিল	আবশ্যিক	১. মাতৃভাষা (বাংলা/উর্দূ/ইংরেজী বিকল্প) ১টি পত্র	১০০
		২. উসূলুল কুর'আন ওয়াল হাদীস, ৩টি পত্র	৩০০
		৩. উসূলুল 'আরাবীয়া ওয়াশ শরীয়া (সাধারণ বিভাগের জন্য), তাজবীদ ওয়াল ক্বিরাত (মুজাব্বিদ বিভাগের জন্য) ৩টি পত্র	৩০০
	ঐচ্ছিক (১টি)	১. ইসলামের ইতিহাস, ২. উর্দূ, ৩. ফারসী, ৪. 'আরবী, ৫. বাংলা, ৬. মুসলিম দর্শন, ৭. রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ৮. অর্থনীতি, ৯. ইংরেজী	৩০০
		সর্বমোট =	১০০০

খ. কামিল স্তর

২ বছর মেয়াদী

পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী

মাদরাসা শিক্ষার কামিল স্তরে সর্বমোট পাঁচটি বিভাগ রয়েছে।

১. কামিল হাদীস।

২. কামিল ফিক্হ।

৩. কামিল তাফসীর।

৪. কামিল আদব।

৫. কামিল মুজাব্বিদ।

১৯৭১ সাল থেকে উক্ত পাঁচটি বিভাগের প্রতিটিতে ১০০০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি চলে আসছিল ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে দেখা যায় যে, কামিল শ্রেণীর প্রতিটি বিভাগের জন্য ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষাসহ মোট ১১০০ নম্বরের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২ বছর পাঠদানের পর এ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কামিল শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে কোন পরিবর্তন নেই।

Dhaka University Institutional Repository

কামিল শ্রেণী

পাঠ্যসূচী

বিভাগের নাম	পত্র নং	বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
হাদীস বিভাগ	১ম পত্র	হাদীস ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	হাদীস ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	হাদীস ৩য় পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	হাদীস ৪র্থ পত্র	১০০
	৫ম পত্র	হাদীস ৫ম পত্র	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	হাদীস ৬ষ্ঠ পত্র	১০০
	৭ম পত্র	তাফসীর ও উসূলুত তাফসীর ১ম পত্র	১০০
	৮ম পত্র	তাফসীর ও উসূলুত তাফসীর ২য় পত্র	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	১০০
		সর্বমোট =	১১০০
ফিকহ বিভাগ	১ম পত্র	হাদীস ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	হাদীস ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	কালাম ১ম পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	কালাম ২য় পত্র	১০০
	৫ম পত্র	ফিক্হ ১ম পত্র	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	ফিক্হ ২য় পত্র	১০০
	৭ম পত্র	উসূলুল ফিক্হ ১ম পত্র	১০০
	৮ম পত্র	উসূলুল ফিক্হ ২য় পত্র	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	
		সর্বমোট =	১১০০

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগের নাম	পত্র নং	বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
তাফসীর বিভাগ	১ম পত্র	তাফসীর ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	তাফসীর ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	তাফসীর ৩য় পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	তাফসীর ৪র্থ পত্র	১০০
	৫ম পত্র	উসূলে তাফসীর	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	তাফসীরুল হাদীস	১০০
	৭ম পত্র	ফিক্হুল কুর'আন	১০০
	৮ম পত্র	ইজাজুল কুর'আন ও মায়ানিউল কুর'আন	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	১০০
		সর্বমোট =	১১০০
আদব বিভাগ	১ম পত্র	আরবী সাহিত্য (প্রাচীন গদ্য) ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	আরবী সাহিত্য (প্রাচীন গদ্য) ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	আরবী সাহিত্য (প্রাচীন পদ্য) ১ম পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	আরবী সাহিত্য (প্রাচীন গদ্য) ২য় পত্র	১০০
	৫ম পত্র	আরবী সাহিত্য (আধুনিক গদ্য)	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	আরবী সাহিত্য (আধুনিক পদ্য)	১০০
	৭ম পত্র	বালাগাত, আরুজ ও কাফিয়া	১০০
	৮ম পত্র	নাকদুল আদাব	১০০
	৯ম পত্র	আল কিতাবাতু ওয়াল খিতাবাতু	১০০
	১০ম পত্র	আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	
		সর্বমোট =	১১০০

Dhaka University Institutional Repository

কামিল শ্রেণী

পাঠ্যসূচী

বিভাগের নাম	পত্র নং	বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
মুজাব্বিদ বিভাগ	১ম পত্র	হাদীস ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	হাদীস ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	উসূলুল ক্বিরাআত আ'শারা ১ম পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	তাফসীর ৪র্থ পত্র	১০০
	৫ম পত্র	উসূলে তাফসীর ৫ম পত্র	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	উসূলুল ক্বিরাআত আ'শারা ২য় পত্র	১০০
	৭ম পত্র	ইযরা ক্বিরাআত আ'শারা	১০০
	৮ম পত্র	মশ্‌ক ক্বিরাআত আ'শারা	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	
		সর্বমোট =	১১০০[১১৩]

১৯৯০ সালে ৯১টি কামিল মাদরাসার মধ্যে মাত্র তিনটি মাদরাসা সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ছিল। ১. সিলেট 'আলীয়া মাদরাসা (১৯১৩ সাল); ২. ঢাকা 'আলীয়া মাদরাসা (১৯৪৭ সাল); ৩. বগুড়া মুস্তফাবিয়া মাদরাসা (১৯৯০ সাল) অবশিষ্ট মাদরাসাগুলো বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফাযিল এবং কামিল ডিগ্রীকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের সমমান প্রদানের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীনে রয়েছে।

২. দরসে নিযামী মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ স্তর

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে ইসলামী শিক্ষার যে ধারা চলে আসছিল, যে শিক্ষার ছোঁয়ায় তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে কোন অশিক্ষিত লোক খুঁজে পাওয়া যেতো না, যে শিক্ষার গৌরব নিয়ে বাগদাদ, কর্ডোভা, গ্রানাডা সমগ্র বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, সে শিক্ষার অনুকরণেই চলে আসছিল দরসে নিযামী বা কাওমী মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থা। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বহু স্বনামধন্য 'আলিম' 'বুজুর্গ' তৈরী হয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেওবন্দ মাদরাসার অনুকরণে বাংলাদেশেও বহু দরসে নিজামী মাদ্রসা গড়ে উঠেছিল। ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কার্যাবলী ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৭৮ সালের পূর্বে মাদ্রাসাসমূহকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কোন সুযোগ না থাকায় তাদের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি বিরাজ করছিল।

১৯৭৮ সালে বেফাক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর থেকে দরসে নিজামী মাদরাসা শিক্ষার উচ্চস্তরের জন্য নিম্ন বর্ণিত পাঠ্যসূচী অনুকরণ করা হচ্ছে।

১১৩. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১১-১৩, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী, ১৯৮৭-১৯৮৮, পৃ ১১-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

মারহালাতুল ফযীলত ১ম বর্ষ
(স্নাতক ডিগ্রী)

১. তাফসীর	১১ পারা-৩০ পারা : বাংলা অনুবাদ
২. হাদীস	রিয়াদুস সালেহীন/ফয়জুল কালাম
৩. ফিক্‌হ	হিদায়া-১ম খণ্ড
৪. ফিক্‌হ	হিদায়া ২য় খণ্ড
৫. উসূলুল ফিক্‌হ	নূরুল আনওয়ার-কিতাবুল্লাহ
৬. আরবী সাহিত্য	মুখতারাত
৭.বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র)	দুরুসুল বালাগাত
৮. ফারায়েয	সিরাজী

মারহালাতুল ফযীলত ২য় বর্ষ
(স্নাতক ডিগ্রী)

১. তাফসীর	তাফসীরে জালালাঈন-১ম ভাগ
২. তাফসীর	তাফসীরে জালালাঈন-২য় ভাগ
৩. উসূলুত তাফসীর	আল ফওযুল কবীর
৪. হাদীস	মিশকাত শরীফ-১ম ভাগ মুকাদ্দিমা সহ
৫. হাদীস	মিশকাত শরীফ-২য় ভাগ
৬. উসূলুল ফিক্‌হ	নূরুল আন্‌ওয়ার-সুন্নত থেকে শেষ পর্যন্ত
৭. কালাম	আকীদাতুত তাহাভী

মারহালাতুত তাকমীল (স্নাতকোত্তর ডিগ্রী)
দাওরায়ে হাদীস ১ম বর্ষ

১. সহীহ বুখারী	পূর্ণ
২. সহীহ মুসলিম	পূর্ণ
৩. জা'মি আত্‌ তিরমিযী	পূর্ণ
৪. সুনানে আবু দাউদ	পূর্ণ
৫. সুনানে নাসাঈ	পূর্ণ
৬. সুনানে ইব্‌ন মাজাহ	পূর্ণ
৭. তাহাবী শরীফ	পূর্ণ
৮. মুয়াত্তা ইমাম মালেক	পূর্ণ
৯. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ	পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

মারহালাতুত তাকমীল (স্নাতকোত্তর ডিগ্রী)
২য় বর্ষ

যে কোন একটি বিষয় (গবেষণার আলোকে)

১. 'উলূমুল কুর'আন।

২. 'উলূমুল হাদীস।

৩. 'উলূমুশ শরইয়া।

৪. লুগাতুল 'আরাবিয়া।

৫. 'উলূমুদ দীন।

৬. ক্বিরাআত ও তাজবীদ।

১৯৭১ সালের পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে সকল কাওমী মাদরাসা ইসলামী শিক্ষার উচ্চস্তরে শিক্ষদানের জন্য খেদমত করে আসছে, সেগুলোর মধ্যে চট্টগ্রামের ম'ঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসা শীর্ষস্থানীয়। ১৯০১ সালে এ মাদরাসা স্থাপিত হওয়ার পর বাংলাদেশে এর অনুকরণে চারশত তেতাল্লিশটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে একান্নটি মাদরাসা ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত দাওরায়ে হাদীস পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। অবশিষ্ট মাদরাসাগুলোতে পর্যায়ক্রমে পরবর্তীকালে দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়েছে। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বেশ কিছু সংখ্যক মাদরাসা দাওরায়ে হাদীস পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে বা নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যবিহীন এ সকল মাদরাসার অবদান অস্বীকার করা যায় না। এ সকল মাদরাসা থেকে পাস করা বহু 'আলিম দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার খেদমত করে আসছেন। সমাজ সেবার ব্যাপারেও এদের অমূল্য অবদান স্বীকৃত। ইতোমধ্যে তাঁরা বাংলা ভাষায় বহু অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন এবং নতুন নতুন অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়

বাংলাদেশে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং গবেষণা মূলক উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই ধারার সূচনা হয়। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬টি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে মূলতঃ এ দেশে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে সাধারণ শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার মহান লক্ষ্যই মূখ্য ছিল। সত্যিকারার্থে প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন করে এই বিশ্ববিদ্যালয় অল্প কালের মধ্যেই 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' খেতাবে ভূষিত হয়। নামী দামি বহু প্রতিভাবান মনীষীর জন্ম দিয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আজ সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে অনেক হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকের ভূমিকায় দীপ্তমান রয়েছে। সিলেবাস, পরীক্ষা পদ্ধতিসহ সকল কর্মকাণ্ডতেই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুসরণ ও অনুকরণ করেই সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

সাধারণ শিক্ষার মানোন্নয়নে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা রয়েছে, ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারেও বিশ্ববিদ্যালয় গুলো ভূমিকা পালন করে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ইসলামী শিক্ষার উন্নয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে এর প্রয়োগে গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করে চলেছে। এক সময় নিউ স্কীম মাদরাসার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ইসলামী শিক্ষাকে ধারাবাহিক করার প্রচেষ্টাও নেয়া হয়েছিল। যদিও স্বাধীনতার পর সে ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। তবুও ইসলামী শিক্ষায় বিষয়গুলোর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সীমাবদ্ধ পরিসরে হলেও চলমান রয়েছে।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় (পাবলিক ইউনিভার্সিটি) সরকারীভাবে বাংলাদেশে ইসলামী একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৫)। এর অনুষদ সংখ্যা ৫, বিভাগ ১৮, শিক্ষার্থী সংখ্যা ৮৩৩৮, কর্তব্যরত শিক্ষক ২১৭ জন, ৯১৪ জন ছাত্র আবাসিক সুবিধা ভোগ করছে, মোট কর্মচারীর সংখ্যা ৪৮৮ জন, মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে এর অনুপাত ১৪.৪২। ১৯৯৯ খ্রী. শিক্ষা বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩১৬ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক এবং ৮১৫ জন স্নাতকোত্তর কোর্স সম্পন্ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর বইয়ের মওজুদ সংখ্যা-৫৯৭১০ খানা।[১১৪]

দেশে মোট ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামী শিক্ষা ও আরবী' বিভাগ নামে একাধিক বিভাগ রয়েছে। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা একটি বিভাগের অধীনে পাঠদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আরবী ও ইসলামী শিক্ষার' জন্য পৃথক দুটি বিভাগ রয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দূ ও ফারসী বিভাগ নামে অপর একটি পৃথক বিভাগ ও রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারী ব্যবস্থাপনায় (পাবলিক) ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৩), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬১), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬২), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৫), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭১), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৫), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৭), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯১), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯২), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯২), বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৮)।[১১৫]

---

১১৪. খ ম আবদুল আউয়াল সম্পাদিত, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ১৯৯৯, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০০, পৃ ৪৩।

১১৫. প্রাগুক্ত, অবলম্বনে।

Dhaka University Institutional Repository

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যায়।[১১৬] এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রেরণা ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রগতি সাধন।[১১৭] মুসলমানদের দাবীর প্রেক্ষিতেই ইংরেজ সরকার ১৯১২ সালের ১২ এপ্রিল ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেয়।

১৯২০ সালে ভারতীয় আইন সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন গৃহীত হয়। একই সালে ১ ডিসেম্বর পি. জে হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালের ১ জুলাই তিনটি অনুষদে ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক ও ৮৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম আরম্ভ হয়।[১১৮]

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

১৯১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণায় একটি সিদ্ধান্ত ছিল, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ নামে একটি অনুষদ থাকবে। কিন্তু স্যার নাথন কমিটি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কীম তৈরী করতে গিয়ে কলা অনুষদের একটি বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় খোলার প্রস্তাব করেন। ফলে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে কলা অনুষদের একটি বিভাগরূপেই ইসলামিক স্টাডিজ আত্মপ্রকাশ করে।[১১৯] নিউস্কীম মাদরাসার পরিকল্পনা রচয়িতা শামসুল 'উলামা আবূ নসর মুহাম্মদ ওয়াহীদ (মৃ ১৯৫০ সাল)[১২০] এ বিভাগের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ (Head) পদে নিয়োজিত হন। এরপর প্রায় ৭টি যুগ ধরে বহু ইসলামী ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটেছে এ বিভাগের সংস্পর্শে। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান সম্প্রসারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অবদান সত্যিই অতুলনীয়।

১৯৭৯ সাল পর্যন্ত 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ সংযুক্ত বিভাগ ছিল। ২১/০৪/৭৯ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিষদ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে একটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পন্ন বিভাগের মর্যাদা দান করে।[১২১] তৎকালীন বিভাগের অন্যতম হিতৈষী প্রফেসর ড. এ বি এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় থেকে অত্র বিভাগের একাডেমিক তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে এ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন

---

১১৬. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯২, ১২শ খ, পৃ ৫৩।

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫।

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯।

১১৯. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন ১৯৯৯, পৃ ৯।

১২০. শামসুল নসর মুহাম্মদ ওয়াহিদ ১৮৭২ সালে সিলেট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯২ সালে সিলেট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি এন্ট্রান্স (Antrons) পাশ করেন। ১৮৯৭ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আরবীতে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯০১ সালে তিনি গৌহাটী কটন কলেজের আরবী, ফারসীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৫ সালে ঢাকা সরকারী সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকেন। ১৯২১ সালে তিনি I.E.S (ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে) উন্নীত হন এবং শামসুল 'উলামা উপাধীতে ভূষিত হন। এ সময় মাদরাসা শিক্ষা ছিলো চরম অবহেলিত। এ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে তিনি নিজ খরচে বিভিন্ন দেশ সফর করে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের একটি প্রকল্প রচনা করেন। এ প্রকল্পের মূল কথা ছিলো, ইসলামী শিক্ষার সাথে ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে বহাল থাকেন।

তাঁর প্রবর্তিত নিউস্কীম শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে বহু রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের শিক্ষার্থী যুগপৎভাবে ইসলামী শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। ১৯৫৩ সালের ৩১ মে ৮১ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১২১. দ্র. বার্ষিক বিবরণী ১৯৭৮-৭৯, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাতিমান সীরাত গবেষক প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন।[১২২] উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সদা তৎপর এ প্রফেসরের সময়কালে এ বিভাগের বৈষয়িক অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

ইসলামিক স্টাডিজ
বিএ (সম্মান) কোর্স
পরীক্ষা বর্ষ : ১৯৭২

পাঠদান পদ্ধতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত অনুসৃত পাঠ্যসূচী থেকে দেখা যায় যে, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সনাতন পদ্ধতির পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত ছিল। এ পাঠ্য সূচী অনুসারে তিন বছরে অনার্স কোর্সের শেষ বর্ষে ৯টি বিষয়ে ৯০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হতো। এ ছাড়া দুই পত্রে সাবসিডিয়ারী ৬০০ নম্বরের পরীক্ষায় পাস করতে হতো।

মান বণ্টন : অনার্স

১ম-৭ম পত্র	৭০০ নম্বর
টিউটোরিয়াল	৭৫ নম্বর
মৌখিক	২৫ নম্বর
	মোট ৮০০ নম্বর

অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য

১ম-৭ম পত্র	৭০০ নম্বর
মৌখিক	১০০ নম্বর
	মোট ৮০০ নম্বর

পাঠ্যসূচী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পরীক্ষাবর্ষে ১৯৭১ ও ১৯৭২ এ তিন বছর মেয়াদী বিএ অনার্স কোর্সে ৯টি বিষয়ের পাঠ্যসূচী নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

---

১২২. **ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন** : নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার অন্তর্গত কুমরাদী দারুল 'উলূম সিনিয়র মাদ্রাসার স্টাফ কোয়ার্টারে জন্মগ্রহণ করেন। সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাঁর জন্ম তারিখ ২২ মার্চ ১৯৫৩।
ঢাকার নবাব বাগিচা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। ১৯৬৬ সালে জামি'আ হোসাইনিয়া আশ্রাফুল 'উলূম মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস সনদ লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের অন্তর্গত মুলতানের খায়রুল মাদারিস থেকে দাওরায়ে তাফসীর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭০ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে এসএসসি পরীক্ষায় তিন বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগে এবং ১৯৭২ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বিএ অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান এবং ১৯৭৬ সালে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৯৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।
ড. মুজতবা হোছাইন শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৮-৭০ সাল পর্যন্ত তিন বছর জামি'আ 'আরাবিয়া এমদাদুল 'উলূম ফরিদাবাদে এবং ১৯৭৯ সালে প্রায় এক বছর ঢাকাস্থ হাফেজ মূসা কলেজে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে প্রফেসর হিসেবে উন্নীত হন। ২০০১ সালে তিনি এ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি এই ঐতিহ্যবাহী বিভাগ পরিচালনা করছেন। ড. মুজতবা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সীরাত বিশ্বকোষ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলাপিডিয়ার অন্যতম সম্পাদক। প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গ্রন্থ সম্পাদনা ও মৌলিক গ্রন্থ রচনাসহ তাঁর চল্লিশোর্ধ প্রকাশনা রয়েছে। [সূত্র : শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন রচিত ও ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন সম্পাদিত, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা.: সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮ গ্রন্থের প্রচ্ছদ পৃ.।]

Dhaka University Institutional Repository

১ম পত্র : আল হাদীস, উসূলুল হাদীস ও তারিখুল হাদীস

আল হাদীস	৬০ নম্বর
উসূলুল হাদীস ও তারিখুল হাদীস	৪০ নম্বর
মোট	১০০ নম্বর

নির্দেশিত গ্রন্থ

১. তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত ও কিতাবুস শামায়েল

২. নুখবাতুল ফিক্‌র।

২য় পত্র : আল কুর'আনুল কারীম ১০০ নম্বর

সূরা আল কাহাফ, আন-নূর, সূরা মুহাম্মদ, আল ফাত্‌হ, আল হুজরাত।

২৯ পারা সূরা জ্বীন থেকে শেষ পর্যন্ত।

৩য় পত্র : আত্-তাফসীর ১০০ নম্বর

তাফসীর	৬০ নম্বর
উসূলুল তাফসীর ও তারীখুল তাফসীর	৪০ নম্বর
মোট	১০০ নম্বর

নির্দেশিত পুস্তক

১. আল কাশশাফ, পারা-৩০

২. আল ইতকান অধ্যায় ৪২ ও ৮০

৪র্থ পত্র : আল কালাম ওয়াআল ফালাসিফাতুল ইসলামিয়্যাহ ১০০ নম্বর

আল কালাম	৫০ নম্বর
আল ফালাসিফাতুল ইসলামিয়্যাহ	৫০ নম্বর
মোট	১০০ নম্বর

নির্দেশিত পুস্তক

শরহুল আকাঈদ আন-নাসাফিয়্যাহ।

সিফাতুল্লাহ অধ্যায় থেকে রিসালাত অধ্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত।

৫ম পত্র : আল ফিকহ ১০০ নম্বর

নির্দেশিত গ্রন্থ : আল হিদায়া, কিতাবুন নিকাহ, কিতুবুত-তালাক, কিতাবুল ওয়াক্‌ফ, কিতাবুল হিবা।

৬ষ্ঠ পত্র : উসূলুল ফিক্‌হ ওয়া তারিখুল ফিক্‌হ ১০০ নম্বর

উসূলুল ফিক্‌হ	৮০ নম্বর
তারিখুল ফিক্‌হ	২০ নম্বর
মোট	১০০ নম্বর

নির্দেশিত গ্রন্থ : নূরুল আনওয়ার, কিতাবুস-সুন্নাহ ইসহেসান এর শেষ পর্যন্ত।

৭ম পত্র : আরবী সাহিত্য ১০০ নম্বর

Dhaka University Institutional Repository

৭ম পত্র : (অথবা) মুসলিম দর্শন ১০০ নম্বর

৮ম পত্র : ইসলামের ইতিহাস ১০০ নম্বর

নির্দেশিত অংশ : জাহেলী যুগ, মহানবী সা.-এর জীবন, খোলাফায়ে রাশিদা, বনু উমাইয়া, বনু আব্বাসীয়া, ফাতেমী খিলাফত, স্পেনে উমাইয়া শাসন।

৯ম পত্র : মৌখিক

মৌখিক	২৫ নম্বর
টিউটোরিয়াল	৭৫ নম্বর
	মোট ১০০ নম্বর[১২৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিএ (সম্মান) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
শিক্ষা বর্ষ : ১৯৭৩-৭৪

পরীক্ষা : ১৯৭৬

পরীক্ষা বর্ষ ১৯৭২-এর পাঠ্যসূচীর সাথে পরীক্ষা বর্ষ ১৯৭৬-এর পাঠ্যসূচীর বেশ পার্থক্য দেখা যায়।

পত্রের শিরোনামের পার্থক্য

পত্র	পরীক্ষা বর্ষ : ১৯৭২	:	পরীক্ষা বর্ষ : ১৯৭৬
১ম পত্র	আল হাদীস	:	আল কুর'আনুল কারীম
২য় পত্র	আল কুর'আনুল কারীম	:	আল হাদীস
৩য় পত্র	আত তাফসীর	:	আত তাফসীর
৪র্থ পত্র	আল কালাম ওয়া আল-ফালাসাফাতুল ইসলামিয়্যাহ	:	আস-সীরাতুন নববীয়্যাহ
৫ম পত্র	আল ফিক্হ	:	আল ফিক্হ ওয়া উসূলুল ফিক্হ
৬ষ্ঠ পত্র	উসূলুল ফিক্হ ওয়া তারিখুল ফিক্হ	:	আল কালাম ওয়া আল ফালাসাফাতুল ইসলামিয়্যাহ
৭ম পত্র	আরবী সাহিত্য	:	আরবী সাহিত্য
	অথবা মুসলিম দর্শন		ইসলামী আদর্শবাদ
৮ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস	:	ইসলামের ইতিহাস
	অথবা		তারিখুল 'উলূমুল ইসলামিয়্যাহ
৯ম পত্র	মৌখিক টিউটোরিয়াল		মৌখিক টিউটোরিয়াল

১২৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পরীক্ষাবর্ষ ১৯৭১ ও ১৯৭২ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিএ (সম্মান) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
শিক্ষা বর্ষ : ১৯৭৫-৭৬

পরীক্ষা : ১৯৭৮

পরীক্ষা বর্ষ ১৯৭৫-এর সাথে পরীক্ষা বর্ষ ১৯৭৮ সালের পাঠ্যসূচীর তেমন কোন পার্থক্য নেই। শুধু ৮ম পত্রে শিরোনাম 'তারিখুল ইসলাম-এর সাথে 'তারিখুল আদয়ান' সংযোগ করা হয়েছে এবং মান বন্টনের ক্ষেত্রে তারিখুল ইসলাম-৬০ নম্বর ও তারিখুল আদয়ান-৪০ নম্বর করা হয়েছে।

বিএ (সম্মান) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
শিক্ষা বর্ষ : ১৯৭৯-৮০

পরীক্ষা বর্ষ : ১৯৮০, ৮১, ৮২

শিক্ষাবর্ষ ১৯৭৯-৮০-এর পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে কোর্স পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। এ পদ্ধতিতে সম্মান ১ম বর্ষে ১ম পত্রে ১০১ এবং ১০২ কোর্সে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা সমাপ্ত করতে হবে।

মান বন্টন : ২টি কোর্সে = ৩৫+৩৫	৭০ নম্বর
ইনকোর্স টেস্ট	২০ নম্বর
টিউটোরিয়াল	১০ নম্বর
মোট	১০০ নম্বর

২য় বর্ষে ২য় ও ৩য় পত্রে ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪ কোর্সে মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা সমাপ্ত করবে। মান বন্টন ১ম বর্ষের অনুরূপ হবে।

৩য় বর্ষে ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পত্রে ৩০১ থেকে ৩১০ পর্যন্ত ১০টি কোর্সে মোট ৫০০ নম্বরের পরীক্ষা সমাপ্ত করবে। মান বন্টন হবে ১ম ও ২য় বর্ষের অনুরূপ।

এ ছাড়া ৩য় বর্ষে উল্লেখিত ১৬টি কোর্সের সমন্বয়ে একটি Comprehensive পত্র থাকবে। এতে লিখিত ৫০ নম্বর এবং মৌখিক ৫০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম বর্ষ : বিএ (সম্মান)
কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা : ১৯৮০

১ম পত্র : আল কুর'আনুল কারীম।

কোর্স : ১০১ সূরা আল আম্বিয়া ও আল আহকাফ।

কোর্স : ১০২ সূরা আন নূর, আল-ফাত্হ ও আল হুজরাত।

দ্বিতীয় বর্ষ : বিএ (সম্মান)
কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা : ১৯৮১

২য় পত্র : আরবী সাহিত্য

কোর্স : ২০১ (এ) ব্যাকরণ ও বাক্য গঠন।
কোর্স : ২০১ (এ) আরবী গদ্য ও পদ্য।
অথবা :
কোর্স : ২০১ (বি) মুসলিম দর্শন।
কোর্স : ২০২ (বি) আত তাসাউফ।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পত্র : সীরাতুন নবী।

কোর্স : ২০৩ জাহিলী যুগ, রাসূলের হিজরত পূর্ব জীবন।

কোর্স : ২০৪ রাসূলের হিজরতোত্তর জীবন।

তৃতীয় বর্ষ : বিএ (সম্মান)
কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা : ১৯৮২

৪র্থ পত্র : আল ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ।

কোর্স : ৩০১ কিতাবুন নিকাহ, কিতাবুত তালাক।

কোর্স : ৩০২ কিতাবুয যাকাত, আল ইজমা ও কিয়াস।

নির্দেশিত গ্রন্থ : ১. আল হিদায়া ২. নূরুল আনওয়ার।

৫ম পত্র : আল হাদীস ও উসূলুল হাদীস।

কোর্স : ৩০৩ তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত।

কোর্স : ৩০৪ কিতাবু শামায়িলুননবী, নুখবাতুল ফিকর।

৬ষ্ঠ পত্র : আত-তাফসীর ও উসূলুত-তাফসীর।

কোর্স : ৩০৫ আল কাশশাফ সূরা আল-আনফাল

কোর্স : ৩০৬ আল ইতকান, অধ্যায় ১,৭,৮,৪২ ও ৮০।

৭ম পত্র : আল কালাম ও তারিখুল আদিয়ান।

কোর্স : ৩০৭ শরহুল আকাঈদ আন-নাসাফী, সিফাতুল্লাহ থেকে রিসালাত-এর শেষ পর্যন্ত।

কোর্স : ৩০৮ টেবু, টোটেম।

৮ম পত্র : ইসলামিক আদর্শবাদ।

কোর্স : ৩০৯ (এ) ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও অন্যান্য।

কোর্স : ৩১০ (এ) ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অন্যান্য।

৮ম পত্র : তারিখুল উলূমুল ইসলামিয়্যাহ।

কোর্স : ৩০৯ (বি) তারিখুত তাফসীর, তারিখুল ফিক্‌হ।

কোর্স : ৩১০ (বি) তারিখুল হাদীস।

৮ম পত্র : ইসলামের ইতিহাস।

কোর্স : ৩০৯ (সি) খোলাফায়ে রাশিদা, উমাইয়া, আব্বাসীয়া।

কোর্স : ৩১০ (সি) বাংলাদেশে মুসলিম শাসন।[১২৪]

১৯৯০ সাল পযন্ত কোর্স পদ্ধতির পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে উল্লেখযোগ্য আর কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয় নি।[১২৫] এ পরীক্ষা পদ্ধতি পূর্বের যে কোন পরীক্ষা পদ্ধতি থেকে নিঃসন্দেহে উন্নত মানের হয়েছে। ইনকোর্স টেস্ট পদ্ধতির ফলে ছাত্রদের নিজ নিজ শিক্ষকগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ৩য় বর্ষে Comprehensive থাকার কারণে এ বছর সব কয়টি বিষয় নতুনভাবে অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছে।

---

১২৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পরীক্ষাবর্ষ ১৯৮০ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

১২৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পরীক্ষাবর্ষ ১৯৯০ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এমএ (প্রিলিমিনারী) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭০-৭১

পরীক্ষা : ১৯৭১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমএ (প্রিলিমিনারী) আগে থেকেই চলে আসছে। শিক্ষাবর্ষ ১৯৭০-৭১-এর পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে দেখা যায় যে, সে সময় এখানে সনাতন পদ্ধতির কোর্স প্রবর্তিত ছিল। নিম্নে পরীক্ষা বর্ষ ১৯৭১-এ পাঠ্যসূচী উল্লেখ করা হলো :

১ম পত্র : আল হাদীস, উসূলুল হাদীস ও তারিখুল হাদীস।
মান বন্টন ৬০+৪০ = ১০০ নম্বর।

নির্দেশিত গ্রন্থ

তিরমিযী আবওয়াবুস-সালাত, নুখবাতুল ফিক্‌র, আহমদ আমীন, ফজরুল ইসলাম ও দোহাল ইসলাম।

২য় পত্র : আত তাফসীর ও আল কালাম।
মান বন্টন ৬০+৪০ = ১০০ নম্বর।

নির্দেশিত গ্রন্থ

১. আল কাশশাফ, ২৯ পারার প্রথম অর্ধেক।
২. শরহুল আকাঈদ আন নাসাফী। রিসালাত অধ্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত।

৩য় পত্র : আল ফিক্‌হ, উসূলুল ফিক্‌হ ও তারিখুল ফিক্‌হ।
মান বন্টন ৬০+৪০ = ১০০ নম্বর।

নির্দেশিত গ্রন্থ

১. আল হিদায়া, কিতাবুন নিকাহ, কিতাবুল ওয়াক্‌ফ।
২. নূরুল আনওয়ার, ইজমা ও কিয়াস।
৩. আহমদ আমীন, ফজরুল ইসলাম ও দোহাল ইসলাম।

৪র্থ পত্র : (এ) ইসলামের ইতিহাস ১০০ নম্বর।
অথবা :

৪র্থ পত্র : (বি) মুসলিম দর্শন ১০০ নম্বর।
অথবা :

৪র্থ পত্র : (সি) আরবী সাহিত্য ও আরবী সাহিত্যের ইতিহাস।

৫ম পত্র : টিউটোরিয়াল ৭৫, মৌখিক ২৫।[১২৬]

ইসলামিক স্টাডিজ এমএ (প্রিলিমিনারী) শিক্ষাবর্ষ ১৯৭০-১৯৯০ পর্যন্ত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর অনুরূপ।[১২৭] তবে শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৮-৮৯ থেকে মান বন্টনের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।[১২৮]

---

১২৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭০-৭১ পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রম দ্রষ্টব্য।
১২৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৯-৮০ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।
১২৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮৮-৮৯ থেকে ১৯৯০-৯১ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এমএ (শেষ বর্ষ) ইসলামিক স্টাডিজ

শিক্ষা বর্ষ : ১৯৭০-৭১

পরীক্ষা : ১৯৭২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী থেকে দেখা যায় যে, এ বিভাগে এমএ সাধারণ কোর্স ছাড়াও বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে বুৎপত্তি অর্জনের জন্য Philosophy of Religion শিরোনামে এমএ শেষ বর্ষে 'বি' কোর্স খোলা রয়েছে।

পাঠ্যসূচী

১ম পত্র : আল হাদীস ১০০ নম্বর ।

নির্দেশিত গ্রন্থ

১. **আল বুখারী** : বুবু-বাদউল ওয়াহী, কিতাবুল 'ইলম কিতাবুল মানকিব, কিতাবুল মাগাজী।
২. **মুসলিম** : কিতাবুন নিকাহ, কিতাবুত তালাক, কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুল আদাব, কিতাবুল ফাজায়েল।

২য় পত্র : আল হাদীস ১০০ নম্বর।

নির্দেশিত গ্রন্থ :

১. আবু দাউদ : কিতাবুয যাকাত, কিতাবুল হজ্জ, কিতাবুস সাওম।
২. তাহাবী : কিতাবুল বুয়', কিতাবুল হিবা ওয়াস সাদাকাহ, কিতাবুয যিয়াদা।

৩য় পত্র : আত-তাফসীর ১০০ নম্বর।

নির্দেশিত গ্রন্থ : (১) বায়দাবী : সূরা ফাতিহা ও প্রথম পারা।

৪র্থ পত্র : (এ) তারিখুল আদইয়ান ১০০ নম্বর।

নির্দেশিত বিষয় :

১. ধর্মের বিবর্তন : উৎস ও ক্রমবিকাশ।
২. বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহ।

অথবা

৪র্থ পত্র : (বি) 'উলুমুল কুর'আন ও তারিখুল হাদীস ১০০ নম্বর।

নির্দেশিত গ্রন্থ

১. আল ইতকান : অধ্যায় ৯১, ১৬, ১৮, ৪৭, ৬৫, ৬৬, ৬৭ ও ৬৮।
২. মিফতাহুস সুন্নাহ।

৪র্থ পত্র : (সি) মুসলিম দর্শন ১০০ নম্বর।

৫ম পত্র : মৌখিক ২৫ নম্বর, টিউটোরিয়াল ৭৫ নম্বর = ১০০ নম্বর

বহিরাগতদের জন্য মৌখিক- ১০০ নম্বর।[১২৯]

---

১২৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭০-৭১ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এমএ (শেষ পর্ব) ইসলামিক স্টাডিজ
শিক্ষা বর্ষ : ১৯৭০-৭১
পরীক্ষা : ১৯৭২

কোর্স 'বি' : ধর্মদর্শন :
১ম পত্র : ধর্মের উৎস ও ক্রমবিকাশ ১০০ নম্বর।

২য় পত্র : বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম ১০০ নম্বর।

৩য় পত্র : ধর্ম দর্শন ১০০ নম্বর।

৪র্থ পত্র : ইসলাম, মহানবীর জীবন ১০০ নম্বর।[১৩০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষাবর্ষ ১৯৭৫-৭৬, ১৯৭৯-৮০, ১৯৮৮-৮৯, ও ১৯৮৯-৯০-এর পাঠক্রম ও ও পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, (উল্লিখিত) শিক্ষাবর্ষ ১৯৭০-৭১-এর পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী থেকে সনাতন পদ্ধতির (এ) বা (বি) কোর্সে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন নেই। তবে শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৮-৮৯, পরীক্ষা ১৯৯০-এর পাঠ্যসূচীতে দেখা যায়, এমএ শেষ বর্ষে কোর্স পদ্ধতির ও একটি পরীক্ষা হয়েছিল। কোর্স পদ্ধতির পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

এমএ শেষ পর্ব (কোর্স এ)
কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা : ১৯৯০
মোট ৫০০ নম্বর

কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা পদ্ধতি : এমএ কোর্স পদ্ধতি পরীক্ষার নিয়মাবলী ও মান বন্টন অনার্স পরীক্ষার নিয়মাবলী ও মান বন্টনের অনুরূপ। তবে Comprehensive পরীক্ষায় লিখিত ৭৫ এবং মৌখিক ২৫ নম্বর হবে।

পাঠ্যসূচী
১ম পত্র : আল হাদীস।
কোর্স : ৫০১
কোর্স : ৫০২।

নির্দেশিত গ্রন্থ : আল বুখারী, বাবুল ওয়াহী, কিতাবুল হজ্জ, কিতাবুর রিকাফ।

নির্দেশিত গ্রন্থ : সহীহ মুসলিম-কিতাবুল ইল্ম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসিয়ার, কিতাবুল আদব, কিতাবুল ফাযায়েল।
কোর্স : ৫০৩।

২য় পত্র : আল হাদীস।
কোর্স : ৫০৪।

নির্দেশিত গ্রন্থ : আত তাহাবী-কিতাবুল বুয়ূ', কিতাবুল হেবা ওয়াস সাদাকাহ, কিতাবুয যিয়াদাত।
কোর্স : ৫০৫।

৩য় পত্র : আত-তাফসীর।
কোর্স : ৫০৬, **নির্দেশিত গ্রন্থ** : বায়দাবী-সূরা ফাতিহা, ১ম পারা ৫ রুকু।

---

১৩০. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশিত গ্রন্থ : বায়দাবী-১ম পারা ৬ রুকু থেকে শেষ পর্যন্ত।
কোর্স : ৫০৭ (এ), **৪র্থ পত্র** : (এ) উলূমুল কুর'আন ও তারিখুল হাদীস।
কোর্স : ৫০৮ (এ), **নির্দেশিত গ্রন্থ** : আল ইতকান, অধ্যায়-৯, ১৬, ১৮, ৬৪, ৬৫, ৬৬ ও৬৭।

নির্দেশিত গ্রন্থ : মিফতাহুস সুন্নাহ।

৪র্থ পত্র : (বি) মুসলিম দর্শন ও তাসাউফ ১০০ নম্বর।

৪র্থ পত্র : (সি) ইসলামী অর্থনীতি ও বিজ্ঞান এবং কারিগরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান।[১৩১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিএ (অনার্স) কোর্স
পরীক্ষা বর্ষ : ১৯৭১-৭২
আরবী বিভাগ
পাঠ্যসূচী (সংক্ষিপ্ত)

১ম পত্র : আরবী গ্রামার ও কম্পোজিশন।

২য় পত্র : রচনা অনুবাদ।

৩য় পত্র : আরবী সাহিত্য গদ্য।

৪র্থ পত্র : আরবী সাহিত্য, পদ্য।

৫ম পত্র : রেটোরিক এন্ড প্রসোডি।

৬ষ্ঠ পত্র : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস।

৭ম পত্র : ইসলামের ইতিহাস।

৮ম পত্র : আরবী ভাষান্তর।

৮ম পত্র : মুসলিম দর্শন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিএ (অনার্স) আরবী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭৩-৭৪
পরীক্ষা : ১৯৭৬
পাঠ্যসূচী (সংক্ষিপ্ত)

১ম পত্র : প্রাচীন আরবী গদ্য

১. আল কুর'আন-সূরা আন-নাহল ও সূরা হুজরাত।
২. আল হাদীস-রিয়াদুস সালেহীন, প্রথম থেকে মুহাফিজাত আস-সুন্নাহ পর্যন্ত। অন্যান্য পত্র পরীক্ষাবর্ষ ১৯৭২ এ অনুরূপ।

---

১৩১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী, ১৯৯০ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিএ (অনার্স) আরবী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭৫-৭৬

পরীক্ষা : ১৯৭৮

শিক্ষাবর্ষ ১৯৭৩-৭৮-এর অনুরূপ।

বিএ (অনার্স) আরবী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭৯-৮০

এ বছরের পাঠ্যসূচীতে কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে মান বন্টন সহ অন্যান্য নিয়মাবলী ইসলামিক স্টাডিজের কোর্স পদ্ধতির নিয়মের অনুরূপ।

১ম পত্র : প্রাচীন আরবী গদ্য।

কোর্স : ১০১।

১. আল কুর'আন, সূরা আন নূর ও সূরা হুজরাত।
২. আল হাদীস, তাজরীদুল বুখারী, কিতাবুল ইল্ম ও কিতাবুল আদব প্রথম অর্ধেক।

অন্যান্য কোর্সসমূহ সনাতন পদ্ধতির পত্রসমূহের আলোকে তৈরী হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এমএ (১ম পর্ব) আরবী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭০-৭১

পরীক্ষা : ১৯৭১

পাঠ্যসূচী (সংক্ষিপ্ত)

১ম পত্র : গ্রামার, রেটোরিক, প্রসোডি ও আরবী রচনা।

২য় পত্র : আরবী সাহিত্য গদ্য।

- আল কুর'আন-সূরা লুকমান, মুহাম্মদ, ফাত্হ, হুজরাত।
- তাজরীদুল বুখারী, কিতাবুল ইল্ম, ফাজায়েলে আসহাবুন নবী।

৩য় পত্র : আরবী সাহিত্য পদ্য।

৪র্থ পত্র : ইসলামের ইতিহাস ও আরবী সাহিত্যের ইতিহাস।

এমএ (১ম পর্ব) আরবী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭৫-৭৬

পরীক্ষাবর্ষ : ১৯৭৬

পত্রের শিরোনামসমূহ পরীক্ষাবর্ষ ১৯৭১-এর অনুরূপ ২য় পত্রে আল-কুর'আনের সূরা মুহাম্মদ ও সূরা হুজরাত কমানো হয়েছে। তাজরীদুল বুখারীর পরিবর্তে রিয়াদুস সালেহীন প্রথম থেকে বাবুত তাকওয়া পর্যন্ত পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এমএ (১ম পর্ব) আরবী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭৯-৮০

পরীক্ষাবর্ষ : ১৯৮১

পত্রের শিরোনামসমূহ শিক্ষাবর্ষ ১৯৭৬-এর অনুরূপ। দ্বিতীয় পত্রে রিয়াদুস সালেহীন-এর পরিবর্তে তাজরীদুল বুখারীর কিতাবুল ইল্‌ম পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এমএ (শেষ পর্ব) আরবী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭০-৭১

পরীক্ষা বর্ষ : ১৯৭২

পাঠ্যসূচী (সংক্ষিপ্ত) :
১ম পত্র : আরবী সাহিত্য গদ্য।

২য় পত্র : আরবী সাহিত্য গদ্য।

৩য় পত্র : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ও আরবী রচনা।

৪র্থ পত্র : মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস।

৪র্থ পত্র : অথবা মুসলিম দর্শন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এমএ (শেষ পর্ব) আরবী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭৫-৭৬

পরীক্ষা বর্ষ : ১৯৭৭

পত্রের শিরোনামসমূহ পরীক্ষা বর্ষ ১৯৭২-এর অনুরূপ। তবে ১ম পত্রে আল হাদীসের পরিবর্তে ইবন হিসামের আস-সিরাতুন নবুবিয়্যাহ সংযোজন করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এমএ (শেষ পর্ব) আরবী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭৯-৮০

পরীক্ষা বর্ষ : ১৯৮০

পত্রের শিরোনামসমূহ পরীক্ষাবর্ষ ১৯৭৭-এর অনুরূপ। তবে ১ম পত্রে 'জাহেজ'-এর কিতাবুল বায়ান ওয়াতভিবইয়ান সংযোজন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৯৫৩ সালে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন প্রফেসর ইতরাৎ হোসেন জুবেরী। ক্ষুদ্র পরিসরে আরম্ভ হয়ে এখন এটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৯-৯০ শিক্ষা বর্ষে এর অনুষদ সংখ্যা ছিল ৬টি এবং বিভাগ সংখ্যা ২৯টি।[১৩২]

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

১৯৭৮ সালে আরবী বিভাগ ভাষা বিভাগ থেকে পৃথক হয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে রূপ লাভ করে।[১৩৩] তখন ইসলামিক স্টাডিজ পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্স এ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্স খোলা হয় ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে।[১৩৪] তখন থেকে এ বিভাগের নাম আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মরহুম প্রফেসর আফতাব আহমদ রাহমানী।[১৩৫]

ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে এমএ শেষ বর্ষ খোলা হয় ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষে।[১৩৬] এর চার বছর পর ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষা বর্ষে খোলা হয় এমএ পূর্বভাগ।[১৩৭]

১৯৯৫ সালে ইসলামিক স্টাডিজ আরবী থেকে পৃথক হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগের মর্যাদা লাভ করে।[১৩৮] এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন প্রফেসর মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ।[১৩৯]

---

১৩২. *বার্ষিক রিপোর্ট* ১৯৮৯-৯০, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২, পৃ ১।

১৩৩. *বার্ষিক রিপোর্ট* ১৯৯০-৯১, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ ৬।

১৩৪. ০৯.০৪.১৯৯৪ তারিখের আরবী ও ইসলামিক বিভাগের একাডেমীক কমিটির কার্য বিবরণীর সিদ্ধান্ত নং-১।

১৩৫. মাওলানা আফতাব আহমদ ১৯২৪ সালে দিনাজপুর জেলার বিরল থানাধীন মুরাদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো মৌলবী মুহাম্মদ উমর মোল্লা। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯৩৮ সালে তিনি দিল্লী গমন করেন। সেখানে দারুল হাদীস রহমানিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। ১৯৪৪ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে এ মাদ্রাসায় পড়া শেষ করেন এবং দিল্লী জামি 'আজম মাদ্রাসায় শিক্ষকতা লাভ করেন। উক্ত রহমানিয়া মাদ্রাসার নামানুসারেই তার নামের সাথে রহমানী শব্দ যুক্ত হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাযিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।
অতঃপর দেশে ফিরে হাই মাদ্রাসার নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৪৯ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ৩য় স্থান লাভ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি সিরাজগঞ্জ ইসলামিক ইন্টার মিডিয়েট কলেজ থেকে আই. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএ অনার্স এবং এমএ উভয় পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন।
১৯৬০ সালে ড. আফতাব আহমদ রাহমানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ইবন হাজার 'আসকালানী এর উপর গবেষণা করে ১৯৬৮ সালে পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে উচ্চতর গবেষণার জন্য লন্ডনের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন এবং দ্বিতীয়বার পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭২ সালে তিনি দেশে ফিরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৮১ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৮১-৮২ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে সম্মান শ্রেণী খোলা হলে তিনি আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ এবং যৌথ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ বিভাগেই কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৪ সালের ২১ এপ্রিল তারিখে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৩৬. বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৮৬-৮৭, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ১৫৭।

১৩৭. বার্ষিক রিপোট ১৯৮৮-৮৯, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ৪৪।

১৩৮. সমাপনী ১৯৯৮, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ১৩।

১৩৯. ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত আবুতোবার নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোবারক উল্লাহ। প্রায় চার যুগ ধরে তারা রংপুর জেলার পীরগঞ্জে থানাধীন চতরা বন্দরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর চাটখিল 'আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৬০ সালে মাদরাসা বোর্ড

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ইসলামিক স্টাডিজ
বিএ (সম্মান)

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ সম্মান বিষয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোন কোন সালের পাঠ্যসূচীতে কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। বিভিন্ন সালের সম্মান শ্রেণীর পাঠ্যসূচী পার্থক্যসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

বিএ (সম্মান) পাঠ্যসূচী
ইসলামিক স্টাডিজ
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮২-৮৩

পরীক্ষা : ১৯৮৫

৩ বছরে সম্মান কোর্সে ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষাসহ ৮টি বিষয়ে ১০০ নম্বর করে মোট ৯০০ নম্বরের পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রতিটি বিষয়ে চার ঘন্টা সময় নির্ধারিত।

প্রথম পত্র : আল কুর'আনুল কারীম

ক. অনুবাদ	৩০ নম্বর
খ. ব্যাখ্যা	৩০ নম্বর
গ. পাঠ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন	১৫ নম্বর
ঘ. পাঠ্য বিষয়ে সমালোচনামূলক প্রশ্ন	২৫ নম্বর
মোট	১০০ নম্বর

১. সূরাতুল আম্বিয়া, আল আহকাফ, আন-নূর, আল ফাতাহ এবং আল হুজরাত।

দ্বিতীয় পত্র : আরবী সাহিত্য

ক. গ্রামার ও কম্পোজিশন

১. গ্রামার ৩০ নম্বর

২. কম্পোজিশন ২০ নম্বর

কর্তৃক গৃহীত আলিম পরীক্ষায় মেধাতালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করেন। এটাই চাটখিল মাদ্রাসার কোন ছাত্রের মেধাতালিকায় স্থান লাভ করার প্রথম রেকর্ড। ১৯৬২ সালে একই মাদরাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ৩য় স্থান লাভ করেন। অতঃপর কামিল, হাদীস ও তাফসীর উভয় পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান লাভ এবং কামিল ফিকহ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাজীবনে তিনি ১৯৭৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ২য় স্থান লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ১ম শ্রেণী লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনে বড় রংপুর 'আলীয়া মাদ্রাসাসহ বেশ কয়েকটি মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দীর্ঘদিন হাদীসের খিদমত করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম আরম্ভ হলে তিনি সেখানে যোগদান করেন এবং সভাপতি, প্রভোস্ট, রেজিস্ট্রারসহ বিভিন্ন দায়িত্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রাখেন।

১৯৯১ সালে তিনি পুনরায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে যোগদান করেন এবং প্রফেসর পদে উন্নীত হন। এ বিভাগে তিনি সভাপতি থাকাকালে ইসলামিক স্টাডিজ স্বয়ং সম্পূর্ণ বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি এ নতুন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিভাগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

তাঁর প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থের মধ্যে *ইমাম তাহাভী র. : জীবন ও কর্ম*, **'উলুমুল কুর'আন** ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশিত গ্রন্থ : রশিদ শারতুনী, মাবাদিউল আরাবিয়া, ৩য় খণ্ড।

খ. আরবী গদ্য ও পদ্য ৫০ নম্বর।

নির্দেশিত গ্রন্থ

১. হামাদানী : মাকামাত, ১-২
২. আহমদ আমীন : ইয়াওমুল ইসলাম পৃ ৫-৩০
৩. হাসান ইবন সাবিত : দিওয়ান, পৃ ৫৮-৬০
৪. হাফিজ ইবরাহীম : দীওয়ান, পৃ ১২৯-১৩৫

অথবা

ক. মুসলিম দর্শন ৫০ নম্বর
খ. আত-তাসাউফ ৫০ নম্বর

মোট ১০০ নম্বর

তৃতীয় পত্র : সিরাতুন নবী ১০০ নম্বর

ক. ইসলাম পূর্ব আরবের সামাজিক, রাজনৈকি, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা।
খ. মহানবী সা.-এর হিজরত পূর্ব জীবন।
গ. মহানবী সা.-এর হিজরতোত্তর জীবন।

চতুর্থ পত্র : আল ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ ১০০ নম্বর

ক. আল ফিক্‌হ ৫০ নম্বর
খ. উসূলুল ফিক্‌হ ৫০ নম্বর

মোট ১০০ নম্বর

নির্দেশিত গ্রন্থ

১. আল হিদায়া : কিতাবুন নিকাহ, কিতাবুত তালাক ও কিতাবুয যাকাত।
২. নূরুল আনওয়ার : আল ইজমা ও আল-কিয়াস।

পঞ্চম পত্র : আল হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১০০ নম্বর

ক. আল জা'মি আত তিরমিযী : আবওয়াবু সালাত ৫০ নম্বর
খ. আল জা'মিআত তিরমিযী : শামায়েলুন নবী সা. ২০ নম্বর
গ. ইবন হাজার আসকালানী : নুখবাতুল ফিকর ৩০ নম্বর

মোট ১০০ নম্বর

৬ষ্ঠ পত্র : আত-তাফসীর ও উসূলুত তাফসীর ১০০ নম্বর

ক. আত-তাফসীর ৫০ নম্বর
খ. উসূল আত-তাফসীর ৫০ নম্বর

নির্দেশিত গ্রন্থ

১. আল্লামা জামাখশরী : আল কাশশাফ, সূরা আনফাল
২. আল্লামা সুয়ূতী : আল ইতকান, অধ্যায় ১, ৭, ৮, ৪২ ও ৮০

৭ম পত্র : আল কালাম ও তারিখুল আদইয়ান ১০০ নম্বর

ক. আল কালাম ৫০ নম্বর
খ. তারিখুল আদইয়ান : টেবু, টোটেম ৫০ নম্বর

মোট ১০০ নম্বর

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশিত পুস্তক

আত-তাফতাযানী : শরহু আকাঈদ আন নাসাফী, সিফাত উল্লাহ থেকে কিতাবের শেষ পর্যন্ত

অষ্টম পত্র : ইসলামী আদর্শবাদ : ১০০ নম্বর

ক. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা	৫০ নম্বর
খ. ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা	২৫ নম্বর
গ. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	২৫ নম্বর
মোট	১০০ নম্বর

৮ম পত্রের অথবা : তারিখুল উলুমুল ইসলামিয়াহ

ক. তারিখুত-তাফসীর ও তারিখুল ফিক্‌হ	৫০ নম্বর
খ. তারিখুল হাদীস	৫০ নম্বর
মোট	১০০ নম্বর

অথবা

ইসলামের ইতিহাস ১০০ নম্বর

ক. খোলাফায়ে রাশেদা, বনু উমাইয়া, বনু আব্বাসীয়	৫০ নম্বর
খ. বাংলাদেশে মুসলিম শাসন	৫০ নম্বর
মোট	১০০ নম্বর

৯ম পত্র : মৌখিক পরীক্ষা : ১০০ নম্বর[১৪০]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ

বিএ (সম্মান) পাঠ্যসূচী

শিক্ষা বর্ষ : ১৯৮৩-৮৪, পরীক্ষা বর্ষ : ১৯৮৬

এ বছরের পাঠ্যসূচী ১৯৮২-৮৩ শিক্ষা বর্ষের পাঠ্যসূচীর অনুরূপ।[১৪১]

উল্লেখ্য যে, এ বছর ১৯৮২-৮৩ শিক্ষা বর্ষ পর্যন্ত (সম্মান) শ্রেণীতে তিন বছর পাঠ সমাপ্ত করার পর ৮টি পত্রের লিখিত এবং ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অনার্স পর্ব সমাপ্ত হতো।

ইসলামিক স্টাডিজ

বিএ (সম্মান) পাঠ্যসূচী

শিক্ষা বর্ষ : ১৯৮৪-৮৫

পরীক্ষা বর্ষ : ১৯৮৫

পরীক্ষা বর্ষ ১৯৮৫ থেকে নতুন পদ্ধতির সূচনা হয়। এ পদ্ধতির নিয়মাবলী ও মান বণ্টন নিম্নরূপ :

১ম পর্ব : ১ম ও ২য় পত্র ২০০ নম্বর + মৌখিক ১০ নম্বর + টিউটোরিয়াল ১০ নম্বর	= ২২০ নম্বর
২য় পর্ব : ৩য় পত্র ১০০ নম্বর + মৌখিক ১০ নম্বর + টিউটোরিয়াল ১০ নম্বর	= ১২০ নম্বর
৩য় পর্ব : ৪র্থ-৮ম পত্র ৫০০ নম্বর + মৌখিক ৩০ নম্বর + টিউটোরিয়াল ৩০ নম্বর	= ৫৬০ নম্বর
মোট	= ৯০০ নম্বর

পাঠ্যসূচী : প্রথম পর্ব

১ম পত্র : আল কুর'আনুল কারীম। সূরা আল আম্বিয়া, সূরা আন নূর, সূরা আল ফাতাহ, আল হুজরাত।

২য় পত্র : আরবী সাহিত্য, গ্রামার এন্ড কম্পোজিশন।

---

১৪০. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ১৯৮২-৮৩ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

১৪১. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

অথবা : মুসলিম দর্শন ও তাসাউফ।[১৪২]
(অন্যান্য পরীক্ষা ১৯৮২-৮৩ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচীর অনুকরণে অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ইসলামিক স্টাডিজ
বিএ (সম্মান) পাঠ্যসূচী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৫-৮৬

পরীক্ষা : ১৯৮৬

১ম বর্ষ : পাঠ্যসূচী ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচীর অনুরূপ।

২য় বর্ষ : পাঠ্যসূচী ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচীর অনুরূপ।

৩য় বর্ষ : আস সীরাতুন নববীয়্যাহ
ক. ইসলাম পূর্ব যুগ।
খ. মহানবী সা.-এর হিজরত পূর্ব জীবন।
গ. মহানবী সা.-এর হিজরতোত্তর জীবন।

অন্যান্য পরীক্ষা ১৯৮২-৮৩ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচী অনুকরণে অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামিক স্টাডিজ
বিএ (সম্মান) পাঠ্যসূচী
শিক্ষা বর্ষ : ১৯৮৬-৮৭

পরীক্ষা : ১৯৮৭

১ম বর্ষ : পাঠ্যসূচী ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষা বর্ষের পাঠ্যসূচীর অনুরূপ।

২য় বর্ষ : পাঠ্যসূচী ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষা বর্ষের পাঠ্যসূচীর অনুরূপ।

৩য় বর্ষ : পাঠ্যসূচী ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষা বর্ষের পাঠ্যসূচীর অনুরূপ।

৪র্থ পত্র : আল ফিকহ, উসূলুল ফিকহ ও তারিখুল ফিকহ
ক. আল হিদায়া-কিতাবুয যাকাত ও কিতাবুল বুয়ু
খ. নূরুল ইজমা ও কিয়াস।

৫ম পত্র : আল হাদীস, উসূলুল হাদীস ও তারিখুল হাদীস।
ক. জামিউত-তিরমিযী-আবওয়াবুস সালাত।
খ. মুকাদ্দামাতুস-শায়খ।

৬ষ্ঠ পত্র : তাফসীর, উসূলুত তাফসীর ও তারিখুত তাফসীর।
ক. আল কাশশাফ-সূরা আনফাল।
খ. আল ইতকান, অধ্যায়- ৮, ৪২ ও ৮০।

৭ম পত্র : আল কালাম, তারিখুল আদিয়ান ও মুসলিম দর্শন।
ক. আবু বকর জাবির আল জাযায়েরী মিনহাজুল মুসলিম ১ম অধ্যায়।

৮ম পত্র : ইসলামের ইতিহাস
১. ক. খোলাফায়ে রাশিদা
খ. বনু উমাইয়্যা

---

১৪২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

গ. বনু আব্বাসীয়া
২. বাংলাদেশের মুসলিম শাসন[১৪৩]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ইসলামিক স্টাডিজ
বিএ (সম্মান) পাঠ্যসূচী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৮-৮৯

পরীক্ষা : ১৯৮৯

১ম পত্র : পাঠ্যসূচী ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচীর অনুরূপ। তবে ২য় পত্রের অথবা হিসেবে তাসাউফ ও মুসলিম দর্শন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২য় পত্র : পাঠ্যসূচী ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচীর অনুরূপ।

৩য় পত্র : পাঠ্যসূচী ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচীর অনুরূপ।

৪র্থ পত্র : ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের অনুরূপ তবে হেদায়া গ্রন্থে কিতাবুল বুয়ূ এর পরিবর্তে কিতাবুন নিকাহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫ম পত্র : ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের অনুরূপ।

৬ষ্ঠ পত্র : ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের অনুরূপ।

৭ম পত্র : আল কালাম ও তারিখুল আদিয়ান।

শরহুল আকাঈদ আন নাসাফ; 'সিফাতউল্লাহ' থেকে গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত।

৮ম পত্র : মুসলিম দর্শন

ক. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা।
খ. ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।
গ. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

অথবা

ইসলামের ইতিহাস।

১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের অনুরূপ।[১৪৪]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
এমএ (পূর্ব ভাগ) পাঠ্যসূচী
ইসলামিক স্টাডিজ
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৮-৮৯

পরীক্ষা : ১৯৮৯

১ম পত্র : আল হাদীস ও উসূলুল হাদীস। মান ১০০ নম্বর

- **নির্দেশিত গ্রন্থ** : আল তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত
- **শেখ আবদুল হক দেহলভী** : মুকাদ্দমা

২য় পত্র : আল-তাফসীর ও আল-কালাম। মান ১০০ নম্বর

---

১৪৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

১৪৪. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

- আল যামাখশারী : আল কাশশাফ, সূরা তাওবা (প্রথম অর্ধেক)
- আল তাফতাযানী : শারহুল আকায়েদুন নাসাফী। (দ্বিতীয় অর্ধেক)

৩য় পত্র : আল ফিক্হ, ওয়া উসূলুল ফিকহ। মান ১০০ নম্বর

- আল হিদায়াহ : কিতাবুন নিকাহ
- নূরুল আনওয়ার : ইজমা ও কিয়াস

চতুর্থ পত্র : ইসলামের ইতিহাস, মান-(৫০০-১২৫৮ সাল) মান ১০০ নম্বর
৫০০-১২৫৮ অথবা আরবী সাহিত্য। মান ১০০ নম্বর

- আল কুর'আন : সূরা আল মুমেনুন, সূরা হাশর
- হামাদানী-১ ও ৩ নং মাকামা
- দিওয়ানে আলী : প্রথম ১০০ পংক্তি

৫ম পত্র :

টিউটোরিয়াল	৫০ নম্বর
টার্মিনাল	২৫ নম্বর
মৌখিক	২৫ নম্বর

মোট = ১০০ নম্বর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
এমএ শেষ পর্ব

এমএ শেষ পর্ব সাধারণ শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে এমএ শেষ পরীক্ষা সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষে। নিম্নে এর পাঠ্যসূচী উল্লেখ করা হলো।

ইসলামিক স্টাডিজ
এমএ শেষ বর্ষ : ১৯৮৪-৮৫
পরীক্ষা বর্ষ : ১৯৮৫

১ম পত্র : আল হাদীস। মান ১০০ নম্বর
নির্দেশিত গ্রন্থ : আল বুখারী-বাবু বাদউল ওয়াহী, কিতাবুল মাগাযী।
মুসলিম-কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল হজ্জ।

২য় পত্র : আল হাদীস। মান ১০০ নম্বর
নির্দেশিত গ্রন্থ : সুনান আবু দাউদ-কিতাবুল সাওম, কিতাবুল আদব ও কিতাবুল জিহাদ।
শারহি মায়ানিল আছার-কিতাবুল বুয়ু, কিতাবুজ যিয়াদাত।

৩য় পত্র : আত তাফসীর। মান ১০০ নম্বর
নির্দেশিত গ্রন্থ : বায়দাবী-সূরা ফাতিহা এবং প্রথম পারার ১ম অর্ধেক।

৪র্থ পত্র : উলূমুল কুর'আন ও তারিখুল হাদীস। মান ১০০ নম্বর
নির্দেশিত গ্রন্থ : আল ইতকান-অধ্যায় : ৯, ১৬, ১৮, ৬৪, ৬৫, ৬৬ ও ৬৭।
মিফতাহুস সুন্নাহ।

৪র্থ পত্র : অথবা মুসলিম দর্শন। মান ১০০ নম্বর

Dhaka University Institutional Repository

৫ম পত্র : ১/টিউটোরিয়াল - ৫০ নম্বর
২/ টারমিনাল - ২৫ নম্বর
৩/মৌখিক - ২৫ নম্বর

- বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য টিউটোরিয়াল ও টার্মিনাল এর পরিবর্তে ৭৫ নম্বরের রচনা পত্র পরীক্ষা দিতে হতো।
- ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষে হাদীস দ্বিতীয় পত্রের তাহাবী থেকে কিতাবুল বুয়ু এবং কিতাবুয যিয়াদাত-এর পরিবর্তে কিতাবুন নিকাহ এবং কিতাবুত তালাক অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয় পত্রে কিতাবুন নিকাহ এবং তালাক বাদ দিয়ে পুনরায় কিতাবুল বুয়ু ও কিতাবুয যিয়াদাহ বহাল করা হয় এবং কিতাবুল হিবা এবং ছাদাকা সংযোজন করা হয়। এ ছাড়া একই বছর ১ম পত্রে বুখারী শরীফে কিতাবুর রিফাক বৃদ্ধি করা হয়।[১৪৫]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আরবী বিভাগ

১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালাভের অল্পকাল পরে আরবী এমএ শেষ পর্ব এবং আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ পাস ও সাবসিডিয়ারী ক্লাস খোলা হয়। তখন এ ক্লাসসমূহ পরিচালিত হতো ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তত্ত্বাবধানে। ১৯৬২ সালে আরবী, উর্দূ, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা বিভাগ নামে পৃথক সত্ত্বা লাভ করে।[১৪৬]

১৯৭৮-৭৯ শিক্ষাবর্ষে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ পৃথক বিভাগরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে ইসলামিক স্টাডিজ পৃথক হওয়ার পর আরবী এখন একক স্বয়ং সম্পন্ন বিভাগ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। আরবী সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ বিভাগের অবদান অনন্য। পবিত্র কুর'আন ও আল হাদীসের ভাষা আরবী, ফলে আরবীর সাথে ইসলামী শিক্ষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। নিম্নে আরবী বিভাগের পাঠক্রম উল্লেখ করা হলো।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আরবী বিভাগ
বিএ (সম্মান) পাঠ্যসূচী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭৩-৭৪

পরীক্ষাবর্ষ : ১৯৭৬

পাঠ্যসূচী (সংক্ষিপ্ত) :

১ম পত্র : প্রাচীন আরবী গদ্য। মান ১০০ নম্বর

১. আল কুর'আন : সূরা আল ফাত্‌হ ও সূরা ক্বাফ
২. মিশকাতুল মাসাবীহ : কিতাবুল ইল্‌ম। কিতাবুল জিহাদ, এ ছাড়া মাকামাতে হারিরী ও মাজানিউল আদবের অংশ বিশেষ।

২য় পত্র : প্রাচীন আরবী পদ্য। মান ১০০ নম্বর

মুয়াল্লাকা, হামাচা, বানাত সোয়াদ, দিওয়ানে মুতানাব্বি ও ইবনুল ফারেদের অংশ বিশেষ।

৩য় পত্র : আধুনিক আরবী গদ্য। মান ১০০ নম্বর

---

১৪৫. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এমএ শেষ বর্ষের সিলেবাস ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯।

১৪৬. বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯০-৯১, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ ০৬।

Dhaka University Institutional Repository

ফাদার রাফাইল-এর আল মুখতারাত, ড. তাহা হোসাইনের ২টি প্রবন্ধ, ফ্লিক হিট্রি, নাজিব হাদ্দাদ ও লুইচ শিখো এর একটি করে প্রবন্ধ।

৪র্থ পত্র : আধুনিক পদ্য। মান ১০০ নম্বর
আহমদ শাওকী এর দিওয়ান, হাফেজ ইবরাহীম-এর দীওয়ান ও আররুসাফী থেকে নির্বাচিত অংশ।

৫ম পত্র : ড্রামা ও নোভেল। মান ১০০ নম্বর
তাওফীক হাকীমের আহলুল কাহাফ, আব্বাস মাহমুদের 'সারা', জুরজী জায়দান-এর আল মান লুক আস সারেদ।

৬ষ্ঠ পত্র : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস। মান ১০০ নম্বর
আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ও আরবের রাজনৈতিক ইতিহাস, যথাক্রমে ৫০০-১২৫৮ সাল ও ৫০০-৭৫০ সাল।

৭ম পত্র : রেটেরিক, প্রসোডি। মান ১০০ নম্বর

৮ম পত্র : রচনা, ব্যাকরণ ও অনুবাদ। মান ১০০ নম্বর

৯ম পত্র : মৌখিক। মান ১০০ নম্বর

আরবী বিভাগ
বিএ (সম্মান) পাঠ্যসূচী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৪-৮৫

পরীক্ষা : ১৯৮৪
১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচীতে পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নিয়মাবলী ইসলামিক অনার্স পরীক্ষা পরিবর্তিত পাঠক্রমের অনুরূপ।

১ম পর্ব :
১ম পত্রের পরিবর্তিত পাঠ্যসূচী। 'আল হাদীস'

১. মিশকাতুল মাসাবীহ : কিতাবুল ইল্‌ম ও কিতাবুল জিহাদ। বাবুল ই'তিসাম।
২. ইলমুত তাজবীদ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
এমএ পূর্ব ভাগ
আরবী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পূর্বভাগ আরবী খোলা হয় ৭০-এর দশকে। মাদরাসা থেকে আলিম, ফাজিল পাস করে যারা আবার বিএ আরবী/ইসলামিক স্টাডিজ নিয়ে পাস করতো, সাধারণভাবে তারাই এ শ্রেণীতে ভর্তি হতো।

আরবী বিভাগ

এমএ (পূর্বভাগ) পাঠ্যসূচী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৫-৮৬

পরীক্ষাবর্ষ : ১৯৮৬
১ম পত্র : প্রাচীন ও আধুনিক গদ্য। মান ১০০ নম্বর
১. আল কুর'আন : তাফসীরে বায়দাবী- সূরা আর রহমান ও সূরা আল ফাত্‌হ।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল হাদীস : মিশকাত, কিতাবুল ইলম ও কিতাবুল জিহাদ এ ছাড়া আহমদ আল হাশেমী-এর আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ-এর নির্বাচিত প্রবন্ধ।

২য় পত্র : প্রাচীন ও আধুনিক গদ্য। মান ১০০ নম্বর

৩য় পত্র : রিটোরিক, প্রসোডি, রচনা ও অনুবাদ। মান ১০০ নম্বর

৪র্থ পত্র : ইসলামের ইতিহাস ও আরবী সাহিত্যের ইতিহাস। মান ১০০ নম্বর

১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ পাঠ্যসূচীর উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নি।

আরবী বিভাগ
এমএ শেষ বর্ষ পাঠ্যসূচী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭৫-৭৬

পরীক্ষা : ১৯৭৬

পাঠ্যসূচী (সংক্ষিপ্ত)
১ম পত্র : প্রাচীন ও আধুনিক গদ্য। মান ১০০ নম্বর
১. যামাখশারী : আল কাশশাফ, সূরা মুজাম্মিল।
২. তাজরীদুল বুখারী : কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল লিবাস ও কিতাবুল আদব।

২য় পত্র : প্রাচীন ও আধুনিক পদ্য- মান ১০০ নম্বর। লাবিদ ও তারাফার মুয়াল্লাকা, হাসান বিন সাবিত আবু তাম্মাম, আহমদ শাওকী, হাফেজ ইবরাহীম ও খলিল মিতরানের দীওয়ান থেকে নির্বাচিত অংশ।

৩য় পত্র : আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস। মান ১০০ নম্বর

৪র্থ পত্র : ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামিক সভ্যতা। মান ১০০ নম্বর

৫ম পত্র :

টিউটোরিয়াল	৫০ নম্বর
টার্মিনাল	২৫ নম্বর
মৌখিক	২৫ নম্বর

মোট = ১০০ নম্বর[১৪৭]

১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ পাঠ্যসূচীতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় নি।[১৪৮]

১৪৭. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের এমএ ১৯৭৫-৭৬ শিক্ষাবর্ষ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

১৪৮. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের এমএ ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষ ১৯৮২ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

গ. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবদান অনস্বীকার্য। বৃটিশ আমল থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন সময়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা হলেও তা বাস্তবায়িত হয় নি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের তরফ থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী উচ্চারিত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৭৬ সালের ১ ডিসেম্বর সরকারীভাবে দেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয় এবং দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ড. এম এ বারীকে সভাপতি করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করেন।

১৯৭৭ সালে ওআইসি-এর উদ্যোগে মক্কানগরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও পাকিস্তান এ তিনটি দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৯ সালে ড. এ এন এম মমতাজুদ্দীন চৌধুরীকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করেন। অবশেষে ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বৃহত্তর কুষ্টিয়া-যশোর জেলার শান্তি ডাঙ্গা, দুলালপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরের বছর ১৯৮০ সালে ৩১ জানুয়ারী তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক ড. এন এম মমতাজুদ্দীন চৌধুরীকে প্রথম উপাচার্য নিয়োগ করা হয়।[১৪৯] ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ :

সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় কলা ও সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে ইসলামী শিক্ষার সংযোগ ও সমন্বয় সাধন। নতুন আঙ্গিকে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও বিন্যাস্তকরণ। ইসলামের আলোকে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দেশে একটি সুসংহত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন। পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধকরণ।[১৫০]

মূলত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল প্রচলিত 'মাদরাসা শিক্ষা' এবং 'সাধারণ শিক্ষা'র মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। মাদরাসা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং অন্যান্য শিক্ষাঙ্গন থেকে আগত শিক্ষার্থীদের ইসলামী শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যাদেশে মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় সাধন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মাদরাসা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের জন্য ১০০ নম্বরের ইংরেজী এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১০০ নম্বরের 'আরবী ও ইসলামিয়াত' বাধ্যতামূলক থাকবে। ছাত্র-ছাত্রীদের অনার্স পাস করার জন্য এ কোর্সে ৩৩% নম্বর অবশ্যই পেতে হবে।

এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে শান্তি ডাঙ্গা, দুলালপুরে ক্যাম্পাস উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। এ সময় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকার পাশে কোথাও স্থাপনের দাবী আসতে থাকে। ফলে ৪ বছর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি স্থগিত থাকে।

---

১৪৯. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় সমাবর্তন স্মরনিকা ১৯৯৯, পৃ ৯-১০।

১৫০. সৈয়দ মুয়াজ্জম কমিশন, সুপারিশ নং-১, ২, ৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে ১৯৮৩ সালে এ এইচ এম এরশাদ সরকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় স্থানান্তর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দেন। এর পর ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে গাজীপুরের বোর্ড বাজারে ২টি অনুষদে ৪টি বিভাগে ৩০০ জন ছাত্র নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষে আল কানুন ওয়া আশ-শরীয়াহ বিভাগ এবং অর্থনীতি বিভাগ প্রবর্তনের মাধ্যমে মোট ৬টি বিভাগের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চলতে থাকে।

১৯৮৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলামকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দান করা হয়। তাঁর সময়ে ১৯৯০ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর থেকে আবার কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। এ সময় তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ প্রবর্তন করেন। তাঁর কার্যকালে প্রথম বারের মতো ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির রেওয়াজ চালু হয়।[১৫১] ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হিন্দু শিক্ষকও নিয়োগ করেন।

আল কুর'আন ওয়া 'উলূমুল কুর'আন বিভাগ
স্নাতক (সম্মান) শ্রেণী

১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকার অদূরে গাজীপুরস্থ ক্যাম্পাসে যে চারটি বিভাগ প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়, আল কুর'আন ওয়া 'উলূমূল কুর'আন তার অন্যতম। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কুর'আন চর্চা ও ও পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ ভারতীয় উপমহাদেশে এটাই ছিল প্রথম। এ বিভাগের বর্তমান নাম আল কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

পাঠদান পদ্ধতি :

প্রাথমিক অবস্থায় এ বিভাগে সনাতন পদ্ধতির পাঠক্রম প্রবর্তিত ছিল। শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবী ভাষা। তবে আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন শাখার সাথে এর গভীর সংযোগ এবং সমন্বয় ছিল। এ বিভাগে তিন বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স সমাপ্তির জন্য নিম্ন বর্ণিত ১৫ শত নম্বরের পরীক্ষায় পাস করতে হতো।

১. ইংরেজী	১০০ নম্বর
২. সাবসিডিয়ারী	৬০০ নম্বর
৩. অনার্স	৮০০ নম্বর
মোট	= ১৫০০ নম্বর

পাঠ্যসূচী : এ বিভাগের পাঠ্যসূচী বিশ্ববিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর আলোকে প্রণীত।[১৫২] অনার্স শ্রেণীর জন্য তিন বৎসরের ৮টি পত্রের পাঠ্যসূচী নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১৫১. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় সমাবর্তন স্মরনিকা ১৯৯৯, পৃ ১১।

১৫২. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

العام الدراسي٧٨-١٩٨٦م

(مقرر الورقة الآلي (التفسير)

ا ؤلا يدرس الأستاذ للطلاب الأمور التا ليه

ا. = أهمية القران في حيواة الانسان-

ب. = تاريخ جمع القران وتد وينة-

ج. = اسلوب التفسير الذي اختاره المفسرون في تفا سيرهم-

د. = الفرق بين التفسير والتاويل-

و. = اسماء الكتب من التفاسير الهامة وتراجم المفسرين اختصارا -

إلكتب المقررة

١ = آبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري : الكشاف عن حقائق غوامز التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل- من حيث البلاغة و الأعجاز-

تفسير جزء الم-

٢ = سيد قطب؛ في ظلال القران -المقدمة وتفسير سورة الفاتحة-

٣ = العلامة الشوكاني : فتح القدير : تفسير سورة محمد (ص)

الورقة الثانية من المادة التخصيصية :(التفسير)

المقررات الدراسية :

١ = آبو عبد الله بن احمد الأنصاري القرطبي ؛ الجامع لاحكام القران - تفسير سورة العمران -

٢ = الشيخ محمود شلتوت: تفسير القران الكريم-

تفسير سورة النساء-

Dhaka University Institutional Repository

الورقة الثالثة : علوم القرآن

مامعنى علوم القرآن وما هو الغرض من مذه الدراسة وما معنى مميزا نها والأبحاث آلتى تتعلق بها. ويدرس الطلاب الموضوعات التالية:

حكمة نزول القرآن مفرقا، معرفة أسباب النزول - جمع القرآن وترتيبه : التفسير، التفسير بالرواية و التفسير بألد راية و التفسير الإشاري - طبقات المفسرين واشهر المفسرين من الصحابة التابعين - اعجاز القرآن القواعد المهمة آلتي يحتاج المفسر آلي معرفتها - العلوم المستنبطة من القرآن، شروط المفسرو آدابه-

نزول القرآن على سبعة احرف و القرأت الشهورة-

الورقة الرابعة: فقه القرآن.

يد رس القرآن من حيث هو صدر للشريعة ودستور للمسلمين و منهاج يسيرون عليه فى حياتهم- فيعطى الاستاذ فكرة و اضحة بضوء أيات القرآن على الموضوعات التالية-

العقيدة و العبادة والمعا ملة والمعاشرة-

علاقة المسلمين فيما بينهم-

النظام الا قتصادى-

نظام الأسرة-

نظام الجهاد-

نظام الحرب والمعاهدة-

نظام الجناية والقضاء-

Dhaka University Institutional Repository

الورقة الخا مسة : (الحديث واصول الحديث)

الف : "الجامع الصحيح للبخارى" :

(١)باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم-

(٢)كتاب الإيمان-

(٣)كتاب العلم-

(٤)كتاب الصلواة-

(٥)كتاب الزكوة-

ب: من "الصحيح لمسلم"

(١)كتاب الجهاد والسير-

ج : من شرح معانى الاثار للطحاوى :

(١)باب الماء يقع فيه النجاسة . (٢) باب سؤرالكلب. (٣) باب الا ذان. (٤) باب المشى فى الجنازة كيف هو. (٥) باب الرجل يصلى على الميت.

المورقة السادسة : التوحيد والكلام-

يعطى الأستاذ فكرة على الموضوعات:

أ = تعريف التوحيد واهميتة و العلا قة بينه ربين العقيدة-

ب = انواع التوحيد : توحيد الربوبية، توحيد الألو هية ، توحيد الأسماء والصفات - كلمة التوحيد وشروطها-

ج = الشرك و انواعه-

د = الاعمال الشركية فى المجتمع-

ه = النفاق و انواعه

Dhaka University Institutional Repository

و = الشفاعة و شروطها و انواعها –

ز = التوسل و أنواعه –

ح = عقيدة آهل السنة و الجماعة :–

في باب الأسماء و الصفات– في باب القدر و أفعال العباد بين الجبرية و القدرية – في باب الأيمان بين الخوارج و الرزجية–

ط = زيارة القبور–

ى = معراج النبي صلى الله عليه و سلم–

الورقة السابعة : تاريخ الإسلام

أ = العرب قبل الإسلام: وصف بلاد العرب، الشعرب العربية، الحالة الاجتماعية، الحالة الادبية، الحالة الدينية– الحالة السياسية– الحالة الاقتصادية–

ب = البعثة النبوية–

ج = الخلفاء الراشدون –

هـ = الخلفاء الأمويون –

الورقة الشامنة :

(١) الأديان والفرق والاتجاهات الفكرية

أولا: الاديان و الفرق

١ = الإسلام –

٢ = اليهودية

٣ = النصرانية –

٤ = الهندوكية

Dhaka University Institutional Repository

ثانيا : الاتجاهات الفكرية المعاصرة

أ = الاشتراكية والشيوعية و الما ركسية –

ب = الراسمالية–

ج = الاستشراق –

د = التبشير –

هـ = العلمانية –

و = وسائل الاعلام و التعليم و تحرير المراة –

ز = القومية - ১৫৩

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

আল কুর'আন বিভাগের ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষা বর্ষের পাঠ্যসূচী হতে ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

১ম পত্র اسلوب التفسيرى الذ اختاره المفسرون في تفاسير هم এবং تاريخ جمع القران وتد وينه -এ শিরোনাম দুটি কমানো হয়েছে। تفسير ابن كثير এর পরিবর্তে ياره الم থেকে تفسير كشاف থেকে سوره المائره অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২য় পত্র : تفسير القران الكريم থেকে سوره النساء-এর পরিবর্তে تفسير الكشافا থেকে سوره الرحمن অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩য় পত্র : العلوم المستنبه من القران এবং القواعد المهملة آلتي يحتاج المفسرن إلى معرفتها -এ শিরোনাম দুটি কমানো হয়েছে।

৪র্থ পত্র : এ পত্রের বিষয়গুলোকে ঠিক রেখে ৪টি শিরোনামে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

১৫৩. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আল কুর'আন ওয়া 'উলূমুল কুর'আন বিভাগের পাঠ্যসূচী ১৯৮৬-৮৭। দ্র. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৬-৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম পত্র : بخارى شريف এর চারটি অধ্যায় রেখে كتاب العلم কমানো হয়েছে।

৬ষ্ঠ পত্র : এ দুটি পত্রে কোন পরিবর্তন নেই।

৮ম পত্র : البوذيه শিরোনামটি বৃদ্ধি করা হয়েছে।[১৫৪]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
আল কুর'আন ওয়া উলূমুল কুর'আন
স্নাতকোত্তর শেষ পর্ব

স্নাতকোত্তর শেষ পর্ব এক বৎসর মেয়াদী কোর্স। বৎসর শেষে চারটি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা দিতে হতো। ৫ম পত্র মৌখিক, টিউটোরিয়াল এবং টার্মিনাল।

মান বণ্টন :

১. লিখিত পরীক্ষা - ৪০০ নম্বর

২. টিউটোরিয়াল - ৫০ নম্বর

৩. টার্মিনাল - ২৫ নম্বর

৪. মৌখিক - ২৫ নম্বর

মোট = ৫০০ নম্বর

লিখিত পরীক্ষার চারটি বিষয়ের পাঠ্যসূচী শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৮-৮৯

١ – الورقة الاولى : التفسير

الكتب المقررة: ١ – أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى : جامع البيان عن تاويل أى القران سورة " ق"

ب – محمد الرازى بن ضياء الدين عمر: مفاتيح الغيب سورة النازعات و العلق

ج – أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى : معالم التنزيل سورة السجدة و لتمان و الفتح

٢ – الورقة الثانية : مناهج المفسرين

الكتب المقررة : ١– د. محمد حسين الذهبى : التفسير و المفسرون–

১৫৪. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আল-কুর'আন ওয়া 'উলূমুল কুর'আন বিভাগের পাঠ্যসূচী ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

٣ – **الورقة الثالثة** : ١ – الحديث الشريف وعلم الجرح التعديل

أ – الحديث الشريف : الكتب المقررة : ٦٠

١ – محمد بن اسما عيل البخارى : الجامع الصحيح : كتا ب التفسير –

٢ – أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى: الجامع : كتاب التفسير

ب – علم الجرح و التعديل : ٤٠

١ – نشأة علم الجرح و التعديل

٢ – أسباب الجرح و التعديل

٣ – مراحل الجرح و التعديل–

٤ – نتائج الجرح و التعديل–

٥ – موقف العلماء تجاه هذه الفتنة –

٦ – ترجمة وجيزة عن عشر ين شخما من المشهوين بالوضع و الكذب

٧ – ترجمة وجيزة عن عشرة من الإعلام الموثو قين في الجرح و التعديل–

الورقة الرابعة علوم القران ومنا هج البحث

مناهج البحث – كتابه البجث والرسالة :

* أهمية البحث و الرسالة
* غاية البحث و الرسالة
* تعريف البحث و الرسالة
* اعطاء المعلومات حول كتابة البحث! الرسالة –
* اعداد شخصية الباحث ونمو مواهبه في انشاء البحث

٢ – تحقيق النصوص والمخطوطات

* أهمية تحقيق النصوص و المخطوطات
* غاية تحقيق النصوص و المخطوطات
* التراث الاسلامى و مدى أهميته

Dhaka University Institutional Repository

(ب) علوم القرآن: ٥٠

١ – ترجمة معاني القرآن الكريم باللغات الأجنبية

٢ – شبهات مزعومة حول القرآن الكريم و الرد عليها

٣ – الوحى و أنواعه

٤ – علم الناسخ و المنسوخ

٥ – علم أسباب النزول [১৫৫]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
উলূমুত তাওহীদ ওয়াদ দাওয়াহ বিভাগ
স্নাতক (সম্মান) শ্রেণী

১৯৮৬ সালের ২৮ জুন যে চারটি বিভাগ নিয়ে গাজীপুরস্থ ক্যাম্পাসে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়, উলূমূত তাওহীদ ওয়াদ দাওয়াহ তার একটি। এ বিভাগের বর্তমান নাম-দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

পাঠদান পদ্ধতি

এ বিভাগের পাঠদান পদ্ধতি হুবহু আল কুর'আন ওয়া 'উলূমুল কুর'আন বিভাগের অনুরূপ ছিল।

পাঠ্যসূচী

১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে প্রথম এ বিভাগের পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়, অনার্স শ্রেণীর জন্য তিন বছরের ৮টি পত্রের পাঠ্যসূচী নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

---

১৫৫. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আল-কুর'আন ওয়া 'উলূমুল কুর'আনের স্নাতকোত্তর শেষ পর্বের ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

العام الدراسى ١٩٨٦-١٩٩٠ م

مقرر الورقة الأولى : (التفسير و أصول التفسير)

أولا - (التفسير) :

يناقش الأستاذ آي القرآن الكريم والسور التي تتعلق بعقائد الإسلام الأساسية من التوحيد و الرسالة و البحث و الجزاء و خاصة تفير سورة الفاتحة و سورة الإخلاص و سورة الأنعام و سورة إبراهيم و سورة الأنبياء، و سورة ق وسورة الملك سورة الواقعة و سورة النبأ وسورة النازعات و سورة المطففين و سورة البروج و سورة القدر وسورة البينة و سورة القارعة و سورة العصر.

ثانيا: (أصول التفسير)

يدرس الأستاذ من مادة علوم القرآن الأمور التالية :

أ - تعريف القرآن، الفرق بينه و بين الأحاديث القدسية و الأحاديث النبوية -

ب - مقاصد القرآن الكريم : الهداية و الأعجاز و التعبد -

ج - الوحي : تعريف و إمكان و ثبوته و اقسامه -

د - المكي و المدني، من القرآن، تعريف كل منها مع بيان الضوابط و الخصائص -

هـ - نشأة علوم القرآن و تطورها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و الصحابة و التابعين رضوان الله عليهم أجمعين.

و - التفسير و التأويل : تصريف كل منهما و الفرق بينهما.

ز - القضايا الهامة التي عولجت في القرآن الكريم.

الورقة الثانية من المادة التخصصية :

(الحديث و أصول الحديث)

لابد من تزويد الطلاب بفكرة عامة عن الحديث وعلومه ليوهل الطلاب بما يعينهم على فهم السنة و مكانتها ويمكنهم من دفع الشبهات آلتي تلقيها أعداء الإسلام ليشككوا في السنة ويحا ولوا نقصر قد رها وأهميتها-

Dhaka University Institutional Repository

هـ – النفاق و انو أعه–

و – ألشفا عة شروطها و انو أعها –

د – التوسل و انو أعه –

ح – عقيدة اهل السنة و الجماعة :

في باب الأسماء و الصفات – في باب القدر و أفعال العباد بين الجبرية و القدرية – في باب الايمان بين الخوارج و المرجئيه–

الورقة الرابعة : (الفقة و اصول)

أولا : دراسات فقهية.

التمهيد : التعريف بالفقه والعلاقة بينه وبين العلوم الشرعية الأخرى، نبذة عن المراحل التاريخية آلتي مربها هذا العلم. يعطى الأستاذ طلابه فكرة واضحة عن التالية :

١ – العبادات:

أ – الصلاة : أهميتها وحكم تاركها، صلاة الجماعة، أحكام، صلاة المسافر و المريض.

ب – الزكاة، الأموال آلتي تجب فيها الزكاة، نصاب الزكاة و مصارفها –

جـ – الصوم، أهميته أنواعه، أحكامه و فوائده –

د – الحج و العمرة، حكمهما و طريقهما –

٢ – أحكام الأسرة :

أ – النكاح، أحكامه و المحرمات من النساء–

ب – الطلاق تعريفه و أقسامه، الخلع، الظهار، الرجعة و العدة –

نيا : دراسة أصولية.

التمهيد : التعريف بأصول الفقه، موضوعه و أغراضه وقائد ته منشأته و تطوره –

يعطى الأستاذ طلابه فكرة عن الأمور التالية :

أ – الأحكام الشرعية: الفرض، الواجب، المندوب، الحرام و المكروه، القضاء والإعادة –

Dhaka University Institutional Repository

ب – أصول الشرع: الكتاب و السنة و الإجماع و القياس –

ج – الاجتهاد : تعريفه، شروطه ومراتبه–

الورقة الخامسة : (تاريخ الدعوة و الدعاة)

التمهيد : أ – التعريف بالدعوة و بيان الحاجة إليها –

ب – التعريف بتاريخ الدعوة –

الدعوة و الدعاة قبل البعثة المحمدية :

أ = آدم – نوح – إبراهيم – موسى – عيسى عليهم السلام –

ب = أسس عقيدة التوحيد –

ج = الإسلام دين جميع الرسل و الأنبياء –

د = اثر العقيدة الصحيحة و العقائد في حياة الأفراد و الأمم –

هـ = الشرائع السماوية و مطابقتها بظروف الأمم–

دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم :

أ = موجز عن حاله العرب قبل البعثة النبوية–

ب = قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة و بيان الظروف آلتي أحاطت به –

ج = مواقف الشركين من الدعوة الإسلامية قبل الهجرة و ثبات الرسول و المسلمين عليها –

د = نتائج الدعوة في المرحلة المكية –

هـ = نتائج الدعوة في المر حلة المدنية –

و = مواقف اليهود و آلمنا فقين و المشركين من الدعوة بعد الهجرة –

ز = انتصارات الرسول في هذه المرحلة –

ح = نبذه عن حياة أجلة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين –

الدعوة الإسلامية في عصر الصحابة و التابعين :

أ = موجز لأعمال الخلفاء الراشدين في توسيع دعوة الإسلام–

ب = موجز لأعمال الدعوة في العصر الأموي –

Dhaka University Institutional Repository

الدعوة في عصر العباسيين :

أ – جهود الدولة في العصر العباسي الأول في نشر الدعوة –

الورقة السادسة: (الأديان والفرق / الملل و النحل)

أولا : (الأديان)

المقدمات:

أ – مفهوم كلمة الدين و الملة و النحلة–

ب – حاجة الإنسان إلى الدين –

جـ – أهمية دراسة الأديان للداعية –

د – علم تاريخ الأديان ونقده –

هـ – الخريطة الدينية للعالم الإسلامي –

ثانيا : (دراسة تحليلية لبعض الأديان الوضعية)

أ – الوثنية

ب – البودية

جـ – الزردشتية

د – الهذوليه

هـ – المانرية

و – المزدكية

ز – البهائية

ثالثا: (الأديان السماوية المتحرفه)

أ – اليهودية، تاريخها، مصاد رها، معتقداتها الباطلة.

ب – بنو إسرائيل في ضوء القرآن الكريم.

جـ – النصرانية ،مصادرها، معتقد آتها في ضوء كتب النصارى الموجودة حاليا. التثليت وبطلانه.

فرق النصارى: (النصطوريون، اليعقوبيون، الارثوذ كسية، الكاثوليكية و البر و تستانية.

Dhaka University Institutional Repository

رابعا: الفرق على الإسلام

أ – الشيعة و الفرق المندرجة تحتها

ب – القاديانية

جـ– الخوارج

الورقة السابعة: (الاتجاهات الفكرية المعاصرة)

١. التمهيد:

أ – تعريف الاتجاهات الفكرية المعاصرة.

ب – أهمية دراسة الاتجاهات الفكرية المعاصرة.

٢. الغزو الفكري للعالم الإسلامي و دعائمه:

أ – الاستعمار الغربي و الشرقي قديما وحديثا.

ب – الاستشراق.

جـ – التبشير.

د – المنح الدراسية.

هـ – وسائل الوعلام.

و – التعليم وتحرير المرأة.

أصد اف العزو الفكري المعاصر للعالم الإسلامي–

٣. دراسة تحليلية نقدية لأهم الاتجاهات الفكرية المعاصرة مع بيان موقن الإسلام فيها:

أ – الاشتر اكيةو الشيوعية و الماركسية –

ب – الرأسمالية –

جـ – العلمانية –

د – القومية اللخوية و القومية الوطنية –

هـ – الداروينية –

و – البراجماتية –

Dhaka University Institutional Repository

ز – مدرسة التحليل النفسي –

حـ – المدرسة الروحية –

ط – الوجودية –

٤. دراسة تحليلية نقدية لبعض الجمعيات و الحركات المعاصرة :

أ – الصهيونية –

ب – الماسونية –

جـ– المنظمات الصهيونية الأخرى على اسم الخدمات الإنسانية.

الورقة الثامنة : (حاضر العالم الإسلامي)

أ – التمهيد : التعريف بالعالم الإسلامي الحاضر.

٢. وضع العالم الإسلامي الحاضر

ا – الوضع السياسي و الاقتصادي للعالم الإسلامي الحاضر –

ب – الوضع الاجتماعي و الثقافي للعالم الإسلامي الحاضر –

جـ – التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي الحاضر –

د – حركات البعث الإسلامي في القرن الحالي –

هـ – مسئولية المسلمين لمواجهة التعديات و تطوير العالم الإسلامي.

و – وضع المسلمين في دول الاقليات المسلمة - [১৫৬]

১৫৬. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, উসুলুত তাওহীদ ওয়াদ দাওয়াহ বিভাগের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর জন্য প্রণীত পাঠ্যক্রম ১৯৮৬-৯০ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
উলূমুত তাওহীদ ওয়াদ দাওয়াহ
স্নাতকোত্তর শেষ পর্ব

স্নাতকোত্তর শেষ পর্ব এক বছর মেয়াদী কোর্স। বছর শেষে চারটি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা দিতে হতো। ৫ম পত্র ছিলো মৌখিক ও টিউটোরিয়াল।

মান বণ্টন

১.	লিখিত পরীক্ষা	- ১০০ নম্বর
২.	টিউটোরিয়াল	- ৫০ নম্বর
৩.	মৌখিক	- ৫০ নম্বর
	মোট	= ৫০০ নম্বর

অথবা

দুইটি লিখিত পত্র	২০০ নম্বর
নির্দিষ্ট শিরোনামে গবেষণাপত্র	২০০ নম্বর
মৌখিক	১০০ নম্বর
মোট	= ৫০০ নম্বর

লিখিত পরীক্ষার চারটি বিষয়ের পাঠ্যক্রম

الورقة الأول :– تفسير القرآن الكريم رايات ألاحكام يدرس

الطلاب من القران الكر بم السور المدينة وخاصة السور التالية :–

سورة النساء سورة المائدة، سورة الأعراف، سورة الأنفال – سورة التوبة، سورة النور، سورة الحجرات

في ضوء كتب التفاسير –

الورقة الثانية :(النظم الإسلامية)

يدرس الطلاب منها مايلى من النظم .

أ – النظام السياسي والإداري،

ب – الحسبة –

الورقة الثالثة : (الإسلام في مواجهة ألا فكار الهدامة)

يدرس الطلاب دراسة تحليلة تقدية للأفكار الحديثة الهدامة وموقف الإسلام منها و خاصة

مايلى من الأفكار –

Dhaka University Institutional Repository

أ - الاشتراكية والشيوعية والماركسية -

ب - الرأسمالية -

ج - العلمانية -

د - حركة التغريب في العالم الإسلامي وخاصة في تركيا - والهند الدول العربية وإيران-

هـ - القومية الوطنية والقومية اللغوية و أثارهما السيئة في المجتمع الإسلامي-

و - الدار ونية وموقف الاسلام منها -

ز - المدرسة الروضيه وصرية الحليل النفسى -

ح - الصهيونية والماسونية و المؤسسات العالمية آلتي ترتبط معها -

ط - حركة التبشير والمؤسسات التبشير ية -

ى - الدعوة الي السفور وحركة تحرير المرأة -

الورقة: الر ابعه (أ) - (تاريخ الثقافة الإسلامية)

* دراسة تحلو ملة نقدية لا وضاع لمجتمعات المختلفة قبل الإسلام -
* دور الإسلام في إنقاذ البشرية من الضلالة وتحريرهم من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق -
* دور قيادة الإسلام و تأثيرها في الحياة العامة -
* دراسة تحلياة عن الضعف في العالم الإسلامي والأسباب ورائها-
* فشل الثقافة الغربية و حاجة الإنسانية للرجوع إلى الإسلام من جديد -

الو رقة الرابعة - "ب" :- (الفلسفة الإسلامية)

(١) دراسة تحلياة تقفية لا هم المدارس الكلامية في الإسلام و خاصة ألا شاعرة و الماتر بدية والمعتزلة -

(٢) الإسلام و فلسغة التصوف و تطور هده الفلسفة عبر القرون -

(٣) دراسة و نقد لحياة الفلاسفة المسلمين و أعمالهم الفاسفة-

و خاصة الكندي، و الفاربى، وابن سينا والغز إلى وابن عربي وابن رشد وابن خلدون وحكيم الشرق العلامة إقبال -

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

আল কানুন ওয়াশ শরীয়াহ বিভাগ

১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুরস্থ ক্যাম্পাসে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে থিওলোজী এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের অধীনে এ বিভাগ পরিচালিত হতো। (বর্তমানে আইন ও শরীয়াহ নামে প্রবর্তিত অনুষদের অধীনে একক বিভাগ হিসেবে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ বিভাগের বর্তমান নাম আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ)।

এ বিভাগ ৪ বছর মেয়াদী এল এল বি ডিগ্রী ও এক বছর মেয়াদী এল এল বি ডিগ্রী প্রদান করে। সনাতন ও সেমিস্টার উভয় পদ্ধতিতে এর পাঠদান ও পরীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। পাঠদানের মাধ্যম ইংরেজী ও বাংলা ব্যবহৃত হয়। এ বিভাগের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী নিম্নরূপ :

DEPARTMENT OF LAW & MUSLIM JURISPRUDENCE

The Papers (Course) proposed in this syllabus are as follows :

Paper I. Legal Philosophy and Jurisprudence

Paper II. Muslim Personal Law (Ibaadaat)

Paper III. Muslim Social Law (Mu'amalaat)

Paper IV. Politics and Constitutional Law

Paper V. Roman Law and Hindu Law

Paper VI. Law of Contract and Tort

Paper VII. Equity, Trust and Transfer of Property

Paper VIII. Land Laws of Bangladesh Registration and Public Demands Recovery Acts Paper

Paper IX. Company Law. Other Business Law and Mercantile Law

Paper X. Civil Procedure and Specific Relief Act

Paper XII. Law of Crimes and Criminal Produture

Paper XIII. Islamic Criminal Law

Paper XIV. Public International Law and International Relations

Paper XV. Islamic International Law and Relations

Paper XVI. Law of Evidence & Limitation Ghazipur Bangladesh.

পর্যালোচনা

ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী পর্যবেক্ষণ করে যে কোন ইসলাম প্রিয় শিক্ষানুরাগীর মনে আশার আলো সঞ্চারিত হবে। মাদরাসার যোগ্য ছাত্ররা আলিম পাস করে ইসলামী শিক্ষার উচ্চস্তরে অগ্রসর হচ্ছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ পাঠ্যসূচী উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন না হলেও আশাব্যঞ্জক। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এর মানোন্নয়নে আরো আন্তরিক ও তৎপর হবেন-এটাই জাতির প্রত্যাশা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে। চট্টগ্রাম শহর থেকে ১২ মাইল উত্তরে ১৩ শত ৫০ একর জমির উপর পাহাড় ঘেরা এক মনোরকম পরিবেশে এ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ক্ষুদ্র পরিসরে আরম্ভ হয়ে ১৯৯০ সালে এর অনুষদ সংখ্যা ছিল ৭টি, বিভাগ ২১টি, ইনস্টিটিউট ২টি, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৯৯৭ জন, গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা ছিল ১, ৪৮, ৯৫১ টি এবং অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ছিল ১৩০টি।[১৫৭]

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অন্যতম বিভাগ। ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এ বিভাগের অবদান অনস্বীকার্য। বিভাগীয় শিক্ষকগণের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় এ বিভাগে ইসলামিক স্টাডিজ অনার্স খোলা হয়েছে ৮০'র দশকে। এখানে ইসলামিক স্টাডিজ অনার্স ক্লাসসমূহের পাঠ্যসূচী পেশ করা হলো :

আরবী ও ইসলামিক বিভাগ
ইসলামিক স্টাডিজ
বিএ (সম্মান) পাঠ্যসূচী

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৮-৮৯

গ্রুপ-'এ'

(তিন বছর মেয়াদী নয়টি পত্রে মোট নয়শত নম্বর)

১ম বর্ষ : ২২০ নম্বর

১ম পত্র : আল কুর'আনুল কারীম ১০০ নম্বর

নির্দেশিত গ্রন্থ

আল কুর'আন, সূরা আন নূর, আল ফাত্হ এবং আল-হুজরাত।

২য় পত্র : আল হাদীস ১০০ নম্বর

নির্দেশিত গ্রন্থ

ক. তিরমিযী : আল জামে', আবওয়াবুস সালাত।

খ. শায়খ আবদুল হক : মুকাদ্দমা।

গ. ইবন হাজার : নুখবাতুল ফিক্র।

২য় বর্ষ : ২১০ নম্বর

৩য় পত্র : ইলমুত তাফসীর ১০০ নম্বর

নির্দেশিত গ্রন্থ

ক. জামাখশারী-আল কাশশাফ : সূরা আনফাল।

খ. সূয়ূতী-আল ইতকান-৮, ৪২ ও ৮০ অধ্যায়।

৪র্থ পত্র : ইলমুল ফিক্হ ১০০ নম্বর

নির্দেশিত গ্রন্থ :

ক. মুরগেনানী-হেদায়া-কিতাবুয যাকাত ও কিতাবুল বুয়ূ।

খ. আহমদ মুল্লাজিউন-নূরুল আনওয়ার : ইজমা কিয়াস।

গ. মুফতী আমীমুল ইহসান-তারিখ ইলমুল ফিক্হ, টিউটোরিয়াল ও মৌখিক ১০+১০= ২০ নম্বর

৩য় বর্ষ : ৪৬০ নম্বর

৫ম পত্র : আরবী সাহিত্য ১০০ নম্বর

---

১৫৭. খ ম আবদুল আউয়াল সম্পাদিত, বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯০, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ১৯৯১, পৃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ পত্র : আস সীরাতুন্নববীয়্যাহ ১০০ নম্বর
   ক. ইসলাম পূর্ব আরব।
   খ. মহানবীর হিজরত পূর্ব জীবন।
   গ. মহানবীর হিজরতত্তোর জীবন।

৭ম পত্র : আল-কালাম ওয়া তারিখুল আদিয়ান ১০০ নম্বর।

নির্দেশিত গ্রন্থ

তাফতাজানী : আল-আকাঈদ আন নাসাফী। অধ্যায়-সিফাতুল্লাহ থেকে শেষ পর্যন্ত।

৮ম পত্র : ইসলামের ইতিহাস।
   ক. খোলাফায়ে রাশিদা।
   খ. বনু উমাইয়্যাহ।
   গ. বনু আব্বাসীয়া।

৮ম পত্র : ইসলামী আদর্শবাদ।

টিউটোরিয়াল   ৩০ নম্বর
মৌখিক   ৩০ নম্বর
মোট ৬০ নম্বর

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

গ্রুপ-'বি'

ইসলামিক স্টাডিজ (সম্মান) পাঠ্যসূচী

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৯-৯০

পরীক্ষাবর্ষ : ১৯৮৯-৯০ ইসলামিক স্টাডিজ অনার্স-এর ১ম পর্ব, ২য় পর্ব ও ৩য় পর্বের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী হুবহু ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষের অনুরূপ।[১৫৮]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আরবী

আরবী বিভাগের পাঠ্যসূচী ইসলামী শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে এখানে সংক্ষিপ্ত করণার্থে আরবী পাঠ্যসূচীভুক্ত কুর'আন ও হাদীস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের শুধু পত্র শিরোনাম উল্লেখ করা হলো।

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

আরবী বিএ (সম্মান) কোর্স পাঠ্যসূচী

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৪-৮৫

(তিন বছর মেয়াদী নয়টি পত্রে মোট নয়শত নম্বর)

১ম বর্ষ : ২২০ নম্বর

১ম পত্র : প্রাচীন গদ্য ১০০
   ক. আল কুর'আন-সূরা হাক্কাহ, মুজাম্মিল ও নাবা।
   খ. আল হাদীস-তাজরীদুল বুখারী থেকে (কিতাবুল মাগাজী) বাবুল উসায়রা থেকে কিসসাতু বনী নজীর।

২য় পত্র : প্রাচীন গদ্য ১০০ নম্বর

টিউটোরিয়াল ও মৌখিক ১০+১০=২০ নম্বর

২য় বর্ষ : ২২০ নম্বর

৩য় পত্র : আধুনিক গদ্য

৪র্থ পত্র : আধুনিক পদ্য

টিউটোরিয়াল ও মৌখিক ১০+১০ = ২০ নম্বর

---

১৫৮. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় বর্ষ : ৪৬০ নম্বর

৪ম পত্র : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ১০০ নম্বর

৬ষ্ঠ পত্র : ব্যাকরণ ও বাক্য রচনা।

৭ম পত্র : সাহিত্য সমালোচনা, আরবী রচনা, অনুবাদ ও কম্পোজিশন।

৮ম পত্র : 'এ' ড্রামা ও ছোট গল্প।

৮ম পত্র : 'সি' মুসলিম দর্শন।

টিউটোরিয়াল ও মৌখিক- ৩০+৩০ = ৬০ নম্বর।[১৫৯]

আরবী (সম্মান) পাঠ্যসূচী

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৬-৮৭

১ম বর্ষ : ১ম পত্র - আল কুর'আনুল কারীম।

ক. আল কুর'আন : শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৪-৮৫-এর অনুরূপ।

খ. আল হাদীস : তাজরীদুল বুখারী, কিতাবুত তাফসীর ১ম থেকে ২০টি হাদীস।

অন্যান্য পত্রের শিরোনাম শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৪-৮৫ এর অনুরূপ।[১৬০]

আরবী (সম্মান) পাঠ্যসূচী

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৮-৮৯

১ম বর্ষ : ১ম পত্র : আল কুর'আনুল কারীম।

ক. আল কুর'আন : সূরা আল ফাতাহ, আল হুজরাত ও মুজাম্মিল।

খ. আল হাদীস : তাজরীদুল বুখারী-কিতাবুল ঈমান ও কিতাবুল মাগাজী।

অন্যান্য পত্রের শিরোনাম শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৬-৮৭ এর অনুরূপ।[১৬১]

আরবী (সম্মান) পাঠ্যসূচী

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৯-৯০

পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৮-৮৯ এর অনুরূপ।[১৬২]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

এমএ (প্রিলিমিনারী) পাঠ্যসূচী

আরবী

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৫-৮৬

১ম পত্র : প্রাচীন ও আধুনিক গদ্য

নির্দেশিত গ্রন্থ

ক. আল কুর'আন : সূরা লুকমান ও সূরা হুজরাত।

খ. আল হাদীস : রিয়াদুস সালেহীন-কিতাবুত তাফসীর ১ম থেকে ২০টি হাদীস।

২য় পত্র : প্রাচীন ও আধুনিক পদ্য।	১০০ নম্বর
৩য় পত্র : গ্রামার, রিটোরিক, প্রসোডি ও রচনা।	১০০ নম্বর
৪র্থ পত্র : ইসলামের ইতিহাস ও আরবী সাহিত্যের ইতিহাস।[১৬৩]	১০০ নম্বর

---

১৫৯. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮৬-৮৭ দ্রষ্টব্য।

১৬০. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য।

১৬১. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য।

১৬২. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য।

১৬৩. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮৫-৮৬ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষা বর্ষ : ১৯৮৭-৮৮

১ম পত্র : প্রাচীন ও আধুনিক গদ্য

ক. আল কুর'আন : শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৫-৮৬-এর অনুরূপ।

খ. আল হাদীস : রিয়াদুস সালেহীন ১ম থেকে বাবুন ফিত তাকওয়া পর্যন্ত।

অন্যান্য পত্র শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৫-৮৬-এর অনুরূপ।[১৬৪]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

এমএ শেষ বর্ষ, আরবী

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৭-৮৮

গ্রুপ 'এ'

১ বছর মেয়াদী ৪ পত্রে ৪০০ নম্বর ও টিউটোরিয়াল, টার্মিনাল ও মৌখিক : ৫০+২৫+২৫= ১০০ নম্বর।

১ম পত্র : প্রাচীন ও আধুনিক গদ্য ১০০ নম্বর

নির্দেশিত গ্রন্থ

ক. আল জামাখশারী, আল কাশশাফ, সূরা কিয়ামাহ।

খ. তাজরীদুল বুখারী, কিতাবুল ইলম।

গ. অন্যান্য।

২য় পত্র : প্রাচীন ও আধুনিক পদ্য	১০০ নম্বর
৩য় পত্র : আরবী রচনা ও দর্শন	১০০ নম্বর
৪র্থ পত্র (এ) : ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস	১০০ নম্বর
৪র্থ পত্র (বি) : মুসলিম দর্শন	১০০ নম্বর

এমএ শেষ বর্ষ (আরবী)

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৭-৮৮

গ্রুপ 'বি'

১ম পত্র : আধুনিক কবিতা ও রচনা	১০০ নম্বর
২য় পত্র : আধুনিক কবিতা	১০০ নম্বর
৩য় পত্র : ড্রামা	১০০ নম্বর
৪র্থ পত্র (এ) : নভেল ও ছোট গল্প	১০০ নম্বর
৪র্থ পত্র (বি) : আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস	১০০ নম্বর
টিউটোরিয়াল, টার্মিনাল, মৌখিক ৫০+২৫+২৫ =	১০০ নম্বর।[১৬৫]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এমএ শেষ বর্ষ (আরবী)

গ্রুপ 'এ' ও 'বি'

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৮-৮৯

এমএ শেষ পর্ব শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৮-৮৯-এর পাঠ্যসূচীতে (গ্রুপ এ, ও বি) দেখা যায় যে, ১ম পত্র তাফসীরে কাশশাফে ১৯৮৭-৮৮ সালের নির্ধারিত সূরা কিয়ামাহ এর পরিবর্তে সূরা ইয়াসিন করা হয়েছে। এ ছাড়া এ বছরের অবশিষ্ট পাঠ্যসূচী শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৭-৮৮-এর অনুরূপ।

---

১৬৪. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮৭-৮৮ দ্রষ্টব্য।

১৬৫. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮৭-৮৮ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. মহাবিদ্যালয় (পাস ও সাবসিডিয়ারী)

বাংলাদেশে মহাবিদ্যালয়গুলো ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। এ সকল কলেজে বিএ পাস কোর্সে পড়ানো হতো, তবে সীমিত সংখ্যক কলেজে বিএ অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খোলা ছিল। এ কলেজগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিএ অনার্স, মাস্টার্স এবং সাবসিডিয়ারী কোর্স পাঠ দান করা হতো। এ সকল কোর্সের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে। ফলে এখানে ১৯৭১-১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক পাস সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচী উল্লেখ করা হলো :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিএ (পাস ও সাবসিডিয়ারী) কোর্স
ইসলামিক স্টাডিজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ছাড়াও অন্য কোন বিভাগে অনার্স কোর্সের সাথে সাবসিডিয়ারী বিষয় হিসেবে আরবী এবং ইসলামিক স্টাডিজ গ্রহণের সুযোগ ছিল। এ ছাড়া ১৯৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ছিল ২১৪টি।[১৬৬] এ সকল কলেজে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বিএ পাস পরীক্ষায় ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিষয়ে (৩০০+৩০০) ৬০০ নম্বরের কোর্স গ্রহণ করতো। ফলে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিএ পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্সের গুরুত্ব মোটেই কম ছিলো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্সের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বিএ পাস (সাবসিডিয়ারী) ইসলামিক স্টাডিজ
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭০-৭১, পরীক্ষা : ১৯৭১-৭২
পাঠ্যসূচী

১ম পত্র : আল কুর'আন ও আল কালাম।

১. আল কুর'আন : সূরা আল ইমরান (১ম অর্ধেক)।
২. আল তাফতাযানী : শরহুল আন নাসাফী রিসালাত অধ্যায়ের (১ম অর্ধেক)।

২য় পত্র : আল হাদীস ও আল ফিক্‌হ

১. মিশকাত আল মাসাবীহ : কিতাবুস সালাত, মাওয়াকীতুস সালাত থেকে আদ দোয়াফিত তাশাহুদ।
২. শরহুল বেকায়া : কিতাবুস সাওম।

৩য় পত্র : আরবী সাহিত্য

১. বি. এ পাস আরবী সিলেকশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ (নির্দিষ্ট অংশ)।

৩য় পত্র অথবা : ইসলামের ইতিহাস, মহানবীর জীবন ও খোলাফায়ে রাশিদা।[১৬৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিএ পাস ও সাবসিডিয়ারী ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী শিক্ষাবর্ষ ১৯৭১-৭২, ১৯৭৩-৭৪, ১৯৮০-৮১ ও ১৯৮৮-৮৯ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শিক্ষাবর্ষ ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে পরবর্তী বছরগুলোতে পাঠ্যসূচীর কাঠামো ঠিক রেখে বিষয়বস্তু কিছুটা বাড়ানো হয়েছে।[১৬৮] তবে সর্বক্ষেত্রেই সাধারণ ছাত্রদের প্রতিদৃষ্টি রাখা হয়েছে, যেন আরবীর প্রাধান্য তাদের অপারগতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে বিএ পাস পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশের এক বিরাট সংখ্যক শিক্ষিত সমজের নিকট ইসলামী শিক্ষার অংশ বিশেষ পৌঁছানো হয়েছে।

---

১৬৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১২শ খ, পৃ ৫০।

১৬৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭১-৭২ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

১৬৮. প্রাগুক্ত, ১৯৭৩-৭৪, ১৯৮০-৮১, ১৯৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিএ (পাস ও সাবসিডিয়ারী)
পরীক্ষাবর্ষ : ১৯৭১ ও ১৯৭২
আরবী বিভাগ
পাঠ্যসূচী (সংক্ষিপ্ত)

১ম পত্র : ব্যাকরণ ও অনুবাদ
২য় পত্র : আরবী সাহিত্য গদ্য
নির্দেশিত গ্রন্থ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত আরবী সংকলন ১৯৫৮।

১. আল কুর'আন : পৃ ১৪-১৯ (আরবী সংকলন থেকে)।
২. আল-হাদীস : পৃ ৫৫-৫৮, ৯২-৯৪ (আরবী সংকলন থেকে)।

৩য় পত্র : আরবী সাহিত্য পদ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিএ পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্স আরবী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭৩-৭৪
পরীক্ষা : ১৯৭৫

আল কুর'আন এবং আল হাদীসসহ প্রতিটি পত্রের পাঠ্যবিষয় পরীক্ষা বর্ষ ১৯৭১-৭২ সাল থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিএ পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্স আরবী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮০-৮১
পরীক্ষাবর্ষ : ১৯৮২

পরীক্ষাবর্ষ ১৯৭৫-এর সাথে এ বছরের পাঠ্যসূচীর উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিএ পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্স আরবী
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৮-৮৯
পরীক্ষাবর্ষ : ১৯৯০

পরীক্ষাবর্ষ ১৯৯০ সালের পাঠ্যসূচীতে বেশ পরিবর্তন করা হয়েছে ১ম পত্রে আরবী সাহিত্যের ইতিহাস সংযোজন করা হয়েছে। আরবী সাহিত্য গদ্য ও পদ্য ২য় পত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ৩য় পত্রে ইসলামী আদর্শবাদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
বিএ পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্স

১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিভাগ ও খুলনা বিভাগের সকল মহাবিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ হিসেবে বিবেচিত হতো। এ সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ছিল ২২৪টি।[১৬৯] এর মধ্যে অনার্স কলেজের সংখ্যা ছিল ২০টি।[১৭০] উল্লেখ্য, বিএ পাস এবং সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হলেও উভয় পরীক্ষার পাঠ্যসূচী অভিন্ন ছিল।

---

১৬৯. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৮৯-৯০, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২, পৃ ১।

১৭০. প্রাগুক্ত, পৃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উক্ত সময়ের মধ্যে বিএ পাস এবং সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা আরবী বা ইসলামিক স্টাডিজের পাঠ্যসূচীতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি। নিম্নে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের পাঠ্যসূচী হুবহু উল্লেখ করা হলো।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিএ (পাস ও সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষা পাঠ্যসূচী

ইসলামিক স্টাডিজ

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭০-৭১

পরীক্ষাবর্ষ : ১৯৭২

১ম পত্র : আল কুর'আন ও আল হাদীস।

নির্দেশিত গ্রন্থ

১. **আল কুর'আন** : সূরা আল ইমরান ৫০ নম্বর
২. **আল হাদীস** : মিশকাতুল মাসাবীহ ৫০ নম্বর
   ক. কিতাবুস সালাত : অধ্যায়ের শুরু থেকে 'বাবুয যিকির বা'দাস-সালাত-এর শেষ পর্যন্ত।
   খ. কিতাবুল আদব : 'বাবুল মুফাখখারাতুল আসাবিয়্যাহ' থেকে বাবুল-গজব-ওয়াল কিবর-এর শেষ পর্যন্ত।

২য় পত্র : আল ফিক্হ ওয়াল কালাম।

নির্দেশিত গ্রন্থ :

১. আল ফিক্হ : সূরাতুল ওয়াকিহ।
   ক. কিতাবুস সাওম।
   খ. কিতাবুল হজ্জ।
২. আল কালাম : শরহুল আকাঈদ, আন নাসাফিয়্যাহ ৫০ নম্বর
   রিসালাত অধ্যায়ের শুরু থেকে কিতাবের শেষ পর্যন্ত।

৩য় পত্র : আরবী সাহিত্য

ক. আরবী গদ্য ও পদ্য ৬০ নম্বর
খ. পাঠ্য পুস্তক অবলম্বনে ব্যাকরণের প্রশ্ন ১৫ নম্বর
গ. পাঠ্য পুস্তক হতে সমালোচনা মূলক প্রশ্ন ২৫ নম্বর

নির্দেশিত গ্রন্থ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ সালের বি. এ পাস আরবী এর জন্য প্রকাশিত সংকলন।

৩য় পত্র (অথবা) : ইসলামের ইতিহাস।

১. ইসলাম পূর্ব আরব।
২. মহানবী সা.-এর যুগ।
৩. খিলাফতে রাশিদা।
৪. খিলাফতে বনু উমাইয়া।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষাবর্ষ ১৯৭০-৭১-এর উক্ত পাঠসূচীতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয় নি।[১৭১]

---

১৭১. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত শিক্ষাবর্ষ ১৯৭০-৭১, পরীক্ষা-১৯৭২, শিক্ষাবর্ষ ১৯৭৪-৭৫, পরীক্ষা-১৯৭৬, শিক্ষাবর্ষ ১৯৮২-৮৩, পরীক্ষা ১৯৮৩, শিক্ষাবর্ষ ১৯৮২-৮৩, পরীক্ষা ১৯৮৪, শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৮-৮৯, পরীক্ষা ১৯৮৯-এর ইসলামিক স্টাডিজ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আরবী বিভাগ

বিএ পাস ও সাবসিডিয়ারী পাঠ্যসূচী

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭০-৭২

পরীক্ষবর্ষ : ১৯৭২

পত্রের শিরোনাম :

১ম পত্র : প্রাচীন ও আধুনিক গদ্য	১০০ নম্বর
২য় পত্র : প্রাচীন ও আধুনিক পদ্য	১০০ নম্বর
৩য় পত্র : ব্যাকরণ, অনুবাদ ও রচনা	১০০ নম্বর

১৯৭০-৭১ শিক্ষা বর্ষ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত উক্ত পাঠ্যসূচীর কোনরূপ পরিবর্তন হয় নি।[১৭২]

মন্তব্য : আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার উক্ত পাঠ্যসূচী সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী। তবে এ পাঠ্যসূচী অনুসারে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একজন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে 'আরবী বা ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে এমএ পূর্ব ভাগের পাঠ্যসূচী অনুকরণ করা সহজ সাধ্য ছিলো না। সম্ভবত এ কারণেই এমএ পূর্বভাগ আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী কম ভর্তি হতো।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বিএ (পাস ও সাবসিডিয়ারী) কোর্স

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের প্রায় প্রতিটি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের অনার্স কোর্সের সাথে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় সাবসিডিয়ারী হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ ছিলো। এ ছাড়া ১৯৯০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ছিল ১৩০টি। এর অনেক কলেজেই বিএ পাস কোর্সে তিনশত নম্বরের আরবী এবং তিনশত নম্বরের ইসলামিক স্টাডিজ পাঠ করানো হতো। বিএ পাস এবং সাবসিডিয়ারী পাঠ্যসূচী অভিন্ন হলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যসূচীতে তা পৃথক করে দেখানো হয়েছে। নিম্নে প্রথমে বিএ পাস এবং পরে সাবসিডিয়ারী পাঠ্যসূচী উল্লেখ করা হলো।

আরবী ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বিএ (পাস) শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৪-৮৫

আরবী

১ম পত্র : আরবী গদ্য

নির্দেশিত গ্রন্থ

- আল কুর'আন-সূরা রুম, দুখান, হুজরাত।
- আল হাদিস-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী পাস সংকলন গ্রন্থ ১৯৫৮, পৃ ৫৫, ৫৮, ৯২, ৯৯।

২য় পত্র : আরবী পদ্য	১০০ নম্বর
৩য় পত্র : গ্রামার, রচনা ও অনুবাদ	১০০ নম্বর

---

১৭২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত শিক্ষাবর্ষ ১৯৭০-৭১, পরীক্ষা ১৯৭২, শিক্ষাবর্ষ ১৯৮১-৮২, পরীক্ষা ১৯৮৩, শিক্ষাবর্ষ ১৯৮২-৮৩, পরীক্ষা ১৯৮৪ এর আরবী পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বিএ (পাস) শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৪-৮৫

ইসলামিক স্টাডিজ

১ম পত্র : আল কুর'আন ও আল হাদীস

- সূরা আল ইমরান এর শেষ ৬ রুকু
- আল হাদীস-মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান-এর ১ম ও ২য় ফসল।

২য় পত্র (এ) : আল কালাম ও আল ফিক্হ।

অথবা (বি) : তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব

৩য় পত্র (এ) : আরবী সাহিত্য

অথবা (বি) : ইসলামের ইতিহাস[১৭৩]

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বিএ পাস (সাবসিডিয়ারী)

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৪-৮৫

আরবী

১ম পত্র : আরবী গদ্য।

নির্দেশিত গ্রন্থ

- আল কুর'আন : সূরা রুম, দুখান ও হুজরাত।
- আল হাদীস : (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী সংকলন গ্রন্থ ১৯৮৫) পৃ ৫৫, ৫৮, ৯২, ৯৯ পাস।

২য় পত্র : আরবী পদ্য ১০০ নম্বর

৩য় পত্র : গ্রামার, রচনা ও অনুবাদ ১০০ নম্বর

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৬-৮৭

বিএ (সাবসিডিয়ারী)

আরবী

পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রম ১৯৮৪-৮৫-এর অনুরূপ।

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৮-৮৯

বিএ (সাবসিডিয়ারী)

আরবী

পত্রের শিরোনামসমূহ শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৬-৮৭-এর অনুরূপ তবে ১ম পত্রে সুরা রূপ-এর পরিবর্তে সূরা লুকমান সংযোজন করা হয়েছে।

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বিএ (সাবসিডিয়ারী)

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৪-৮৫

ইসলামিক স্টাডিজ

১ম পত্র : আল কুর'আন ও আল হাদীস

নির্দেশিত গ্রন্থ

- আল কুর'আন : সূরা আল ইমরান ৬ষ্ঠ রুকুর শেষ পর্যন্ত।
- আল হাদীস : মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান এর প্রথম অধ্যায়।

---

১৭৩. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রম দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পত্র (এ) : আল কালাম ও আল ফিক্‌হ

নির্দেশিত গ্রন্থ

- আল্লামা তাফতাজানী : আল আকাঈদুন নাসাফী।

২য় পত্র : 'বি' অথবা

৩য় পত্র : আরবী সাহিত্য

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী পাস সংকলন গ্রন্থ ১৯৫৮

৩য় পত্র অথবা

- খোলাফায়ে রাশেদুন
- বনু উমাইয়া

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

এমএ (সাবসিডিয়ারী)

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৬-৮৭

ইসলামিক স্টাডিজ

পত্রের শিরোনামসমূহ শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৪-৮৫-এর অনুরূপ তবে ১ম পত্রে কিতাবুল ঈমান-এর পরিবর্তে বাবুল ইহতেসাম সংযোজন করা হয়েছে।

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বিএ সাবসিডিয়ারী

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৮৮-৮৯

ইসলামিক স্টাডিজ

পত্রের শিরোনামসমূহ শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৬-৮৭ এর অনুরূপ, তবে ১ম পত্রে বাবুল ইহতেসাম এর পরিবর্তে বাবুল কবীরাহ ওয়া আলামাতুন নিফাক সংযোজন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিএ পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিকট ইসলামী শিক্ষার অংশ বিশেষ পৌছে দেয়ার জন্য উক্ত পাঠ্যসূচী বেশ উপযোগী হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চ. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মোট ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯২), ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, চট্টগ্রাম (১৯৯২), ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (১৯৯৩), সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি (১৯৯৩), দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি (১৯৯৩), ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এ্যান্ড টেকনোলজি (১৯৯৩), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (১৯৯৫), আহসান উল্যাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৫), এএমএ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (১৯৯৫), কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৬), এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (১৯৯৬), ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি (১৯৯৬), ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (১৯৯৬), কুইন্স ইউনিভার্সিটি (১৯৯৬), গণ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৬)।

এই বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর মধ্যে দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম- এই দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ দানের ব্যবস্থা করছে। এছাড়াও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ কলা অনুষদের আওতায় ইসলামিক স্টাডিজ দিয়ে বিএ অনার্স ও এমএ ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

১. দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি

এই বিশ্ববিদ্যালয়টির মূল ক্যাম্পাস ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত। এখানে ৪টি ইন্সটিটিউট, ৩টি অনুষদ এবং ৫টি বিভাগ রয়েছে। এতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৯৩৫ জন। (১৯৯৮-৯৯শিক্ষাবর্ষ), শিক্ষক সংখ্যা ৯৮ জন, ৬ জন শিক্ষিকা, ৩৩ জন পিএইচ ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত এবং অন্যান্য উচ্চতর ডিগ্রী প্রাপ্ত শিক্ষক ৬৫ জন। কর্মকর্তার সংখ্যা ২১ জন। অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা ৫৪ জন। এখানে একটি উন্নত ধরনের গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারে বই ও সাময়িকীর সংখ্যা ১০,১৭৫ খানা।[১৭৪]

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলো হচ্ছে :

১. ডিপার্টমেন্ট অব দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
২. ডিপার্টমেন্ট অব এ্যারাবিক স্টাডিজ
৩. ডিপর্টমেন্ট অব ল' এন্ড শরীয়াহ (ইসলামিক স্টডিজ)

এ্যারাবিক ডিপার্টমেন্টে এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ ও সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলো হচ্ছে :

১. ডিপার্টমেন্ট অব কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
২. ডিপর্টমেন্ট অব কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজী

মানবিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলো হচ্ছে :

১. ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিজ ল্যাংগুয়েজ এন্ড লিটারেচার
২. ডিপর্টমেন্ট অব এডুকেশন

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ইন্সটিটিউট রয়েছে, যথা :

১. ইন্সটিটিউট অব বিজনেস স্টাডিজ (বি বি এ এবং এম বি এ)
২. সৈয়দ আলী আশরাফ ইন্সটিটিউট অব হায়ার ইসলামিক লার্নিং
৩. ইসলামিক একাডেমী (ইন্সটিটিউট অব ইন্টেলেকচুয়াল স্টাডিজ)

---

১৭৪. দ্র. খ ম আবদুল আউয়াল সম্পাদিত, বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৯, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী বন্দর নগরী চট্টগ্রামের চকবাজারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম[১৭৫] অবস্থিত। ১টি ইন্সটিটিউট, ৩টি অনুষদ, এবং ৫টি বিভাগ নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রা শুরু করে। শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫৬০ জন। শিক্ষক সংখ্যা ৫৯ জন। ৯ জন শিক্ষক পিএইচ ডি ডিগ্রীধারী ও ৭ জন উচ্চতর শিক্ষা প্রাপ্ত। কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৩৬ জন। গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা ৬৪৩৮ খানা।[১৭৬]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে ৩টি অনুষদ রয়েছে, যথা :

১ শরীয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
২ এডমিনিস্ট্রেটিভ সায়েন্স
৩ মডার্ণ সায়েন্স

বিষয়গুলো হচ্ছে :

১. বিএ (অনার্স) ইন কুর'আনিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ (৮ সেমিষ্টার ৪ বছর মেয়াদী)।
২. বিএ (অনার্স) ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ (৮ সেমিষ্টার ৪ বছর মেয়াদী)।
৩. এমএইন কুর'আনিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ (৪ সেমিষ্টার ২ বছর মেয়াদী)।
৪. ব্যাচেলর ডিগ্রী ইন বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (৮ সেমিস্টার ৪ বছর মেয়াদী)।
৫. বিএসসি (অনার্স) ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (৮ সেমিস্টার ৪ বছর মেয়াদী)।
৬. বিএসসি (অনার্স) কম্পিউটার এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (৮ সেমিষ্টার ৪ বছর মেয়াদী)।
৭. বিএ (অনার্স) ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ এন্ড লিটারেচার (৮ সেমিস্টার ৪ বছর মেয়াদী)।
৮. এক্সিকিউটিভ এমবিএ (৬ সেমিস্টার ২ বছর মেয়াদী)।
৯. রেগুলার এমবিএ (৭ সেমিস্টার ২ বছর ৪ মাস মেয়াদী)।[১৭৭]

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :

১. আরবী ভাষা কোর্স (৩ মাস মেয়াদী)।
২. ডিপ্লোমা কোর্স (৬ মাস মেয়াদী)।
৩. কম্পিউটার সায়েন্স, সার্টিফিকেট কোর্স (৬ মাস মেয়াদী)।

পর্যালোচনা

বাংলাদেশে ১৩টি পাবলিক ইউনিভার্সিটির মধ্যে মাত্র ১টি বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী শিক্ষার সরাসরি ব্যবস্থাপনায় রয়েছে। দেশের জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থানে এর অবস্থান দেশের এক প্রান্তে। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশের সমগ্র এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে অধ্যয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় কম। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা ও আরবী এবং উর্দূ ও ফার্সী বিভাগ চালু আছে, তা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কম শিক্ষক, গ্রন্থাগার, আবাসিক সুবিধা, আসন সংখ্যা এবং বার্ষিক বরাদ্দ ও তুলনামূলক কম হওয়ায় যথাযথ মান সম্পন্নতার দাবী পূরণ করতে পারছে না।[১৭৮]

---

১৭৫. প্রাগুক্ত।

১৭৬. *Souvenir 2000*, Islamic University Chittagong Trust, p 18-19.

১৭৭. Islamic University Chittagong, *Admission Hand Book 1999–2000*, p 5-15.

১৭৮. বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের মূল বাজেটে দেখা যায়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার জন্য ৬.২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, অথচ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৯.৩৫ কোটি টাকা, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বছরে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যথাক্রমে ৬০.৭০, ৩৭.০০ ও ২৯.২৫ কোটি টাকা। অপরদিকে ইসলামী শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়নে একই অর্থ বছরে সর্বনিম্ন অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে বিদেশী অর্থ সাহায্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কম। ১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯ সালে নয়টি

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী পর্যায়ের ইসলামী শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর (উল্লেখিত দু'টি) ব্যবস্থাপনা, ক্যাম্পাসের স্বল্পতা, শিক্ষকের স্বল্পতা, আর্থিক সংকট ইত্যাদি বিষয় পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। অপরদিকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যয় সরকারী বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় অনেক বেশী। ফলে পর্যাপ্ত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর আকাংখা থাকা সত্ত্বেও এসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আশার কথা হচ্ছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় স্থাপিত হওয়ার পর থেকে যাঁরা সেখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বের হয়েছেন তারা জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। জাতীয় উচ্চ শিক্ষার হারে নতুন মাত্রা যোগ করছেন। এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারী পর্যায়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইসলামী শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করছে, তাতে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সাড়ায় প্রতীয়মান হচ্ছে বেসরকারী পর্যায়ে আরও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। তাহলে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা তথা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তা বিশেষ অবদান রাখতে পারবে।

এক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষা ধারার ফাযিল ও কামিল শ্রেণীকে স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর মান প্রদানের লক্ষ্যে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের জাতীয় দাবী পূরণ হলে ইসলামী শিক্ষা উন্নয়নে এটি নতুন মাত্রা যোগ হবে। কারণ আলিম শ্রেণী পর্যন্ত সমমান বিদ্যমান থাকায় ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ফাযিল ও কামিল শ্রেণীতে অধ্যয়ন না করে ড্রপআউট কিংবা গতিপথ পরিবর্তন করছেন। ফাযিল ও কামিল বা উচ্চতর ডিগ্রীধারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। গবেষণার সুষ্ঠু গতিধারা সৃষ্টি হচ্ছে না। উল্লেখিত দাবী পূরণ হলে ইসলামী শিক্ষা উন্নয়নে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে-এটা নিশ্চিতই বলা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গড় ছাত্রসংখ্যা হচ্ছে ৭০,৩৫৫ জন। অথচ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা তিনবছরে গড় ছাত্রসংখ্যা পাঁচ হাজারের কিছু বেশী। দ্র. বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৯, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : চার

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : এক

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা : মৌলিক সমস্যা ও প্রতিকার

ব্যক্তি মানুষের শরীর মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের মাধ্যমে সাফল্যের সৌধ নির্মাণে যেমন শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য তেমনি একটি জাতির মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির জোয়ার সৃষ্টির মাধ্যমে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে জাতিকে এগিয়ে নিতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির হাতিয়ার স্বরূপ। শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলে। তার বিশ্বাসকে শাণিত করে, মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করে এবং দেশ, জাতি ও মানবতার প্রতি কতর্ব্যবোধ জাগ্রত করে। এভাবেই একজন শিক্ষিত মানুষ বিশ্ব নাগরিকত্বের ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়। তবে কোন শিক্ষাই বাঞ্ছিত ফল বয়ে আনে না যদি সেই শিক্ষা ধর্ম ও নৈতিকতা বিবর্জিত হয়। স্টানলি হাল-এর মতে :

> If you give them three 'Rs' i.e. Reading Writing and Arithmatic, and donot give them the fourth 'R' i.e. Religion, they are sure to become the fifth 'R' i.e. Rescal.[১]

শিক্ষা ব্যবস্থা একদিকে যেমন হবে আদর্শিক ভাবধারায় পুষ্ট তেমনি কৌশলগতভাবে তা হবে জীবন ঘনিষ্ঠ ও বাস্তবমুখী। আধুনিকতার সকল উপাদান থাকবে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে। মোটকথা জীবন ও যুগ জিজ্ঞাসার সকল উত্তর এবং একই সাথে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপাদান সমৃদ্ধ হবে শিক্ষা ব্যবস্থা।

আদর্শিক শূন্যতা

শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা- আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। একটি উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে জাতীয় আদর্শ ও বিশ্বাসের উপস্থিতি এতটা উজ্জ্বল হওয়া প্রয়োজন যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী কর্ম ও চিন্তায়, বাক্য ও ব্যবহারে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হয়ে গড়ে ওঠে।[২] জাতীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্য, ভালোবাসা ও কমিটমেন্ট দেশপ্রেমের পূর্বশর্ত। এ বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই যে, বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শের নাম ইসলাম। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে একশ্রেণীর ষড়যন্ত্রকারী বাংলাদেশের গণমানুষের হাজার বছরের লালিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধূম্রজাল সৃষ্টির প্রয়াস চালালেও ইতিহাসের অমোঘ ধারায় জাতি তার আদর্শিক শূন্যতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সংযোজন, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে আরোপিত 'ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ'-কে প্রত্যাখ্যান করে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা' সংবিধানে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সবশেষে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় আদর্শ ইসলাম স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও এই জাতির, শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আজও ইসলাম মূল প্রেরণা হিসেবে স্বীকৃতি পায় নি। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজও সেক্যুলার তথা ধর্ম বিমুখই রয়ে গেছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে না; সংবিধানের স্বীকৃত আদর্শকে অনুসরণ করে না। এই অর্থে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা গণবিরোধী ও সংবিধানের মৌল আদর্শ পরিপন্থী।

একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রসূত ভীতি ও উন্নাসিকতাই শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ রূপায়ণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। জাতীয় মতামতকে উপেক্ষা করে গুটি কয়েক ইসলাম বিদ্বেষী পণ্ডিতমূর্খ যেভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মবিরোধী রূপদানের জন্য বারে বারে চেষ্টা করেছেন এবং আজও করছেন

---

১. উদ্ধৃত : ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'আমাদের শিক্ষা : কিছু ভাবনা', *ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি স্মারক* (১৯৫২-২০০২, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা : ঢাকা সাহিত্যসংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০২, পৃ ৮৫।

২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'আমাদের শিক্ষা সংস্কার : ধর্ম ও চরিত্র গঠনে', মাহে নও, নভেম্বর ১৯৬১, পৃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

তা খুবই দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। এসব ব্যক্তি মনে করেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম অনুপ্রবিষ্ট হলে তা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অবৈজ্ঞানিক উপাদানে ভরপুর হয়ে উঠবে। তাদের এই আশংকা খুবই অমূলক ও অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে এসব বুদ্ধিজীবী না ইসলাম বুঝেন না বিজ্ঞান। সারা দুনিয়ায় মুসলিমগণ তো বটেই এমনকি অমুসলিম মনীষীগণও একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। যা কিছু বিজ্ঞানসম্মত, যৌক্তিক তাই-ই ইসলাম। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ রাজা যুবরাজ চার্লস কর্তৃক ১৯৯৩ সালে Oxford Centre for Islamic Studies-এ প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ উল্লেখ করতে চাই। তাঁর ভাষায় :

> More than this, Islam can teach us today a way of understanding and living in the world which Christianity itself is the poorer for having lost. At the heart of Islam is its preservation of an integral view of the universe. Islam like buddhism and Hinduism refuses to separate man and nature, religion and science, mind and matter, has preserved a metaphysical and united view of ourselves and the word around us.[৩]

সুতরাং বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের বিরোধ যারা আবিষ্কার করেন তাদের মস্তিষ্ক যে অতিমাত্রায় উর্বর তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জাতীয় আদর্শের প্রতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সংশয় সৃষ্টির মাধ্যমে যারা জাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে চান তারাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম বিদ্বেষী চিন্তা ও তত্ত্ব আমদানী করতে কৃত সংকল্প। এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে দেয়া যায় না।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী ছাঁচে গড়ে তোলার বিপক্ষে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীগণ অপর একটি যুক্তির অবতারণা করে থাকেন। সে যুক্তিটি হলো, বাংলাদেশে নানা ধর্মের লোক বাস করেন। সুতরাং ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত হলে ঐসব ধর্মের লোকদের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে এবং তারা আপত্তি তুলতে পারেন।

এ যুক্তিটি খুবই দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। কারণ বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ অধিবাসী মুসলমান। পৃথিবীর সব দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার আলোকে শিক্ষাসহ সকল ব্যবস্থা প্রণীত হয়। তবে সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয় যেন অন্য ধর্মের লোকদের অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে এমন কোন বিষয় পাঠ্যসূচীতে সংযোজন করা না হয়। বিশ্বের সেরা গণতন্ত্রের দেশ বৃটেনের সকল স্কুলের সাথে প্রার্থনা কক্ষ রয়েছে। তার জন্য বৃটেনের গণতন্ত্র কি ভেঙ্গে গেছে, নাকি অন্য ধর্মের নিপীড়নকারী বলে তাদের কেউ গাল পেড়েছে?

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রূপায়িত হলে তাতে হিন্দু বা অন্য ধর্মের লোকদের আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলেও অন্য ধর্মের লোকদের তাদের ধর্ম শিক্ষা ও আচরণের অবশ্যই স্বাধীনতা ও সুযোগ থাকবে। দ্বিতীয়তঃ ইহজাগতিক বিষয়বালীতে ইসলাম যতটা স্পর্শকাতর অন্যান্য ধর্ম ততটাই নিস্পৃহ। পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী অর্থনীতি পড়তে একজন হিন্দু বা খ্রীস্টান আপত্তি করে না তেমনি ইসলামী অর্থনীতি পড়তেও তার আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ, হিন্দু বা খ্রীস্টান ছাত্র ধর্মের নিজস্ব কোন অর্থনীতি নেই। পক্ষান্তরে ইসলামের নিজস্ব রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা রয়েছে বলেই একজন মুসলিম ছাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা শিখতে চায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রতিবেশী দেশ ভারতে হিন্দুরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কখনও হিন্দু ধর্মভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা দাবী করে না। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের মুসলমানরা বরাবরই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবী করে এসেছে এবং এজন্য বহু তরুণ জীবন দিয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দুটি উপাদান হতে হবে ইসলামী মূল্যবোধ এবং স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের চেতনা তথা দেশপ্রেম।[৪]

---

৩. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, 'আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ', *মাসিক দারুস সালাম (আদর্শ শিক্ষা সংখ্যা)*, ৩য় বর্ষ : ২য়-৩য় সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০০, পৃ ১২০।

৪. প্রফেসর ড. আনিস আহমদ, 'শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি', বাংলাদেশ ইসলামিক স্টাডিজ ফোরাম স্মরণিকা, ২০০০, পৃ ২৫-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই অপরিকল্পিত এবং বলা যায় এডহকভিত্তিক। শিক্ষার সকল পর্যায়ে পরিকল্পনার অভাব তীব্র ও প্রকট। গত ৫০ বছরে এ দেশটি দু'বার স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আজ অবধি জাতীয় কোন শিক্ষানীতি প্রণীত হয় নি। এদেশে বহুবার বহু শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে কিন্তু নানা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কারণে আজ পর্যন্ত কোন কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হতে পারে নি। ৫০ বছরে একটি জাতিকে সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি থেকে বঞ্চিত রাখা নিঃসন্দেহে দেশীয়, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ফসল।

অপরিকল্পিত বলেই এদেশে আজও স্কুল, মাদ্রাসা, কওমী মাদরাসা, খ্রীস্টান মিশনারী স্কুল ইত্যাদি নানা ধারার শিক্ষা পাশাপাশি চলে আসছে।

শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা একান্ত অপরিহার্য। দেশের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী করা এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। দেশে কতজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসা বিশেষজ্ঞ, আইন, হিসাব ও অর্থ বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি প্রয়োজন তার কোন হিসাব সরকারের কাছে নেই। ফলে পরিকল্পিতভাবে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তব সমাজ চাহিদার আলোকে ঢেলে সাজাতে হলে আমাদের অবশ্যই পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশে সুদীর্ঘকাল যাবৎ দুটি ভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। একটি সাধারণ শিক্ষা যা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করা হয়। অপরটি মাদরাসা শিক্ষা। এই দুই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। এই বিভক্তি কোন স্বাধীন জাতির জন্য মোটেই কাম্য হতে পারে না। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, জীবন ও জগত সম্পর্কে সচেতন করে ও শিক্ষা দেয়। কিন্তু ধর্ম ও নৈতিকতার প্রশিক্ষণ সাধারণ শিক্ষায় নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে, মাদরাসা শিক্ষায় ধর্ম ও নৈতিকতার উপরে সবিশেষ জোর দেয়া হলেও যুগ জিজ্ঞাসা ও আধুনিকতাকে সযত্নে পরিহার করা হয়। এরপরও এ কথা সত্য যে, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের সবাই যেমন নৈতিকভাবে দেউলিয়া হয় না বা ধর্মকে বর্জন করে না। তেমনি মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরাও সব সময় নৈতিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন না। এর কারণ, স্কুল ও মাদরাসায় কয়েক ঘন্টার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও প্রতিটি শিক্ষার্থী তার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে তার পরিবারের সদস্য, আত্মীয়, বান্ধব ও সমাজের নানা প্রতিষ্ঠানের সাথে। পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, জন্মগত বিশ্বাস, মসজিদের খুতবা, মক্তবের শিক্ষা, ধর্মীয় আলোচনানুষ্ঠান, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে একজন সাধারণ শিক্ষার্থী প্রায়শঃ এমন কিছু সবক পায় যা তাকে শিক্ষা ব্যবস্থা আরোপিত মূল্যবোধের মোকাবিলায় জয়ী হতে সাহায্য করে। তাই আজও এদেশে সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে এক বিরাট অংশ নৈতিকভাবে যথেষ্ট দৃঢ় ও ঋজু। পক্ষান্তরে, মাদরাসায় নৈতিকতার উপর যথেষ্ট জোর দেয়া সত্ত্বেও জীবন ও জগতের বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত না হওয়ায় জীবনযুদ্ধে তাদের অনেকেই নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্যর্থ ও পরাজিত হন।[৫]

মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার যা কিছু ভালো এবং সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার যা কিছু অপরিহার্য এতদুভয়ের সমন্বয়ে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন দরকার। যে শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক আবিষ্কারের সাথে পরিচিত করার পাশাপাশি ধর্ম ও নৈতিকতার শ্রেষ্ঠতম পাঠ দেবে। একজন শিক্ষার্থী পেশাগতভাবে দক্ষ হবার পাশাপাশি নৈতিক বিচারে প্রচণ্ড রকম সৎ ও আদর্শবান হবে।

ধর্ম ও নৈতিকতাভিত্তিক একমুখী শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পার হবার পর ছাত্র-ছাত্রীরা Specialization-এর জন্য যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয় তেমনি ধর্মীয় শিক্ষার বুৎপত্তি লাভের জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থীরা মাদরাসায় ভর্তি হতে পারবে। একজন ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের পাঠ্যসূচী আলাদা হওয়া সত্ত্বেও তারা উভয়ে যেমন আধুনিক তেমনি মাদরাসা শিক্ষায় বিশেষভাবে পারদর্শীগণ আধুনিক সমাজেরই একজন হবেন।

---

৫. আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, 'আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি', *বার্ষিকী ৯৩*, ঢাকা : তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ১৯৯৩, পৃ ৪০-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা অবকাঠামোর অপ্রতুলতা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি মারাত্মক সীমাবদ্ধতা হলো অবকাঠামোর অপ্রতুলতা। এদেশের শিক্ষিতের হার বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৫% থেকে ৩৫% পর্যন্ত। সর্বোচ্চ সংখ্যাটিকে স্বীকারকালে দেখা যায়, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে। মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর লেখাপড়ার ভার বহনের ক্ষমতা দেশের শিক্ষা অবকাঠামোয় নেই। ভর্তির সময় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উপচে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পত্র-পত্রিকায় উদ্বেগের সাথে লেখালেখি হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরেই আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের বসতে দেয়ার মত স্থান সংকুলান হচ্ছে না। অর্থাৎ সরকার দেশের মোট জন সংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করতেই হিমশিম খাচ্ছেন। অদূর ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছা ও সামর্থ্য কোনটাই সরকারের আছে বলে মনে হয় না। এরই মধ্যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী যদি সত্যি সতিই বাস্তবায়িত হয় তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় ঠিক তিনগুণ না হলেও দ্বিগুণের বেশী তো অবশ্যই হবে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার আগেই সরকারের অন্তত প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা কমপক্ষে দ্বিগুণ করা দরকার ছিল। সংকুলান উপযোগী শিক্ষা অবকাঠামোর এ দৈন্য ঘুচানোর একটি সহজ উপায় সরকারের হাতে অবশ্যই রয়েছে। সেটি হলো-মসজিদ কেন্দ্রিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা। বাংলাদেশে ২ লাখেরও বেশী মসজিদ রয়েছে। মসজিদের ইমামদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়ে ৫০০/- থেকে ১০০০/- টাকার নামমাত্র মাসিক ভাতার বন্দোবস্ত করলে তারা অতি যত্নের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন। মসজিদের বারান্দা অথবা মসজিদের সংলগ্ন কোন ঘরে এই কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে। এই কর্মসূচী গৃহীত হলে কোন প্রকার বাড়তি জমি হুকুম দখল করা ছাড়াই বাংলাদেশ ২ লাখের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকারী হবে। এ যাবৎকাল স্থানীয় মসজিদ কমিটি ও মুসল্লীদের উদ্যোগে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই এক হিসাব মতে সারা দেশে প্রায় ১ লাখের মত মক্তব পরিচালিত হচ্ছে। সরকার যদি বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে এই লক্ষাধিক মক্তবকে স্বীকৃতি দেন এবং স্বল্প ব্যয়ে এগুলোর আধুনিকায়ন করেন তাহলে দ্রুত সুফল পাওয়া যাবে।

শিক্ষা অবকাঠামোর অপ্রতুলতা দূর করার আরেকটি উপায় হলো, বিদ্যমান স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিফ্‌ট' পদ্ধতি চালু করা। যেমন 'মর্নিং শিফ্‌ট', 'ডে শিফ্‌ট' ইত্যাদি। ইতোমধ্যে শহরাঞ্চলের কিছু কিছু স্কুলে এ ধরনের শিফট পদ্ধতি চালু হয়েছে। শিফ্‌ট পদ্ধতি সারা দেশে চালু করলে সরকার অবকাঠামো তৈরীর একটি বিরাট ব্যয় থেকে বেঁচে যাবেন। এছাড়া যতদিন উভয় শিফটের জন্য পূর্ণ সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব না হয় ততদিন পর্যন্ত বর্তমান শিক্ষকদের 'শিফ্‌ট ভাতা' হিসাবে কিছু টাকা দিলেই তারা উভয় শিফ্‌ট চালিয়ে নিতে আগ্রহী হবেন। অবকাঠামোর স্বল্পতা দূর করার আরেকটি উপায় হলো বিশেষ করে শহরাঞ্চলের শত শত কোচিং সেন্টারকে শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে এবং মেয়াদভিত্তিক স্বীকৃতি দিয়ে সাধারণ কারিকুলামের আওতায় নিয়ে আসা। তাহলে কোচিং প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। সেই সাথে সাধারণ স্কুল/কলেজের সাথে কোচিং সেন্টারের একটি সমান্তরাল প্রতিযোগিতা চলবে, যা আমাদের শিক্ষার মানকে আরও উন্নত করবে। মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি সাপেক্ষে 'নাইট শিফ্‌ট' অবিলম্বে চালু করা উচিত। এর ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে।[৬]

শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচুর বৈষম্য লক্ষণীয়। দেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করা হলেও কার্যত সকল মানুষকে শিক্ষা লাভের অধিকার অর্জনের ব্যবস্থা করতে সব সরকারই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।[৭] যার অর্থ শুরু থেকেই জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। বড় অংশে থাকছে

---

৬. মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১২১।

৭. অধ্যাপক আখতার ফারুক, 'শিক্ষামুক্ত শিক্ষাঙ্গন : মুক্তি কোথায়?', *জাতীয় ছাত্র কনভেনশন ২০০০*, ঢাকা : বাংলাদেশ ছাত্র মজলিস, ২০০০, পৃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

নিরক্ষর জনগোষ্ঠী এবং ছোট অংশে থাকছে ভাগ্যবান স্বাক্ষর গোষ্ঠী। সংবিধানে শিক্ষাকে অধিকার বলা হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষা এদেশে সুযোগেরই নামান্তর। যার সামর্থ্য আছে সে-ই শুধু এই শিক্ষা অর্জন করতে পারে। শিক্ষার প্রথম স্তরেই বৈষম্যের সূত্রপাত। যারা দরিদ্র তাদের জন্য রয়েছে মসজিদ কেন্দ্রিক মক্তব, যার প্রতি সরকারের কোন নজর নেই। স্থানীয় মুসলিম জনগণের আর্থিক সহায়তা ও ব্যবস্থাপনায় গড়ে ওঠে ও পরিচালিত হয় এসব মক্তব। অনধিক-পাঁচশত টাকা বেতনে একজন দরিদ্র আদর্শ শিক্ষক দিন-রাত পরিশ্রম করে জরাজীর্ণ পাঠকক্ষে শত শত শিশু-কিশোরকে পাঠ শিক্ষা দেন মক্তবে। সরকারী উদ্যোগে দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে তার অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। এসব প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন সরকারীভাবে দেয়া হলেও স্কুল ঘরসমূহের অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব করুণ। শহরের সরকারী প্রাইমারী স্কুল ভবন ও পল্লীর সরকারী প্রাইমারী স্কুল ভবনের মধ্যেও যথেষ্ট বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রাম এলাকায় কোথাও কোথাও খোলা আকাশের নীচে শিক্ষা দানের দৃশ্য পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। গরীব ও স্বল্পবিত্তের জনগণের ছেলেমেয়েদের জন্য এই সাদামাটা, অনাড়ম্বর ও সেকেলে শিক্ষার পাশাপাশি শহর-নগরের বিত্তবানদের ছেলেমেয়েদের জন্য রয়েছে বিলাসবহুল শিক্ষার সুবন্দোবস্ত। এসব নার্সারী, কেজি ও প্রিপারেটরী স্কুলের মান যেমন সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে অনেক উচ্চ তেমনি এসব স্কুলে বেতনের পরিমাণও অনেক অনেক বেশী এবং অবশ্যই সীমিত আয়ের লোকদের নাগালের বাইরে। প্রায়শ কালো টাকার মালিকরা তাদের সন্তানদের বিরাট অংকের 'ডোনেশন'-এর বিনিময়ে এসব উচ্চবর্ণের স্কুলে ভর্তি করান এবং এভাবেই অতি যত্নে সবার অলক্ষ্যে তৈরী হয় ভবিষ্যতের শাসক শ্রেণী। অথচ প্রচুর মেধা ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য তরুণ এসব উঁচুমানের নার্সারী, কেজি, প্রিপারেটরী ও প্রি-ক্যাডেট জাতীয় স্কুলের দরজায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় শুধুমাত্র এ কারণে যে তাদের পিতা-মাতার আয় সীমিত। যথেষ্ট টাকা খরচ করার সামর্থ্য তাদের নেই। বৈষম্যের এখানেই শেষ নয়। উচ্চ বর্ণের বাংলা মিডিয়াম স্কুলের পাশাপাশি শহরাঞ্চলে গড়ে উঠেছে প্রচুর সংখ্যক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তর মাড়িয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও এই বৈষম্যের ধারা অব্যাহত থাকে। গ্রামের স্কুল ও কলেজের সাথে শহরের স্কুল ও কলেজের বৈষম্য সকলেরই চোখে পড়ার মত। পার্থক্যটা এতই বেশী যে, কোন সরকারী অফিসারকে মফস্বলে বদলী করলে তিনি প্রথমেই ভাবনায় পড়েন তার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে। কারণ তিনি জানেন যে, মফস্বলে ভালো স্কুল নেই। ফলে তিনি মফস্বলে যেতে চান না আর গেলেও তদবীর শুরু করেন শহরে ফেরৎ আসার। খোদ সরকারের উদ্যোগেই এই স্তরে প্রচণ্ড স্থায়ী বৈষম্য সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। সরকারী স্কুলের সাথে বেসরকারী স্কুলের বৈষম্য আজও খুব প্রকট। এছাড়া ভাগ্যবানদের জন্য রয়েছে ক্যাডেট স্কুল ও কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ইত্যাদি নানা উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব স্কুল-কলেজে ছাত্র প্রতি সরকারের যে অর্থ ব্যয় করেন তা দিয়ে সাধারণ স্কুলের অন্তত একশত ছাত্র শিক্ষার সুযোগ পেতে পারে। উচ্চমানের প্রতিষ্ঠানে সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার আইন করে নিষিদ্ধ করা না হলেও বাস্তব অবস্থাটা এমন যে সাধারণ মানুষের সন্তান এসব প্রতিষ্ঠানে কদাচিৎ ঢুকতে পারে। বস্তুত এসব প্রতিষ্ঠানে সুযোগ লাভের প্রক্রিয়াটাই এমন যে ভাগ্যবানরাই কেবল সে সুযোগ লাভের যোগ্য হতে পারে। উচ্চ শিক্ষা স্তরে এই বৈষম্য ব্যবস্থাপনাগতভাবে খানিকটা কম হলেও প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্তরের স্থায়ী বৈষম্যের রেশ উচ্চ শিক্ষাঙ্গনকে অবশ্যই প্রভাবিত করে। পূর্ব প্রস্তুতির তারতম্যের কারণেই মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে যেসব ছাত্র অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে তাদের প্রায় সবাই সুবিধাভোগী শ্রেণীভুক্ত। আর সুবিধাবঞ্চিত দু'চারজন যারা এসব বিষয়ে চান্স পায় তাদের তুলনা গোবরে পদ্ম ফুলের মতই।

এভাবে আমাদের দেশের বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বস্তরে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। একভাগে তৈরী হয় দেশের আগামী দিনের শাসক, অধিকর্তা আর অন্যভাগে তৈরী হয় এমন এক বিশাল জনগোষ্ঠী যারা শিক্ষিত হয়েও ভাগ্যাহতই থেকে যাবে এবং কার্যত ভাগ্যবানদের আদেশ পালনের জন্য নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখতে অভ্যস্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরনের বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলাম অনুমোদন করে না। যে শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত, আধুনিক ও কর্মমুখী সে শিক্ষার অধিকার গরীব-ধনী সকলেরই। বিত্ত যতদিন শিক্ষার অপরিহার্য উপাদান হবে ততদিন সমাজে বৈষম্য থাকবেই। অথচ ইসলাম একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। দেশে গরীব, ধনী সকল রোগীর চিকিৎসা যেমন অভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় তেমনি গরীব, ধনী সকল শিক্ষার্থীর সুযোগ সমান হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার পরিবেশের অভাব

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ নেই।[৮] প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে দেখা যায়-ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ও তদারকীর অভাবে বিশেষত পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান খুবই খারাপ। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও দলীয়করণের ফলে যথেষ্ট সংখ্যক অযোগ্য ও অপদার্থ লোক প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ করে। কোন সম্মানজনক চাকরি লাভে ব্যর্থ লোকেরা যখন ঘুষ দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার গুরু দায়িত্ব কাঁধে নেয় তখন ঐ শিক্ষকের কাছ থেকে একজন শিশু শিক্ষার্থী ভালো শিক্ষা বা উন্নত চরিত্র কোনটাই আশা করতে পারে না। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যোগ্য শিক্ষকের অভাব ও তদারকীর অপ্রতুলতার পাশাপাশি নোংরা ও সংকীর্ণ ছাত্র রাজনীতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে ফেলেছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনকে কেন্দ্র করে সহপাঠীদের ঝগড়া প্রায়শ সশস্ত্র মোকাবিলায় রূপ নিচ্ছে।[৯] উচ্চ শিক্ষাস্তরে এই অবস্থা আরও মারাত্মক। বড় বড় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজসমূহ এখন অস্ত্রধারীদের কাছে জিম্মি হয়ে আছে। উচ্চ শিক্ষায়তনের ছাত্রাবাসসমূহ সশস্ত্র মাস্তানদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। হলগুলোতে পুলিশের পাশাপাশি সশস্ত্র ক্যাডাররা কখনো হল গেটে বসে আবার কখনো ছাদে উঠে সারা রাত জেগে হল পাহারা দেয়। সশস্ত্র ক্যাডার পোষার ব্যাপারে সরকারী দলও বিরোধী দলের মধ্যে রীতিমত প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা চলে। কারণ, যতবেশী ক্যাডার ততবেশী আধিপত্য। সশস্ত্র ক্যাডারদের সহায়তা ছাড়া সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার কথা কল্পনা করতে পারেন না আবার বিরোধী দল ও ক্যাডারদের বাদ দিয়ে আন্দোলনের কথা ভাবতে পারেন না। আমাদের রাজনীতিকদের উপর সাধারণ জনগণ ও ছাত্র সমাজের কোন আস্থা নেই। এভাবে গণবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসনির্ভর রাজনীতি ধ্বংস করছে আমাদের শিক্ষার পরিবেশ।[১০]

এই পরিবেশের পরিসমাপ্তির জন্য সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসার মত দল ও নেতার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে সাধারণভাবে সন্ত্রাস চললেও দেশের মাদরাসাসমূহ তুলনামূলকভাবে শান্ত। প্রায় ঝঞ্ঝাটমুক্ত পরিবেশ সার্বিক ও সাধারণ অবক্ষয় সত্ত্বেও মাদরাসায় যেটুকু ইসলামী শিক্ষা চালু রয়েছে তার প্রত্যক্ষ সুফল হচ্ছে মাদরাসাসমূহের এই সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ। এ থেকে বুদ্ধিমান ও সচেতন জনগোষ্ঠীকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে যে, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধের স্ফুরণ ঘটাতে পারলে আমাদের শিক্ষার সকল স্তরে সন্ত্রাসমুক্ত ও সুশিক্ষার উপযোগী পরিবেশ অবশ্যই বিরাজ করতো।

শিক্ষকদের ব্যক্তিগত কর্মব্যস্ততা

শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হবার আরেকটি বড় কারণ হলো এক বিরাট সংখ্যক শিক্ষকের শিক্ষকতার বাইরে নানাবিধ উপার্জনে আত্মনিয়োগ। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার অঙ্গন সর্বত্রই বহু সংখ্যক শিক্ষক শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কনসালটেন্সী, কোচিং সেন্টারসহ নানা পন্থায় বাড়তি আয় সৃষ্টিতে এত বেশী ব্যস্ত যে মূল পেশার দিকে নজর দেয়ার সময় তাদের হয় না। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকগণ প্রায়শ স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায় বাড়ির কাজ শেষ করে তবে স্কুলের কাজে যোগদানের প্রবণতা লক্ষণীয়। কলেজ পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী প্রায় কলেজেই এমন অনেক শিক্ষক থাকেন যারা এক জেলায় বসবাস করেও অন্য

---

৮. ওয়াকিল আহমেদ, 'আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা', পাথেয়, মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সম্পাদিত, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, পৃ ১৭।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১২২।

১০. আবদুল কাদের মোল্লা, 'আমাদের শিক্ষা সংকট উত্তরণের উপায়', *মাসিক দারুস সালাম*, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

জেলার কলেজে চাকরি করেন। এরা সপ্তাহে ২ দিন বা ৩ দিন কলেজে যান এবং এক সঙ্গে ২/৩ ঘন্টা এক নাগাড়ে পড়িয়ে সিলেবাস শেষ করেন। এদের আরেকটি বিকল্প রয়েছে। কোন বিষয়ে যদি একের অধিক শিক্ষক থাকেন তবে তারা নিজেদের মধ্যে সপ্তাহ ভাগ করে নেন। যেমন ৩ জন শিক্ষক থাকলে প্রত্যেকে ২ দিন করে কলেজে উপস্থিত থেকে ক্লাস নেন। এভাবে ফুল টাইম শিক্ষকগণ স্থায়ীভাবে পার্ট টাইম শিক্ষক হয়ে যান।[১১] যদিও খাতায় তাদের হাজিরা থাকে প্রতি দিনের। এর প্রতিকারের কোন উদ্যোগ নেই। অধ্যক্ষের বাইরে কলেজ গভর্নিং বডি আছে, আছে সরকারের শিক্ষা অধিদপ্তর, বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু খবরদারীর কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেই। পরীক্ষাকেন্দ্রে গণটোকাটুকি চলে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের লজ্জাকর অধ্যায় সংযোজিত হয় শিক্ষার ইতিহাসে। তার ওপর জাল সার্টিফিকেট ব্যবসা তো রয়েছেই।

ইসলাম কর্ম ফাঁকিকে সীমাহীন অপরাধ বলে গণ্য করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষকদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধের জাগৃতি না থাকায় তারা আজ আর কর্মফাঁকিকে অপরাধ মনে করে না। আবারও মাদরাসা শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার তুলনা করতে হয়। বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসাসমূহে একজন শিক্ষক ২ হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা বেতনে দিন-রাত যেভাবে পাঠদানে ব্যস্ত থাকেন তা সত্যিই অবাক হবার মত। পক্ষান্তরে সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে এর চেয়ে পাঁচ-সাতগুণ বেশী বেতন নিয়ে শিক্ষকদের এক বিরাট অংশ যেভাবে দায়িত্বে অবহেলা প্রদর্শন করেন তা সত্যিই দুঃখজনক। শিক্ষকদের মধ্যে পরকালীন জবাবদিহিতা থাকলে তারা আদৌ কর্মফাঁকি দিতে পারতেন না।

কর্মবিমুখ শিক্ষা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় ত্রুটি হলো কর্মবিমুখতা। স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ দানের সাথে বাস্তব কর্মজীবনের প্রায়শঃ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।[১২] মুখে সব সরকারই উৎপাদনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষার কথা বললেও বাস্তবে তারা কর্মবিমুখ শিক্ষাকেই পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এমন অনেক বিষয়ে লেখাপড়া করে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করা হয় যা আদৌ জীবন ঘনিষ্ঠ নয়। এসব বিষয়ে গবেষণা হতে পারে কিন্তু পাঠ দেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই।

বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের পরও একজন ছাত্র প্রায়শ স্বাধীনভাবে কোন ল্যাবরেটরী পরিচালনা করতে পারে না। একইভাবে বাণিজ্যে সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী একজন ছাত্র স্বাধীনভাবে একটি ফার্মের হিসাব পরিচালনা, আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ, কিংবা বাজারজাতকরণ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হয়। বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও কলা সকল বিষয়েই এমন সব বইপত্র পড়ানো হয় যা পুরোপুরি বিদেশী। অর্থাৎ এসব পাঠে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট প্রায়শ অনুচ্চারিত থেকে যায়। ফলে একজন উচ্চ ডিগ্রীধারী ছাত্রকে নিয়োগ করার পর সংশ্লিষ্ট ফার্মকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে এবং গোড়া থেকেই প্রশিক্ষণ শুরু করতে হয়- যা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। প্রশ্ন হলো, নিয়োগকর্তাকে যদি সবকিছু গোড়া থেকেই শেখাতে হবে তাহলে এত বছর ধরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ দানের যৌক্তিকতা কোথায়, শুধু স্কুল পর্যায়ে ভাষা (Language) ও যোগাযোগ (Communivation) শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিলেই তো হয়।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যে কতটা অবাস্তব তার একটি চালচিত্র পাওয়া যাবে যদি সর্বোচ্চ নির্বাচনী পরীক্ষা বিসিএস পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত ডিগ্রী ও বিসিএসের জন্য নির্ধারিত বিষয়গুলোর (Combinations) উপর জরীপ চালানো হয়। এমন প্রায়ই দেখা যায় যে, অর্থনীতি ও বাণিজ্যের ছাত্ররাও বিসিএস এর জন্য ইসলামের ইতিহাস, ইসলামিক স্টাডিজ, সমাজকল্যাণ, দর্শন ইত্যাদি বিষয় বেছে নেয়। প্রশ্ন হলো, একজন ছাত্র ১৬ বছর অধ্যয়নের পর যে বিষয়ে ডিগ্রী পেলো সে বিষয় নিয়ে বিসিএস দিতে তার এত ভয় কেন? সরকারই বা এক বিষয়ের ছাত্রকে অন্য বিষয়ে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেন কেন? অর্থনীতি বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রী প্রাপ্ত ছাত্র

---

১১. প্রফেসর ড. এস এম নজরুল ইসলাম, 'উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা', শিক্ষা সপ্তাহ স্মরণিকা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০০, পৃ ১৯।

১২. রওশন আরা চৌধুরী, 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা পরিকল্পনার ভূমিকা', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, অক্টোবর ১৯৮৭, পৃ ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

যখন ৩ মাসের প্রস্তুতি নিয়ে অন্য কোন বিষয়ে বিসিএস পাস করার স্বপ্ন দেখে তখন শিক্ষা পদ্ধতির অন্ত সারশূন্যতা পরিষ্কার হয়ে যায়।

বাংলাদেশের সেরা ব্যাংকার বলে যিনি খ্যাত তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। এখন বহু ব্যাংকার হয়েছেন যারা বাণিজ্যের ছাত্র ছিলেন না। বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীতে বহু কর্মরত লোকের সন্ধান মেলে যারা বাণিজ্য বা কলা অনুষদের ছাত্র ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য পড়ে যারা ব্যবসায় নামেন তাদের চেয়ে ব্যবসা না পড়া লোকেরা এদেশে সফল হয়েছেন বেশী। ধোলাইখাল বা জিঞ্জিরা টেকনোলজীর যারা উদ্যোক্তা তাদের মধ্যে কয়জন ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন সে প্রশ্ন অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। এমবিবিএস ডাক্তার প্রায়শ অন্য চাকরি করেন। এসবই হচ্ছে বাস্তবতা বিবর্জিত ও কর্মবিমুখ শিক্ষার ফল।

এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রতিটি বিষয়ে দেশজ উপাদান সংযোজিত করতে হবে। কেস স্টাডিজকে সকল পর্যায়ে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ব্যবহারিক শিক্ষাকে আরও ব্যাপক ও গুণগত মানে উন্নীত করতে হবে। বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাকালের একটি নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই কল-কারখানা, ল্যাবরেটরী ও ফার্ম, সরকারী অফিস-আদালত ও মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট থেকে বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে। এভাবেই শিক্ষাকে কার্যোপযোগী ও বাস্তবমুখী করতে হবে।

আধুনিকতা বর্জিত শিক্ষা

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সার্বিক বিচারে খুবই সেকেলে, গতানুগতিক ও আধুনিকতার স্পর্শমুক্ত। পাঠক্রম, অবকাঠামো, প্রযুক্তি, উপকরণ ইত্যাদি সকল বিষয়েই সমস্যা বিদ্যমান। উন্নত বিশ্বে শিক্ষার বিষয়বস্তু প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা আধুনিক পাঠ্য বিষয় থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছি। উন্নত দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীসমূহ এত সমৃদ্ধ ও উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন যে, যে কোন সময়ে যে কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত যোগাড় করা সেখানে কোন সমস্যাই নয়। এমনকি এই বাংলাদেশেরই কোন তথ্য ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকান কোন লাইব্রেরীতে যত সহজে ও অনায়াসে পাওয়া সম্ভব বাংলাদেশে বসে তা তত সহজে সম্ভব নয়। বিজ্ঞানে উন্নত বিশ্ব যখন মহাকাশ অধ্যয়ন করছে আমরা তখন ধোলাইখাল প্রযুক্তি নিয়েই মহাখুশী। আর বাজার অর্থনীতিতে যখন উন্নত বিশ্ব অভিন্ন বাজার থেকে অভিন্ন ডলারে পৌঁছে যাচ্ছে আমরা এদেশে তখন জাল মুদ্রা তৈরীর কারখানা আবিষ্কারে ব্যস্ত। চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাশ্চাত্য যখন কোলন কিংবা ক্রোমজম নিয়ে গবেষণা করছে আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান তখন হার্ট পরীক্ষার জন্য 'রেডিওগ্রাম' মেশিন পর্যন্ত চালাতে অপারগ। এভাবে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বমানে উত্তীর্ণ হতে পারে না। সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

একটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাতারাতি বদলে দেয়া যায় না। আমাদের প্রত্যাশা, ধীরে ধীরে পরিকল্পনার আলোকে এদেশে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা রূপ লাভ করুক-যা হবে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে অবিলম্বে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন খুবই জরুরী।[১৩]

পরীক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত উন্নতির মান বা মূল্য নিরূপণ যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর সংগে ঐ সমস্ত স্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর পাঠ ব্যবস্থা এবং তার ফলাফল কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে উন্নতমানের পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে তা মূল্যায়ন করা সম্ভব। পরীক্ষার উদ্দেশ্য যেহেতু বহুবিধ সেহেতু উদ্দেশ্যের তারতম্য অনুযায়ী পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষার গঠন প্রণালী এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার তারতম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের দেশে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় এর প্রতিফলন তেমন ঘটে না। এখানে মূলত রচনাধর্মী বহিঃপরীক্ষার উপর অতি মাত্রায়

---

১৩. আহমেদ স্বপন মাহমুদ, 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি', দৈনিক ভোরের কাগজ, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে অন্তত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও সে পরীক্ষার ফলাফলের উপর যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে পরীক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের গভীরতা, ব্যক্তিত্ব, নৈতিক ও মানসিক গঠন, জাতীয় সমস্যাবলীর সাথে পরিচিতি, অধ্যবসায়, উদ্যম ও আত্মনির্ভরশীলতা ইত্যাদি সম্পর্কে সার্বিক মূল্যায়ন ততটা হয় না।

১৯৮৮ সালে[১৪] পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি তাঁদের রিপোর্টে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় এনেছে। কতিপয় শিল্পোন্নত দেশ এবং কয়েকটি প্রতিবেশী দেশে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁরা আলোচনা করেছেন এবং সংগৃহীত তথ্য ও জনমত বিশ্লেষণ করে পরীক্ষার উদ্দেশ্য, ধরন, পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান সুপারিশ রেখেছেন। তাঁদের মতে বহিঃ এবং আন্তঃপরীক্ষাকে পরস্পর সম্পূরক হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্য সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন প্রয়োজন। সীমিত দু-একটি পরীক্ষার উপরে নির্ভর না করে তাঁরা বছরব্যাপী পরীক্ষা, অভীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণের সুপারিশ করেছেন। কমিটির মতে 'চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশে আন্তঃ, বহিঃ ও সমন্বিত নম্বর পৃথকভাবে দেখাতে হবে'। একই সাথে কমিটি রচনাধর্মী, নৈর্ব্যক্তিক এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সমন্বয়ে পরীক্ষা পরিচালনার পক্ষেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা প্রাক পরীক্ষণের মাধ্যমে আদর্শায়িত প্রশ্ন তৈরি এবং প্রশ্নব্যাংক গড়ে তোলার সুপারিশ করেছেন। পরীক্ষার্থীদের সরাসরি পাস/ফেল ঘোষণা না করে প্রতি বিষয়ে তাদের সফলতা ও বিফলতার নিরিখে গ্রেডিং সম্পর্কেও তাঁরা আলোচনা করেছেন।[১৫]

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থাতে শিক্ষকরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই শিক্ষা, পরিবেশ এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হলে অগ্রণী ভূমিকা তাঁদেরই গ্রহণ করতে হয়। যে কারণেই হোক শিক্ষক সমাজ তাঁদের পূর্ব গৌরব অনেকাংশে হারিয়ে বসেছেন। পূর্বের সেই অকুণ্ঠশ্রদ্ধা ও প্রশ্নাতীত মর্যাদার আসনে তাঁরা সমাসীন নন। মহল বিশেষে তাঁদের যোগ্যতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, পাঠদানে কুশলতা, পরীক্ষাপত্র মূল্যায়নে নিরপেক্ষতা ইত্যাদি নিয়েও কথা উঠেছে। এই অবস্থা শিক্ষক, ছাত্র অভিভাবক বা সুশীল সমাজ কারো জন্যই অভিপ্রেত হতে পারে না। শিক্ষকদের নির্বাচন, নিয়োগ, উপযুক্ত ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ, আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা, গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে যেমন তেমনি প্রয়োজন প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন ও সমন্বিতকরণের। প্রতিভাবান, দক্ষ ও নিবেদিত শিক্ষকদের যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও উৎসাহ দান এবং সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের সাথে সাথে শিক্ষকদেরও নিয়মিত মূল্যায়ন অধিকার সমাজের জন্য উন্মুক্ত রাখা দরকার। এ মূল্যায়ন শিক্ষক নিজে, তাঁর সহকর্মীরা, বিশেষজ্ঞরা অথবা কর্তৃপক্ষ করতে পারেন। তবে এ মূল্যায়ন অবশ্যই নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক হতে হবে এবং এর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি পূর্ব নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস যে-কোন জাতির জন্যেই এক অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে। তাই দেশের সর্বস্তরের জনগণের উচিত উক্ত অনভিপ্রেত সামাজিক সমস্যাটি নিরসণের জন্য যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করা। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সন্ত্রাসের যোগসূত্র প্রমাণিত। তাই সন্ত্রাস দমনে সরকার ও বিরোধী দলের ব্যাপক ভূমিকা থাকা উচিত। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের স্বরূপ ও পরিণতি পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করা যায় যে, সন্ত্রাসের অশুভ প্রভাব সমাজ-জীবনে কতটা ভয়ংকর ও ক্ষতিকর। সন্ত্রাসের এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিক্ষাঙ্গন তথা দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার প্রয়াসে সন্ত্রাসীদের সরকার ও বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল তাদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমন সহজতর হবে।

---

১৪. ১৯৮৮ পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সুপারিশের আলোকেই দেশের সাধারণ শিক্ষা ধারায় ৫০% নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা মূল্যায়ন নামে পরীক্ষায় সন্নিবেশন করা হয়।

১৫. ড. আবু ইউসুফ মোঃ নেছার উদ্দিন, ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে বাংলাদেশের অবদান (১৯৭১-১৯৯৯ খ্রী.), অপ্রকাশিত পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ, ঢা বি, ২০০০২, পৃ ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের ভূমিকা : প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালকমণ্ডলী/বৈধ কর্তৃপক্ষের সরাসরি তত্ত্বাবধানে তার নিজস্ব আইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু আইনানুগ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাঙ্গনে অবলীলাক্রমে সন্ত্রাস সংঘটিত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠছে।[১৬] তাই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন কোনভাবেই কাম্য নয়। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে।

১. সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করা; ২. পরীক্ষা ও পাঠদান যথাসময়ে শেষ করা; ৩. হল/হোস্টেলে মেধানুযায়ী সিট বন্টন; ৪. শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি ও আঞ্চলিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা; ৫. আইনের যথাযথ প্রয়োগ; ৬. শিক্ষাঙ্গনে যথোপযুক্ত আচরণবিধি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের ব্যাপকতা ভয়াবহতা এ কথাই প্রমাণ করে যে, সন্ত্রাস আজ আর কোন নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা গোটা সমাজদেহে ক্যান্সারের ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে জাতীয় মেধার বিরাট অপচয় হচ্ছে এবং এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্ষেত্রে 'সিস্টেম লস'-এর ন্যায় যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে অচিরেই জাতীয় জীবনে অপূরণীয় মেধার শূন্যতা দেখা দেবে।[১৭] এটা সুস্পষ্ট যে, আমাদের দেশের মতো অনুন্নত দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ছাত্র-যুবসমাজকে একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এরই ফলে আমাদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ছাত্ররা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।[১৮] রাজনৈতিক আদর্শের আড়ালে দেশের যুবসমাজ, বিশেষ করে ছাত্র-যুবসমাজ অনেক সময় অজ্ঞাতসারেই কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী হয়ে ওঠে। এ ধরনের পরিস্থিতিতেই যুক্তির পরিবর্তে পেশীশক্তি প্রধান হয়ে ওঠে। অভাব, নিরাপত্তাহীনতা এবং বেকারত্বের সম্ভাব্য পীড়নের আশঙ্কায় আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে আজ বাংলাদেশের সমগ্র ছাত্র সমাজ অস্থির এবং এই অস্থিরতার সুযোগেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের অনুপ্রবেশ ঘটছে। তাই দেখা যায়, যে বয়সে ছাত্রদের আদর্শবাদী হয়ে বিশ্বভুবন গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখার কথা, ঠিক সেই বয়সেই তারা চোরাগলির পথে পা বাড়িয়ে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে, যার ফলে তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন সন্ত্রাসের আবহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।[১৯] এমতাবস্থায় সন্ত্রাস ও তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে শিক্ষাঙ্গন এবং শিক্ষার্থীদের রক্ষা করে দেশ ও জাতির স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনগুলোকে মেধা লালনের ক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ আজ জাতির সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, আমরা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যর্থ হলে জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সমূহ আশঙ্কা দেখা দেবে। শিক্ষাঙ্গনসমূহে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য দূর করার প্রশ্নে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে। তাদের অঙ্গীকার করতে হবে :

- পেশীশক্তি নয়, যুক্তি ও বক্তব্যের জোরেই তাদের সমর্থক ছাত্র-সংগঠনসমূহকে নিজেদের সমর্থনের পরিধি বৃদ্ধির কাজ করতে হবে।
- কেউ সশস্ত্র ক্যাডার রাখবে না, নিজ সংগঠনে সন্ত্রাসী ও দুর্বিনীত কর্মীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেবে না।

---

১৬. আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর, 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা', মাসিক চিন্তাভাবনা, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ ২১।

১৭. কাজী খালেকুজ্জামান আহমদ, সাপ্তাহিক বিচিত্রা (বিশেষ সাক্ষাৎকার), ঢাকা, ১৯৯২, পৃ ১৪।

১৮. এম. এ. তাহের, 'যুব সমাজ ও জাতীয় উন্নয়ন : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে', *দি জার্নাল অব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট*, ঢাকা, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২, পৃ ১১।

১৯. আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, 'বর্তমান যুব সমাজ', *যুব জীবন বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

- আইনানুগ কর্তৃপক্ষের দ্বারা কোন সংগঠনের কর্মী সন্ত্রাসমূলক আচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে তার দণ্ড মওকুফের জন্য রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করবে না। সন্ত্রাসী আচরণের ক্ষেত্রে দলের নীতি হবে সম্পূর্ণ নৈর্বক্তিক।
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন এবং মানুষ ও সম্পদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। মহলবিশেষের সংকীর্ণতা বা স্বৈরাচারী মনোভাব ও আচরণের জের হিসেবে উচ্চশিক্ষার পবিত্র বিদ্যাপীঠ যেন কোনভাবে কলুষিত না হয়, শিক্ষার্থী তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকার ও স্বাধীনতা যেন ক্ষুণ্ণ না হয় এ ব্যাপারে গোটা জাতিকে সতর্ক থাকতে হবে।
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। সুতরাং সন্ত্রাস দমনে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিপুল জনমত গড়ে তোলার জন্য জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোকে সক্রিয় নীতি গ্রহণ করতে হবে। টেলিভিশন ও রেডিওতে সন্ত্রাসের উৎস, প্রসার ও পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে রাজনৈতিক নেতা, ছাত্রনেতা, শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলোচনা, বিতর্ক, নাটকসহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নত বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার প্রচার আমাদের ছাত্র-শিক্ষকদের অধিকতর বিদ্যামনস্ক হতে উৎসাহিত করবে।
- আমাদের দেশে প্রচলিত আইন ও বিধি-ব্যবস্থা সন্ত্রাস দমনে নিশ্চয়তা বিধান করতে যথোপযুক্ত ও যুগোপযোগী নয়। এ জন্য প্রয়োজন জনপ্রতিনিধিদের সর্বসম্মতিক্রমে সন্ত্রাস দমনে নতুন, যুগোপযোগী ও কার্যকর আইন প্রণয়ন এবং আইনের সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।[২০]

---

২০. আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর, 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা', প্রাগুক্ত, পৃ ২১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : দুই
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ও প্রশাসনিক সমস্যা বিদ্যমান। এর উন্নয়নকল্পে নানা সুপারিশ এসেছে অভিজ্ঞ মহল থেকে। পত্র-পত্রিকায় এসব মতামত প্রকাশিতও হচ্ছে। সরকারও বিভিন্ন কমিশন গঠন করে এ প্রয়াসে অংশীদার হয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়ন করা হয় নি কোন সুপারিশ। ইসলামী শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে এখানে কতিপয় নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

ক. 'আলীয়া মাদরাসা

ব্যবস্থাপনা কাঠামো : মাদরাসা বোর্ড

আলীয়া মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে। দেশে একটি মাত্র বোর্ড এজন্য বিদ্যমান রয়েছে। এর উপর 'আলীয়া মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিশাল দায়িত্ব থাকায় কাজের পরিধির তুলনায় ব্যবস্থাপনার স্বল্পতায় সার্বিক ব্যবস্থার কোন উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

এ কারণে দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে মাদরাসা বোর্ড স্থাপন জরুরী। স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে এ বোর্ডের একাধিক শাখা স্থাপন প্রয়োজন। এতে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় গতির সঞ্চার হবে। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় অনাকাঙ্খিত জটিলতা দূর হবে। বোর্ডের জনবল কাঠামোকে দেশের অন্যান্য বোর্ডের সাথে মিল রেখে ঢেলে সাজানো দরকার। সচিব, উপসচিব, সহকারী সচিব পদসহ একটি সাচিবিক দপ্তর সৃষ্টি করা জরুরী। বর্তমানে রেজিস্ট্রার সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় সারা দেশের মাদরাসা শিক্ষার বিরাট দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়। ফলে অযথা প্রশাসনিক জটিলতা লেগেই থাকে। তাছাড়া ইবতিদায়ী মাদরাসাসমূহের মঞ্জুরী প্রদান ও তত্ত্বাবধানের জন্য বর্তমানে একজন সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দায়িত্ব পালন করেন। এ শাখাকে প্রাণচঞ্চল করে মাদরাসা শিক্ষার তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ইবতিদায়ী মাদরাসার সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া জরুরী।

সিলেবাস ও পাঠক্রম সমস্যা

বোর্ড স্বায়ত্তশাসন লাভ করার পর ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত কোন পাঠক্রম চালু করতে পারে নি। এ দায়িত্ব পালনের জন্য বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সেকশনে লোকবল মাত্র চার জন। দীর্ঘ সময় চলে গেলেও ইবতিদায়ী পরবর্তী স্তরগুলোতে পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস প্রণীত হয় নি। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বোর্ডের দীর্ঘ ইতিহাসে এ পর্যন্ত কারিকুলাম প্রণয়ন সম্ভব হয় নি। নানা ত্যাগ তিতীক্ষার বিনিময়ে যে কাজটি ১৯৯৪ সালে সূচনা করা হয়েছিল, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পর্যায়ে আছে তা বন্ধ হয়ে আছে।

কারিকুলাম শিক্ষা ব্যবস্থার রক্ষা কবচ। ইবতিদায়ী স্তরে কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের কারণে শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পাঠ্য পুস্তকেরও মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এ স্তরে পাঠ্য পুস্তকের গুণগত মান বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

দাখিল, আলিম ও কামিল পর্যয়ে সিলেবাস প্রণয়ন অতীব জরুরী। এ স্তরগুলোতে শিক্ষার মান আশানুরূপ নয়। এস্তর গুলোতে বর্তমানে যেসব পাঠ্যপুস্তক রয়েছে তা অপরিকল্পিত ও আধুনিক চিন্তা চেতনার বিরোধী। এস্তর

Dhaka University Institutional Repository

গুলোর পাঠ্যপুস্তকের অবস্থা খুবই হতাশা ব্যঞ্জক। সময়োপযোগী এবং সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বয় সাধন করে এ সকল স্তরে কারিকুলাম প্রণয়ন করে পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হলে মাদরাসা শিক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।[২১]

বাংলাদেশ মাদরাসা বোর্ডের অধীনে 'টেক্সট্ বুক উইং' নামে যে বিভাগটি চালু আছে, তা একটি শিক্ষা ধারার পাঠ্যপুস্তক, সিলেবাস প্রণয়ন, মানবন্টন, মেধার মূল্যায়ন, উন্নয়ন, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। এনসিটিবি'র অনুকরণে মাদরাসা শিক্ষা ধারার সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের জন্য শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন। বর্তমান প্রক্রিয়ায় মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে রেখেও কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক সমস্যার সমাধানে বিশেষ ফল পাওয়া যাবে। লোকবল, অফিস উপকরণ ও যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাবে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অন্যান্য শিক্ষা ধারায় এ সংক্রান্ত উন্নতি হলেও মাদরাসা শিক্ষা ধারায় এখনও তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থা বিরাজ করছে। উল্লেখ্য যে, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞগণই একটি যথাযথ পাঠক্রমও সিলেবাস প্রণয়ন করতে পারে। অথচ বাংলাদেশ মাদরাসা বোর্ডের 'টেক্সট বুক উইং'-এ নিয়মিতভাবে কোন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত নেই। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে অস্থায়ীভাবে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়, যা সুষ্ঠু কাজের জন্য যথেষ্ট নয়। এনসিটিবিতে এ কাজের জন্য অনেকগুলো পদ থাকলেও মাদরাসা বোর্ডের এ শাখায় কোন পদ সৃষ্টি করা হয় নি এবং কোন লোকও নিয়োগ করা হয় নি। কারিকুলাম শাখার জন্য কোন নিয়মিত দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নেই। মাদরাসা পরিদর্শক তার দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। এজন্য পাঠ্য পুস্তকের ও সিলেবাসের মত জরুরী বিভাগে একজন নিয়মিত কর্মকর্তা নিয়োগ জরুরী।

প্রশিক্ষণের সমস্যা

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের এ সময়ে শিক্ষাদান ও শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিস্তৃতভাবে বলার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাদরাসা শিক্ষা ধারায় প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা এখনো গড়ে উঠে নি। সাধারণ শিক্ষাধারায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে নগন্য সংখ্যক শিক্ষক মাদরাসাসমূহে পাঠদান করছে। এ ছাড়া অবশিষ্ট সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণবিহীনভাবে মাদরাসাসমূহে পাঠদান করছে।

উল্লেখ্য মাদরাসা বোর্ড নব্বইয়ের দশক থেকে একটি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এটিও নিয়মিত করার উদ্যোগ নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তরের সহায়তায় সরকারীভাবে গাজীপুরে একটি মাদরাসা শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট চালু করা হয়েছে। একে যথাযথ মানসম্পন্ন করে এখানে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।[২২]

পরিচালনা কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব

মাদরাসায় কর্মরত শিক্ষকদের বেতন ভাতা, চাকুরীকালীন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তদারকীর জন্য পৃথক কোন অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিপ্তরের অধীনে এজন্য মাত্র একজন সহকারী পরিচালকের পদ 'বিশেষ শিক্ষা' নামে রাখা হয়েছে। বর্তমানে দেশে মাদরাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৩]

ফলে মাদরাসা শিক্ষা ধারার জন্য পৃথক অধিদপ্তর সৃষ্টি করা জরুরী। জাতীয় শিক্ষা কমিটি ১৯৯৭ খ্রী.-রিপোর্টে এ ব্যাপারে সুপারিশও করেছে। অবশ্য তাতে আপাততঃ 'পরিচালক (মাদরাসা)' নামে একটি পদ সৃষ্টি করে সাবেক অবস্থায় রেখেই ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হচ্ছে। এটা করা হলেও কিছুটা উন্নতি হবে। আর পর্যায়ক্রমে পৃথক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা ও তদারকীর ব্যবস্থা করতে পারলে মাদরাসা শিক্ষা ধারায় আশানুরূপ ফল আসবে। পৃষ্ঠপোষকতাহীন তদারকী যেমন অর্থহীন আবার তদারকী বিহীন পৃষ্ঠপোষকতাও

---

২১. বিভিন্ন পত্র পত্রিকার রিপোর্ট, কমিটি রিপোর্ট ও শিক্ষা কমিশনসমূহের সুপারিশের আলোকে।

২২. দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য পিটিআই ও টিটিসি রয়েছে। বেসরকারী পর্যায়েও সম্প্রতি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার মানের কোন মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি।

২৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিস রেকর্ড অনুযায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যহীন হতে বাধ্য। মাদরাসা শিক্ষা ধারার বেলায় এ দু'টো অবস্থাই বিরাজমান আছে। ফলে ব্যবস্থাপনার উন্নতি যেমন আশানুরূপ হচ্ছে না, তেমনি এ ধারায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক সমাজেরও সার্বিক উন্নতি হচ্ছে না।

ছাত্র সংখ্যার স্বল্পতার কারণ ও এর প্রতিকার

দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ধারার তুলনায় মাদরাসা শিক্ষা ধারায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম। এর কারণ একাধিক। তবে এর মূল কারণ হচ্ছে, ইবতিদায়ী মাদরাসাসমূহের উন্নয়নের অভাব। ইবতিদায়ী মাদরাসাসমূহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমানের পাঠদান করা হলেও রহস্যজনক কারণে নিম্নের সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে :

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত পূর্ণাঙ্গ সরকারী কোন ইবতিদায়ী মাদরাসা নেই।

২. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাহিরে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত সুযোগ সুবিধাও তারা পাচ্ছে না। ১৯৯২ সালে, প্রতি ইউনিয়নে ১টি করে ইবতিদায়ী মাদরাসাকে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত বেতন ভাতা দেয়ার কথা থাকলেও নগন্য সংখ্যক মাদরাসা এর আওতায় এসেছে।

৩. ইবতিদায়ী মাদরাসাসমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কোন প্রকল্পই সরকারীভাবে এ যাবৎ গৃহীত হয় নি। ফলে গৃহ ও শিক্ষার প্রয়োজনীয় পরিবেশগত সুবিধা হতে প্রতিষ্ঠানগুলো বঞ্চিত রয়েছে।

৪. সরকারী অন্যান্য সময়োপযোগী সুযোগ সুবিধা ইবতিদায়ী মাদরাসাসমূহ পাচ্ছে না।

আশির দশক থেকে ২০০০ খ্রী. পর্যন্ত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুমোদন প্রাপ্ত ইবতিদায়ী মাদরাসা প্রায় বিশ সহস্রাধিক। এগুলো থেকে ভালো মাত্রায় ছাত্র-ছাত্রী বের হয়ে আসছে না। যার ফলে তৃণমূল পর্যায়ে নড়বড়ে শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমই লক্ষ্য করা যায়। সংবিধানে বর্ণিত সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার দাবীকে ইবতিদায়ী মাদরাসাগুলো পূরণ করছে। সাথে সাথে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার দায়িত্বও তারা পালন করছে। নিরক্ষতার হাত থেকে জাতিকে বাঁচাবার সংগ্রামে তাঁরা সক্রিয়। অথচ এফিলিয়েটেড একটি বোর্ড এদের মঞ্জুরী দেয়ার পর কেন তাদেরকে সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

উল্লিখিত সমস্যাগুলোর সমাধান করা হলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং নিরক্ষতার হারও দেশে উল্লেখযোগ্য হারে কমবে।

বিজ্ঞান ও কর্মমূখী শিক্ষার অনুপস্থিতি

মাদরাসা শিক্ষা ধারায় আশির দশক থেকে বিজ্ঞান শিক্ষা চালু হয়। বাণিজ্য ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এখনও অনুপস্থিত। বিজ্ঞান শিক্ষার সার্বিক অবস্থা সাধারণ শিক্ষার তুলনায় বৈষম্যমূলক। জাগতিক জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভবিষ্যত দিক নির্দেশনার ব্যবস্থা মাদারাসা শিক্ষা ধারায় অনুপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনাময় বহু শিক্ষার্থী দাখিল স্তর বা তারও পূর্ব থেকে 'ড্রফ আউট' হয়ে অন্য ধারায় স্থানান্তরিত হচ্ছে, কিংবা একেবারেই শিক্ষা থেকে সরে যাচ্ছে।

উচ্চস্তরে সমতার অভাব

যে কোন শিক্ষা ধারার প্রথম থেকে শেষ স্তর পর্যন্ত পর্যায় ক্রমিক মান নির্ণিত থাকে। মাদরাসা শিক্ষা ধারায় আলিম শ্রেণীকে ১৯৮৭ সাল থেকে এইচএসসি'র মান দিলেও ফাযিল ও কামিল স্তরের কোন সমমান না থাকায় ফাযিল ও কামিল স্তরটি মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ স্তর হলেও আলিম পাশের পর ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপক হারে সাধারণ শিক্ষাধারার দিকে ধাবিত হচ্ছে। সমমান হলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বছর যথাযথ কাজে লাগতো এবং মাদরাসা শিক্ষা ধারার উচ্চস্তরের শিক্ষার অবস্থা আরও উন্নত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকটি শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে (স্বাধীনতার পর) ফাযিল ও কামিল শ্রেণীকে মাদরাসা বোর্ডের অধীনে না রেখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়ার প্রস্তাব করা হলেও তা আজও বাস্তবায়িত হয় নি। যার কারণে দেশের একমাত্র মাদরাসা বোর্ড অনাকাঙ্খিত শিক্ষা জটিলতা নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের শিক্ষা নীতিমালারও এটা পরিপন্থী। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল ও কামিল স্তরকে নেয়া হলে উচ্চ স্তরে শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াও গবেষণাসহ অপরাপর দিকে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতো। মাদরাসা শিক্ষা পূর্ণতা লাভের একটি সুযোগ লাভ করতো।[২৪]

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ শিক্ষার উচ্চ স্তরের শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এর মধ্যে, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের অধীনে আরবী, ইসলামিক স্টাডিজ ও উর্দূ-ফারসী বিভাগ চালু করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোতে আসন সংখ্যা ও সুযোগ সুবিধা এবং আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের পরিকল্পনা ছিল, ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবীর জন্য পৃথক অনুষদ প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তা কলা অনুষদের অধীনস্থ বিভাগে পরিণত করা হয়েছে। অথচ ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী অনুষদ পৃথকভাবে চালু করলে ইসলামী শিক্ষার উচ্চ স্তরে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হতো।[২৫]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান স্থানে অবস্থিত হওয়ায় দেশের সব অঞ্চলের শিক্ষার্থীগণ সেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ পাচ্ছে না।

ঢাকায় বা দেশের মধ্যবর্তী কোন জেলায় তা প্রতিষ্ঠিত হলে সামগ্রিকভাবে সারা দেশের শিক্ষার্থীদের উপকারে আসত। সাথে সাথে এর অধীনে মাদরাসা বোর্ডের ফাযিল ও কামিল শ্রেণীকে অধিভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হলে তা সমস্যার সমাধানের জন্য নিয়ামক হিসেবে কাজে আসত।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : প্রত্যাশা ও বাস্তবতা

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদৌলার পতনের পর ইংরেজগণ দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে। তারা মুসলিম আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা উপেক্ষা করে সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষা এ দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। যা ইসলাম প্রিয় জনতার প্রাণে আঘাত হানে। ১৯৪১ খ্রী. The Mohamedan Education Advisory Committee সরকারী পর্যায়ে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী পেশ করেন। পরবর্তীতে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা আকরম খাঁ প্রমুখের নেতৃত্বে আন্দোলনের সূচনা হয়। যার লক্ষ্য ছিল 'বিজ্ঞান ও মানবিক বিষয়ের সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা।' উদ্দেশ্য ছিল ১. কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে ইসলামী শিক্ষার সংযোগ ও সমন্বয় সাধন ২. নতুন আঙ্গিকে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যস্তকরণ ৩. ওহীভিত্তিক ও জাগতিক জ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দেশে একটি সুসংহত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন।

১৯৩৭ খ্রী. অবিভক্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক কলকাতা মাদরাসায় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। মাদরাসার ছাত্ররা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী পেশ করে। ১৯৪১ খ্রী. 'মোহামেডান এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি' ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী পেশ করে। ১৯৪৬-৪৭ খ্রী. মাদ্রাসা সিলেবাস কমিটির সভাপতি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোর সুপারিশ পেশ করেন। ১৯৪৯ খ্রী. মাওলানা আকরাম খাঁ একটি কমিটি গঠন করে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জোরদার করেন। ১৯৬৩

---

২৪. ড. আবু ইউছুফ মোঃ নেছার উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৬।

২৫. পৃথক অনুষদ হলে 'Islamisation of Knowledge'-এর চাহিদা মত ইসলামের শাখা বিষয়গুলোর গুরুত্বানুসারে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী খোলার সুযোগ হতো। বিষয় করার কারণে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিষয়গুলোর অংশবিশেষ দিয়ে যে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে, তা যথাযথ জ্ঞান লাভের সহায়ক নয়। (বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সিলেবাস পাঠক্রম দ্র.)।

Dhaka University Institutional Repository

ও ৬৫ খ্রী. ঢাকায় মাদরাসা ছাত্রদের মহাসমাবেশের মাধ্যমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয় এবং একই বছরের ৩১ মার্চ পবিত্র মক্কায় অনুষ্ঠিত ওআইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন।[২৬]

পরবর্তীতে ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের ২২ নভেম্বর শিল্পনগরী কুষ্টিয়া হতে ২৫ কি মি ও ঝিনাইদহ শহর হতে ২১ কি মি দূরে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ সীমান্তবর্তী শান্তিডাংগার দুলালপুরে তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন। ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের ১০ জুলাই জাতীয় সংসদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাশ হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২১ জুলাই ঢাকার অদূরে গাজীপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু তখনও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয় নি। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ মাদরাসা ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র ভর্তির দাবীর প্রেক্ষিতে তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দীন আহমদ ১৯৮৫/৮৬ শিক্ষাবর্ষে শরীয়াহ ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ৪টি বিভাগে ছাত্র ভর্তির মাধ্যমে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৮৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত প্রসপেক্টাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বলা হয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যলয়ে অর্জিত হয় না এমন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই বিশ্ববিদ্যলয় নিবেদিত।[২৭] ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের তৎকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী পুনর্বার কুষ্টিয়াতে ক্লাস উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশের জনগণের আশা ছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষা-ভাষীদের ধর্মীয় চেতনা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ বিকাশের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কোন গুরুত্বই নেই। বস্তুতঃ মাদরাসা ছাত্রদের ক্রমাগত আন্দোলন এবং অবিশ্রান্ত সংগ্রামই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করে তুলেছিল। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলতঃ ইসলামী শিক্ষার জন্য। যেখানে মাদরাসা ছাত্রদের অগ্রাধিকার থাকবে। কিন্তু বর্তমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মাদরাসা ছাত্রদের তেমন কোন গুরুত্বই দেয়া হয় না। যেখানে প্রয়োজন ছিল নতুন নতুন ইসলামী বিভাগ খোলার মাধ্যমে মাদরাসা ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার পথকে সুগম করে তোলা, সেখানে প্রস্তাবিত 'ইসলাম এন্ড কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন' অনুষদে বিভিন্ন প্রকার টালবাহানা করে শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে না।

দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যেমন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ তৈরি করা হয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ তৈরি করা হয়, তেমনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব সংক্রান্ত বিষয়াদী শিক্ষাদানের মাধ্যমে ইসলামী বিশেষজ্ঞ তৈরী হবে এটাই জাতির কাম্য। কিন্তু সে আশা আজ সুদূর পরাহত।

জাতি আশা করেছিল, এ বিশ্ববিদলয়ে সন্ত্রাস মুক্ত সুন্দর ও নির্মল পরিবেশে ছাত্র ছাত্রীরা লেখাপড়া করবে। বিভিন্ন সময় সন্ত্রাস সৃষ্টি মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনকে কলুষিত করা হয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে যাতে সমস্যা না হয় এজন্য ছাত্র ভর্তি ফি এমন হবার প্রয়োজন যাতে গরীব পিতা-মাতারা অর্থ যোগান দিতে পারেন। কিন্তু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফি দ্বিগুণ এমনকি তারও অনেক বেশি। যা বিশ্বদ্যিালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীর অন্যতম শর্ত ছিল এ বিশ্ববিদ্যালয় হবে সম্পূর্ণ আবাসিক এবং তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্কলারশিপের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু তা করা হয় নি। বরং প্রায় ছয় সহস্রাধিক ছাত্র ছাত্রীর জন্য মাত্র তিনটি হল। তাও আবার শহীদ জিয়াউর রহমান হলের একাংশ টাকার অভাবে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীদেরকে ২০/২৫ কি মি দূর ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়াতে নিম্নমানের ছাত্রাবাসে অধিক টাকায় ভাড়া করে থাকতে হয়।[২৮] কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ শহর হতে

২৬. সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, বর্ষ ১০ সংখ্যা ২৬, ২৭ সেপ্টেম্বর- ৩ অক্টোবর ২০০০ খ্রী.।

২৭. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (পরে কুষ্টিয়া) এর প্রসপেক্টাস দ্র.।

২৮. বিভিন্ন সময়ের জাতীয় পত্রিকার রিপোর্টের আলোকে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় অনেক দূরে অবস্থিত হবার কারণে পর্যাপ্ত সংখ্যক যানবাহনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল, সেখানে মাত্র কয়েকটি বাস আছে। প্রয়োজনের তুলনায় যা একেবারেই অপ্রতুল; সেগুলোর অধিকাংশই ভাড়া করা নিম্নমানের যা অধিকাংশ সময় বিকল হয়ে পড়ে থাকে। ফলে প্রায় সময়ই অনেক ছাত্রের পরীক্ষার সময়ও যথাসময়ে ক্যাম্পাসে আসা সম্ভব হয় না। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম ইসলামী ঐতিহ্যের আলোকে হবে- এটাই বাস্তবতা। দেশবাসীর দাবী ছিল হলগুলোর নাম সাহাবী ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের নামে নামকরণ করা হবে। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আকারে রূপ দেয়ার হীনচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বস্তুতঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অনেক ত্যাগ তিতীক্ষা ও আন্দোলনের ফসল। জাতি আশা করেছিল এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তৈরি হবে ইমাম আবূ হানিফার মত ফকিহ ও আইনবিদ, যাঁরা জাতিকে কুরআন সুন্নাহ'র সঠিক দিক নির্দেশনা দেবেন। ইবনে খালদুন ও তাবারীর মত ঐতিহাসিক, যাঁরা সমাজের সামনে তুলে ধরবে সঠিক ও সুন্দর ইতিহাস। ইবনে সিনার মত চিকিৎসা বিজ্ঞানী, ইবনে কাসিরের মত মুফাস্‌সীর, শাহ ওয়ালিউল্লাহর মত মুহাদ্দিস, ইমাম গাযালীর মত দার্শনিক, যারা জাতিকে সঠিক সুন্দর ও কল্যাণের পথ দেখাবেন। উল্লেখ্য যে, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী[২৯] টাঙ্গাইলের সন্তোষে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে যান। কিন্তু একে পুরোপুরি রূপায়নের আগেই তিনি ইন্তিকাল করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে গুণগত ও মানগত উন্নতির জন্য চেষ্টা করলে তা দেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখবে।

১৯৯৭ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি শাখা বৃদ্ধি করে এর অধীনে মাদরাসা বোর্ডের ফাযিল ও কামিল শ্রেণীর কার্যক্রম ন্যাস্ত করার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখিত প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করলে সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উপকার থেকে দেশের ইসলামী শিক্ষা বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ উপকার পাবেন না। ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী শিক্ষার বিষয়াদী পড়ানোর এবং গবেষণার ব্যবস্থা করেছে। তবুও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন এক সময় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকায় ছিল, দেশের ইসলামী শিক্ষার বেলায় এ ধরনের ভূমিকায় নিয়োজিত রাখার জন্য ঢাকা কেন্দ্রিক একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা জরুরী।

---

২৯. **মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী** : পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান জেলা) ধানগড়া গ্রামে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শরাফত আলী খান। বাল্যকালেই পিতৃহারা হয়ে তিনি শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। সাথে সাথে তিনি বিভিন্ন মনীষীর সহচার্য লাভের চেষ্টা চালান। সিরাজগঞ্জের একটি মাদরাসায় তাঁর প্রাথিমিক শিক্ষা শুরু হলেও বেশী দিন তা স্থায়ী হয় নি। ডানপিটে স্বভাবের কারণে তিনি বেশী দিন এ মাদরাসায় পড়াশুনা করতে পারেন নি। এসময় মহাজনী প্রথা ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় আনুষ্ঠানিক লেখা পড়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে নি। পরে অনেকের পরামর্শে তিনি ১৯০৭ খ্রী. দেওবন্দ মাদরাসায় অধ্যায়নের জন্য গমন করেন। এর আগে তিনি ২৪ বছর বয়সে আসামের জলেশ্বর এলাকায় গমন করেন। দেওবন্দ দু'বছর অধ্যয়ন শেষে তিনি পুনরায় জলেশ্বর ফিরে যান। ১৯২৩ খ্রী. তিনি জলেশ্বর ত্যাগ করে আসামের 'ভাসান চর' গমন করেন। এখানেই তাঁর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বিরাট সময় অতিবাহিত হয়। এ কারণেই তাঁর নামের সাথে 'ভাসানী' শব্দটি যুক্ত হয়। তিনি একাধিকবার কারা বরণ করেন। উপমহাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের তাঁর সময়কালের সকল কর্মকাণ্ডে মাওলানা ভাসানীর জীবনকে পৃথক করে দেখা যায় না। সকল অধ্যায়ে তার সক্রিয় উপস্থিতি তাকে দেশে বিদেশে জনপ্রিয় করে তোলে। দল মত নির্বিশেষে তাঁকে 'মাওলানা ভাসানী' বলে অভিহিত করতে থাকে। দেশ মাতৃকার স্বাধীকার আন্দোলন, দেশাত্ববোধ তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। এজন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ, খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আওয়ামী লীগসহ ঐতিহাসিক সকল আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের জন্য মহাঅভিশাপ মনে করে ভারত থেকে, পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করার জন্য ১৯৭৬ খ্রী. তিনি ফারাক্কা লং মার্চ কর্মসূচী পালন করেন। বিশ্বের বহু দেশ তিনি সফর করেন এবং বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষ চারাবাড়ী এলাকা পুনর্দখল করেন। এখানেই তিনি জীবনের শেষভাগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সার্থক একটি শিক্ষা প্রকল্প হাতে নেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৬ খ্রী. ৯৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। দ্র. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (পরিশিষ্ট) ১৯৮৫, পৃ ১৫-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে মাদরাসা-ই-আলীয়া ঢাকাকে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের যে ঘোষণা করা হয়েছিল, তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন সম্ভব। প্রয়োজনে এর প্রশাসনিক ভবন অন্যত্র স্থাপন করে বর্তমান স্থানেই এর একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব।

সরকারী মাদরাসার স্বল্পতা

দেশের 'আলীয়া মাদরাসাসমূহের মধ্যে মাত্র তিনটি মাদরাসা সরকারী মাদরাসা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। অথচ সাধারণ শিক্ষা ধারায় প্রত্যেক জেলায় একাধিক মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্কুল ও কলেজ সরকারীভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। সেখানে মাদরাসা শিক্ষাধারায় প্রতি জেলায় কমপক্ষে একটি মাদরাসা সরকারী করা আবশ্যক। তাহলে দেশে মাদরাসা শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন, উন্নয়ন ও উচ্চতর গবেষণার পথ প্রশস্ত হবে। আশির দশকে সরকারের শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রতি জেলায় একটি করে মাদরাসা সরকারীকরণের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না হওয়ায় বহুলাংশে মাদরাসা শিক্ষা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় প্রস্তাবিত ৬৪টি মাদরাসা সরকারী করা হলে দেশের মাদরাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতো।

খ. কাওমী মাদরাসা

প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার নিয়ম নীতির সমস্যা

বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা ধারায় দ্বিতীয় শাখা হচ্ছে, কাওমী মাদরাসা। এই উপধারাটি 'দারসে নিযামী' নামেও পরিচিত। 'খারেজী' মাদরাসা নামেও অভিহিত করা হয়। দারুল 'উলূম মাদরাসা নামেও কেউ কেউ এদের অভিহিত করে থাকে।[৩০] এ ধরনের মাদরাসাগুলো প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেশে কোন বিধিবদ্ধ নীতিমালা নেই। সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। সকল কাওমী মাদরাসাগুলোর শিক্ষা পদ্ধতি ও সিলেবাস প্রায় অভিন্ন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। জনগণের বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দান, অনুদান ও চাঁদা দ্বারা এসব মাদরাসার নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। যাকাত, ফিতরা, 'উশর ইত্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে এ ধরনের মাদরাসাগুলোতে 'লিল্লাহ বোডিং'-এ ছাত্রদের থাকা খাওয়া ও উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়।

এ ধরনের মাদরাসাগুলোতে আধুনিক বিষয় যেমন বাংলা, ইংরেজী, গণিত, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পাঠদানের সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি নেই। গত দু'দশক থেকে এগুলোর ইবতিদায়ী স্তরে এসব বিষয় চালু করা হলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে তা অনুপস্থিত। ফলে এ ধরনের মাদরাসায় শিক্ষার্থীরা একপেশে শিক্ষা লাভ করছে। দেশে বিদ্যমান অন্য শিক্ষাধারার সাথে এদের কোন সমন্বিত শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। ফলে কাওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন শেষে পুনরায় মাধ্যমিক পর্যায় থেকে অধ্যয়ন শুরু করতে হয়। এতে শিক্ষা জীবনে তাদের বিরাট সময় অপচয় হয়ে যায়। কাওমী মাদরাসা থেকে পাশ করে কোন ছাত্র-ছাত্রী সরকার স্বীকৃত কলেজ/ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। সরকারী বেসরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি লাভের ক্ষেত্রে এদের সমমান দেয়া হয় না। সীমিত ক্ষেত্রে ইমাম ও মুয়াজ্জিনসহ কিছু কিছু পদে অবশ্য এরা নিয়োগ লাভের সুযোগ পাচ্ছে। দেশে কাওমী মাদরাসার সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। কারণ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে হওয়ায় সঠিক সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব হয় না। এ ধরনের মাদরাসাগুলো শিক্ষার্থীদের ডিগ্রী অর্জনের সনদ নিজেদের মাদরাসা থেকেই প্রদান করে। ফলে সনদের বিশ্বাস যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

---

৩০. দেশে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে মাদরাসাগুলোকে চারটি নামে অভিহিত হয়। ১. কাওমী : এর মাধ্যমে মনে করা হয় কাওম বা মুসলিম জাতির শিক্ষায় নিয়োজিত বলে এর নাম কাওমী মাদরাসা, ২. দরসে নিযামিয়া : বাগদাদের নিযামিয়া মাদরাসার অনুকরণে এগুলো পরিচালিত হয় বলে একে কেউ কেউ দরসে নিযামিয়া মাদরাসা নামে অভিহিত করে, ৩. দারুল 'উলূম : দারুল 'উলূম দেওবন্দের অনুকরণে এসব মাদরাসা পরিচালিত হয় বলে একে দারুল 'উলূম মাদরাসা নামেও অভিহিত করা হয়, ৪. খারেজী ঃ সরকারের নিয়ম নীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনাধীন নয় বলে এসব মাদরাসাকে সাধারণত খারেজী মাদরাসা নামেও অভিহিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অথচ এ মাদরাসাগুলো সুষ্ঠু নিয়মনীতির মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা ও আলীয়া মাদরাসা শিক্ষা ধারার সাথে সমন্বিত প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হলে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে 'মাইল ফলক' হতে পারে।

'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যাহ' বা কাওমী মাদরাসা বোর্ড নামে যে প্রতিষ্ঠান গত দু'দশক ধরে পরিচালিত হচ্ছে, তার অধীনে দেশের সকল কাওমী মাদরাসা অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ সরকারী কোন বিধি বলে এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং আইনগত কোন বিধান দ্বারা এই বোর্ডের অধীনে সকল কাওমী মাদরাসাকে অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্যবাধকতা নেই। যার ফলে যেসব মাদরাসা কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় বোর্ডের অধীনে আসছে তাদের নিয়েই এই বোর্ডকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। একটি বোর্ডের জনবল কাঠামোসহ অফিস ব্যবস্থাপনা এ বোর্ডের নেই বললেই চলে। কাগজে কলমে কতগুলো বিভাগ এবং বিভিন্ন কমিটির নাম উল্লেখ থাকলেও এগুলোর কোন কার্যকারিতা আছে বলে মনে হয় না।

দেশের একটি শিক্ষাধারার ব্যাপারে জাতীয় স্বীকৃতি থাকা বাঞ্চনীয়। আর এজন্য সনদ লাভের প্রক্রিয়া বিশ্বাস যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যা'র পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তর পত্র মূল্যায়ন এবং ফলাফল তৈরীর প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব এখতিয়ারাধীন। এক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করে ইনসাফভিত্তিক ফলাফল ও মেধা যাচাইয়ের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়া কঠিন। সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা এখানে নেই। এই বোর্ডকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেয়া বা অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করে পরিচালনার কোন প্রচেষ্টারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। যা একটি শিক্ষা ধারার গ্রহণযোগ্যতা, উপযোগ্যতা ও উন্নয়নের জন্য কাম্য হতে পারে না। আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার নিরীখে এ শিক্ষা বোর্ড ও এর অধীনস্থ মাদরাসাসমূহে প্রচলিত শিক্ষা ধারাকে ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের সাথে সমন্বয়ের উদ্যোগ কেন নেয়া হয় না এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগণের সাথে সম্পৃক্ত একটি শিক্ষা ধারার ব্যাপারে কেন এত উদাসীন থাকবে, তা রীতিমত রহস্যজনক ব্যাপার ! এ বোর্ড অপরাপর বোর্ডের মত শক্তিশালী মানদণ্ডের উপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলে দেশে ইসলামী শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে নতুন সোপান সৃষ্টি হতে পারে।

মাদরাসা শিক্ষা ধারার দু'টি উপধারা ১. কাওমী মাদরাসা ও ২. আলীয়া মাদরাসা। এ দু'ধরনের উপধারা সৃষ্টি হওয়ায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। দুটি শিক্ষা ধারা থেকে শিক্ষা লাভ কৃত শিক্ষার্থীগণ কর্মজীবনে দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। যা দেশ ও জাতির কাম্য নয়। অথচ দুটি শিক্ষা ধারার মধ্যে খুব বড় ধরনের ব্যবধান নেই। বরং মৌলিক বিষয়গুলোর অবস্থান একেবারেই কাছাকাছি। সময় ও চাহিদার আলোকে দু'টি শিক্ষা ধারার সার্বিক বিষয় পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে এ পদক্ষেপ হবে যুগান্তকারী। বৃটিশরা ইসলামী শিক্ষাকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংসের জন্য মাদরাসা শিক্ষায় দু'টি ধারা সৃষ্টি করেছিল। ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নের ব্যাপারে দুই উপধারার সংশ্লিষ্টগণ একমত। বৃটিশদের এ চক্রান্তকে বানচাল করে দিয়ে এক ধারায় রূপ দেয়া আবশ্যক। সাধারণ শিক্ষা ধারার চেয়ে ইসলামী শিক্ষা ধারার ইতিহাস বাংলাদেশে প্রাচীন। অথচ তা ব্যাধিগ্রস্থতায় নিমর্জিত। মাদরাসা শিক্ষার এ দুটি উপধারাকে এক ধারায় রূপান্তরের বিষয়টি সরকারী কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই বিবেচনা করতে হবে। তা না হলে ইসলামী শিক্ষা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও ইসলামী শিক্ষার মূল্যমান দারুণভাবে ব্যাহত হবে।

আধুনিক ও বিজ্ঞান শিক্ষার অনুপস্থিতি

ইসলামের সোনালী যুগে বিজ্ঞানের বিকাশ সাধিত হয়েছে।[৩১] ইসলামী শিক্ষা লাভ করার পাশাপাশি মুসলমানদের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হওয়ার গৌরব গাঁথা ইতিহাস রয়েছে। অথচ বাংলাদেশের কাওমী

---

৩১. আধুনিক ও বিজ্ঞান শিক্ষায় যেসব বিষয় প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ধারায় পড়ানো হয়, তা কোন ক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। তাছাড়া রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়গুলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে জড়িত। মুসলমানদের মধ্যে জগত

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার শিক্ষা ধারায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে পরিহার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় বিজ্ঞান শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয়ও মনে করা হচ্ছে। এ অবস্থা কোন ক্রমেই কাম্য হতে পারে না। আর মাদরাসা তথা ইসলামী শিক্ষায় স্বাতন্ত্র বজায় রেখে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলনে কোন অসুবিধা নেই। এজন্য গবেষণা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে এ শিক্ষা ধারায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন অপরিহার্য। বিজ্ঞান শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির ফলে এ ধারায় শিক্ষিতরা নিজেদেরকে সমাজে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ করবে। দেশ জাতির উন্নতি ও অগ্রগতিতে তারা আশাব্যাঞ্জক অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

কর্মমুখী শিক্ষার অভাব

কাওমী মাদরাসা শিক্ষা ধারায় কর্মমুখিতা একেবারেই অনুপস্থিত রয়েছে। ফলে এ ধারার শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভর ও সাবলম্বী হতে পারছে না। শিক্ষা শেষে এদের সীমাবদ্ধ দু'একটি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে নিয়োগের কিংবা নিজের অর্জিত যোগ্যতা দিয়ে আত্মনির্ভরশীল কোন উদ্যোগ নিতে পারছে না। শিক্ষা লাভ তখন এদের জন্য দুঃখের ও ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অথচ ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমূখী শিক্ষার বিষয়গুলো শিক্ষা দিলে তারা যুগ ও সময়ের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে। কারিগরী, বৃত্তিমূলক, বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক বিষয়সমূহ এ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী। অন্যথায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বেকার বা অর্ধ-বেকার থেকে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। এজন্য কাওমী মাদরাসাসমূহে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে একটি যুগ উপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন অত্যাবশ্যক।

গ. সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণের অভাব

দেশের সাধারণ শিক্ষা ধারায় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের অধীনে ইসলামী শিক্ষা, আরবী ও উর্দূ ফারসী বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। উচ্চস্তরে ইসলামী শিক্ষাকে গুণগত মানে উন্নীত করার জন্য বর্তমান ব্যবস্থা মোটেও যথেষ্ট নয়। কারণ 'ইসলামী শিক্ষা' স্বতন্ত্রভাবেই একটি অনুষদ হওয়ার দাবী রাখে। আর এটা হলে এ অনুষদের অধীনে Quranic Scince, Hadith Scince, Comparative Religion, Islamic Idelogy ও Islamic Economics-এর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনার্স ও এমএ ডিগ্রী প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সমাজনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিল্পকলা, আইন, দর্শন ইত্যাদি বিষয়কে Islamigation of knowledge[৩২]-এর আলোকে ঢেলে সাজানো যাবে। পাশাপাশি সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামের চিন্তাধারায় বিন্যস্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ঘ. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর

প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রমে 'ইসলাম ধর্ম' নামে একটি বিষয় পাঠ্যভুক্ত রয়েছে। 'ইসলাম ধর্ম'কে 'ইসলামী শিক্ষা' নামকরণ করে ১০০ নম্বরের একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় হিসেবে চালু করা দরকার। এর সংস্কার সাধন করে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে না রেখে একে আবশ্যিক বিষয়ের মর্যাদায় উন্নীত করা প্রয়োজন।

জোড়া খ্যাতিমান, বিজ্ঞানী, চিকিৎসা বিজ্ঞানী, দার্শনিক, গণিতবিদ, রাজনীতিবিদ জন্ম দিয়েছে, অথচ কাওমী মাদরাসা সমূহ শিক্ষা ব্যবস্থায় এসকল বিষয়কে উপেক্ষা করে মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্যকে প্রকারান্তরে অবহেলা করে চলেছে।

৩২. **Islamiszation of Knowledge** : এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞানকে ইসলামীকরণ। আধুনিক বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে বিগত কিছুদিন থেকে এ ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ড. সৈয়দ আলী আশরাফ এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রস্তাবও পেশ করেছেন। এ লক্ষ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণামূলক কাজের সূচনা করে গেছেন। যা অব্যাহত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান বা শিক্ষাকে ইসলামের আলোকে বিন্যস্ত করা। যা Islamisation of Knowledge হিসেবে অপরাপর শিক্ষার সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে বর্তমানে ইসলামী শিক্ষার ২০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয় চালু রয়েছে। মুসলিম দেশ হিসেবে ইসলামী শিক্ষাকে (২০০ নম্বরের) বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। বাংলা, ইংরেজীর ন্যায় ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা অপরিহার্য। তবেই মুসলিম দেশ হিসেবে দেশের গুরুত্ব ও মর্যাদা ধাপে ধাপে উৎকর্ষ লাভ করবে।[৩৩]

দেশের সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পিটিআই ও টিটিসিগুলোতে *ইসলামী শিক্ষা* আবশ্যকীয় হিসেবে পড়ানো হয় না। অতিরিক্ত ঐচ্ছিক হিসেবে ৫০/১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা চালু আছে। আবশ্যিক বিষয় হিসেবে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকলে নৈতিক মান সম্পন্ন মেধাবী মানব সম্পদ তৈরীতে ব্যাপক অবদান রাখবে।[৩৪]

ইসলামী শিক্ষায় নারীদের সম্পৃক্ততা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে মেয়েদের মাদরাসায় পড়ালেখা করার ব্যাপারে এক ধরনের হীন মানসিকতা কাজ করত। ফলে কাওমী মাদরাসা সংশ্লিষ্টরা মনে করত, মহিলাদের কুর'আন তিলাওয়াত করা এবং ধর্মীয় কিছু 'ইবাদত পালন ব্যাতিরেকে অন্য কোন শিক্ষার প্রয়োজন নেই। 'আলীয়া মাদরাসাগুলোতে সহশিক্ষাকে পর্দার কারণে প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পর মহিলাদের পড়ার সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হতো। স্বাধীনতার পর আস্তে আস্তে এসব ভ্রান্ত ধারণার বিলুপ্তি ঘটে। বর্তমানে 'আলীয়া ও কাওমী উভয় ধারাতেই নারীদের পর্দা রক্ষা করে পড়ালেখার জন্য মহিলা বা বালিকা মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ইতোমধ্যে কয়েকটি কামিল স্তরের মহিলা মাদরাসা অত্যন্ত সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া দাখিল আলিম ও ফাযিল স্তরের বেশ কিছু মাদরাসা স্থাপিত হয়েছে। এসব মাদরাসায় ছাত্রীদের অধ্যয়নের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার বেলায় নারী শিক্ষার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তবে সাধারণ শিক্ষা ধারায় নারী শিক্ষার জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে তা মহিলা মাদরাসায় অনুপস্থিত। সরকারী ও বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এসকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে ইসলামী শিক্ষায় বিপুল সংখ্যক নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গত তিন দশকে সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ বড় বড় আশা বুকে ধারণ করেছে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ অত্যন্ত সময়োপযোগী সুপারিশসমূহ দাখিল করেছেন। নীতি-নির্ধারকদের অনভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক সমস্যা, ইসলামী শিক্ষার প্রতি শ্রেণী ও মহল বিশেষের বৈষম্যমূলক আচরণ অনেকটা দাবিয়ে রাখার মত অবস্থায় উপনীত হয়েছে। নিম্নের ছক থেকে এর সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করা যেতে পারে :

১.	বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার বিষয় চালু করণ	কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে	কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে কোন বিভাগ নেই
২.	পাঠক্রমকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করণ	প্রাথমিক পর্যায়ে হয়েছে	উদ্যোগ নেয়া হলেও সম্পন্ন হয় নি
৩.	মাদরাসা শিক্ষার দু'ধারার সমন্বয় সাধন	উদ্যোগ নেয়া হয় নি	----
৪.	সরকারী বৃত্তির সমতা	তুলনামূলকভাবে কম	আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় হচ্ছে না
৫.	মাষ্টার্স পর্যন্ত সমমান প্রদান	আলিমকে এইচ এস সি'র মান দেয়া হয়েছে	ফাযিল ও কামিলকে মান দেয়া হয় নি

৩৩. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাস অনুযায়ী।

৩৪. পিটিআই ও টিটিসির সিলেবাস পর্যালোচনার আলোকে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.	একাধিক মাদরাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠাকরণ	একটি মাত্র বোর্ড সারা দেশের মাদরাসাসমূহের দায়িত্ব পালন করেন	উদ্যোগ নেয়া হয় নি
৭.	মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ	উদ্যোগ নেয়া হয়েছে	মহল বিশেষের ষড়যন্ত্রের কারণে হয় নি
৮.	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলককরণ	উদ্যোগ নেয়া হয়েছে	মহল বিশেষের ষড়যন্ত্রের কারণে হয় নি
৯.	মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা	মাত্র ১টি চালু করা হলেও অপরাপর চলমান ইন্সটিটিউটগুলোর সাথে মানের সমতা নেই	মহল বিশেষের ষড়যন্ত্র ও আমলা তান্ত্রিক জটিলতার শিকার
১০.	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সাধারণ শিক্ষার সমপরিমান সরকারী অনুদান প্রদান	তুলনামূলকভাবে কম	সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসার বেলায় ১০:১ পর্যায়ের হিসাব দ্বারা উন্নয়ন বণ্টন করা হয়
১২.	বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে সাধারণ ও ইসলামী শিক্ষার সমতা বিধান	উদ্যোগ নেয়া হয় নি	উদ্যোগ নেয়া জরুরী
১৩.	সরকারী মাদরাসার সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ	প্রতি জেলায় ১টি করে মাদরাসা সরকারীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়	রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তা হয় নি
১৪.	একাধিক ইসলামী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	উদ্যোগ নেয়া হয়েছে	রাজনৈতিক ও আমলা তান্ত্রিক জটিলতায় তা হচ্ছে না
১৫.	মাদরাসা শিক্ষাধারায় কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিষয়াদী অন্তর্ভুক্ত করণ	অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে	এর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয় নি
১৬.	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্বত্র ও সকল বিষয়ে মাদরাসার ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ দান	প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তবে সকল বিষয়ে উন্মুক্ত নয়	গত কয়েক বছর যাবৎ নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় ছাড়া ভর্তির সুযোগ দেয়া হয় নি
১৭.	কামিল শ্রেণীতে অনার্স কোর্স চালুকরণ	শিক্ষা কমিশন সমূহে সুপারিশ করা হয়েছে	লাল ফিতার দৌরাত্মে বাস্তবে সূর্যের আলো দেখে নি
১৮.	উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থাকরণ	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সীমিত পরিসরে ব্যবস্থা আছে	মাদরাসা শিক্ষা ধারায় ক্ষেত্র তৈরী হয় নি
১৯.	ইবতিদায়ী মাদরাসাকে প্রয়োজনীয় মর্যাদা দিয়ে উন্নতকরণ	মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক একাডেমিক স্বীকৃতি দান করা হয়েছে	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় নি
২০.	মাদরাসা শিক্ষা ধারায় বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া	গতানুগতিক সিলেবাসের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে	গবেষণামূলক ভাষা ইনস্টিটিউট বা ইসলামী একাডেমী স্থাপিত হয় নি
২১.	মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে ইসলামী শিক্ষার সকল বিষয়সমূহের ওপর প্রয়োজনীয় বই পত্র রচনা	কিছু কিছু বই পত্র বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে	পরিকল্পনা মাফিক সকল বিষয়ে সমান্তরালভাবে বই পুস্তক রচিত হয় নি
২২.	আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা ধারার আদান প্রদানের ব্যবস্থাকরণ	সীমিত ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করা হয়েছে	দেশী ও বিদেশী প্রয়োজনীয় আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তা দানের অভাবে হচ্ছে না

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : তিন
ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রস্তাবনা

ক. জ্ঞানের ইসলামীকরণ ও প্রায়োগিক পদ্ধতি

জ্ঞানের ইসলামীকরণের (Islamization of Knowledge) প্রবক্তা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী বলেন : আধুনিক জ্ঞানের ইসলামীকরণ[৩৫] একটি মহান পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে, যদি সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে মুসলিম দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও কলেজগুলো ইসলামী সভ্যতার বাধ্যতামূলক কোর্স চালু করে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের ধর্ম ও উত্তরাধিকারের প্রতি বিশ্বাস এনে দেবে এবং তাদের বর্তমান অসুবিধাসমূহ মোকাবিলা ও অতিক্রম করার মনোবল যোগাবে। আর সেই সাথে তারা আল্লাহ তাআলার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়।

এ ইসলামী লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে এবং এভাবে আল্লাহর বাণীকে স্থান ও কালের গণ্ডিতে মহীয়ান করতে হলে পার্থিব জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। এ জ্ঞানই হচ্ছে ডিসিপ্লিন বা বিষয়সমূহের লক্ষ্য। মুসলমানরাই অধ:পতিত ও অচৈতন্য হওয়ার আগে এ সব ডিসিপ্লিনের উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়, ইসলামকে তারা প্রতিষ্ঠিত করে এবং এর প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করে। শুধু তাই নয়, তারা বিশ্ব সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী ও তার তাৎপর্য প্রত্যেকের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। তারা সর্বক্ষেত্রে আশ্চর্য অবদান রাখে এবং সে জ্ঞানকে তাদের ইসলামী আদর্শ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করে। কিন্তু তাদের এ নির্জীব থাকাকালীন সময়ে অমুসলিমরা মুসলিম বিজ্ঞানী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারের স্থান দখল করে, সে সবকে সমন্বিত করে তারা নিজেদের বিশ্ব দৃষ্টি গড়ে তোলে। জ্ঞানের বিষয়বস্তুগুলোর উন্নয়ন করে তাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে এবং সে জ্ঞানকে তাদের নিজেদের কাজে লাগায়। তাই আজ অমুসলিমরাই সমস্ত জ্ঞান-শাখায় অবিসংবাদিত অধিনায়ক। আজ মুসলিম জগতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অমুসলিমদের লেখা বইপত্র, তাদের কৃতিত্ব, বিশ্ব মতামত, সমস্যা ও আদর্শ মুসলিম যুবক-যুবতিদের পড়ানো হচ্ছে। পরিহাসের বিষয় এই যে, আজ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম শিক্ষকরাই মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্যকরণের কাজে নিয়োজিত।[৩৬]

এই পরিস্থিতির অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, মুসলিম বিশেষজ্ঞরাই সমস্ত আধুনিক বিষয়ের উপর প্রভুত্ব করতে সক্ষম, এগুলোকে তারা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারবে এবং কি শেখাতে হবে তার সব কিছুর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে সক্ষম হবে। আর সেটাই হচ্ছে প্রথম পূর্বশর্ত। তারপর সে জ্ঞানকে ইসলামী উত্তরাধিকারের অবয়বে সমন্বিত করতে হবে। এর উপকরণগুলোকে ইসলামের সার্বজনীন মতামতের প্রয়োজনে কাটছাঁট, সংশোধন ও পুনর্ব্যাখ্যা করতে হবে। বিষয়গুলোর দর্শনে এবং তার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যে ইসলামের সঠিক প্রাসঙ্গিকতা পুনরায় নির্ণিত হওয়া উচিত। সবশেষে অগ্রণী হিসেবে তাদের নিজেদের উদাহরণ দিয়ে, নতুন যুগের মুসলিম ও অমুসলিমরা কিভাবে তাদের পদাংক অনুসরণ করতে পারে তা শিক্ষা দেয়া উচিত। মানুষের জ্ঞানের সীমাকে আরো সম্প্রসারণের জন্য, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি বৈচিত্র্যের নতুন স্তর আবিষ্কার করার জন্য এবং ইতিহাসে তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য নতুন পন্থা উদ্ভাবনের প্রয়াস চালাতে হবে।

---

৩৫. মূলত সর্বপ্রকার জ্ঞান, যা আমরা শিক্ষার মাধ্যমে স্কুলে-কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করি। সেই জ্ঞানের ভিত্তিমূলে মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে এবং জ্ঞান আহরণ সম্পর্কে ইসলামী ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠিত করাই সত্যিকারভাবে জ্ঞান বা শিক্ষাকে ইসলামীকরণ করা। দ্র. ড. সৈয়দ আলী আশরাফ জ্ঞানের ইসলামীকরণ সম্পর্কে এক সাক্ষাতকারে উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন। উদ্ধৃত, *বরেণ্য*, সৈয়দ আলী আশরাফ স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা : দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯, পৃ ১৯৬।

৩৬. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী, 'জ্ঞানের ইসলামীকরণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ', মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, *মাসিক দারুস সালাম*, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানের ইসলামীকরণের কাজ অত্যন্ত কঠিন। পরিষ্কার করে বলতে গেলে, বিষয়গুলোর ইসলামীকরণ করতে হবে। তার চেয়ে সোজা করে এভাবে বলা যায় যে, প্রায় কুড়িটি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনর্লিখিত করে প্রকাশ করতে হবে। কোন মুসলমান এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে নি যে, এর পূর্বশর্ত কি হতে পারে, অথবা এতে কি কি পদক্ষেপ ও কর্মপন্থা গৃহীত হতে পারে। আমাদের পূর্ববর্তী সংস্কারকগণ পাশ্চাত্যের জ্ঞানের সাথে ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গির দ্বন্দ্বের কথাও জানত না। আমাদের বর্তমান যুগেই প্রথম এই বিবাদের কথা আবিষ্কৃত হয়। আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধির মধ্য দিয়েই তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব আমাদের ওপর যে মনস্তাত্ত্বিক অত্যাচার করেছে তার ফলে আমরা এক আতংকের মধ্য দিয়ে জেগে উঠেছি। মুসলিম জগতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমাদের চোখের সামনে ইসলামী আকীদার ওপর যে অত্যাচার চলছে সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত। সে জন্যই এই অশুভ ব্যাপারে মুসলিম জগতকে আমরা সাবধান করে দিচ্ছি এবং ইতিহাসে এ-ই প্রথমবারের মত একে দমন করার উদ্দেশ্যে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করছি, তার ফলাফল যাচাই করা ও পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সঠিক পথে ইসলামী শিক্ষা পুনরায় চালু করতে চাচ্ছি।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মানুষের পুরো জ্ঞান-সম্পদকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্গঠিত করতে হবে। জীবন, বাস্তবতা ও পৃথিবী সম্পর্কিত কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা না হলে তাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে না। সেটাই হচ্ছে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নের উদ্দেশ্য। ইসলামে জ্ঞানের পুনর্গঠন বলতে এর ইসলামীকরণ বোঝায় অর্থাৎ জ্ঞানের নতুন করে সংজ্ঞা দিতে হবে এবং তথ্যাদিকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। তথ্যাদির কার্যকরণ ও সম্পর্ক নিয়ে পুনর্বার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে, উপসংহারগুলোর পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে, উদ্দেশ্যের পুনর্বিন্যাস করতে হবে এবং তা এমনভাবে করতে হবে যাতে বিষয়গুলো দর্শনকে সমৃদ্ধ করে এবং ইসলামের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এ লক্ষ্যে ইসলামের পদ্ধতিকরণ ক্যাটেগরিগুলোকে যথা- সত্যের ঐক্য, জ্ঞানের ঐক্য, মানবতার ঐক্য, জীবনের ঐক্য এবং সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য-মানুষের কাছে সৃষ্টির দাসত্ব এবং সর্বোপরি আল্লাহর কাছে মানুষের দাসত্ব- এই চিন্তাধারার আলোকে পাশ্চাত্য ধারণাগুলোকে অবশ্যই সংশোধন করতে হবে এবং বাস্তবতাকে উপলব্ধি ও বিন্যস্ত করার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। তদ্রূপ, পাশ্চাত্য মূল্যবোধের স্থলে ইসলামী মূল্যবোধকে পুন: স্থাপন করা উচিত এবং তদনুযায়ী প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যার্জনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়া উচিত। ইসলামী মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে : মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী জ্ঞান, মানুষের প্রতিভার বিকাশ সাধন, ঐশী ধারাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে সৃজনধর্মী চিন্তা পুনর্গঠন, কৃষ্টি ও সভ্যতার উন্নয়ন, জ্ঞান-বিজ্ঞতা, বীরত্ব, নৈতিক উৎকর্ষ, ধর্মকর্ম ও সাধুতা দিয়ে মানব কীর্তি স্তম্ভকে সমৃদ্ধ করা।

জ্ঞানের ইসলামীকরণে প্রায়োগিক পদ্ধতি

আধুনিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি ও শ্রেণীবিন্যাস

পশ্চিমী আধুনিক জ্ঞানের শাখাগুলোকে অবশ্যই শ্রেণী, নীতি, পদ্ধতি, সমস্যা ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 'সূচীপত্রের তালিকা' অথবা কোর্সের সিলেবাসের আলোকেই এই বিন্যাস করতে হবে। টেকনিক্যাল শব্দাবলী অথবা অধ্যায়গুলোর শিরোনামের আলোকে এই বিন্যাসের ব্যাখ্যা করলে চলবে না। শ্রেণী, নীতি, সমস্যা ও জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখার পশ্চিমী ও সর্বোৎকৃষ্ট সারকথার ব্যাখ্যাসহ টেকনিক্যাল শব্দাবলীর অর্থ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করত বিন্যস্ত বিষয়গুলো বাক্যাকারে প্রকাশ করতে হবে।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জরিপ

জ্ঞানের প্রতিটি শাখার ওপর জরিপ চালাতে হবে এবং এ সম্পর্কিত নিবন্ধে এর উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক বিকাশ, বিকাশের পদ্ধতি, দৃষ্টিপাতের ব্যাপকতা এবং এর পক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের অবদানের ওপর আলোকপাত করতে হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর টীকাসমেত গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের মাধ্যমে শাখার জরিপ সম্পন্ন হওয়া উচিত। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখার সব গুরুত্বপূর্ণ বই ও নিবন্ধের পর্যায়ক্রমিক তালিকা সন্নিবেশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই ধাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে মুসলমানদেরকে সে সম্পর্কে অনুধাবন করতে সাহায্য করা। জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট বিষয়কে ইসলামীকরণের নিমিত্তে বিশেষজ্ঞদের জন্যও এটা ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। জ্ঞানের জগতে বিস্ফোরণ ঘটার দরুন পাশ্চাত্য আজ 'বর্ণাঢ্য'। তাই ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে তাদের ইসলামীকরণ প্রচেষ্টায় জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভিত্তিমূল স্পর্শ করে এর পরিচিতি, ইতিহাস, স্থানিকতা এবং সীমার মধ্যে সমন্বয় বিধানে মনোযোগী হতে হবে।[৩৭]

ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি-সংকলন

জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট বিষয়টির সাথে ইসলামের বিস্তৃত সাযুজ্য অন্বেষণের আগেই ঐ বিষয় সম্পর্কে ইসলামী জ্ঞান কি বলতে চায় তা উদঘাটন করা আবশ্যক। এই সাযুজ্য সন্ধানের নিমিত্ত আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতরাই অবশ্যই সূচনাবিন্দু হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় জ্ঞানের ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া দুর্বল হতে বাধ্য। অবশ্য ইসলামী বিষয়গুলো আধুনিক গবেষকদের ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় বিদ্যমান নেই। এমনকি তারা এর অন্বেষণে যথাযথভাবে প্রস্তুতও নয়। কারণ আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং এর নাম প্রাচীন জ্ঞান-শাস্ত্রে এভাবে পরিচিত নয়। একইভাবে এগুলো আধুনিক জ্ঞানের অনুরূপ শ্রেণীবদ্ধ নয়। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম বিদ্বানরা প্রায়শ এগুলোর মর্ম অনুধাবনে ব্যর্থ হন। ফলে তারা হতাশ হয়ে এ প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেন এই ভেবে যে ইসলামী জ্ঞান সংশ্লিষ্ট আধুনিক বিষয়ে নীরব। আসল কথা হলো, ঐ বিষয়টি ইসলামী জ্ঞানের যে শাখায় শ্রেণীভুক্ত হয়েছে সে সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। তদুপরি ইসলামী জ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার অনুসন্ধানের উদ্যম ও সময় কোনটাই এসব পণ্ডিতদের নেই।

অন্যদিকে প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষিত আলিমরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে অজ্ঞতার দরুন এগুলোর সাথে ইসলামী জ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যর্থ হন। তারা আধুনিক জ্ঞানের বিষয়, বিষয়বস্তু ও সমস্যা সম্পর্কে অপরিচিত। সুতরাং তাদেরকে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামী জ্ঞান থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আহরণে মনোযোগী করা আবশ্যক। এ জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ বিশেষজ্ঞদেরকে আধুনিক জ্ঞান সম্পর্কে পরিচিত করে তুলতে এবং এগুলোর সাথে ইসলামী জ্ঞানের সাযুজ্যের মানদণ্ড নির্ণয়ে সহায়ক।

এই তৃতীয় ধাপে আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত ইসলামী জ্ঞান অধ্যয়নের জন্য এর কয়েক খণ্ড সংকলন প্রণয়ন করতে হবে। এসব সংকলন মুসলিম চিন্তাবিদদের বিশেষ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তাকে ইসলামী জ্ঞানের সূত্র প্রদানে সহায়ক হবে। এগুলো সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের শাখায় ইসলামী জ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্ট অবদান, তার পরিচিত বিষয়বস্তুর ক্রমানুসারে তার সামনে তুলে ধরবে। আধুনিক মুসলিম বিদ্বানদের ইসলামী জ্ঞান অর্জনের যেহেতু সময় নেই এবং কৌশলও জানা নেই-অনেক ক্ষেত্রে এগুলোর ভাষা সম্পর্কেও তারা অজ্ঞাত সেজন্য এসব সংকলন ছাড়া তাদের পক্ষে ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্র অনুধাবন সম্ভব নয়।

ইসলামী জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি-বিশ্লেষণ

ইসলামী জ্ঞানের অবদান পাশ্চাত্য-শিক্ষিত মুসলমানদের অনুধাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কেবল সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করা যথেষ্ট নয়। অতীতের মনীষীরা তাদের সমকালীন সমস্যার প্রেক্ষিতে ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। তাদের গবেষণাকর্ম সে সময়ের ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিশ্লেষণ এবং জীবন ও চিন্তার অন্যান্য বিভাগের সাথে সমসাময়িক সমস্যার সম্পর্ক চিহ্নিত করে তুলে ধরতে হবে। ইসলামী জ্ঞানের অবদানের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ফলে নিঃসন্দেহে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ওপর ব্যাপক আলোকপাত হবে। এটা আমাদের প্রাচীন মনীষীরা কিভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে অনুধাবন করেছেন, কিভাবে তাঁরা এর আলোকে বাস্তব জীবনাচরণের পন্থা বাতলে দিয়েছেন এবং কিভাবে তারা নানা জটিল সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়েছেন তা উপলব্ধিতে সহায়ক হবে।

---

৩৭. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী জ্ঞানের বিশ্লেষণ বিক্ষিপ্তভাবে করলে চলবে না। ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে এর একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে ক্রমবিন্যাস করতে হবে। সর্বোপরি, প্রধান নীতিসমূহ, প্রধান সমস্যাদি এবং বর্তমান সমস্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলোই ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা কৌশলের লক্ষ্য হওয়া উচিত।[৩৮]

বর্তমান জ্ঞান শাখাগুলোর সাথে ইসলামের সুনির্দিষ্ট সাযুজ্য স্থাপন

উপরোক্ত চারটি ধাপ ইসলামী চিন্তাবিদদের সামনে সমস্যার রূপরেখা তুলে ধরেছে। মুসলমানদের জ্ঞান-বিকাশের হারানো সূত্রের একটা সারসংক্ষেপ এ থেকে পাওয়া যায়। আধুনিক জ্ঞান যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে সে সব ক্ষেত্রে ইসলামী জ্ঞানের অবদান সম্পর্কে যথাসম্ভব সঠিক তথ্যও তাঁরা লাভ করেন। সেই সাথে তাঁরা আধুনিক জ্ঞানের লক্ষ্য সম্পর্কেও অবহিত হন। এসব তথ্য আধুনিক জ্ঞানের সমপর্যায়ে সূত্রবদ্ধ করে আরো সুনির্দিষ্ট রূপ দিতে হবে অথবা সূত্র ও প্রায়োগিক দিক উল্লেখসহ তাত্ত্বিকরূপে দাঁড় করাতে হবে। এ প্রসংগে আধুনিক জ্ঞানের প্রকৃতি-এর উপাদান, গঠন পদ্ধতি, নীতি, সমস্যা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, এর সাফল্য ও ব্যর্থতা-সবকিছু ইসলামী জ্ঞানের আলোকে বিন্যস্ত করতে হবে। অত:পর জ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের সাথে ইসলামী জ্ঞানের সুনির্দিষ্ট প্রাসংগিকতা উভয়ের অভিন্ন অবদানের আলোকে নির্ণয় করতে হবে। এটা করতে গিয়ে তিনটি প্রশ্নের জবাব অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। প্রথমত, আধুনিক জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে সে ব্যাপারে ইসলামী জ্ঞান কুরআন নাজিল হওয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কি অবদান রেখেছে? দ্বিতীয়ত, জ্ঞানের ঐ বিষয়ের সাথে ইসলামের অবদান কতটুকু সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ ? ইসলামী জ্ঞান আধুনিক জ্ঞানের কোন কোন ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ, অপূর্ণ অথবা প্রেক্ষিত ও পরিধি অতিক্রম করে গেছে। তৃতীয়ত, আধুনিক জ্ঞানের যেসব শাখায় ইসলামী জ্ঞানের অবদান সামান্য বা শূন্য সেক্ষেত্রে মসুলমানরা ঐ ঘাটতি পূরণ, সমস্যা নির্ণয় ও প্রেক্ষিত প্রসারিত করার লক্ষ্যে কোন্ পন্থায় অগ্রসর হবে?

আধুনিক জ্ঞানের বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা

বর্তমান পর্যায়ে যেহেতু ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞানে সামগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে, উভয় জ্ঞানের পদ্ধতি, নীতি, সারবস্তু, সমস্যা ও সাফল্য চিহ্নিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে আধুনিক জ্ঞানের সাথে ইসলামের সুনির্দিষ্ট সামঞ্জস্য সুস্পষ্টভাবে নির্ণিত হয়েছে তাই এখন সংশ্লিষ্ট বিষয়টি ইসলামের দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। জ্ঞানের ইসলামীকরণের লক্ষ্যে এটি প্রধান পদক্ষেপ। পূর্ববর্তী পাঁচটি ধাপকে এর প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে ধরে নেয়া যায়। যে সব ঐতিহাসিক বিবর্তন ও ঘটনাক্রম জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখার রূপ নির্ণয় করেছে তা চিহ্নিত ও উদঘাটন করতে হবে। এর পদ্ধতি অর্থাৎ উপাত্ত এবং এর তত্ত্ব ও নীতি যার আলোকে সমস্যাদি নিরূপণ করা হয়-সবকিছু বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তাওহীদের ৫টি স্তম্ভের সাথে রূপায়ণ, পর্যাপ্ততা, যুক্তিগ্রাহ্যতা ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মূল্যায়ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের প্রধান সমস্যা ও সারবস্তু বিশ্লেষণ করে ঐ জ্ঞানের মৌল দর্শনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। বিষয়টির আপাত: উদ্দেশ্যের সাথে চূড়ান্ত লক্ষ্য ও পদ্ধতির বিস্তারিত মূল্যায়ন আবশ্যক। লক্ষ্য করতে হবে, এতে কি এর প্রতিষ্ঠাতাদের দৃষ্টিভংগির পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে; জ্ঞান-অন্বেষণের সামগ্রিক উদ্যমে যথার্থ ভূমিকা পালিত হয়েছে কি? এটা কি সাধারণ মানুষের প্রশ্নের অংশ হিসেবে প্রত্যাশিত ফল অর্জন করেছে? এটা কি সৃষ্টির ঐশী রীতি অনুসারে উপলব্ধি ও ইতিহাস-চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্য অর্জন করতে পেরেছে? সংশ্লিষ্ট জ্ঞান সম্পর্কে প্রকৃত ইসলামী দৃষ্টিভংগিতে এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে সংশোধন, সংযোজন অথবা বিয়োজন আবশ্যক তার ওপরেও যথাযথ আলোকপাত করতে হবে।

ইসলামী জ্ঞানের উৎস পর্যালোচনা-উৎকর্ষ

ইসলামী জ্ঞান বলতে আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কালাম কুরআন মজীদ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর সুন্নাহকে বুঝে থাকি। কুরআনের ঐশী মর্যাদা ও সুন্নাহর আদর্শ প্রশ্নাতীত। কিন্তু এ দু'টি উৎস সম্পর্কে মুসলমানদের উপলব্ধি অবিমিশ্র নয়। বরং ঐশী নীতির আলোকে এটি বিচার-সাপেক্ষ।

---

৩৮. ড. আবদুল ওয়াহিদ, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, ঢাকা : ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০১, পৃ ৬৬-৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

একইভাবে ঐ দুই সূত্র থেকে উৎসারিত বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্তও পর্যালোচনা-সাপেক্ষ। এ কারণে যে, এসব চিন্তাধারা আগের মতো মুসলিম জীবনে গতিশীল ভূমিকা পালন করছে না। আধুনিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে ঐশী বাণী উপলব্ধির সাযুজ্য তিনটি ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে : প্রথমত, সরাসরি ওহীর সূত্র এবং ইতিহাসে প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ সা., তাঁর সাহাবী রা. এবং তাদের উত্তরসূরীদের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তের আলোকে ইসলামী দর্শন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিশ্বব্যাপী উম্মাহর বর্তমান চাহিদা এবং তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাবতীয় আধুনিক জ্ঞান। ইসলামী জ্ঞানের কোথাও যদি অপর্যাপ্ততা অথবা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় তবে তা সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে ভবিষ্যতের জন্য এর আরো উন্নয়ন ও সৃজনশীল পরিশুদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। এটাও মনে রাখতে হবে, ইসলামী জ্ঞানের সাথে সংগতিশীল নয়-ইসলামের নামে এমন যে কোন প্রয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। সবল হোক অথবা দুর্বল, আগাগোড়া গভীর ইসলামী জ্ঞানই হবে এই কার্যক্রমের ভিত্তি। তদুপরি জ্ঞানের ইসলামীকরণের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল উদ্যোগ এমন একটা কাঠামোর ওপর দাঁড় করাতে হবে যাতে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎসের সামঞ্জস্যশীল হয়, কখনোই যেন বিচ্ছিন্ন না হতে পারে।

সুতরাং মানব জীবনে ইসলামী জ্ঞানের অবদান মূল্যায়নের এই গুরুদায়িত্ব অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের ওপরেই ন্যস্ত হওয়া আবশ্যক। তাদেরকে একই সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মুসলমানদের চাহিদা এবং আধুনিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ হতে হবে। ইসলামী জ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা সংশ্লিষ্ট যথাসম্ভব পর্যাপ্ত ও সঠিক উপলব্ধি অর্জনে তাদেরকে সাহায্য করবেন।

উম্মাহর প্রধান সমস্যাবলী জরিপ করা

জড়তা কাটিয়ে মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে পুনর্জাগরণের পথে এগিয়ে চলেছে। তারা এখন সর্বক্ষেত্রে ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলির ফলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক চেতনার ওপর যেন 'আইসবার্গের হিমশীতল পাথর' চাপা পড়েছে। উম্মাহর সমস্যাদির সামগ্রিক কারণ, লক্ষণ, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সংঘাত এবং এর পরিণাম সম্পর্কে বাস্তব ও পুংখানুপুংখ পর্যালোচনা হওয়া আবশ্যক।

সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের যৌক্তিকতা মুসলমানদেরকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করাতে হবে এবং ইসলামের ওপর সেগুলোর প্রভাব সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে। কোন মুসলিম চিন্তাবিদ উম্মাহর অস্তিত্ব কিংবা তার আশা-আকাংখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক কৌতূহলবশত বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে 'কল্যাণকর-কার্যকর জ্ঞান' অর্জনের জন্য প্রার্থনা শিখিয়েছেন। সমসাময়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মুসলিম মনীষীদের মন-মানস এই জ্ঞানচর্চায় কেন্দ্রীভূত করতে হবে। সর্বোপরি, আধুনিক জ্ঞান এবং আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইসলাম-বিমুখতার হাত থেকে রক্ষা করে পুন: ইসলামীকরণ প্রচেষ্টার ওপর জোর দিতে হবে। এর পাশাপাশি যে সব প্রধান সমস্যা উম্মাহর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তা কাটিয়ে ওঠার আন্তরিক প্রয়াস প্রয়োজন।

মানব জাতির সমস্যা জরিপ

শুধু উম্মাহ নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের দায়িত্ব ইসলামী দর্শনের ওপর ন্যস্ত। এটা অনস্বীকার্য যে, সমগ্র বিশ্ব-চরাচর আল্লাহ তা'আলার আমানতের আওতাধীন এবং সেই অনুসারেই মানুষকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এটাও সত্য যে, অন্যান্য জাতির তুলনায় মুসলিম উম্মাহ নানাদিক দিয়ে পশ্চাদপদ ও অনুন্নত। কিন্তু ধর্মীয়, নৈতিক ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির আদর্শ হিসেবে মুসলমানরা অদ্বিতীয় সত্যের ধারক। কারণ ইসলামের বদৌলতে উম্মাহ মানবজাতির জন্য কল্যাণকর এক আদর্শের অধিকারী এবং আল্লাহর ইচ্ছা মাফিকই ইতিহাসের গতিধারা নির্ণীত হয়।

সুতরাং, ইসলামী চিন্তাবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের আলোকে আজকের বিশ্বের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হওয়া। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক চক্র এবং তাদের জোয়াল উৎপাটনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত তথাকথিত বিপ্লবীদের মধ্যেকার সংঘাতে মানবতার স্বার্থ আজ বিপন্ন। ইসলামী মূল্যবোধের পতাকাবাহী মুসলিম উম্মাহ-ই কেবল এই আর্তমানবতার মুক্তির সোচ্চার মুখপাত্র হতে পারে। সংকীর্ণ জাতিসত্তার অহমিকা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের

Dhaka University Institutional Repository

মূলে কুঠারাঘাত করছে। মদ ও মাদক, যৌন-স্বেচ্ছাচার, পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, নিরক্ষরতা ও আলস্য, সমরসজ্জা, প্রকৃতির বিনাশ এবং পরিবেশের ভারসাম্যতার প্রতি হুমকি অবাধে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। উম্মাহ তথা মানবতার কল্যাণে নিশ্চিতভাবে ইসলামী চিন্তা, পরিকল্পনা ও কার্যক্রমকে এসব সমাধানে নিয়োজিত করতে হবে। মানব জাতিকে এসব সমস্যা থেকে মুক্ত করে সমৃদ্ধি ও সুবিচারের দিকে চালিত করার প্রচেষ্টা কোনক্রমেই ইসলামী মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

সৃজনশীল বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ

আধুনিক জ্ঞানের পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞান উপলব্ধি ও ব্যুৎপত্তি অর্জন, এগুলোর ক্ষমতা ও দুর্বলতা নিরূপণ, আধুনিক জ্ঞানের সাথে ইসলামী জ্ঞানের সাযুজ্য প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে ইতিহাসের অভিযাত্রায় উম্মাহর সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ ও অনুধাবন এবং শুহাদা আলান্নাস মানব জাতির জন্যে সাক্ষীর দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে মানবকুলের বৃহত্তর সমস্যাদি উপলব্ধির পর এক্ষণে মুসলিম চিন্তাবিদদের জন্য সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন। পুনরায় বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদান এবং মানব সমাজে গ্রহণযোগ্য ও সভ্যতামুখী ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার জন্য এক নতুন আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করতে হবে।

বহু শতাব্দীর বিকাশরুদ্ধতা-জনিত ব্যবধান নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞানের মধ্যে অবশ্যই সৃজনশীল সমন্বয় সাধন করতে হবে। ইসলামী জ্ঞানকে অবশ্যই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অব্যাহত সাফল্যের সাথে তাল রেখে সমান তালে এগিয়ে চলতে হবে এবং আধুনিক জ্ঞানের চেয়েও এর দিগন্ত প্রসারিত করতে হবে। উম্মাহর বাস্তব সমস্যার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই উভয় জ্ঞানের সৃজনশীল সমন্বয় ঘটাতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতীয়মান নতুন সমস্যাসহ সামগ্রিক বিশ্ব-সমস্যার ফলপ্রদ সমাধান দেয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন হচ্ছে মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগের ইসলাম-সম্মত রূপ কি এবং কিভাবে উভয় জ্ঞানের সমন্বিত কাঠামোকে উম্মাহ ও মানব জাতির কল্যাণে এগিয়ে নেয়া হবে? একটি নির্দিষ্ট বিষয় অথবা সমস্যা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিশেষ প্রকৃতির প্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্য কোন্ পন্থা বেছে নেয়া বৈধ? এটা নিশ্চিত যে, প্রত্যেক বিষয়েই বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের সুযোগ রয়েছে যা ইসলামী আদর্শের নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী হতে পারে, হতে পারে কম অথবা বেশী কার্যকর কিংবা যা ইসলামী লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত অথবা বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এর মধ্যে কোন্ পথটি সম্ভব, প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য, বাঞ্ছনীয় অথবা বৈধ? সংশ্লিষ্ট সমস্যার সাথে ইসলামের সাযুজ্য কোন মানদণ্ডে নিরূপণ করা হবে? কোন্ পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত সমাধানের কার্যকারিতা পরিমাপ করা হবে? সৃজনশীল সমন্বিত তত্ত্বের অবদান প্রকাশ, পরীক্ষা ও মূল্যায়নের নীতিই বা কি হবে? কোন্ নীতির আলোকে এতে সংশোধন ও পরিবর্তন আনা হবে এবং এগুলোর অগ্রগতি ও ফলপ্রসূতা পর্যবেক্ষণ-মূল্যায়ন করা হবে? সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টায় উপরিউক্ত প্রশ্নগুলো গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে।

ইসলামী কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ের পুনর্বিন্যাস-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক

স্বভাবতই সকল ইসলামী চিন্তাবিদ উম্মাহর বর্তমান ও ভবিষ্যত স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যার একই রূপে সমাধান নাও দিতে পারেন। এ ধরনের মতপার্থক্য শুধু বাঞ্ছিত হবে না, বরং একে আগ্রহের সাথে স্বাগত জানাতে হবে। উম্মাহর চাহিদা ও লক্ষ্য সম্পর্কে ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক। উম্মাহ হিজরীর প্রথম শতকের মতো গতিশীলতা ফিরে পেতে পারে না যদি না, ইসলাম নতুন নতুন চিন্তা ও উদ্ভাবন নিয়ে নিরন্তর গবেষণায় নিমগ্ন না হয়। কেননা এর মাধ্যমেই আল্লাহর প্রাকৃতিক রীতির প্রতিফলন ঘটতে পারে। এই প্রকৃতি নৈতিক ও সৃজনশীল কার্মকাণ্ডের অতল খনির মতো। এর মধ্যেই ঐশী মূল্যবোধ ও আদেশ-নির্দেশ ঐতিহাসিক ধারায় সমন্বিত ও সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার আলোকেই লিখে যেতে হবে-তা নয়, বরং বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে ব্যক্তি বিশেষের রচনাবলী ব্যাপকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে ইসলামী জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট আধুনিক জ্ঞানের প্রাসংগিকতা ও সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত শর্তাদি পুরোপুরিভাবে মেনে চলে একটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করলেই জ্ঞানের ইসলামীকরণ সম্পন্ন হবে না। মুসলিম মানসের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে বহু পাঠ্যবই রচনা করা আবশ্যক। সর্বোপরি, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা-চাহিদা মেটানো জন্য অবিলম্বে প্রচুর পুস্তক প্রণয়ন করা দরকার। জ্ঞানের অফুরন্ত খোরাক যুগিয়ে মুসলিম মানসকে তৃপ্ত করা এবং পরিমার্জিত আকারে অসীম ইসলামী জ্ঞান তুলে ধরার লক্ষ্যে আরো অনেক বই প্রয়োজন। তবে আমাদেরকে সর্বপ্রথম আধুনিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল উন্নত মানের পাঠ্যবই রচনায় অগ্রাধিকার দিতে হবে যা একই সাথে ভবিষ্যতে ইসলামী মানসের জন্য দিক-নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত ধাপগুলোর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দিয়েই যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয় তাহলে তা সাধারণ মানের হতে বাধ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আমাদের সকল কর্তব্য উত্তমরূপে সমাধা করার তাগিদ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক রচনা জ্ঞানের ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ধাপ। এই কাজটি পূর্বোল্লেখিত সকল ধাপের প্রক্রিয়ায় সাফল্যের মুকুট পরিয়ে দেয়।

ইসলামী জ্ঞানের প্রসার

ইসলামী চিন্তাবিদদের এসব গবেষণাকর্ম যতোই মহৎ সৃষ্টি হোক- তা যদি তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে সংরক্ষিত থাকে তবে তা অর্থহীন। একইভাবে এসব বই-পুস্তক যদি কেবল তাঁদের পরিচিত বন্ধুমহলে, আশপাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা স্বদেশের মধ্যে চর্চা করা হয় তবে তাও হবে একটি দুঃখজনক ব্যাপার। আল্লাহ তাআলার দ্বীনের জন্য যা কিছু প্রণয়ন করা হয় গোটা উম্মাহ তার স্বত্ত্বাধিকারী। যদি জগতের সর্বাধিক সংখ্যক লোক এর সুফল না ভোগ করতে পারে তাহলে তাতে আল্লাহর আশীষধারা প্রবাহিত হতে পারে না। মুসলিম মনীষীদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াসের বৈষয়িক পুরস্কার অবশ্যই গ্রন্থস্বত্বের মাধ্যমে দেয়া উচিৎ। তাই বলে তা একচেটিয়া মুনাফা অর্জনের উৎস হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দ্বীনের জন্য প্রণীত রচনাবলী কাগজ, কালি ও বাঁধাইয়ের খরচ যে যোগাতে পারবে সেই তা প্রকাশের অধিকার ভোগ করবে।

দ্বিতীয়তঃ এসব বই-পুস্তক রচনার লক্ষ্য হওয়া উচিত সমগ্র মুসলিম জগত তথা মানব জাতির পুনর্জাগরণ এবং শিক্ষার আলোকদানের মাধ্যমে তাদের মননের উৎকর্ষতা অর্জন। অবশ্য মুসলিম মনীষীদের তাঁদের লেখার মাধ্যমে কেবল তথ্য সরবরাহ করলে চলবে না, এর চেয়েও বেশী কিছু করতে হবে। ইসলামী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে জ্ঞানের সেসব ক্ষেত্রের রহস্য উন্মোচনে নিমগ্ন হতে হবে যা এখনো অনুদঘটিত রয়ে গেছে। অখণ্ড সাধনায় নিয়োজিত হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটতে পারে এবং এভাবে এগিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট গবেষক ইনশাআল্লাহ এমন সাফল্য অর্জন করবেন যা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি।

এ কারণে উপরিউল্লিখিত ধাপের আলোকে প্রণীত রচনাবলী বিনামূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম বিদ্বানদের কাছে পাঠন উচিত এবং তাঁদেরকে আরো উন্নত বই-পুস্তক, নিবন্ধ, সংকলন ইত্যাদি প্রণয়নে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেয়ার তাগিদ দেয়া উচিত। একই সাথে রচনাবলী বিশ্বের সকল মুসলিম চিন্তাবিদের কাছেও পাঠাতে হবে এবং এটাই হবে ইহকালীন সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার। এর অর্থ বৈষয়িক পুরস্কার-প্রাপ্তি নিবারণ করা নয়, বরং যে মনীষী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত তাঁর জন্য তো আরেকটি মানুষের হৃদয়ে ইসলামী চৈতন্যের বীজ রোপণ করে দেয়ার চেয়ে উত্তম পুরস্কার আর কিছু হতে পারে না।

তৃতীয়তঃ এই কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় রচিত বইপত্র মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানাতে হবে। স্বভাবত সেগুলো বিভিন্ন দেশের স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদও করতে হবে।

জ্ঞানের ইসলামীকরণে অন্যান্য সহায়ক উপায়

সম্মেলন ও সেমিনার

জ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সম্মেলন ও সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। উম্মাহর যে সব সমস্যা এই ক্যাটেগরির আওতায় পড়ে তার ওপর একই সাথে বহুবিধ বিষয়ে আলোকপাত করা যায়। এছাড়া একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ের জন্য চিন্তাবিদ ও কুশলীদের মধ্যে সম্মেলন হওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

ফ্যাকাল্টি প্রশিক্ষণের জন্য শ্রেণী কর্মশালা

প্রথম থেকে দ্বাদশ ধাপ-এর আলোকে সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হওয়ার পরপরই ফ্যাকাল্টির শিক্ষকদেরকে ঐসব বিষয়ে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া আবশ্যক। বিশেষজ্ঞদেরকে তাঁদের রচনাবলী ও বই-পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত তত্ত্ব, নীতি ও সমাধানের অলিখিত ধারণাসমূহ এবং অপ্রকাশিত ফলাফল নিয়ে ফ্যাকাল্টির সদস্যদের সাথে আলোচনার সুযোগ দেয়া উচিত। এছাড়া এ ধরনের আলাপ-আলোচনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে শিক্ষকদেরকে যোগ্যতার সাথে শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করা যায়।[৩৯]

বাস্তবায়নের আরো নিয়ম

১. মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নের এ পর্যায়ে মুসলিম বিদ্বানরা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ চালিয়ে যাবেন- এমনটা আশা করা উচিত হবে না। নিয়মিত কর্তব্যের বাইরে এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের মান অনুযায়ী তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানের নিয়ম চালু করতে হবে। সারা বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মান অনুযায়ী সম্মানী নির্ধারণ করা উচিত। আমরা অমুসলিম, বিদেশী অথবা অনাবাসিক বিদ্বানদের তুলনায় মুসলিম, দেশীয় অথবা আবাসিক বিদ্বানদের কম পারিশ্রমিক দানের নীতিতে বিশ্বাসী নই। বস্তুত এই বৈষম্যই 'মেধা পাচার', মুসলিম বিদ্বানদের হতাশা এবং ঔদাসীন্য, নিরাসক্ততা ও বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতায় নৈরাজ্যের মূল কারণ।

২. শিক্ষা সংক্রান্ত বইপত্র প্রণয়নের জন্য কেবলমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তিদের যাতে নিয়োগ করা যায় সেদিকে সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি দেখা যায় কোন একজন বিদ্বান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন কিছু তৈরি করতে পারবেন না কিংবা তা মানসম্মত হবে না বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে একই কাজের জন্য একাধিক বিদ্বানকে দায়িত্ব দেয়া যায়। কারো পরিশ্রমের ফল গ্রহণযোগ্য না হওয়ার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এ ব্যাপারে কোন আপোষ করা যাবে না। সুতারং এটাকে একটি নীতি হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হবে যে, প্রতিটি কাজের জন্য অন্তত পাঁচজন বিদ্বানকে দায়িত্ব দিতে হবে। বিদ্বানদের গবেষণামূলক কাজে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য।

৩. মৌলিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটা ঘটে থাকে, যদিও সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার তুলনায় কিছুটা কম। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাশৈলীর ভিন্নতা স্বাভাবিক; আবার একই বিষয়ে একাধিক বইপত্রও তৈরী হতে পারে। এটাকে কখনোই অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি হিসেবে দেখা ঠিক নয়। এই বৈচিত্র্য বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সমৃদ্ধই করে।

৪. যদি প্রস্তাবিত কাজটি বৃহদাকারের হয় তাহলে তা ভাগ ভাগ করে বিভিন্ন বিদ্বানকে দেয়া, যাতে সেটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা যায়।

৫. জ্ঞানের ইসলামীকরণ যেহেতু মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথম কাজ, সেহেতু এর ফল সকল মুসলিম দেশ ভোগ করবে, এ জন্য প্রতিটি দেশের কাছ থেকে এই মহতী কাজের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। উম্মাহর কোন সংস্থা জ্ঞানের ইসলামীকরণের দায়িত্ব নেয় নি বলে এই কাজ এখন গোটা উম্মাহর জন্য ফরজে আইন। অতএব এ জন্য মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশ, সংস্থা-সংগঠন এবং বিত্তবানদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

---

৩৯. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

খ. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সম্ভাব্য কাঠামো

ব্যক্তি ও জাতির বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা ছাড়া মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। শিক্ষাই মানুষকে পশুর স্তর থেকে মানবিক স্তরে উন্নীত করে। শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তির দৈহিক, মানবিক, নৈতিক-আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধিত হয়। তাই শিক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব সবার কাছেই স্বীকৃত। তবে শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন ও প্রকৃতি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও জাতির ধর্ম-আদর্শ, সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং সে জাতির প্রকৃত ও বাস্তব চাহিদার উপর। এ জন্যেই সব জাতির শিক্ষাব্যবস্থাও শিক্ষানীতি হুবহু একরকম নয়, হতেও পারে না। একজন মুসলিম ব্যক্তি ও মুসলিম জাতির জন্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থা কাঙ্ক্ষিত-তা হচ্ছে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা একটি ব্যাপক বিষয়। নমুনা হিসেবে এখানে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পেশ করা হলো।

শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস

শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রম নির্ধারণ ও সিলেবাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতিপয় নীতিগত বিষয় সামনে রাখতে হবে।

১. একটি নির্দিষ্ট স্তর (প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তর) পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস এক ও অভিন্ন হতে হবে।
২. মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করার জন্য যে পরিমাণ ইসলামী জ্ঞানার্জন সবার জন্য ফরয ততটুকু শিক্ষা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।
৩. একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে জ্ঞান দক্ষতা-অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. আদর্শ চরিত্র গঠন, সুনাগরিক তৈরী, সুস্থ সবল, সুশৃঙ্খল ও মহৎ উন্নত জীবন যাপন করার জন্য যে ধরনের শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস প্রয়োজন তা নিশ্চিত করতে হবে।
৫. ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক পারদর্শীতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সমকালীন পরিস্থিতিতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার এবং যুগসমস্যার সুষ্ঠু সমাধান পেশ করার যোগ্যতা অর্জিত হয়, এ দিকটা লক্ষ্য রেখে উচ্চ শিক্ষার সিলেবাস ও কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে।
৬. শিক্ষার কারিকুলাম ও সিলেবাস এমন হতে হবে যাতে করে সমকালীন জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ও মৌলিক গবেষণার যোগ্যতা অর্জিত হয়।
৭. কারিকুলাম ও সিলেবাস এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থীদের সমস্ত মানবীয় গুণ ও বৃত্তির বিকাশ সাধন সম্ভব হয়।
৮. শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের ধর্মীয়, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, সামরিক ও প্রযুক্তিগত সার্বিক চাহিদা পূরণ হয়।

উল্লিখিত নীতিগত দিক ও প্রয়োজনকে সামনে রেখেই প্রত্যেক স্তরের শিক্ষাক্রম, বিষয় নির্ধারণ ও সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক স্তর

উদ্দেশ্য

১. ইসলামের চাহিদা মাফিক খেলাধুলা ও আনন্দদায়ক পরিবেশের মাধ্যমে শিশুর প্রয়োজনীয় অভ্যাস গড়ে তোলা।
২. শিশুর দৈহিক, মানসিক ও চারিত্রিক পরিপুষ্টি সাধন।
৩. ভবিষ্যতে সুসামঞ্জস্য ইসলামী পারিবারিক ও সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবনযাপনের জন্য সহায়তা করা।

Dhaka University Institutional Repository

৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ। পাঠ্য : ১. অক্ষর (মাতৃভাষা ও 'আরবী) শিখানো, ২. গণনা শিখানো, ৩. নৈতিক পরিবেশ বিষয়ক শব্দ শিখানো, ৪. ইসলামের মৌলিক শব্দ : আল্লাহ, রাসূল সা., কুর'আন ইত্যাদি শব্দাবলী এবং কালেমা তাইয়্যেবা শিখানো, ৫. শিক্ষামূলক ছড়া শিখানো, ৬. আঁকাজোকা শিখানো, ৭. জরুরী অভ্যাসসমূহ : ডানহাতে পানাহার, কাপড় পরা, সালাম দেয়া, শিষ্টাচার ও সুন্দরভাবে সম্বোধন করা, টয়লেট ব্যবহার, ঘুমানো, বিসমিল্লাহ বলে সব কাজ শুরু করা ইত্যাদি অভ্যাস সৃষ্টি।

প্রাথমিক স্তর

৮ বছর মেয়াদী (১ম-৮ম শ্রেণী)

উদ্দেশ্য

১. ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিশুর নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন।

২. শিশুর মনে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা আল্লাহ ও রাসূল সা.-এর প্রতি আনুগত্য, নাগরিকতাবোধ, মানবতাবোধ, কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা এবং অধ্যবসায়, শ্রম, শিষ্টাচার, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলী জাগ্রত করা।

৩. ক. মাতৃভাষায় লিখন, পঠন ও হিসাবরক্ষণের ক্ষমতা অর্জন, খ. ইসলামের মৌলিক ধারণা ও ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন বিশেষত বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত ও মৌলিক 'ইবাদতগুলো যথাযথ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, ভবিষ্যত নাগরিক হিসেবে যেসব মৌলিক জ্ঞান ও কলাকৌশল প্রয়োজন হবে সে সবের সঙ্গে পরিচিতি।

৪. পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি।

প্রকৃতি

১. সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

২. এক ও অভিন্ন শিক্ষা।*[৪০]

৩. অবৈতনিক শিক্ষা।

প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম ও পঠিতব্য বিষয়

মৌলিক বিষয়

১. বাংলা।

২. 'আরবী ভাষা ও ইংরেজী ভাষা।

৩. গণিত।

৪. ধর্মতত্ত্ব ও শরী'আ : ক. আল কুর'আন বিশুদ্ধ পাঠ, খ. ইসলামী আকাঈদ, গ. ইসলামী ফিক্হ/'ইবাদাত ও পারিবারিক ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান, ঘ. ইসলামী আখলাক-আদব, ঙ. ইসলামের ইতিহাস।

৫. বিজ্ঞান।

৬. সমাজ বিদ্যা : ইতিহাস, পৌরনীতি, পরিবেশ জ্ঞান, অর্থনীতি।

৭. শরীর চর্চা।

৮. বৃত্তিমূলক বিষয়।

ধর্মতত্ত্ব ও শরী'আত বিষয়ক সিলেবাস এমন হতে হবে যাতে ৮ বৎসরে একজন শিক্ষার্থী বিশুদ্ধভাবে কুর'আন তিলাওয়াত শিখতে পারে। মৌলিক 'ইবাদতগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারে এবং ইসলামের

---

৪০. বিভিন্নতার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। হাফেজ ও ক্বারী তৈরীর জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশেষ ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক শরী'আহর বিধান ও ইসলামের গোড়ার ইতিহাস জানতে পারে। প্রাথমিক স্তরেই যাতে ইসলাম যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এ বিষয়ে ধারণা জন্মে এবং কুর'আন হাদীস আকা'ঈদ উসূলের মৌলিক ধারণা লাভ করতে পারে।

অন্যান্য বিষয়ের সিলেবাস ও পাঠক্রম এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে বর্তমান যুগের চাহিদা মতো মৌলিক জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়। সাথে সাথে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, শব্দ চয়ন, বিষয়বস্তু নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারাকে সামনে রাখতে হবে। ইসলামের/ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোন বিষয় এ স্তরে সিলেবাসভুক্ত করা যাবে না। এককথায় বিভিন্ন বিষয়ের সিলেবাস ও পুস্তক প্রণয়ন এমনভাবে হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ইসলামী ভাবধারা পুষ্ট হয়। বিশেষ করে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, পরিবেশ জ্ঞান, পৌরনীতি, ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামী ভাবধারা জাগ্রত করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তর : ৪ বছর
(৯ম-১২শ শ্রেণী)

উদ্দেশ্য

১. উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ।

২. প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত শিক্ষার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণ।

৩. ইসলামী জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধকরণ ও ইসলামের বিশ্বদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন।

৪. দক্ষ, সৎ, ধার্মিক, কর্তব্য নিষ্ঠ, কারিগরী যোগ্যতা সম্পন্ন জনশক্তি সরবরাহ।

শিক্ষার স্তর

এ পর্যায়ে শিক্ষার স্তরকে বিভিন্ন রূপে বিন্যস্ত করা ভাগ করা যায় :

১. বিজ্ঞান বিভাগ।

২. বাণিজ্য বিভাগ।

৩. ধর্মতত্ত্ব ও শরী'আহ বিভাগ।

৪. মানবিক বিভাগ।

বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ

বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের পাশাপাশি 'ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমন্বিত (ইসলামী তত্ত্ব, নীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, নৈতিকতা হবে) নামক একটি বিষয় আবশ্যিকভাবে পড়তে হবে। বাণিজ্য বিভাগে ইসলামী ব্যাংকিং ইনস্যুরেন্স বাণিজ্য আইন ইত্যাদি সিলেবাসভুক্ত করতে হবে। মানবিক বিভাগে 'ইসলামী সভ্যতা' বিষয়টি ছাড়াও সমস্ত বিষয়ে ইসলামী তত্ত্ব-ভাবধারা মতবাদ পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত করতে হবে। বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে মাতৃভাষা ছাড়াও ইংরেজী/ আন্তর্জাতিক ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে এবং 'আরবী তৃতীয় ভাষা হিসেবে পড়তে হবে।

মানবিক বিভাগ

মানবিক বিভাগে মাতৃভাষা, 'আরবী ও ইংরেজী পড়তে হবে।

ধর্মতত্ত্ব ও শরী'আহ বিভাগ

মাতৃভাষা, 'আরবী ভাষা, ইংরেজী ভাষা বা অন্যকোন আন্তর্জাতিক ভাষা, কুর'আন, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিক্হ, কালাম, ইসলামী রাষ্ট্র তত্ত্ব ও ইসলামী অর্থনীতি ইত্যাদির বিষয়সমূহের মৌলিক জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষায়ও 'ইসলামী সভ্যতা' বিষয় এবং মাতৃভাষা পড়াতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে সামরিক শিক্ষার একটি কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ স্তর

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা

উদ্দেশ্য

১. বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরী।

২. গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসার।

৩. আধুনিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় উপযুক্ত লোক তৈরী।

৪. ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা সম্পন্ন জনশক্তি তৈরী।

কারিকুলাম/পঠিতব্য বিষয়সমূহ

উচ্চ শিক্ষার কারিকুলাম ও সিলেবাস নির্ধারণে নিম্নোক্ত মৌলিক বিষয়গুলো সামনে রাখতে হবে :

১. সমস্ত বিষয়ের/বিভাগের সাথে 'ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি' সম্পর্কিত একটি বিষয় থাকতে হবে।

২. মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য, আইন অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে সংশ্লিষ্ট বিষয়েও ইসলামী তত্ত্ব, মতবাদ ও দৃষ্টিকোণ সংযোজন করতে হবে।

৩. আল কুর'আন, আল হাদীস, ফিকহ, দর্শন, ইসলামী সভ্যতা, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্ব ও সরকার, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও মতবাদ ইত্যাদি বিষয়ে সম্মান ও স্নাতকত্তোর কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. চিকিৎসা, প্রকৌশল ও কৃষি শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়েও 'ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি' বিষয়ক একটি আবশ্যিক পত্র থাকতে হবে। এ বিষয়ের মাধ্যমে পেশাগত শিক্ষার দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ইসলামী তত্ত্ব, সভ্যতা সংস্কৃতি, সমাজ কাঠামো নৈতিকতা ইত্যাদি সম্পর্কিত স্পষ্ট ও মৌলিক ধারণা দিতে হবে। অর্থাৎ এসব শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সচেতন মুসলিম চিকিৎসাবিদ মুসলিম প্রকৌশলী, মুসলিম কৃষিবিদ হিসেবে সমাজে ভূমিকা পালন করতে পারে।

নারী শিক্ষা

নারী শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে :

১. নারীদের বৃত্তি সমূহের বিকাশ এবং গৃহ ও সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে মুসলিম নারী হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করার ব্যবস্থা করা।

২. মেয়েদের স্বভাব উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দেয়া।

৩. মেধা সম্পন্ন নারীরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. সহশিক্ষার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা।

৫. চিকিৎসা বিজ্ঞানে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬. সম্ভাব্য সর্বস্তরেই যাতে মহিলারা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭. পৃথক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা মেডিকেল ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া। যতদিন তা সম্ভব না হবে ততদিন উপযুক্ত হিজাব সহকারে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

গণশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ

১. একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা নির্মূল করতে হবে।

২. বয়স্ক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে ইসলাম/ধর্ম/নৈতিকতা সম্পর্কে সচেতন, স্ব স্ব পেশা বিশেষ করে কৃষি ও কৃষি ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিবেশ বিষয়ক এবং নাগরিক দায়িত্ব আইন কানুন সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. বিভিন্ন প্রকার গণ মাধ্যম, মসজিদ ও ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে গণশিক্ষার জন্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

ক্রীড়া ও সামরিক শিক্ষা

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সবার জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সাথে স্বাস্থ্য চর্চা ও নির্দোষ ও শরী'আত অনুমোদিত পন্থায় খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

আমাদের মত একটি দরিদ্র দেশের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা খুবই জরুরী। এ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। তাই এ ধরনের শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়।

১. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্তির পরই শিক্ষার্থীদের বাছাই পর্বের মাধ্যমে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানে তাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে কুর'আন, হাদীস, ইসলামী আখলাক ও সীরাতের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে কৃষি ও কুটির শিল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. এ উদ্দেশ্যে দেশের প্রত্যেকটি উপজেলায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

অমুসলিমদের জন্য স্ব স্ব ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা

ইসলাম অমুসলিমদের যে অধিকার দিয়েছে, অন্য কোন আদর্শ তার সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে অমুসলিমদের জন্য তাদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানার সুযোগ থাকবে।

উচ্চতর গবেষণা

অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ইসলামী বিভিন্ন গবেষণামূলক কোর্সের ব্যবস্থা থাকতে হবে। যাতে ইজতিহাদী ক্ষমতাসম্পন্ন একদল বিশেষজ্ঞ তৈরী হতে পারে। যাদের কাছে মুসলিম উম্মাহ যুগ সমস্যার ক্ষেত্রে সঠিক ও বাস্তব দিক নির্দেশনা পাবে, যারা ইসলামের আলোকে একটি আধুনিক রাষ্ট্র পরিচলনার ক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম হবেন।

গ্রন্থ রচনা

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন বই পত্রের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন বই-পত্র যে দৃষ্টিতে লেখা হয়েছে তাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তার ওপর আঘাত এসেছে ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে সমাজ পাঠ, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনস্তত্ব, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়, ইতিহাস। এ বিষয়গুলোকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করে নতুনভাবে লিখতে হবে।

১. সমাজ পাঠ ও সমাজ বিজ্ঞানকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এমনভাবে গ্রন্থিত করতে হবে যার ফলে তাকে ইসলামী সমাজ পাঠ ও ইসলামী সমাজ বিজ্ঞান নামে আখ্যায়িত করা সম্ভব হবে।

২. বিজ্ঞানের প্রকাশ ভঙ্গী ও বিশ্লেষণ প্রণালীকে আল্লাহ বিশ্বাস ও কুর'আনী আহকামের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি বই পুনর্লিখিত হতে হবে। কোথাও কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের মোকাবিলায় বান্দার অহম যেন না থাকে।

৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ ও পদ্ধতির আলোকে নতুন করে সাজাতে হবে। অন্যান্য রাজনৈতিক মতবাদ ও পদ্ধতিগুলো সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকবে এবং ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সিস্টেমের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৪. অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক মতবাদ ও ব্যবস্থার সুস্পষ্ট ও জোরালো বর্ণনার সাথে সাথে বিশ্বে প্রচলিত পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, মার্কসবাদ প্রভৃতি অর্থনৈতিক মতবাদগুলোর গলদ সুস্পষ্ট করতে হবে।

৫. ইসলামের ইতিহাস থেকে রাজা বাদশাহদের ইতিহাসের প্রাধান্য হ্রাস করতে হবে। ইসলাম মুসলমানদের কি হয়েছে, মুসলমানরা ইসলামের সাথে কি ব্যবহার করেছে, ইসলাম বিশ্ব মানবতাকে কি দিয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

> ইসলামের বিরুদ্ধে কিভাবে অনৈসলামের আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে, ইসলাম কিভাবে তার মোকাবিলা করেছে এবং ইসলামকে গ্রহণ করে মুসলমানরা কিভাবে বিশ্বে উন্নতি লাভ করেছে এবং ইসলামকে পরিহার করে কিভাবে তারা অধঃপতিত হয়েছে তার ইতিহাসই হবে ইসলামের ইতিহাস। আর এ ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও রাজ বংশের নামে চিহ্নিত না হয়ে মুজতাহিদীন ও মুজাদ্দিদীনে ইসলাম, ইসলামের অনুসারী শ্রেষ্ঠ মুসলিম শাসকবৃন্দ ও শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষীদের নামে চিহ্নিত হওয়া উচিত।[৪১]

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এক ব্যাপক ভিত্তিক ব্যবস্থা। দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণেই এ শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের জাতির বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে সত্যিকার সংহত জাতি গড়ে তোলার জন্য কাঙ্ক্ষিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই একমাত্র বিকল্প। তাই এর জন্য আমাদের প্রয়াস চালাতে হবে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যতিত সত্যিকার আদর্শ মানুষ তৈরী সম্ভব নয়। সত্যিকার আদর্শ মানুষ ছাড়া আদর্শিক সমাজ বিনির্মাণ অসম্ভব। তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবীকে জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়াস ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

---

৪১. অধ্যক্ষ মুঃ আবদুর রব, *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা*, ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯০; অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, 'ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা', *কেন্দ্রীয় সহযোগী সদস্য সম্মেলন* ১৯৯৭, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস, ১৯৯৭, পৃ ২০-২৬; ড. মোহাম্মদ লোকমান, 'ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : কাঠামো ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি', *বাংলাদেশ ইসলামিক স্টাডিজ ফোরাম স্মারক* ২০০০, পৃ ১৭-১২।

Dhaka University Institutional Repository

গ. বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার উন্নয়ন : প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম, ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধশালী ও অযুত সম্ভাবনার একটি দেশ হলেও এখন পর্যন্ত এর কোন শিক্ষানীতি নেই। অথচ শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড- যা জাতিকে পৌঁছে দিতে পারে তার সুস্পষ্ট লক্ষ্যবিন্দুতে, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতির স্বর্ণশিখরে। তাই দেশ ও জাতির চাহিদা মোতাবেক একটি আদর্শভিত্তিক, বিজ্ঞানমুখী, যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অতীব জরুরী। '৪৭ সালে বৃটিশ গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার পর এবং '৭১-এ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ পর্যন্ত এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে অনেক এবং এ প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত আছে।

শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে করণীয়

এদেশের সুদীর্ঘ শিক্ষা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কোন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টই এ পর্যন্ত কোন পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয় নি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয়েছে প্রচুর বিতর্কিত। সচেতন দেশবাসী এবং জাতি কর্তৃক হয়েছে প্রত্যাখ্যাত। এ ব্যর্থতার কারণ কি? নানামুখী পর্যালোচনায় বিজ্ঞ পর্যবেক্ষকদের অভিমত এই যে, উক্ত প্রচেষ্টা সমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চাহিদা ও লক্ষ্য পূরণের পরিবর্তে তৎকালীন সরকারসমূহের রাজনৈতিক ইচ্ছা পূরণেই ছিল বেশী সচেষ্ট। ফলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সুতরাং, সর্বজনগ্রাহ্য কমিশন গঠন অতীব জরুরী। বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হিসেবে বিবেচ্য দিক :

১. বাংলাদেশের শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দুটি উপাদান হবে ইসলামী মূল্যবোধ এবং স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী চেতনা। এই দুটির একটিকে অপরটির সাথে সাংঘর্ষিকভাবে উপস্থাপনের জন্য মহল বিশেষের যে প্রয়াস আমদের জাতীয় বিকাশকে শ্লথ করছে তাদের হঠাকারিতা মোকাবিলা করে উভয় উপাদানের স্বাভাবিক সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

২. শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে হবে নৈতিক দিক থেকে সৎ এবং পেশাগত দিক থেকে যোগ্য মানুষ গড়ে তোলা।

৩. শিক্ষার কারিকুলামে এই জনপদের হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত হতে হবে।

৪. শিক্ষার সুযোগকে সার্বজনীন ও অবাধ করার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।[৪২]

৫. শিক্ষার সকল স্তরে ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে সন্নিবিষ্ট করতে হবে।

৬. মাদরাসা শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় রূপান্তরিত করা ও এর আধুনিকায়নের জন্য পর্যাপ্ত গবেষণা, পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নিশ্চিত করতে হবে। মাদরাসার ডিগ্রীধারীদেরকে সকল স্তরে সমমর্যাদায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

৭. মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৮. বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত শিক্ষা অবকাঠামো গড়ে তোলার সুপারিশ থাকতে হবে।

৯. এনজিও পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমসমূহকে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে।

১০. নারী শিক্ষাকে ব্যাপকতর ও উন্নত করার লক্ষ্যে নারীদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নারী শিক্ষা উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে।

১১. শিক্ষা ব্যাংক এবং শিক্ষা ঋণ প্রকল্প চালু করতে হবে।

১২. ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে সকল পর্যায়ে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করতে হবে।

১৩. শিক্ষা সম্প্রসারণে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা এবং ইবতিদায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এই প্রোগ্রামে সম্পৃক্ত করতে হবে।

---

৪২. *সাপ্তাহিক বিক্রম*, শিক্ষা সংখ্যা, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৮, পৃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. কওমী মাদরাসাসমূহকে স্বীকৃতি দিয়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে রেজিস্ট্রেশন ও সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় আনতে হবে। এই শিক্ষাধারার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।[৪৩]

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা : প্রস্তাবনা

সুষ্ঠ ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য যথার্থ প্রশাসন ও সুন্দর ব্যাবস্থাপনা অপরিহার্য। আদর্শিক ভিত্তি, মহৎ উদ্দেশ্য, গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রভূত ভৌত সুবিধাদি নিস্ফল প্রয়াস বলে পরিগণিত হতে পারে কেবলমাত্র প্রশাসনিক অব্যবস্থা-অপব্যবস্থার কারণে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের প্রচুর অর্থব্যয় বা বরাদ্দ অন্তত শিক্ষার জন্য কোনই সুফল বয়ে আনে না যদি তা গতিশীল প্রশাসন ও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত না হয়। কেন্দ্র থেকে ব্যাপ্ত পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার[৪৪] মধ্যে সুসমন্বয়ের মাধ্যমেই শিক্ষার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব।

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ধারা প্রমাণ করে 'ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ' শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা। শিক্ষাক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন নীতি ও আদর্শের চেয়ে রাজনৈতিক বিবেচনা, আমলাতান্ত্রিক সুবিধা এবং 'যখন যেমন তখন তেমন' অবস্থা বিরাজ করায় একটির পর একটি শিক্ষানীতি প্রণীত হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটে নি। বরং সবসময়ই শিক্ষাকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বে চলমান গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছে। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার প্রতিটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষাবিদদের দ্বারা অথচ বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাদের অংশিদারিত্ব ছিল অতীব নগণ্য। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিষয় বিশেষজ্ঞের অনুপস্থিতির কারণে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে এবং শিক্ষামানের ক্রমাবনতি ঘটেছে।[৪৫]

শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষাব্যবস্থাপনার সাথে শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শিক ভিত্তির আত্মিক যোগাযোগ রয়েছে। নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, মানবতাবাদী দেশপ্রেমিক চরিত্রবান এবং সুশৃঙ্খল নাগরিক সৃষ্টি করতে চাইলে শিক্ষকদের মধ্যেও ঐ সব গুণাবলীর সমাবেশ থাকতে হবে। তেতুল গাছে যেমন মিষ্টি আম ধরে না সেরূপ অনৈতিক, লোভী, অর্থলিপ্সু, অসহিষ্ণু, অস্থির শিক্ষকমণ্ডলী সুনাগরিক উপহার দিতে পারে না। সে জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের প্রথম শর্ত হওয়া উচিত নীতি-নৈতিকতা। উত্তম চরিত্র, উন্নতমানের নৈতিকতা পদোন্নতি এবং গুরুত্বপূর্ণ পদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য হওয়া উচিত। নৈতিক পদস্খলনকে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং তাকে চাকরিচ্যুতসহ কঠোর শাস্তি দিতে হবে। শিক্ষকতা পেশায় যাতে মেধাবী ও চরিত্রবান জনশক্তির বিপুল সমাবেশ ঘটে এ জন্য উচ্চ প্রারম্ভিক বেতন দিতে হবে। অন্যান্য ক্যাডার ও চাকরি ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক অবস্থা এড়ানোর জন্য বিশেষ শিক্ষা ভাতা অথবা স্টার, প্রথম বিভাগ ইত্যাদির জন্য 'স্পেশাল' ইনক্রিমেন্ট' দেয়া যেতে পারে। এ ছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে যে কোন স্তরেই থাকুন না কেন প্রাথমিক বিদ্যালয় অথবা মহাবিদ্যালয়ে তাকে তার ডিগ্রী ও যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন দিতে হবে। যেমন এমএ পাস করা একজন যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করে তবে তাকে এম এ পাসের প্রাপ্য স্কেলই দিতে হবে। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষা সমৃদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণ হবে।

১. শিক্ষকদের নৈতিক ও আত্মিক উন্নতিবিধানের সাথে সাথে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রীবৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার মান উন্নয়নের সাথে পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অভিভাবকরা প্রায়শই অভিযোগ করেছেন পাঠ্যপুস্তকগুলো যেমন নিম্নমানের তেমনি অসংখ্য ভুলে পরিপূর্ণ। দেশের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সরবরাহের জন্য দায়িত্বশীল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক এটা শিক্ষানুরাগী মানুষের কাম্য নয়। ১৯৮৩ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন

---

৪৩. শাহ আবদুল হান্নান, 'কাওমী মাদরাসা শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কিছু প্রস্তাব', *মাসিক দারুস সালাম*, আদর্শ শিক্ষা সংখ্যা, পৃ ৬৫।

৪৪. শিক্ষা প্রশাসন বলতে রাষ্ট্রব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত তদারকি ও মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষকে বোঝানো হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বলতে শীর্ষ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পঠন-পাঠন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনাকেই নির্দিষ্ট করা হয়।

৪৫. ড. আবদুল লতিফ মাসুম, 'শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা : একটি সমন্বিত প্রস্তাবনা', *সাপ্তাহিক বিক্রম*, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র এবং স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড একীভূত করা হয়। সম্ভবত সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিলো না। দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার কারণে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের দায়িত্ব টেক্সটবুক বোর্ড নিতে পারে। তবে পরবর্তী পুস্তক জাতীয় শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা মোতাবেক অবাধ রাখার অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তিতে গঠিত ও সরবরাহ করতে পারে। এতে পাঠ্যপুস্তকের মান বৃদ্ধি পাবে এবং প্রকাশনা ক্ষেত্রে 'বিপ্লব' ঘটবে।

২. সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে উচ্ছৃঙ্খলতা, অস্থিরতা ও অরাজকতামুক্ত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলভিত্তিক প্রতিযোগিতাও কোন্দলমুক্ত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সকল রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য প্রয়োজন।

৩. শিক্ষার মানই একটি সুস্থ জাতি গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। এ জন্য চাই- ভবিষ্যত বংশধরদের নির্মল স্বাস্থ্য এবং আনন্দ উজ্জ্বল পরমাণু তাই প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেহ ও মনের সমবিকাশের স্বার্থে শরীর চর্চা ও খেলাধুলা বাধ্যতামূলক করা উচিত।

৪. জীবনযুদ্ধের সবক্ষেত্রেই যাতে ভবিষ্যত নাগরিকরা নৈতিক চৌকস ও পারঙ্গম হয়ে উঠতে পারে এজন্য আবৃত্তি, বক্তৃতা, বিতর্ক, সাধারণ জ্ঞান, প্রদর্শনী ইত্যাদিসহ শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৫. শিক্ষার্থীর চিত্তবিনোদনের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ ক্রীড়া, শিক্ষামূলক ধারা, ছবি প্রদর্শন ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের সাহচার্যের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬. ছাত্রদের বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে টিফিনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে চালু 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী' ইতিবাচক ফলের পরিবর্তে নেতিবাচক ফল দিচ্ছে। কর্মসূচী প্রত্যাহারপূর্বক টিফিনের ব্যবস্থা ও গরিব সকলের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৭. শিক্ষার সর্বস্তরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি জেলায় পিটিআই স্থাপন করতে হবে। 'নায়েম' ধরনের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান ও সুবিধার সম্প্রসারণ করতে হবে।

৮. ছাত্রদের যেমন নির্দিষ্ট পোশাক আছে শিক্ষকদেরও তেমনি নির্দিষ্ট রুচিশীল পোশাক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে।

৯. ছাত্রদের পরিশ্রমী, স্বাবলম্বী ও পরোপকারী করার জন্য বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কার্যক্রম যেমন খাল খনন কর্মসূচী, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১০. ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। এজন্য প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক দলগুলোর একটি গোলটেবিল বৈঠকে ডাকতে পারেন। জাতীয় একমত্যের ভিত্তিতেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা সম্ভব না হলে অন্তত সরকারিভাবে ছাত্ররাজনীতি নিরুৎসাহিতকরণের প্রক্রিয়া ও কর্মসূচী অনুসরণ করতে হবে।

শিক্ষাপ্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটির সফলতা আর একটির ওপর নির্ভরশীল। বলাবাহুল্য যে, এসব ক্ষেত্রে শিক্ষা নেতৃত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নেতৃত্বেই প্রমাণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসমাজের গতিপ্রকৃতি কি রকম হবে। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার যদি সুসমন্বয় সাধিত না হয়, তাহলে সকল প্রস্তুতি, সকল প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনায় প্রাথমিক পদক্ষেপ

ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতির মৌলিক নীতি ও উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের স্পষ্টতাকে আলোচনা করলে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত এর সকল দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, এর ভিতরে কারিকুলাম, সিলেবাস, পাঠ্য বই এবং অন্যান্য শিক্ষাপোকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ভৌগোলিক পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থানের বহুরূপী প্রয়োজনের সমন্বয়কৃত পরিপূরক এবং বিশ্বব্যাপী এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনকে চিহ্নিত করতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমাজের রাজনৈতিক নেতাদের। সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষাই হচ্ছে রাজনীতির প্রথম পদক্ষেপ। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উচিত একে চিহ্নিত করে এবং এর তত্ত্বগত ও বাস্তব ব্যবহারে উভয়কেই গ্রহণ করা।

পরিকল্পনা

কাজের একটি প্রক্রিয়াগত ক্রমোন্নতির ধাপে যে সকল জিনিস হিসাবে আনতে হবে : গন্তব্য ও লক্ষ্য সময়ের পরিমাপ, সম্পদের সম্ভার [মানব ও বস্তুগত] উপদেশসহ দেখা-শুনা, প্রয়োগ এবং সফলতার পরিমাপ।

অবকাঠামো

বর্তমানে পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, দালান কোঠা ও ভূ-সম্পত্তি থেকেই যাবে কিন্তু তাদেরকে ইসলামী বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গির রেখায় প্রতিফলিত হতে হবে এবং তা হবে স্রষ্টার নির্দেশ [উবাদিয়াহ] এবং খলিফাতুল্লাহ হিসেবে অপরিবর্তনশীলতার দৃঢ় ভিত্তিতে। অবকাঠামোতে অপরিহার্য পরিবর্তনসমূহ আনতে হবে এর মধ্যে ইসলামের কর্তব্য পালনে ও ধর্মানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় মসজিদ, পূজাস্থানের সুবিধা এবং অমুসলিমদের [মুসলিম দেশসমূহে] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

দ্বি-শাখার পরিসমাপ্তি

বেশির ভাগ মুসলিম দেশেই দু'ধরনের পদ্ধতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখা যায়, ধর্মীয় এবং লৌকিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। যারা এই লৌকিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ বের হচ্ছে তারাই সমাজের প্রতিটি স্তরে আধিপত্য লাভ করছে, পক্ষান্তরে যারা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হচ্ছে তারা সমাজের মূল স্রোতের বাইরেই থেকে যাচ্ছে কেবল কিছু ধর্মীয় ও আত্মিক প্রয়োজনের ক্ষেত্র ছাড়া বর্তমানের ধর্মীয় শিক্ষা পদ্ধতি ক্রটিযুক্ত এবং বর্তমান সময়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে পাল্লা দিতে অক্ষম। বরং তারা দুই ভুবনেরই [এই পৃথিবী এবং পরের] চরম উৎকর্ষতা লাভকে কেন্দ্রীভূত করতে গিয়ে জাগতিক জগতের উন্নয়নের পথে পিছিয়ে পড়েছে। এ বিষয়টি আরো কৌতুহল উদ্দীপক যে অনেক মুসলিম দেশে পার্থিব শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাশাপাশি পৃথকভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় লৌকিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহসহ সবগুলোকে একত্রীভূত করে এক অখণ্ড পদ্ধতির ভেতরে নিয়ে আসতে হবে যাতে এই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সকল বিষয়কে তার অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

কারিকুলাম

স্রষ্টার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যায় না এমন সব জ্ঞানের শিক্ষা ও তার প্রয়োগ চালিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে কারিকুলাম, সিলেবাস, পাঠ্যবই ও শিক্ষাসম্পদ রয়েছে তা অতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবং তা কুর'আন ও সুন্নাহর শিক্ষার ভিত্তিতে সংকলিত করে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্ব ও মানবতার উপর প্রতিফলিত করতে হবে। অবস্থান ও প্রয়োজনের পার্থক্যকে চিহ্নিত করে একটি বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা একটি উদারভিত্তিক কারিকুলাম তৈরী করতে হবে যা উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা, অঙ্গীকার এবং আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল [প্রত্যয়] এর প্রকল্পকে সফল করে তুলবে। এই কারিকুলাম হবে প্রথম ব্যক্তকৃত জ্ঞান এবং দ্বিতীয়ত আরোরিত জ্ঞানের ভিত্তিতে।

সিলেবাস

প্রত্যেকটি বিষয় এবং শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই একজন উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিপূর্ণ সিলেবাস তৈরী করা উচিত:

ক. ব্যক্ত জ্ঞানের জন্য : কুর'আন পাঠ করা, মুখস্ত রাখা, বুঝতে পারা, প্রয়োগ করা এবং সুন্নাহ শিক্ষা [সংগ্রহ প্রেরণ, প্রামাণিকতা, শ্রেণীভুক্ত করানো এবং প্রয়োগ ইত্যাদি], সীরাত শিক্ষা, ইসলামী শরীয়া শিক্ষা, ফিক্হ শিক্ষা এবং 'উসূল আল-ফিক্হ, কুর'আনী 'আরবী শিক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

খ. আহোরিক জ্ঞানের জন্য : কলা ভাষাতত্ত্ব, সামাজিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অন্যান্য।

পাঠ্যপুস্তক

বিভিন্ন বিষয় এবং উপরের 'খ' উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহের পাঠ্যপুস্তকসমূহ অবশ্যই এসব বিষয়ের বিশারদদের দ্বারা পরীক্ষিত হতে হবে। কোনও বইয়ের সূচীতে ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী কিছু থাকলে তা সংকলিত, বাদ দেয়া বা স্থানান্তরিত করতে হবে। যদিও এটি একটি বিশাল কাজ তথাপি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সফল প্রয়োগের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

নতুন পাঠ্যবইসমূহ পণ্ডিতবর্গের দ্বারা আহোরিত জ্ঞানের নির্বাচিত ক্ষেত্র যেমন ব্যতিক্রমধর্মী সামর্থ্যের আলোকেই লেখা উচিত, তারা সৃজনশীলতা, মৌলিক এবং বিশ্বাসনির্ভর মানবজ্ঞানের উন্নয়নের ভিত্তিকেই প্রতিফলিত করে যাতে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সমগ্র মানবতার জন্য সাফল্য বয়ে আনতে পারে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদেরও যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে তা অনস্বীকার্য, বস্তুত প্রত্যেক বার্তা বাহক ও নবীগণ ছিলেন অপরিহার্য শিক্ষক। শিক্ষকরাই হচ্ছেন জ্ঞানের পরিবাহক-তা ব্যক্তকৃতই হোক অথবা অব্যক্ত। তিনিই বার্তার রূপায়ক। তিনিই বার্তাতে নিহিত বক্তব্যকে বাস্তবতার নিরিখে প্রকাশন করেন। ইলম [জ্ঞান] এবং আমল [কাজ] অবশ্যই সমন্বয় হতে হবে। একটি ভিন্ন অন্যটি হচ্ছে ফল বিহীন বৃক্ষ। বাণীকে অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে যাতে করে এর সফলতা উৎসাহিত হয় যার নিকট ইহা অভিপ্রেত/আকাঙ্খিত। আল্লাহর দ্বীন [পথ] কে [ইসলাম] এর মৌলিক বিশুদ্ধতা সহকারে সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। স্রষ্টার সর্বশেষ প্রকাশিত মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে ঘোষিত হয়েছে : সৃষ্টা কর্তৃক শেখানো ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে অন্যের নিকট পৌছানোর দায়িত্বে ইসলামী শিক্ষকদের শিক্ষিত করে তুলতে হয়ে।

শিক্ষকগণ তাঁদের তাকওয়া [আল্লাহর প্রতি সচেতনতা ও ভক্তি] এর চমৎকার উদাহরণসমূহের দ্বারা বিশ্বাস, ইহসানের সর্বোচ্চতম রূপদানের বর্ণনার মাধ্যমে ছাত্রদের প্রেষিত করবেন এবং আল্লাহ তা'আলার বাণীর প্রচারে তাদের উৎসাহিত করে যাবেন।

শিক্ষকগণ ঐ সকল লোকদের দ্বারা প্রশিক্ষিত হবেন, যারা তাকওয়া ও জ্ঞানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং ইসলামের চর্চায় নিয়োজিত। যদিও এরূপ লোকের প্রাপ্যতা হবে সংখ্যায় অতি নগণ্য। আমাদের কাজ হবে তাঁদেরকে খুঁজে বের করা এবং তাঁদের নিকট থেকে উপকার গ্রহণ করা।

শিক্ষার ধাপসমূহ : শিক্ষার প্রতিটি পর্যায় যেমন, নার্সারী, প্রাইমারী [প্রাথমিক], সেকেন্ডারী, উচ্চ [বৃত্তিমূলক ও বিশ্ববিদ্যালয়] ইসলামী পদ্ধতিতে পরিকল্পিত হওয়া উচিত।

একটা নিশ্চিত পর্যায়ে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় দেশে নির্দেশিত কোন একটি পথে কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সন্দেহাতীতভাবে এক সাহসী পদক্ষেপ। কিন্তু সমগ্র শিক্ষা পদ্ধতিতে এর সামগ্রিক দিকই বিবেচনায় আনতে হবে-এর উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং একটি শিশুকে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিনে প্রতিযোগিতা ও উৎকর্ষের সফলতা লাভের জন্য খলিফাতুল্লাহ [আল্লাহর একজন প্রতিনিধি] হিসেবে গড়ে তোলা।

'আরবী

'আরবী ইসলামী শিক্ষার প্রচলিত ভাষা হওয়া উচিত। কুর'আনের ভাষা, যা মহান স্রষ্টা আল্লাহর সমস্ত কথাকেই ধারণ করে আছে। বিশটিরও বেশি দেশে প্রধান ভাষা হিসেবে কথা হয়ে থাকে এবং সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানেরাই এই ভাষা ব্যবহার করে বিশেষত তাদের সালাতে [বাধ্যতামূলক প্রতিদিনের ইবাদত]। সমস্ত মুসলমানেরই উচিৎ কুর'আনকে পাঠ ও আবৃত্তি করা এবং অনুধাবন করা। শাস্ত্রীয় ও আধুনিক 'আরবীর উপর পূর্ণ জ্ঞান ছাড়া কুর'আন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে আহোরিত শিক্ষার পুনর্গঠন অসম্ভব। ভাষা হিসেবে 'আরবী শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতির একটি অখণ্ড অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় সমর্থন : যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সমর্থন এই পদ্ধতিকে উৎসাহিত করছে ততক্ষণ এটি মূলত রাষ্ট্র নির্ভর ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা মুসলিম সরকারগুলোর কাছে প্রধান ও অগ্রগণ্য হওয়া উচিত।

মাদরাসার পাঠক্রম সংস্কার প্রসঙ্গ

মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বর্তমানে যে সমস্ত সমস্যায় ভুগছে তা নিরসন কল্পে ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জন করে গণমুখী ও বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থা গণমুখী তথা জীবনমুখী করার জন্য আমাদের মানসিকতায় সর্বাগ্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। মাদরাসার পাঠ্যক্রম সংস্কার প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত হবে :

১. সময় ও ব্যয়বহুল পাঠ্য তালিকার পরিবর্তন করতে হবে, যাতে ইসলামী শিক্ষার পথ সকলের জন্য সহজলভ্য, প্রশস্ত ও উন্মুক্ত থাকে।

২. পাঠ্যসূচী সহজ ও আকর্ষণীয় হওয়া অপরিহার্য। পাঠ্য বই নির্বাচনকালে শিক্ষার্থীদের মন, মেজাজ, বয়স, রুচি, মেধা ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। বইয়ের সংখ্যাও সীমিত রাখতে হবে যাতে তাদের উপর বোঝায় পরিণত না হয়। পাঠ্যসূচী সংস্কারের নামে কেবল সামান্য সংশোধনী গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. শিক্ষক, পরিচালক ও কর্তৃপক্ষ হবে ইসলামী আদর্শের ধারক ও বাহক। নৈতিক আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা কখনো সত্যিকারের মানুষ গড়ে তুলতে পারে না। এইসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা শিক্ষকরা যাঁরা হবেন তাঁরা অবশ্যই পর্যাপ্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত হবেন এবং ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁরা সম্পূর্ণ ইসলামী আদর্শের অনুসারী হবে।

৪. পাঠ্যসূচীতে দেশ ও আন্তর্জাতিক চাহিদার প্রতিফলন থাকতে হবে।

উপরোক্ত মৌলিক পদ্ধতি অবলম্বনের প্রেক্ষিতে আকাঙ্খিত সিলেবাস পরিবর্তন করতে হলে নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী কার্যকরী করা যেতে পারে :

১. মাদ্রাসা শিক্ষাকে গণমুখী ও বাস্তবমুখী করার জন্য পাঠ্যসূচীতে এমন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঐসব বিষয়কে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :
   ক. বাধ্যতামূলক
   খ. ঐচ্ছিক

   বাধ্যতামূলক বিষয়গুলোর মধ্যে থাকবে ১. কুর'আন, হাদীস, ফিকহ, ২. 'আরবী ভাষা, ৩. মাতৃভাষা, ৪. গণিত, ৫. সাধারণ জ্ঞানের জন্য একটি নির্ধারিত বিষয়, ৭. সামরিক শিক্ষা (মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান), ৮. জাতীয় ও দেশীয় ইতিহাস (সমাজ চেতনার জন্য)।

   ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর মধ্যে থাকবে, বিদেশী ভাষা, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন শাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, হিসাব শাস্ত্র ইত্যাদি।

২. শিক্ষার কাল ১৬ বছরের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। কোন ডিপ্লোমা লাভের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে, এগুলো মূল শিক্ষা বর্ষের বাইরে থাকবে।

৩. পাঠ্য বিষয়গুলো শ্রেণীভেদে বিন্যাস করার সময় বিশেষভাবে নজর দিতে হবে যেন একই বিষয় একাধিক শ্রেণীতে পাঠের ব্যবস্থা না করা হয়। এতে একদিকে যেমন বইয়ের বোঝা কমবে, অন্যদিকে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ হবে।

৪. নোট বইয়ের প্রচলন বন্ধ করে দিতে হবে। বাংলা ও 'আরবী ভাষার উপর জোর দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের এ দুটো ভাষায় সম্যক দখল না থাকায় মাদ্রাসা শিক্ষা গুণগত দিক থেকে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। পাঠ্য সূচীর সমন্বয় সাধন এমনভাবে করতে হবে যেন প্রতিটি শিক্ষার্থী সমাজ ও রাষ্ট্র যন্ত্রের কর্মকাণ্ডে সফলভাবে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন কবতে পারে।

৫. প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বয়ের কোন অবাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়। বরং মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, ভাবমূর্তি ও পরিবেশের পবিত্রতা রেখে সংস্কার করতে হবে। যাতে

Dhaka University Institutional Repository

করে কোমলমতি বালক-বালিকাদের কচি মনে ইসলামী জীবনাদর্শের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গে পাঠ্য বইয়ের সংখ্যাধিক্য যেন শিশুদের জন্য বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

৬. দাখিল বা মাধ্যমিক স্তরের শ্রেণীসমূহে 'আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, ফিকহ, বাংলা, অংক, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদির সাথে 'আরবী কথোপকথন বাধ্যতামূলকভাবে রাখা উচিত।

৭. আলিম বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কুরআন হাদিস, 'আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, ফিকহ, উসূলে ফিকাহ, ইতিহাস, বাংলা আকাঈদ (যুগ চেতনার আলোকে) ইত্যাদি থাকবে।

৮. ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে নিম্নের যে কোন দুটি নেয়া যেতে পারে। যে কোন একটি বিদেশী ভাষা, ইসলামী অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি।

৯. আলিম বিজ্ঞান বিভাগে তাফসীর, হাদীস, 'আরবী সাহিত্য, ফিকহ, বাংলা, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গণিত, জীববিদ্যা, ইংরেজী, কৃষি বিজ্ঞান, উসূলে ফিকহ, আকাঈদ, উর্দূ ইত্যাদি বিষয়ের যে কোন দুটি বিষয় দিতে হবে। তবে জীববিদ্যা ও গণিতের মধ্যে যে কোন একটি অবশ্যই থাকতে হবে।

১০. কামিল বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগে বিশেষভাবে পাণ্ডিত্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করা যেতে পারে। যেমন : হাদীস বিভাগে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহের সাথে হাদীস তত্ত্ব ও হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মোহাদ্দেসীনে কিরামের ও জীবনী ও সনদ প্রভৃতি বিষয়গুলো সংযোজিত থাকবে।

পাঠ্যসূচীর পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশেষভাবে মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য প্রতিটি বিভাগে সরকারীভাবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়া দেশের প্রতিটি অঞ্চলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিগুণ মেয়াদী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে তাদেরকে জীবনের প্রতিটি স্তরের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টাও করতে হবে।

শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি : প্রেক্ষিত ধর্ম ও মূল্যবোধ

শিক্ষার জন্য একটি অতি মূল্যবান উৎস হচ্ছে আমাদের সেই সব মূল্যবোধ যা আমরা সকলেই সাধারণভাবে বিশ্বাস করে থাকি। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পরিব্যাপ্ত একটি মস্তবড় সমস্যা হচ্ছে মূল্যবোধ থেকে জ্ঞানচর্চা, তথ্য সংগ্রহ ও দক্ষতা অর্জনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। অথচ এখানে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় অন্ত র্দৃষ্টি যা সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য তা সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে। প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহ ও অন্যান্য সকল ধর্মই মানব জীবনে মূল্যবোধের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব এবং এর অলৌকিক সূত্র থেকে উৎসারিত হবার কথা স্বীকার করে। সত্য, সুন্দর ও ন্যায় বলতে আমরা যা বুঝি তারও উৎস সীমাবদ্ধ মানব অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে। সব ধর্মেই দেখা যায়, কিভাবে বিভিন্ন মূল্যবোধ এক সূত্রে গাঁথা একটি পরিপূর্ণ একক। মানুষের মধ্যে সুবিচারের আকাঙ্খা, ভালোবাসা, দয়া ও সহমর্মিতা মূল্যবোধসমূহকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। সব ধর্মই এখন মানবীয় অনুভূতির উৎস ঐশ্বরিক বলে মানে। কারণ এ সবকিছুই ঐশ্বরিক গুণাবলীর প্রতিফলন। সব ধর্মই মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও নিয়তির উপর জোর দেয়। এভাবেই প্রতিটি ধর্ম মানব জীবন সম্বন্ধে একটি সুগ্রথিত ও একীভূত ধারণা পেশ করে যা খণ্ডিত ও পরস্পর সম্পর্কহীন নয়। ধর্ম তাই শিক্ষানীতি প্রণয়নকারীদের ও শিক্ষাদানকারীদের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি নীতিমালা প্রদান করে। এগুলোর বাস্তব রূপ দেয়া অত্যন্ত উদ্যম সাপেক্ষ ও কঠিন কাজ। এ কাজে প্রজ্ঞা ও দক্ষতা প্রয়োজন। তথাপি এটি একটি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় কাজ।

১. শিক্ষাকে সেই সমস্ত মূল্যবোধ ও মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে যার সত্যতা ও কল্যাণময়তা স্বীকৃত। কারণ এর ভিত্তি ঐশ্বরিক। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও নিয়তির প্রতিফলন থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. জ্ঞানের সাথে ধর্মের, জ্ঞানের সাথে সদগুণের, জ্ঞানের সাথে কর্মের, ক্ষমতার, বিত্তের, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের এবং জাতীয় উন্নয়নের যে মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে সে সম্বন্ধে উদীয়মান তরুণ ও তরুণীদের অন্তরে যথার্থ উপলব্ধি সৃষ্টি করতে হবে।

৩. যে সব বিষয় পড়ানো হবে তার প্রতিটির সাথে ধর্মীয় সত্যের যে সম্পর্ক রয়েছে এবং ধর্মীয় অন্তদৃষ্টি একটি বিষয়কে কিভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪. সাহিত্যের পাঠ্যসূচী এমনভাবে প্রণীত হবে হবে যাতে কল্পনাগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অনুভূতিগত জীবন পরিশুদ্ধ ও তার সৃজনশীল ক্ষমতা পরিপুষ্ট হতে পারে। মানব কল্পনাপ্রসূত রচনার উপর কিভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রয়োগ করা যায় সে ক্ষমতা তাকে অর্জন করতে হবে। এর ফলে সে যথার্থ এবং অর্থহীন মানসিক আবেদনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখবে।

৫. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতের পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীকে শুধু যুক্তিপূর্ণ ও যথার্থ হতে, বিশ্লেষণ করতে, সাধারণ ধারণা আরোপ করতে ও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেই শেখাবে না বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তার ও প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও কি ধারণা দিয়েছে এবং বিজ্ঞান গবেষণায় কল্পনা ও অন্তর জ্ঞান কত বড় ভূমিকা পালন করেছে সে সম্বন্ধেও শিক্ষার্থীকে অবহিত হতে হবে। মানুষ ও প্রকৃতি যে সৃষ্টিকর্তার গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি ধর্মের এই ধারণার সাথে বিজ্ঞানের ধারণা সম্পর্কে শিক্ষার্থী যাতে বুঝতে পারে সে যোগ্যতা তার মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডকে নৈতিকতার আলোকে যাচাই করার ক্ষমতা ও শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগ্রত করতে হবে।

৬. সমাজ ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন এমনভাবে হতে হবে যাতে এ সব সম্বন্ধে ধর্ম যে সুসম্পর্কিত ও পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণ ধারণা পেশ করে তাও যেন শিক্ষার্থী অনুধাবন করতে পারে। তার মধ্যে নিঃস্বার্থ সেবার মনোবৃত্তি শক্তিশালী করে তুলতে হবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সংগতি রেখে চলার ইচ্ছা ও ক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ধর্মের লক্ষ্য অনুযায়ী মানুষে মানুষে সম্পর্ক কিভাবে উন্নত করা যায় এবং পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণ করা যায় সেটাও তাকে শেখাতে হবে।

৭. শিক্ষার্থীকে আরও বেশি করে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধেও জ্ঞান দিতে হবে যাতে সেগুলোকে সে বুঝতে ও মূল্য দিকে সক্ষম হয়।

৮. জীবন ও মানব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ধর্মীয় এবং বস্তুবাদী এই দুই ধারণার মধ্যে কতখানি মিল অমিল রয়েছে সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তুলতে হবে। মানবসত্তা সম্বন্ধেও যান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক ধারণার বিপদ সম্পর্কেও তাকে অবহিত করতে হবে।

৯. বিভিন্ন শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ শিক্ষার্থীর কেবলমাত্র নান্দনিক উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করবে না, এটাকে শিক্ষা দিতে হবে যাতে মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তাটিও এর মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠে এবং মানুষকে তার কল্পনা বৃত্তিমূলক চিন্তাকে নৈতিকতার সাথে যুক্ত করতে শিখায়।

১০. শরীর বিদ্যা এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে করে দৈহিক কল্যাণকে শিক্ষার্থীর মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সাথে সুগ্রথিত করে দেয়।

১১. উপরোক্ত সুপারিশমালার আলোকে বর্তমান পাঠ্যসূচীকে প্রয়োজন মতো সংশোধন করতে হবে।

১২. ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যারা নিশ্চিত তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন মতো গবেষণা করার সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা প্রতিটি বিষয়ে মৌলিক তত্ত্ব পেশ করতে পারেন এবং যার সাহায্যে পাঠ্য পুস্তক উপযুক্তভাবে প্রণয়ন করা যায়।

১৩. যেহেতু অধিকাংশ শিক্ষকই শিক্ষার এই দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সচেতন নয় সেহেতু তাদের প্রশিক্ষণদানের বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এর মাধ্যমে তাঁরা জানতে পারবেন কোন বিষয়কে কিভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা দেয়া যায়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ সকল শিক্ষকবৃন্দই পরবর্তীতে অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন।[৪৬]

---

৪৬. ইশারফ হোসেন, 'জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণ এবং সৈয়দ আলী আশরাফের শিক্ষাদর্শন', *ইন্টেলেকচুয়াল ডিসকোর্স*, ঢাকা : সেন্টার ফর ইন্টেলেকচুয়াল ডিসকোর্স, ফেব্রুয়ারী ২০০২, পৃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন : সমস্যা ও উত্তরণ

আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ইচ্ছা শক্তি ও সহজাত আবেগের ভিত্তিতে এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা দান করেছেন আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য।[৪৭] এবং শয়তানকে অনুমতি দিয়েছেন আমাদেরকে স্রষ্টার আদেশ পালন থেকে দূরে রাখতে। এভাবেই আমরা বিভ্রান্তিকর ও জটিল সমস্যায় পরিবেষ্টিত হয়েছি যার ফলে আমাদের অবশ্যই সমাধান খুঁজে বের করতে হবে যাতে করে আমরা আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীতে আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারি।

ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় :

১. যার আইনই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্বজনীন সেই আল্লাহকে স্রষ্টা ও পথ প্রদর্শক স্বীকারে অস্বীকৃতি।

২. আল্লাহর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.-কে সমস্ত মানব জাতির আদর্শরূপে গ্রহণে অনীহা।

৩. অধিবিদ্যায় বিশ্বাসহীনতা যেমন, স্রষ্টায়, একত্ববাদ (তাওহীদ), মৃত্যুর পরের জীবন (আখিরাত), বেহেশত (জান্নাত) এবং দোযখ (জাহান্নাম)।

৪. নাস্তিক ও অন্যান্য ধর্মের চিন্তাবিদ ও নেতাদের মধ্যে ইসলামী বিশ্বাস ও শিক্ষা সম্পর্কে প্রচণ্ড রকম অজ্ঞতা।

৫. বেশীর ভাগ মুসলিম দেশগুলোতেই দ্বি-শাখায় বিভক্ত শিক্ষা পদ্ধতির উপস্থিতি : ধর্ম নিরপেক্ষ (পার্থিব) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

৬. ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা বেষ্টিত এক শিক্ষা ব্যবস্থা যা কেবল ঈমান, ঐতিহ্য, নৈতিকশিক্ষা এবং জীবনের আত্মিক সাধনার দিকগুলোই আলোচনা করে এবং এই বৈষয়িক পৃথিবীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

৭. ইসলামী বিশ্ব ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে দর্শন ও চিন্তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত নয় (যেমন সূক্ষ্ম বিচার পদ্ধতির সমর্থন, মানবতাবাদ, বস্তুবাদ, জাতীয়তাবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, অপেক্ষবাদ, ব্যক্তিত্ববাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, অস্তিত্ববাদ ইত্যাদি)।

৮. ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতির সকল শাখাকে গ্রহণ করতে সরকারী দলের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব।

সংকল্পের দৃঢ়তা থাকলে কোন সমস্যাই অনতিক্রম্য নয়। সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহপাক যিনি শুধু একটি 'আরবী শব্দ 'কুন' (হও) বলে আদেশ করেন আর সকল কিছুই হয়ে যায়।[৪৮] সেই মহান স্রষ্টার অসীম দয়া ও কৃপার উপর পূর্ণভাবে নির্ভর করে শুধু শুরু করতে হবে। স্রষ্টা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তার ইচ্ছাগুলোকে পরিপূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতে। তিনি যে কোন কিছুই পরিবর্তনের এবং প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা রাখেন যখন ইচ্ছা করেন কিন্তু তিনি এই পরিবর্তনের কাজটি মানুষের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

আজকাল মুসলমানেরা ইসলামের সৌন্দর্য, উৎকৃষ্টতা ও ইপ্সিত ফলদানের ক্ষমতা সম্পর্কে বলতে ও লিখতে বেশ পারদর্শিতা দেখালেও নিজেরা লক্ষণীয়ভাবে এর চর্চায় পিছিয়ে আছে। এখন সম্পূরকভাবে বক্তব্য, লেখালেখি ও আলোচনা-সভার মাধ্যমে ইসলামকে চর্চার প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদ-এর মাধ্যমে আমাদেরকে কথা ও কাজের অসামঞ্জস্যতা সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোরভাবে সাবধান করেছেন।[৪৯] আমরা আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে মিল রাখতে অসমর্থ হলে তা অমুসলিমদের দৃষ্টিতে ইসলামের ভাবমূর্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন করে। এই ব্যাপক অসামঞ্জস্যতাই হচ্ছে অমুসলিমদের কাছে ইসলামকে একটি বাস্তবধর্মী ও অর্থবহ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে চিনতে না পারার একটি অন্যতম কারণ, যাকে তারা মনে করে অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটি ধর্ম যার বর্তমান পৃথিবীকে দেয়ার কিছুই নেই। আমাদেরকে অবশ্যই একবার সাবধানী চোখ নিয়ে নিজেদের দিকে তাকাতে হবে এবং এই ধরনের ধারণাকে দূর করার

---

৪৭. কুর'আন, ১২ : ৫৩।

৪৮. কুর'আন, ২ : ১১৭।

৪৯. কুর'আন, ২ : ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করতে হবে। আমরা যদি আমাদের কথা কাজের অসামঞ্জস্যতা দূর করতে না পারি তবে কোন সমাজই বিশেষ করে বস্তুগতভাবে অগ্রসরমান পশ্চিমা জনগণ কখনোই আমাদেরকে আন্তরিকভাবে নিতে পারবে না। নতুবা আমাদেরকে অত্যন্ত বিদ্রুপাত্মকভাবে অপদস্ত ও অবহেলিত করা হবে। তাওহীদের প্রতি অবিচলিত ঈমান, রিসালাতে ও আখিরাতের বিশ্বাসে গড়া কাজই (আমল) আমাদেরকে এই অপদস্তুতার হাত হতে রক্ষা করতে পারে। প্রয়োজন শুধু স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে স্রষ্টার নিকট নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণের দৃঢ়মূল ইচ্ছা। আর তখনই স্রষ্টা কর্তৃক সাফল্যের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, যিনি কখনোই তাঁর প্রতিজ্ঞার ব্যতিক্রম করেন না।[৫০]

আল্লাহর নবীগণ যা ব্যাখ্যা করে গেছেন সেইসব মৌলিক বিষয়াদি সম্বন্ধে দ্বিধা বা সন্দেহই মানুষের মাঝে অবিশ্বাস, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়। এই সন্দেহ সমাজের বিরাট ক্ষতি সাধন করে এবং সামাজিক দৃঢ়তার অভাব ও অশান্তির সৃষ্টি করে। পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার খলিফা হিসেবে মানুষের সম্মানকে এটি মাটিতে মিশিয়ে দেয়।[৫১]

ইসলামের নবী সা. তাঁর প্রত্যেকটি কথাকে কাজে বাস্তব রূপ দানের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণকে নিশ্চিত করে আরব সমাজকে তার পূর্বাবস্থা থেকে সভ্যতার সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ে এনেছিলেন। তাঁর এই বিস্ময়কর উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসকে পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে।[৫২] মুসলমানরা আজ তাদের পূর্বসূরীদের বিশ্বাস ও কর্মের সেই উচ্চ পর্যায় থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। আমাদের নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে পরস্পরের প্রতি একটি ঘনিষ্ট ভালোবাসার খাঁটি বন্ধন এবং ভক্তিশ্রদ্ধা গড়ে তোলা উচিত এবং স্রষ্টার প্রতি নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনা ও তা কথায় প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক নবীই তাদের কথাকে কাজের বাস্তব রূপদান করে গেছেন। আর আমরা যখন কেবল তাঁদের এই উদাহরণের অনুকরণ করতে পারব তখনই আমাদের সাফল্যে নিশ্চয়তা আসবে।

---

৫০. *কুর'আন*, ৩ : ১৩৯।

৫১. *কুর'আন*, ৭ : ১৭৯।

৫২. গোলাম সারোয়ার, 'ইসলামী শিক্ষা : অর্থ, সমস্যা ও প্রত্যাশা', শওগাত্ত-উল-আলম অনূদিত, *মাসিক দারুস সালাম*, প্রাগুক্ত, পৃ ৭১-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

হিযরতের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. মদীনায় ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। মদীনায় আগমনের পর ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটতে থাকে। মসজিদে নববী ছিল ইসলামের প্রথম শিক্ষায়তন। রাসূল সা. ছিলেন প্রথম শিক্ষক। সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন এ শিক্ষা কেন্দ্রের প্রথম ছাত্র।

এ মদীনা মুনাওয়ারা থেকেই সূচিত হয় ইসলামী শিক্ষার অগ্রযাত্রার ইতিহাস। ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হতে থাকে। রাসূল সা.-এর সাহাবাগণ ও তাঁদের উত্তরসূরিরা পৃথিবীর বঞ্চিত মানবতার দ্বারে দ্বারে বয়ে নিয়ে যায় ইসলামের সুমহান শিক্ষা। তাঁরা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষায়তন। প্রজ্জ্বলিত হয়েছে জ্ঞানের আলোক বর্তিকা। এ নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে প্রাণ চাঞ্চল্য।

ইসলামের এ সুমহান শিক্ষা ও সংস্কৃতির জোয়ারেই প্লাবিত হয়েছিল ভারত উপমহাদেশ। ইসলামের পতাকাবাহীরা এখানে এসেছেন 'আরব, ইরান ও আফগানিস্তান থেকে। তাঁরা এসেছেন কখনো বীরের বেশে, কখনো দরবেশের বেশে, আবার কখনো বণিকরূপে। তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে। ব্যক্তিগত ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা এদেশে গড়ে তুলেছিলেন হাজারো শিক্ষা কেন্দ্র। সেসব শিক্ষা কেন্দ্র থেকেই তৈরী হয়েছেন হাজার হাজার মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, শাসক, সেনাপতি, সৈনিক ও কর্মচারী।

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকেই এ দেশে ইসলাম প্রচারকগণ আসতে থাকেন। পরবর্তীকালে অগণিত মুবাল্লিগ এ দেশে এসে ইসলাম প্রচার করেন। এদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এদেশের অসংখ্য মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। বিরাট বিরাট এলাকা ইসলামের পুণ্য ভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু মুসলমানগণ এদেশে শাসন ক্ষমতা লাভ করেন সামরিক অভিযানের মাধ্যমে। তারা ১২০৩ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ছয়শত বছর এদেশের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। এ দীর্ঘ শাসনামলে এ দেশে মুসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল দক্ষ ও আদর্শ মানুষ গড়ার কারখানারূপে। মুসলমানরা এদেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী বিপ্লব সাধন করে। ধর্মই ছিল তাদের শিক্ষার বুনিয়াদ। ফলে এসব শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য সরকারকে তেমন ব্যয়ভার বহন করতে হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়াকফ ও উইলের সম্পত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। দ্বীনদার লোকেরা পারলৌকিক পুণ্য লাভের জন্য ওয়াকফ এবং সম্পত্তি প্রদানের অসিয়ত করে যেতেন। পাক-ভারতীয় মসজিদ কেন্দ্রিক মাদরাসার এ অবস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত বলবত থাকে।

নিয়মতান্ত্রিকভাবে এ দেশে সর্বপ্রথম কখন এবং কোথায় ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১১৯২ সালে শিহাবুদ্দীন ঘুরী এ দেশে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করেন। তখন থেকেই ইসলামী শিক্ষার চর্চা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি দিল্লীতে মাদরাসায়ে মুয়িযিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর মুসলিম শাসক, 'আলিম ও বিদ্যোৎসাহী লোকদের প্রচেষ্টায় গোটা ভারত বর্ষের আনাচে-কানাচে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সুলতান মুহাম্মদ ইবন তুঘলকের (১৩২৫-৫১) আমলে দিল্লীতে ১ হাজার মাদরাসা ছিল। দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়ার পরও কেবল রোহিলা খণ্ড জেলায় বিভিন্ন মাদরাসায় ৫ হাজার 'আলিম শিক্ষা দান কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এস. বসুর এডুকেশন ইন্ডিয়া গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ শাসনের পূর্বে কেবলমাত্র বাংলাদেশেই ৮০ হাজার মক্তব ছিল।

ইংরেজ জাতি এদেশে ১৯০ বছর শাসন-শোষণ চালিয়েছে। এ সময় তারা এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করে দেয়। কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের জমিদারী চলে যায়। ফলে সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৮০ সালে ইংরেজ সরকার তাদের কর্মচারীর চাহিদা পূরণের জন্য একটি মাদরাসা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এ সময় কলকাতার বিশিষ্ট মুসলমানগণ সেখানে একটি মাদরাসা স্থাপনের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কাছে আবেদন করেন। এ আবেদনের প্রেক্ষিতে একই সালে কলকাতা 'আলিয়া মাদরাসা স্থাপিত হয়।

বৃটিশ শাসনামলে যে সকল বৃটিশ কর্মকর্তা শিক্ষার সাথে জড়িত ছিলেন, তারা বহুরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে বৈরী মনোভাব পোষণ করতে থাকেন। তারা এ দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুছে ফেলে তদস্থলে আধুনিক শিক্ষার নামে ভিন্ন সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচারের লালন ও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থার এ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে স্যার সৈয়দ আহমদ বেরলবী রহ. প্রথম লড়াইয়ের সূচনা করেন। এর ধারাবাহিকতা হিসেবে সংঘটিত হয় ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব। এতে নেতৃত্ব দেন সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, সাইয়্যেদ আহমদুল্লাহ খান। এ বিপ্লবে মুসলমানদের ভূমিকা ছিল প্রধান। মাদরাসার ছাত্ররাও এতে অংশগ্রহণ করেন। ফলে তাঁরা মাদরাসা বন্ধ করার কৌশল গ্রহণ করেন। কলকাতা মাদরাসা বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। যদিও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় এ উদ্যোগ সফল হয় নি।

মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তা, সাংস্কৃতিক উত্থান, শিক্ষার সংস্কার আন্দোলনে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী ছিলেন প্রধান পথিকৃৎ। তাঁর ভাবনা ছিল, ভারতে ইসলামের অবলুপ্ত গৌরব ও শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী শিক্ষার আলোকে মানুষকে গড়ে তোলা। এতদুদ্দেশ্যে তিনি দিল্লীতে বিখ্যাত মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠান থেকেই বেরিয়ে আসেন শাহ 'আবদুল 'আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ.। তিনি সর্বপ্রথম ভারতকে দারুল হরব ঘোষণা দিয়ে আজাদী সংগ্রামের গোড়াপত্তন করেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাইল শহীদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এ সংগ্রামের অংশগ্রহণ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে তোলেন। বাংলার শহীদ তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহর সংগ্রাম ছিল সে আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা। ইংরেজদের জুলুম-নির্যাতনের মোকাবিলায় ১৮৭০ সালের দিকে এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

এ কঠিন ও জটিল সময়ে 'আল্লামা কাশেম নানুতুবী শাহ ওয়ালী উল্লাহর শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দের গোড়াপত্তন করেন। পর্যায়ক্রমে সাহারানপুর, শাহী মুরাদাবাদ, মীরাট প্রভৃতি স্থানেও মাদরাসা স্থাপন করেন। আল্লামা নানুতুবী রহ. তাঁর আন্দোলনের বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন, 'ময়দানের আন্দোলনকে আমি প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ পোশাকে আচ্ছাদিত করে দিয়েছি।

আল্লামা নানুতুবী শিক্ষা বিস্তারের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে হাজারো 'আলিম-'উলামা গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সকল মাদরাসা মুসলমানদের অন্তরে ইসলামী চেতনা উজ্জীবিত করে এবং শিক্ষাদান ও শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটলো। মুসলমানরা প্রত্যাশিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র লাভ করলেও পাকিস্তানের শাসকগণ পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে নি। তখন বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠন করে এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সকল কমিশন ও কমিটির সুপারিশ কখনো পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয় নি। তবে তাদের সুপারিশসমূহ শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো তৈরি, সিলেবাস ও কারিকুলাম প্রস্তুত, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও শ্রেণী বিন্যাসে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

Dhaka University Institutional Repository

দুই.

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। নবীন রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝে শিক্ষা সংস্কার কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবেই বিলম্বিত হয়। কিন্তু এ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশে ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে কোন ভাটা পড়ে নি। মসজিদ ও মক্তব কেন্দ্রিক এ শিক্ষা যথাযথভাবে চলতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মসজিদ বেড়েছে, মক্তব স্থাপিত হয়েছে। এ জন্য সরকারী অনুদানের প্রয়োজন হয় নি। বাংলাদেশ অস্তিত্ব লাভের পর ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টায় এদেশে বহু উন্নতমানের মক্তব ও প্রাথমিক পর্যায়ের মাদরাসা গড়ে উঠেছে। ১৯৭৮ সালে কাওমী মাদরাসা বোর্ড গঠিত হওয়ার পর থেকে দরসে নিযামীর ইবতিদায়ী মাদরাসাগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলতে থাকে। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সরকার ইবতিদায়ী মাদরাসার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে মাধ্যমে ইবতিদায়ী মাদরাসার জন্য উন্নত কারিকুলাম এবং পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে। বর্তমানে দেশের ইবতিদায়ী মাদরাসাসমূহ সেই প্রচেষ্টারই বাস্তব প্রতিফলন।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর পাকিস্তান আমল অপেক্ষা যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। ১৯৭৮ সাল থেকে দরসে নিযামী মাদরাসার মাধ্যমিক স্তরে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে এ স্তরের পরীক্ষা গ্রহণ করা হতে থাকে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৫ সাল থেকে মাদরাসা শিক্ষার দাখিল স্তরকে এসএসসি এবং ১৯৮৭ সাল থেকে আলিম স্তরকে এইচএসসি এর সমমান মর্যাদা দিয়েছে। এতে ইসলামী শিক্ষার প্রতি ছাত্র-জনতার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য প্রতিটি বিভাগের সকল ছাত্রের জন্য ধর্ম শিক্ষার ১০০ নম্বরের কোর্স আবশ্যিক বিষয়রূপে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। মাদরাসার দাখিল এবং আলিম স্তরের জন্য মানবিক, বিজ্ঞান, মুজাব্বিদ, হিফজুল কুর'আন বিভাগ চালু হয়েছে। সাথে সাথে উন্নতমানের পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়েছে।

মাদরাসার শিক্ষার ফাযিল এবং কামিল স্তরটি আশানুরূপ উন্নত হয় নি। এর প্রধান কারণ, ফাযিল এবং কামিল পর্যায়কে সাধারণ শিক্ষার সমমান দেয়া হয় নি। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার বেশ উন্নতি হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ছিল 'আরবী বিভাগের সাথে। ১৯৭৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ দুটি স্বতন্ত্র বিভাগে রূপান্তরিত হয়। ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্স এবং ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষে এমএ শেষ পর্ব ও ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে এমএ পূর্ব ভাগ খোলা হয়।

১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ আরবী বিভাগ থেকে পৃথক হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগে রূপ লাভ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আশির দশকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ অনার্স এবং এমএ শেষপর্ব এবং এমএ পূর্ব ভাগ খোলা হয়। 'আরবী এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ছাড়াও প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক এবং সমাজ বিজ্ঞানের সম্মান শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তখন সাবসিডিয়ারী বিষয় হিসেবে 'আরবী বা ইসলামিক স্টাডিজ পাঠের সুযোগ ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে বিএ পাস শ্রেণীর জন্য তিনশত নম্বরের 'আরবী বা ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় পাঠের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া ইসলামী শিক্ষার বৃহত্তর অর্থে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী অর্থনীতি, মুসলিম দর্শন, শরীয়াহ দর্শন, মুসলিম পারিবারিক আইন, মুসলিম উত্তরাধিকার আইন পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় জনগণের দীর্ঘকালের আশা-আকাঙ্ক্ষা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অস্তিত্ব লাভ করেছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৯ সালে। এতে ইসলামী শিক্ষার প্রতিটি দিক এবং প্রান্ত নিয়ে উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণার সুযোগ হয়েছে।

সর্বোপরি বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৭৫ সালে। এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, প্রকাশনা বিভাগ, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক মিশন, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ, দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগ, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প, মসজিদ পাঠাগার, কেন্দ্রীয় ও জেলা পাঠাগার প্রকল্প ইত্যাদি ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে বাংলাদেশে শহর ও গ্রাম-গঞ্জে অমূল্য অবদান রেখে আসছে।

ইংরেজ আমল থেকেই এদেশে শিক্ষার উন্নতি-অগ্রগতির জন্য শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভে কমিশনগুলোর সুপারিশের ধারণা দেয়া হয়েছে। তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রায় প্রতিটি কমিশন ইসলামী শিক্ষা তথা কুর'আন ও হাদীস কেন্দ্রিক শিক্ষাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে উন্নতি ও অগ্রগতির যুগান্তকারী সুপারিশসমূহ সরকার তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাছে পেশ করেছে। দু-একটি কমিশন অবশ্য ইসলামী শিক্ষাকে প্রকারান্তরে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছে। শিক্ষা কমিশনগুলোর এ সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নের ইতিহাস সুখকর নয়। কিছু কিছু কমিশনের সুপারিশ অংশ বিশেষ বাস্তবায়িত হয়েছে, কখনো কখনো বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে রহস্যজনক কারণে হারিয়ে গেছে, জাতি তার পরিণতির কোন খবর অবহিত হতে পারে নি। আবার কোন কোন কমিশন বছরের পর বছর লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে রিপোর্ট প্রণয়ন করে বিবেচনার জন্য জমা দিয়েছে, কিন্তু তা অনুমোদন লাভ ব্যতিরেকেই হারিয়ে গেছে। দু-একটি কমিশন কেবলমাত্র ইসলামী শিক্ষার জন্যও গঠিত হয়েছে। কিন্তু কমিশনের রিপোর্ট যদি কিয়দাংশও বাস্তবায়িত হতো, হয়তো বা ইসলামী শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশের অবদান বিশ্বের অনেক দেশের জন্যও মডেল হতে পারতো। এই দিকটির জন্যও একাধিক বিষয়কে দায়ী করতে হয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বারে বারে তিরোহিত হওয়ার কারণেই এই সিদ্ধান্তহীন প্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

পঞ্চাশের দশকের পূর্বে যে উদ্দেশ্যে 'ওল্ড স্কীম' ও 'নিউ স্কীম' মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি বিধায় তা বন্ধ করে দেয়া হয়। যুগের চাহিদার আলোকে বিশ্বমানের জনসম্পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা এখনো অনুপস্থিত। দেশের অভ্যন্তরে এখনো সমমান বিধানের জটিলতা রয়েই গেছে। অপরদিকে ইংরেজদের সময়কালে ইসলামী শিক্ষায় যে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছিল, আজও তা 'আলীয়া, কাওমী, খারেজী, দরসে নিযামী ইত্যাদি নামে অভিহিত হচ্ছে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের পথে বিভক্ত ধারাগুলো অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। জনগণের মধ্যে এসব বিভাজন এ শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহের কারণ হিসাবে কাজ করছে।

মাদরাসা শিক্ষার দু'টি চলমান উপধারার মধ্যে 'আলীয় মাদরাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী হচ্ছে কামিল। চারটি বিষয়ভিত্তিক বিভাগ ব্যতীত অনার্স পদ্ধতির কোন ব্যবস্থা চালু করা হয় নি। ফলে উচ্চ শিক্ষায় বিশ্বমানের ডিগ্রীধারী সৃষ্টি হচ্ছে না। একই কারণে গবেষণা কার্যক্রমও চালু করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। আগেই বলা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে কিছু ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু ফাযিল ও কামিল ডিগ্রীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। এর জন্য একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রীকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হলে এক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব হতো।

অপরদিকে কাওমী মাদরাসার সাথে 'আলীয়া মাদরাসার পাঠ দান, পরিচালনাসহ সার্বিক ব্যবস্থার সমন্বয় বিধান করা একান্তই দরকার। কারণ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এ শিক্ষা উপধারা পৃথক থাকার কারণে দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানবসম্পদ জীবন সমস্যার সমাধানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় টিকে থাকতে পারছে না। নির্দিষ্ট বেসরকারী দু-একটি সেবামূলক পেশায় নিয়োজিত হওয়া ছাড়া এদের কোন গত্যন্তর থাকে না। কখনো কখনো এ ধারার লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সমাজের বোঝা মনে করছে।

বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষা বিশেষ করে মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাস ও পাঠ্য বইয়ের গুণগত মান নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। এ দিকটির পশ্চাৎপদতার কারণ হচ্ছে, এর জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও প্রচেষ্টার অভাব। মুসলিম দেশগুলোর সিলেবাস ও পাঠক্রমের সাথে আমাদের পাঠ্য বই ও পাঠ্যক্রমের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

সৌদি 'আরবের মাতৃভাষা শিক্ষার বইগুলোতে বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা বৈচিত্র্য ও পরিবেশনা অত্যন্ত চমৎকার। প্রতি অধ্যায়ে ছবি দ্বারা শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। উপদেশমূলক গল্প, কথোপকথন, নাটিকা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। ৫ম শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক শ্রেণীগুলোতে ভাষা শিক্ষার জন্য কুর'আন ও হাদীসের দ্বারা একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত রয়েছে। কুর'আন ও হাদীসের ব্যাখ্যামূলক আলোচনাও বইতে স্থান পেয়েছে। দেশপ্রেম, পতাকার প্রতি সম্মান, দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রতি আগ্রহ, পিতা-মাতা, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, বিদ্যালয় ইত্যাদির আলোচনাও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। একই সাথে পাঠ্য বইগুলোতে কৃষক, শ্রমিক, মালিক, কামার-কুমার, ডাক পিয়ন প্রভৃতি পেশার লোকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার প্রয়াসও পাঠ্য বইগুলোতে বিদ্যমান।

মিশর, লিবিয়া, ইরাক ও মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশের পাঠক্রমের অবস্থা প্রায় সৌদী 'আরবের পাঠক্রমের অনুরূপ। অথচ আমাদের দেশের পাঠ্যপুস্তকগুলোর অবস্থা দেখলে মনে হবে তা পরিকল্পনাহীনভাবে প্রণীত হয়েছে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকের এবং পাঠক্রমের উন্নতি তথা সংস্কারের পদক্ষেপ নেয়া ইসলামী শিক্ষার জন্য অতীব জরুরী। তাহলে মুসলিম দেশগুলোর পরস্পরের দক্ষ জনশক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে দেশ উন্নতি লাভ করার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ অংশীদার হতে পারবে। কয়েকটি মুসলিম দেশের মুসলিম অধিবাসীর শতকরা হার হলো : মালয়েশিয়া ৫০%, বাংলাদেশ ৮৫%, পাকিস্তান ৮৭%, ইরাক ৯৪%, কুয়েত ৯১%, সৌদী 'আরব প্রায় ১০০%, মিশর ৯১%, সুদান ৮২%, লিবিয়া প্রায় ১০০%। এই হার বিশ্লেষণ দ্বারা বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম মুসলিম দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়। অথচ বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা ধারার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর কোন উন্নততর ও অপরাপর মুসলিম দেশের সঙ্গে এখনো সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা করা যায় নি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা থেকে উপকৃত হবার বিষয়টি এ পর্যায়ে বিবেচিত হতে পারে। তবে তা যাচাই-বাছাই করে এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যেন ইসলামী মূল 'আকীদা-বিশ্বাসের সাথে তার কোন সংঘাত দেখা না দেয়। কারণ কুর'আন হাদীসে বর্ণিত সত্যই চিরন্তন ও শাশ্বত সত্য। বিজ্ঞানের আবিস্কার যতটুকু এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ততটুকুই গ্রহণীয়, বাকীটুকু বর্জনীয়। সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে একথা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে বিজ্ঞান কখনো চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। আর একথাও প্রমাণিত সত্য যে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণাই প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ বিবর্জিত নয়। তাই বিভিন্ন আর্দশের পরিমণ্ডলে যে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিস্কৃত সেটা কখনো বিনা দ্বিধায় গ্রহণীয় নয়।

সারকথা সিলেবাস প্রণয়নের বেলায় এবং বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়াদির বই পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের সাথে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন করতে হবে। অনেক মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানী তাদের মূল্যবান অবদান দ্বারা এ ক্ষেত্রে আমাদের চলার পথকে সুগম করে গেছেন। ইবন খালদুন তাঁর প্রসিদ্ধ মোকাদ্দমার শেষ দিকে শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক পর্যায়ে শিক্ষাদানকে তিনি শিল্প হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রণয়নে তাঁর এ মূল্যায়ন মৌলিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। প্রয়োজনীয় সিলেবাস প্রণয়ন ও পাঠদানের জন্য আধ্যাত্মিক-চারিত্রিক ও একাডেমিক সব পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের দীর্ঘমেয়াদী মহাপরিকল্পনার আওতায় স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমেও এ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজে হাত দেয়া যেতে পারে।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর জন্য জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একটি সুসমন্বিত ধারায় অবগাহনের মাধ্যমে নিজের প্রকৃত অবস্থান ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং শিক্ষা একদিকে যেমন জীবিকা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম অন্যদিকে তা আবার আল্লাহর নৈকট্য লাভেরও প্রধান উপায়-এ দৃষ্টি ভঙ্গির উন্মেষ ঘটানো। একই সাথে শিক্ষার সার্বজনীনতার প্রতি গুরুত্ব দেয়াও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষা গুটি কয়েক ব্যক্তির সম্পদে পরিণত হলে সেটা শোষণের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমেই শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান বর্তমান নৈরাজ্যকর অবস্থা থেকে জাতিকে উদ্ধার করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

কুর'আন

ড. অরবিন্দ পোদ্দার : *মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্য মধ্যযুগ*
কলকাতা : এস খান প্রিন্টার্স, তাবি।

আল বেরুনী : *ভারতবর্ষ*
কলকাতা : মিতা প্রকাশন, তাবি, ১ম খ।

আলাউদ্দীন খান : *জ্ঞানের অনুসন্ধান*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭।

আঃ খাঃ আবদুল মান্নান : *শিক্ষার ইতিহাস ও শিক্ষানীতির মূল কথা*
ঢাকা : তাবি।

আবুল খায়ের জালাল উদ্দিন সম্পাদিত : *শিক্ষা ও বিজ্ঞানে ভারত*
ঢাকা : ভারতীয় হাই কমিশন, ১৯৭৪।

আবূ দাউদ তায়ালিসী : *মুসনাদ*
মিসর : আল-মাতবা'আতুস সালাফিয়া, ১৩৮৯ হি., ১ম খ।

ড. আবদুল ওয়াহিদ : *বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*
ঢাকা : ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০১।

আবদুস শহীদ নাসিম : *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*
ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর : *ইসলামের পূর্ণতা ও হযরত মুহাম্মদ সা.*
ঢাকা : পানাম প্রেস লিমিটেড, ২০০২।

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযিদ ইবন মাজা আল কাবীনী : *আস সুনান*
দেওবন্দ : আল-মাকতাবা রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি.।

আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত তিরমিযী : *জামি'উত তিরমিযী*
দিল্লী : মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫০।

আফজালুর রহমান : *হযরত মুহাম্মদ সা. জীবনী বিশ্বকোষ*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৯, ১ম খ।

আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আসসাজিসতানী : *সুনান আবূ দাউদ*
কানপুর : আল-মাতবা'আল মাজীদী, ১৩৭৫ হি.।

আল্লামা আহমদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন জাযির বালাযুরী : *ফুতুহুল বুলদান*
কায়রো : মাতবা'আতুস শরফিল ইসলামিয়া, ১৯৭৭।

আজিজুর রহমান মল্লিক দিলওয়ার হোসেন অনূদিত : *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান*
ঢাকা : বাএ, ১৯৮২।

আ ত ম মুছলেহ উদ্দীন : *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২।

আজিজুল হক বান্না : *বরিশালে ইসলাম*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল ফাত্তাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া : *দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান*
ঢাকা : আল আমিন রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৮।

আবদুল হক ফরিদী : *মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ*
ঢাকা : বাএ, ১৯৮৫।

আবদুল মওদূদ : *ওহাবী আন্দোলন*
ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৫।

আবুল ফাত্তাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া : *দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস-এতিহ্য-অবদান*
ঢাকা : আল আমিন রিসার্চ একাডেমী, ১৯৮৮।

আবদুল মান্নান তালিব : *বাংলাদেশে ইসলাম*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৪।

আব্দুল মান্নান তালিব : *বাংলাদেশে ইসলাম*
ঢাকা : ১৯৮০।

আব্দুল মান্নান তালিব : *সাহিত্য সংস্কৃতি : ভাষা ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট*
ঢাকা : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯১।

আ সি মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস*
কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্সয়্যান্ড পাবলিশার্স, তাবি, ৩য় খ.।

ড. আবদুল করিম : *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*
ঢাকা : বাএ, ১৯৯৪।

ড. আবদুল করিম : *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*
ঢাকা : বাএ, ১৯৯৪।

আবদুস সাত্তার
মোস্তফা হারুন অনূদিত : *আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮০।

আবদুস সাত্তার : *তারীখ-ই-মাদরাসা আলীয়া*
ঢাকা : ১৯৫৯, ২য় খ।

অধ্যাপক আব্দুল গফুর : *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭।

আবূ 'আব্দির রহমান আহমদ
ইবন শু'আয়ব আন নাসায়ী : *সুনান আন নাসায়ী*
লেবানন : কারাজ আল ফিকর, ১৯৯০, ৩য় খ।

ড. আবু ইউনুছ খান মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর : *ড. গোলাম মকসূদ হিলালী : কর্মজীবন ও চিন্তাধারা*
ঢাকা : ইফাবা, ২০০১।

আ. ন. ম বজলুর রশীদ সম্পাদিত : *আমাদের সূফী সাধক*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৪।

আ ন ম বজলুর রশীদ : *পাকিস্তানের সুফী সাধক*
ঢাকা : জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ১৯৬৫।

আব্বাস আলী খান : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*
ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাস আলী খান : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*
ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪।

'আল্লামা আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আততাবারী : *তারীখুত তাবারী*
মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৭, ১ম খ।

আমীনুল ইসলাম : *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*
ঢাকা : বাএ, ১৯৮৪।

আসকার ইবনে শাইখ : *লালন ফকীর*
ঢাকা : সাতরং প্রকাশনী, ১৯৬৯।

মওলানা আকরম খাঁ : *এসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য*
কলকাতা : মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ১৯২৪, ১ম খ.।

ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল আশশায়বানী : *আল-মুসনাদ*
কায়রো : মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৯৬৭।

ইবন আবদিল বার : *আল-ইস্তিআব*
হায়দারাবাদ : ১২২৬ হি., ২য় খ।

ইবন হাজার আসকালানী : *আল-ইসাবা ফী আহওয়ালিস আস সাহাবা*
কায়রো : মাতবা'আতুশ শরফিল ইসলামিয়া, ১৯৬২, ১ম খ।

ইবন হাজার আসকালানী : *তাহযীব*
হায়দারাবাদ : ১৩২৫ হি. ৫ম খ।

ইবনুল আসির : *উসদুল গাবা*
২য় খ, ৩য় খ।

ইবন কাইয়্যেম আল জাওযী : *যাদুল মা'য়াদ*
বৈরুত : মাকতাবাতু বহুছ ওয়াদ দারাসাত, ১৯৯৫, ৩য় খ।

মাওলানা ইসহাক ফরিদী : *দারুল উলূম দেওবন্দ : ঐতিহ্য* ও অবদান
কুমিল্লা : ইকরা রওজাতুল আতফাল, ১৯৯৭।

এ কে এম মহিউদ্দীন : *চট্টগ্রামে ইসলাম*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৬।

এ কে এম মহিউদ্দিন : *চট্টগ্রামে ইসলাম*
ঢাকা : ইফাবা।

এ কে এম আবদুল আলিম : *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*
ঢাকা : বাএ, ১৯৬৯।

এ কে এম নাজির আহমদ : *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*
ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯।

এ কে এম নাজির আহমদ : *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*
ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৭।

এ এস এইচ কে সাদেক : *শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ভাবনা*
ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

এস এম জাফর	:	*মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা* ঢাকা : বাএ, ১৯৮৮।
এনামুল হক	:	*বঙ্গে সূফী প্রভাব* কলকাতা : ১৯৩৫।
ডকটর এনামুল হক	:	*বঙ্গে সূফী প্রভাব* কলকাতা : মহসিন এন্ড কোং, ১৯৩৫।
ড. এম এ রহিম মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান অনূদিত	:	*বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১৫৭৬)* ঢাকা : ১৯৮২, ১ম খ।
ড. এম এ রহিম মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান ও ফজলে রাব্বী অনূদিত	:	*বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬-১৭৫৭)* ঢাকা : ১৯৮২, ২য় খ।
এম এ রহিম	:	*বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৬।
ড. এ আর মল্লিক দিলাওয়ার হোসেন অনূদিত	:	*বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান* ঢাকা : ১৯৮২।
ড. এবনে গোলাম সামাদ	:	*বাংলাদেশে ইসলাম* ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭।
এ এন রাশেদা সম্পাদিত	:	*শিক্ষাবার্তা (১৯৮৭-১৯৯৭) : নির্বাচিত রচনা* ঢাকা : শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ১৯৯৮।
এ এম এম সিরাজুল ইসলাম	:	*ইসলামে মসজিদের ভূমিকা* ঢাকা : ১৯৯৩।
এডভোকেট এ এম এম আব্দুল জলীল	:	*দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ* ঢাকা : ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৩।
এ জেড এম শামসুল আলম	:	নতুন প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসা শিক্ষা *ইনকিলাব*, ২৮ ডিসেম্বর ২০০১।
এ জেড এম শামসুল আলম	:	দাওয়াতে তাবলীগ : একটি দ্বীনি প্রশিক্ষণ *অগ্রপথিক*, জুলাই ১৯৯৬।
এ জেড এম শামসুল আলম	:	*মহিলা মাদ্রাসা : প্রাসঙ্গিক ভাবনা।* ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৪।
এস এম জাফর রশীদ আল ফারুকী অনূদিত	:	*মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা (১০০০-১৮০০)* ঢাকা : বাএ, ১৯৮৮।
ড. ওয়াকিল আহমদ	:	*উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা* ঢাকা : বাএ, ১৯৮৩, ১ম খ।
ড. ওয়াকিল আহমদ	:	*উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা* ঢাকা : বাএ, ১৯৮৩।
ওলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ তিবরিজিবী	:	*মিশকাতুল মাসাবীহ* দেওবন্দ : মাকতাবা রহীমিয়া, ১৯৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান : *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*
ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯।

কাজী দ্বীন মোহাম্মদ : *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ*
ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯।

মাওলানা ক্বারী বেলায়েত হুসাইন : *নূরানী পদ্ধতিতে কুর'আন শিক্ষা*
নূরানী তালিমুল কুর'আন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৯৯।

ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী : *ভারতের ইতিহাস কথা*
কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লি., ১৯৯৩।

কে এম রইচ উদ্দীন খান : *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*
ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৮।

অধ্যাপক কে আলী : *ইসলামের ইতিহাস*
ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, ৩৪ সংখ্যা।

কে আলী : *বাংলাদেশ ও পাক ভারতের ইতিহাস*
ঢাকা : ১৯৭৯।

খোন্দকার সিরাজুল হক : *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম*
ঢাকা : বাএ, ১৯৮৪।

গোলাম আহমদ মোর্তজা : *চেপে রাখা ইতিহাস*
কলকাতা : এ্যাডভান্স বুক ডিপো, ১৯৮৯।

ড. গোলাম সাকলায়েন : *বাংলাদেশের সূফী সাধক*
ঢাকা : ১৯৮২, ৩য় সংখ্যা।

ড. গোলাম সাকলায়েন : *বাংলাদেশের সূফী সাধক*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৩।

গোলাম সাকলায়েন সম্পাদিত : *বাংলাদেশের সূফী সাধক*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৩।

গোপাল হালদার : *সংস্কৃতির রূপান্তর*
ঢাকা : রহমান আর্ট প্রেস, ১৯৭৪।

জুলফিকার আহমদ কিসমতী : *চিন্তাধারা*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৮।

জুলফিকার আহমদ কিসমতী : *আযাদী আন্দোলনে সংগ্রামী 'ওলামাদের ভূমিকা*
ঢাকা : ১৯৯৯।

তালিমুল কুর'আন ওয়াকফ এস্টেট : *নূরানী শিক্ষা পরিচিতি*
ঢাকা : তালিমুল কুর'আন ওয়াকফ এস্টেট, ১৯৮৮।

দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত : *আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : *সিলেটে ইসলাম*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : *জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম*
ঢাকা : ইফাবা, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৮৬।

ডব্লিই ডব্লিউ হান্টার
এম. আনিসুজ্জামান অনূদিত : *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*
ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯০।

মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন : *ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান*
ঢাকা : আল হেরা প্রকাশনী, ১৯৯২।

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী : *মেশকাত শরীফ*
ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৪, ২য় খ।

মাওলানা নুর মোহাম্মদ সম্পাদিত : *জীবনের জল ছবি*
ঢাকা : ১৯৯৯।

পি কে হিট্টি : *আরব জাতির ইতিহাস*
কলকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৭৯।

ফকীর আব্দুর রশীদ : *সূফী দর্শন*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৪।

মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী : *ইসলামিক নলেজ এন্ড ডায়েরী*
ঢাকা : ১৯৯৪।

ফজলুর রহমান খান : *ইসলামে শিক্ষা ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ*
ঢাকা : দায়েমী কমপ্লেক্স, ১৯৯২।

ফজলুর রহমান খান : *ইসলামে শিক্ষা ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ*
ঢাকা : দায়েমী কমপ্লেক্স, ১৯৯২।

ড. তারাচাঁদ : *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*
ঢাকা : বাএ, ১৯৯৯।

বদরুদ্দীন উমর : *পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট*
কলকাতা : ১৯৭৯।

বিপিন চন্দ্র : *আধুনিক ভারত*
দিল্লী : ১৯৮৯।

প্রিন্সিপাল মাওলানা বেগম নূরজাহান আকবর : *বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৮।

বেফাকুল মাদারিসিল 'আরাবিয়া বাংলাদেশ : *সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কর্মসূচী*
ঢাকা : বেফাকুল মাদারিসিল 'আরাবিয়া বাংলাদেশ, ১৯৯৭।

বায়যাবী : *তাফসীরে বায়যাবী*
ঢাকা : দি হলি প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৮।

মওদুদ আহমদ : *বাংলাদেশ : স্বায়ত্ত শাসন থেকে স্বাধীনতা*
ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৯৮।

মানজুরুর রব মুর্তজা, সৈয়দ আহসান : *শিক্ষা মনোবিদ্যা ও মক্তব প্রশাসন*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

মাহবুবুর রহমান : *মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়*
ঢাকা : তৌহিদ ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮।

মফিজুল্লাহ কবির : *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*
ঢাকা : বাএ, ১৯৮৭।

ড. মজির উদ্দীন মিয়া : *বাংলাদেশের গবেষণা পত্রিকা*
ঢাকা : বাএ, ১৯৯২।

মেহরাব আলী : *দিনাজপুরে ইসলাম*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯১।

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী : *খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া*
কলকাতা : ১৯২৯।

মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশায়রী : *সহীহ মুসলিম*
দিল্লী : আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি.।

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব
এ এস এম আলাউদ্দীন : *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*
ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৯।

মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী : *সহীহুল বুখারী*
দেওবন্দ : আল-মাকতাবা আর রহীমিয়া, ১৩৮৪ হি।

মুহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান ও
মোঃ সাহাব উদ্দীন : *ইসলামী শিক্ষা পরিচিতি*
ঢাকা : পূর্ব দেশ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬।

মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *নারী*
ঢাকা : সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ১৯৮৮, ২য় সংখ্যা।

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*
ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০।

ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান সম্পাদিত : *মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*
রাজশাহী : সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজ লি., ১৯৮৯।

অধ্যাপক মুহাম্মদ মোমিন উল্লাহ : *শিক্ষার ইতিহাস*
ঢাকা : রহমান আর্ট প্রেস, ১৯৮০।

মুহাম্মদ আজিজুল হক
মুস্তফা নূর-উল-ইসলাম অনূদিত : *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষায় ইতিহাস ও সমস্যা*
ঢাকা : বাএ, ১৯৬৯।

ড. মুহাম্মদ এনামুলক হক : *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*
ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫।

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক : *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*
ঢাকা : আবদুল্লাহ ব্রাদার্স, ১৯৪৮।

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক : *বাংলার ইতিহাস : ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা-পর্ব (১৬৯৮-১৭৭৪)*
ঢাকা : বাএ, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক : *ভারতের মুসলমানও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭)*
ঢাকা : বাএ, ১৯৯৩।

অধ্যাপক মুহাম্মদ মোমিন উল্লাহ্ : *শিক্ষার ইতিহাস*
ঢাকা : রহমান আর্ট প্রেস, ১৯৮০।

মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস কাসেমী : *সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফগানীর রচনাবলী*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৩।

মাওলানা মুশতাক আহমদ : *তাহরীকে দেওবন্দ*
ঢাকা : সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯২।

মুস্তাফা নুরউল ইসলাম : *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*
ঢাকা : ১৯৭৭।

মুফতি কুতুব উদ্দীন : *তারীখে মক্কা*
লাইপ সিবা : ১৮৫৭।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : *স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৭৯।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ (১৮০১-১৯৭১)*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : *বাংলাদেশের দশ দিশারী*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯১।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : *ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯১।

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ : *নওয়াব সলীমুল্লাহ*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী*
ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ২০০০।

ড. মুহাম্মদ ইছহাক : *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৩।

মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান : *ইসলামের ইতিহাস*
ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪।

মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল : *হায়াতে মুহাম্মদ*
কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ আল মুহাম্মদীয়া, ১৯৬৮।

মুহম্মদ মমতাজ উদ্দীন (অনু) : *ইরান ও ইসলাম*
ঢাকা : বাএ, ১৯৭৯।

মুহাম্মদ আবদুস শাকুর : *মুসলিম বিশ্বের নৈতিক পাঠক্রম*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭।

মুহম্মদ আবদুল কুদ্দুস : *মক্তব শিক্ষক প্রদর্শিকা*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ লুতফুল হক : *কোরকানিয়া মকতব পরিচালনা পদ্ধতি*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৪; ৪র্থ সংখ্যা।

মিনহাজ-ই-সিরাজ
এ কে এম জাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত : *তবকাত আন নাসিরি*
ঢাকা : বাএ, ১৯৮৩।

মিনহাজ-ই-সিরাজ : *তবকাত আন নাসিরি*
কলকাতা : ১৯৬৪।

মনসুর মূসা সম্পাদিত : *প্রবন্ধ সংকলন*
ঢাকা : ১৯৭৪।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ : *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*
ঢাকা : ১৯৬৫।

মোহাম্মদ আজিজুল হক
মুস্তফা নূর-উল ইসলাম অনূদিত : *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা*
ঢাকা : বাএ, ১৯৬৯।

মুফতী আজহার উদ্দিন আহমদ : *শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি*
সিলেট : ১৯১৪।

মুসা আনসারী : *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি (৭৫০-১২৫৮)*
ঢাকা : বাএ, ১৯৯৯।

মোহাম্মদ আজহার আলী : *শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*
ঢাকা : বাএ, ১৯৮৬।

মোহাম্মদ আজহার আলী
হোসনে আরা বেগম : *শিক্ষানীতির স্বরূপ*
ঢাকা : বাএ, ১৯৯১।

মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী : *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*
ঢাকা : ১৯৯৯।

মোহাম্মদ কোরবান আলী : *খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী,*
ঢাকা : ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৮।

মোঃ আবদুস সাত্তার : *ফরিদপুরে ইসলাম*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৭।

ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার : *ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান*
ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯২।

মোঃ আবদুর রশীদ সম্পাদিত : *ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭।

মোঃ আবদুর রশীদ সম্পাদিত : *ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭।

ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন : *শিক্ষা ও উন্নয়ন : উন্নয়নশীল দেশের প্রতিশ্রুতি*
ঢাকা : ১৯৯১।

মোঃ মাসুদুল হক : *কমিউনিটি ভিত্তিক শিক্ষা*
ঢাকা : সুরাইয়া বেগম, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোহাম্মদ এছহাক : *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৩।

শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইসহাক : *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*
চট্টগ্রাম : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০।

শায়খ 'আলী ইবন বুরহানুদ্দীন আল-হলবী : *আস্‌সীরাতুল হলবিয়্যা*
মিসর : মাতবা'আ মুসতাফাল বাবিল হলবী, ১৯৬৪, ১ম খ।

শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া : *ছাহাবা কাহিনী*
মোজাফ্‌ফর হোছাইন ও মোঃ মোছলেহউদ্দীন অনূদিত ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৯।

মাওলানা শিবলী নু'মানী : *সীরাতুন্নবী*
আ'যম গড় : মাতবা' মা'আরিফ, ১৯৫২।

যদুনাথ সরকার : *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*
কলকাতা : ১৯২৫, ২য় খ.।

শরীফা খাতুন : *দর্শন ও শিক্ষা*
ঢাকা : বাএ, ১৯৯৯।

শামসুল হক : *উচ্চ শিক্ষা : বাংলাদেশ*
ঢাকা ; ১৯৮৯।

শামসুল হক : *সংস্কৃতি চর্চায় ও গ্রন্থাগার সংগঠনে মুসলমান*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯২।

শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী : *আর রাহিকুল মাখতুম*
রিয়াদ : মাকতাবাতু দারুস সালাম, ১৯৯৩।

শাহেদ আলী : *ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা*
সুনামগঞ্জ : সোস্যাল আপলিপট সোসাইটি, ১৯৬৫।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস*
কলকাতা : ১৩৮০ ব.।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*
ঢাকা : ১৯৭৮।

সাইয়্যেদ সুলায়মান নদবী : *'আরব ও হিন্দ কে তায়াল্লাকাত*
এলাহাবাদ : ১৯৩০।

সায়্যিদ আমীর আলী : *দি স্পিরিট অব ইসলাম*
অধ্যাপক দরবেশ অলী খান অনূদিত ঢাকা : ১৯৯৩।

সায়্যিদ আব্দুল লতিফ : *ইসলামী সংস্কৃতির বুনিয়াদ*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬।

স্যার সৈয়দ আহমদ : *আসবাব-এ-বাগাওয়াত-এ হিন্দ আয়না-এ আদব*
লাহোর : টওক মীনার, ১৯৬১।

সৈয়দ আবদুল আসকর : *এরফের ইতিহাস*
কলকাতা : ১৯২৪।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আব্দুল মান্নান : *পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা*
করাচী : ইকবাল একাডেমী, ১৯৫৯।

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী : *আদব কায়দা শিক্ষা*
কলকাতা : ১৯১৪।

সৈয়দ তুফায়িল আহমদ : *মুসলমানোঁকা-রওশন মুস্তাকবিল*
বাদায়ূন : নিযামী প্রেস, ১৯৩৮।

সৈয়দ মাহমুদুল হাছান : *বাংলাদেশে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ*
ঢাকা : বাংলাদেশে সৌদী 'আরব ভাতৃ সমিতি, ১৯৯১।

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান : *বাংলাদেশের মসজিদ*
ঢাকা : বাএ, ১৯৮৭।

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান : *মসজিদের ইতিহাস*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭।

সৈয়দ মুরতজা আলী : *হযরত শাহজালাল ও ইতিহাস*
ঢাকা : বাএ, ১৯৬৪।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী : *শিক্ষা ব্যবস্থা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ*
ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ২য় সং, ১৯৯১।

সাইয়্যেদ মাহবুব রেজবী : *তারিখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*
দেওবন্দ : ইদারা ইহতিমাম দারুল 'উলূম, ১৯৯২, ১ম খ।

ড. সিকান্দর আলী ইব্রাহিমী : *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : অতীত ও বর্তমান*
ঢাকা : ১৯৯১।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী : *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*
ঢাকা : ১৯৭৬।

ডক্টর সৈয়দ মাহমুদূল হাসান : *ইসলামের ইতিহাস*
ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৮১।

হাফেজ হাবিবুর রহমান : *সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি*
ঢাকা : আইডিয়েল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৭।

ড. হাসান জামান : *সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস*
ঢাকা : ১৯৮৭।

ড. হাসান জামান : *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*
ঢাকা : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : *ভারত বর্ষের ইতিহাস*
কলকাতা : নবজীবন প্রেস, ১৯৮৩।

ফকীর আবদুর রশীদ : *সূফী দর্শন*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৫।

ফজলুল হাছান ইউসূফ : *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী গ্রন্থ

Dr. Muhammad Abdur Rahim	: *Social and Cultural History of Bengal* Karachi : 1957, Vol. II
Yusuf Husain	: *Glimpses of Medieval Indian Culture* London : Asia Publishing House, 1959, 2nd ed.
M A Sattar	: *Tarikh-i-Madrasha-i-Alia* Dacca : Research Publication, Section, Madrasha-i-Alia, 1957.
Muhammad Kutub	: *Islam and women* Dhaka : Adhunik Prokashoni, 1988.
Mufti Amimul Ahsan	: *Tarikh-i-Ilm-i-Hadith* Dacca : Mufti Manzil, nd.
Tuta Khalil	: *The Contribution of the Arabs to Education.* New York : 1926.
Dr. Aamidullah	: *History of Muslim Education* Bairut : 1945.
... ...	: *Islam War Asr-i-jadeed* New Delhi : 1970, Vol II.
P K Hitti	: *History of the Arabs* London : 1970, 10th ed.
K M Nizami Prof. Hasan Askari	: *Arabs accounts of India* Bengal : Past & Present,1948.
A H Bani	: *Shamsuddin Ilyas, Sir Jadunath Sarker Commemoration Volume.* Panjab University, 1958.
Dr. A K M Ayub Ali	: *History of the Traditional Islamic Education in Bengal* Dhaka : IFB 1983.
K Fazli Rabbi	: *The Origin of the Musalmans of Bengal.* Nil dated.
I H Qureshi	: *Administration of Sultanate of Delhi.* Nil dated
Dr. Muhammad Ishaq	: *Indian Contribution to the Study of Hadith Literature* Dhaka : University of Dhaka, 1976.
Muhammad Mohar Ali	: *History of the Muslim of Bengal* Riyadh : Imam Muhammad Ibu Sa'ud Islamic University, 1985, Vol IB.

Dhaka University Institutional Repository

Dr. Shaikh Ghulam Muqsud Hilali : *Islami Attitude towards non Muslims*
Rajshahi : Rajshahi Printing Works, 1952

W W Hunter : *The Indian Musalmans*
Lahore : 1968.

Muhammad Mohar Ali : *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities*
Chittagong : The Mehrah Publication, 1965.

Dr. Sekandar Ali Ibrahimy : *An Introductoin to Islamic Education in Bangladesh*
Dhaka : 1992.

A R Mallick : *British Policy and the Muslims in Bengal*
Dhaka : 1977.

Dr. Sekandar Ali Ibrahimy : *Reports on Islamic Education and Madrasha Education in Bengal (1861-1977)*
Dhaka : IFB, 1987, Vol. 4.

Dr. James Wise : *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*
London : 1883.

Prof. Zahir Ahmad Siddiqi edited : *Education in Iran*
Lahore : Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran, Spring 1994.

কোষগ্রন্থ

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত : *ইসলামী বিশ্বকোষ*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬, খ।

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত : *ইসলামী বিশ্বকোষ*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬, খ।

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত : *ইসলামী বিশ্বকোষ*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭, খ।

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত : *ইসলামী বিশ্বকোষ*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৮, খ।

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত : *ইসলামী বিশ্বকোষ*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯১, খ।

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত : *ইসলামী বিশ্বকোষ*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯২, খ।

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত : *ইসলামী বিশ্বকোষ*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯২, খ।

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত : *ইসলামী বিশ্বকোষ*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫, খ।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত : *ইসলামী বিশ্বকোষ*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৭, খ।

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত : *ইসলামী বিশ্বকোষ*
ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬, খ।

সাইয়েদ আবদুল হাই সংকলিত : *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ*
ঢাকা : বাএ, ১৯৮৬।

সরদার ফজলুল করিম সংকলিত : *দর্শনকোষ*
ঢাকা : বাএ, ১৯৯৫।

মফিজ উদ্দিন আহম্মদ সংকলিত : *দর্শন পরিভাষা কোষ*
ঢাকা : বাএ, ১৯৮৪।

আবদুল হাকিম সম্পাদিত : *বাংলা বিশ্বকোষ*
ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২।

খন্দকার শহিদুল ইসলাম সম্পাদিত : *গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র সারগ্রন্থ*
ঢাকা : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ১৯৯৭।

: *Encyclopedia of Religion and Ethics*
Edinburah, Vol V

: *বিশ্বকোষ*
কলকাতা ; ১৪ খ।

অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন : *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭)*
অপ্রকাশিত পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. শেহাবুল হুদা : *The Saits and Sharines of Chittagong.*
অপ্রকাশিত পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. আবু ইউছুফ নেছার উদ্দিন : *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বাংলাদেশের অবদান (১৯৭১-১৯৯৯ খ্রী.)*
অপ্রকাশিত পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোঃ তৌহিদুল হাছান : *বাংলাদেশে মুসলিম দর্শন চর্চা (১৯৪৭-৯৩)*
অপ্রকাশিত এম ফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

ড. আবদুল করিম : *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার গোড়ার কথা*

সহায়ক গবেষণা প্রবন্ধ-নিবন্ধ

সাঈদ-উর রহমান : মধ্যযুগের বাংলায় শিক্ষার ধারা : কয়েকটি দিক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৮৪।

কাজী সালেহ আহমেদ : উচ্চ শিক্ষা : সমস্যা ও সমাধান
উন্নয়ন বিতর্ক, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক এম. আমিনুল ইসলাম : নতুন শতাব্দীতে পৃথিবী এক বিন্দুতে মিলিত হবে
দৈনিক অর্থনীতি, একুশ শতক বরণ সংখ্যা, ১ জানুয়ারী ২০০০।

ড. আলী আসগর : কেমন হবে একুশ শতকের বিশ্ববিদ্যালয়।
দৈনিক অর্থনীতি, একুশ শতক বরণ সংখ্যা, ১ জানুয়ারী ২০০০।

ড. ইকবাল মাহমুদ : একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা : বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা
দৈনিক অর্থনীতি, একুশ শতক বরণ সংখ্যা, ১ জানুয়ারী ২০০০।

সালমা আখতার : প্রশাসনিক কলাকৌশল ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬।

রওশন আরা চৌধুরী : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা পরিকল্পনার ভূমিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৮৭।

কাজী আবু হোরায়রা : মহানবী সা.-এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা
সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হিজরী, ইফাবা।

শায়খ ইসহাক আল-মাদানী : বাংলাদেশে তাওহীদ বিষয়ক জ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা
আল মানার, নভেম্বর ২০০০।

অধ্যাপক ড. কাজ দীন মুহম্মদ : বাংলাদেশে ইসলাম
শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন '৯১, বাংলাদেশ সৌদী আরব ভাতৃ সমিতি, অক্টোবর ৯১।

শেখ আলী আশরাফ : বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে আওলীয়াদের ভূমিকা
শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন '৯১।

এ জেড এম শামসুল আলম : সামাজিক নেতৃত্বে আলেমদের করণীয়
পাথেয়, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।

আবদুল মমিন চৌধুরী : বাংলায় ইসলাম বিস্তারের পটভূমি
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৮৬।

মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম
প্রবন্ধাবলী, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৯৯।

ওয়াকিল আহমেদ : আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ব্যবস্থা
পাথেয়, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

বিশেষ প্রতিবেদন : শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম, বিজ্ঞান ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটাতে হবে
সাপ্তাহিক বিক্রম, ৮-১৪ জুলাই ১৯৯৭।

ড. আবদুল লতিফ মাসুম : বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান প্রেক্ষিত
বিক্রম, ২৪-৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।

তায়েক ফজল : নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি : বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ?
বিক্রম, ৬-১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।

শহিদুল ইসলাম : শিক্ষার মান উন্নয়নে ও আধুনিকীকরণে শিক্ষক-ছাত্রের ভূমিকা
ভোরের কাগজ, ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ স্বপন মাহমুদ : আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি
ভোরের কাগজ, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯।

মোঃ হেদায়েত হোসেন : বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি এবং সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা
বাংলাদেশ এশিয়াটি সোসাইটি পত্রিকা, জুন ১৯৯৯।

ড. কে এম মোহসীন : ক্যাম্পাস নিরাপত্তা : একুশ শতকের চিন্তা
দৈনিক অর্থনীতি, ১ জানুয়ারী ২০০০।

ইকফাৎ জাহান : ঔপনিবেশিক আমলে সিলেটের শিক্ষা ব্যবস্থা (১৮৩৬-১৮৭৪)
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৯৬।

খাদিজা খাতুন, মোঃ মতিনুর রহমান : শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিমত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৯৬ ৯৬-জুন ৯৭।

ম. আবু তাহের : শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস : একটি মতামত পর্যালোচনা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ৯৬-জুন ৯৭।

শরীফ উদ্দিন আহমেদ : শহরে মফস্বল ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা (১৯০০-১৯১১)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ৯৫-জুন ৯৬।

মোঃ নূরুল ইসলাম, মোঃ মনজুর : বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ৯৮-ফেব্রুয়ারী ৯৯।

কাজী আফরোজ জাহান আরা ও অন্যান্য : ঢাকা ও মফস্বল শহরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ৯৮-ফেব্রুয়ারী ৯৯।

শাহজাহান তপন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাগত শিক্ষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৮০।

মোঃ আবু তাহের : বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা : প্রাসঙ্গিক তথ্য ও আলোচনা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৯৩।

মোঃ আবদুল হালিম ও অন্যান্য : বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের গণিত শিক্ষাক্রম : একটি নমুনা জরিপভিত্তিক পর্যালোচনা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ২০০০।

কাজী আফরোজ জাহান আরা : বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা : ধারণা, পরিপ্রেক্ষিত এবং বাস্তবায়ন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ২০০০।

মোঃ অহিদুজ্জামান ও অন্যান্য : বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার আইন ও নীতিমালা : একটি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ২০০০।

আব্দুল মালেক : বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠন : একটি নীতি-নির্দেশনা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ২০০০।

মেহতাব খানম : শিশু শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের মূল্যায়ন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৮৭।

মোঃ রোবায়েত ফেরদৌস : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ শঙ্কা : একটি সামাজিক শিক্ষণ-সমীক্ষা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ৯৭-জুন ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ হেদায়েত হোসেন : বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা আইন : তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ৯৭-জুন ৯৮।

নজরুল ইসলাম : বাংলাদেশের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার কার্যকারিতা প্রসঙ্গে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫।

আনিসুজ্জামান : বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২।

জাফরুল হাসান বেগ : নজরুল ইসলামের শিক্ষা-চিন্তা
সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক ১৪০৫।

আবদুল মালেক : বেগম রোকেয়ার শিক্ষা-সমাজ বিষয়ক চিন্তা ও কর্ম
সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক ১৪০৪।

আবদুল মালেক : রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনে ব্যক্তি ও সমাজ
দর্শন ও প্রগতি, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৭।

হোসনে আরা আলম : রাসেলের শিক্ষাদর্শনে স্বাধীনতার ধারণা
দর্শন ও প্রগতি, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৭।

নুসরাত সুলতানা : রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন : একটি ত্রিমাত্রিক সমীক্ষা
দর্শন, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৬।

মাহমুদ নাসির জাহাঙ্গীর : জীবনানন্দের দুটি উপন্যাস : বেসরকারী কলেজে শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ
উত্তরাধিকার, এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৯৯।

সরকার আবদুল মান্নান : জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ : সমাজ ও শিক্ষাভাবনা
উত্তরাধিকার, এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৯৯।

মুহাম্মদ আবুল হোসেন মাহমুদ : *ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শিক্ষা ব্যবস্থা*
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৮৫।

অধ্যাপক ড. এস এম শরফুদ্দীন : মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষণ
শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন, ১৯৯১।

ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন : সৌদি আরবের শিক্ষা ব্যবস্থা
শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন, ১৯৯১।

ডগলাস কে স্টিভেনসন
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম অনুদিত : *আমেরিকার জীবন ও প্রতিষ্ঠান*
ঢাকা : ইউসিস, ১৯৮৯।

মাওলানা ইরফান আলী : জীবন পথ ও ইসলামী শিক্ষা
মনীষা [মাওলানা ইরফান আলী সংখ্যা], ২৯ আগস্ট ১৯৯৭।

মোবাশ্বের হোসাইন : ইসলামী শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষা
স্মরণিকা, ১২ বর্ষ পূর্তি দস্তরবন্দী সম্মেলন, ডিসেম্বর ১৯৯৭।

এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন : উপমহাদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও আল্লামা নানূতবী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

রাবিয়া খাতুন : ইসলামী যুগের অপরিহার্য দাবী
সম্মেলন স্মারক ১৯৯৩, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা।

হাফেজ মোহাম্মদ জাফর : ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা ও বাস্তবায়ন
শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন, ১৯৯১।

মুহাম্মদ আবদুল বাকী : দারুল উলূম দেওবন্দ প্রসঙ্গে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৮৫

এ এম এম নূরুল আলম : বাংলাদেশে আরবী চর্চার ভবিষ্যৎ ও প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩।

এ কে এম নূরুল আলম : বৃটিশ-বঙ্গে মুসলিম শিক্ষার ধারাবাহিকতা এবং এর বিবর্তন ধারা (১৮৫৭-১৯৪৭)
ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ৩য় খ, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪।

মোজাফ্ফর আহমদ : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দর্শন : এডওয়ার্ড মিল্‌স-এর ভাবনা
দেব স্মারক বক্তৃতা ১৯৯৭, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাম্মদ নূরুল আমীন : শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের দান
বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, আহসান পাবলিকেশন্স ঢাকা, জুন ২০০২।

মাসুদুজ্জামান, কাজী আফরোজ জাহান আরা : বাংলাদেশে নারী শিক্ষা : প্রাথমিক গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ২০০০।

শাহ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম : বৃটিশ ভারতে মুসলমান শিক্ষা আন্দোলন (১৯০০-১৯১১)
ঐতিহ্য, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮৯।

আ নম আবদুর রহমান : ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব
অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭।

মাহমুদ জামাল : মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা
অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮।

শহিদুল ইসলাম : শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম
সুন্দরম, অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৪০০।

হায়াৎ মামুদ : আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় দৃষ্টিভঙ্গির ধারাক্রম
সুন্দরম, জৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০১।

আসহাবুর রহমান : ইসলামী মৌলবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি
সুন্দরম, অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৪০০।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী : মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস
মাহে নও, মার্চ ১৯৭০।

আহমদ হোসাইন : মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার
তাহজীব, বৈশাখ ১৩৮৪।

মাওলানা মোঃ মতিউর রহমান : বাংলার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা
তাহজীব, ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী : মাদ্রাসা শিক্ষার ত্রুটি ও তাহার প্রতিকার
তাহজীব, প্রাগুক্ত।

মোঃ রওশন আলী : মাদ্দরাসা শিক্ষার প্রাসঙ্গিক ভাবনা
তাহজীব, প্রাগুক্ত।

অধ্যক্ষ মাও. নুরুল ইসলাম : বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা
মাসিক শাহ জালাল, আগস্ট ১৯৯২।

প্রতিবেদক : বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার এক নতুন দিগন্ত
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭।

অধ্যাপক ড. এ হাসান : আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একটি পর্যালোচনা
শিক্ষাঙ্গন বার্তা, জুলাই ১৯৯৬।

প্রতিবেদক : শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদদের মতামত-৩
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, জুলাই ১৯৯৬।

শাহেদ আলী : মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা সমস্যা
অগ্রপথিক, ৩০ অক্টোবর ১৯৮৬।

সৈয়দ মুসা রেজা : ইসলামী দুনিয়ার শিক্ষা নিয়ে ষড়যন্ত্র
অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭।

ড. এম আবদুল কাদের : মুসলমান আমলে উচ্চ শিক্ষা
মাহে নও, আগস্ট ১৯৭১।

ড. কাজী মোতাহার হোসেন : আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা
মাহে নও, মার্চ ১৯৬৭।

রাজী উদ্দীন সিদ্দিকী
মিন্নাত আলী অনূদিত : পাকিস্তানের শিক্ষা-ব্যবস্থা
মাহে নও, জানুয়ারী, ১৯৫৫।

মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ : মাদ্রাসা শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারা
আত-তাওহীদ, জানুয়ারী ১৯৭৮।

আহমদ আবদুল আজীজ আলে মোবারক
মাওলানা মোহাম্মদ হারুণ ইসলামাবাদী অনূদিত : শিক্ষার ইসলামী বুনিয়াদ
আত তাওহীদ, মার্চ ১৯৭৮।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান খান : মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী : রাজনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার অবদান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৮৩।

এ এফ আবদুল হক : শিক্ষায় ধর্মের স্থান
সন্ধান, ফেব্রুয়ারী ১৯৭১।

ড. এ বি এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী : উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলের শিক্ষা ব্যবস্থা
মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকা : অতীত ও বর্তমান (১৭৮০-১৯৮০)
ঢাকা : মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ১৯৮১।

আল্লামা শিবলী নুমানী
নূরুদ্দীন আহমদ অনূদিত : প্রাচীন মুসলিম শিক্ষাপদ্ধতি
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই- সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী : পাকিস্তানের ধর্মীয় শিক্ষা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৬৪।

ড. হাফিজ উদ্দীন শেখ : ধর্ম শিক্ষা কোন পথে
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৭০।

মুহাম্মদ আবদুশ শাকুর : কয়েকটি মুসলিম দেশের পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী উপাদান
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৫।

তোফাজ্জল হোসাইন ফরিদ : সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তরালে
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৭।

অধ্যাপক হেলাল উদ্দীন আহমদ : জ্ঞান-প্রেরণার উৎস কুর'আন মজীদ ও হাদীস
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭।

আবুল হাসানাত নদভী
গোলাম সোবহান সিদ্দিকী অনূদিত : উপমহাদেশে প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭।

ফিরোজ আহমেদ : ইসলামের জ্ঞানের অবস্থান : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৮।

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান : আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণে মাদ্রাসা শিক্ষা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩২ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, অক্টোবর-মার্চ, ১৯৯২।

আবদুন নূর : শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৪।

ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী : ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে দারুল 'উলুম দেওবন্দের ভূমিকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৪।

আ ক ম আবদুল কাদের : হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সা. প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।

ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী : বৃটিশ আমলে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে উপমহাদেশীয় উলামা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

মোহাম্মদ ইসমাঈল মিয়া : মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সা. : শিক্ষা বিস্তার
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

Abdul Momin Chowdhury : Islamiszation in Bengal : Some Aspects of the Socio-Religious Background. *The Dhaka University Studies*, Dhaka 1990

Charles & Butterworth : Revelation and Politics Philosophy : What is Islamization of knowledge? *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Summer 1993

M. Mufazzalul Huq : Educational Under development of Tribals in the Chittagong Hill Tracts : An Analysis of the Educational policies the government. *The Dhaka University Studies*, December 1990.

সেমিনার প্রবন্ধ

প্রফেসর মুজিবুর রহমান : *মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা : অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*
জাতীয় সেমিনার, ঢাকা : ১৯৯৩।

এ কে এম আবদুল্লাহ : *ইসলামী শিক্ষা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*
ঢাকা : ইসলামিক স্টাডিজ জাতীয় সমন্বয় কমিটি
জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তন, ৩ অক্টোবর, ১৯৯৬।

আবদুল ওয়াহিদ : *রাসূলুল্লাহ সা.-এর শিক্ষা দর্শন ও বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষায়*
ঢাকা : ওয়ার্ল্ড মুসলিম কালচারাল সোসাইটি
জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তন, ২৯ জুন ২০০০।

জরিপ, নির্দেশপঞ্জি, প্রতিবেদন, বর্ষপঞ্জি, সূচী

এবতেদায়ী মাদ্রাসা জরিপ ১৯৮৯
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯০।

শিক্ষা সূচী ১৯৮৪ (মিমিও)
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৬।

শিক্ষা সূচী পত্র ১৯৮৫
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৮।

অনুমোদিত কলেজসমূহের তালিকা (জুন ১৯৯৪ পর্যন্ত)
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৪।

অনুমোদিত হাই স্কুলসমূহের তালিকা : বিভাগ-খুলনা
ঢাকা : গণশিক্ষা পরিচালনা দপ্তর, ১৯৭৪।

অনুমোদিত হাই স্কুলসমূহের তালিকা : বিভাগ-চট্টগ্রাম
ঢাকা : গণশিক্ষা পরিচালনা দপ্তর, ১৯৭৪।

অনুমোদিত হাই স্কুলসমূহের তালিকা (১৯৭৪ ইং পর্যন্ত) : বিভাগ-ঢাকা
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৭৮।

অনুমোদিত হাই স্কুলসমূহের তালিকা : বিভাগ-রাজশাহী
ঢাকা : গণশিক্ষা পরিচালনা দপ্তর, ১৯৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা মহানগর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডাইরেক্টরী
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৯।

বাংলাদেশ বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ের তালিকা ও কিছু মৌলিক তথ্য (মিমিও)
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৩।

বাংলাদেশ বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ের তথ্য (তালিকাসহ) ১৯৮৭
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৭।

মাদ্রাসা ডাইরেক্টরী : (দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার তালিকা)
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯২।

বাংলাদেশ কলেজ ডাইরেক্টরী ১৯৯৪
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৪।

১৯৯০ দশকের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা : জাতীয় কর্মশালার প্রতিবেদন
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৯০।

গণ স্বাক্ষরতা ১৯৮০ প্রতিবেদন
ময়মনসিংহ : মৌলিক শিক্ষা একাডেমী, ১৯৮১।

জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ : অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৭৯।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটি
আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন সম্পাদিত
ঢাকা : প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা বিভাগ, ১৯৯৭।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ : প্রতিবেদন
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৯৭।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্স প্রতিবেদন
ঢাকা : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, ১৯৯৫।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৮৮।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৭৬।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৯৭।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৮৬।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট
ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম, ১৯৭৮।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৭৮।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা
ঢাকা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ১৯৮৭।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক বৃন্দের জন্য নূন্যতম বেতনক্রম প্রণয়ন ও প্রবর্তন সম্পর্কিত কমিটির রিপোর্ট
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৭৯।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার কল্পে জনমত যাচাই রিপোর্ট
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৪।

শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৮৭ : ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৮৭।

শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৮৯ : দেশ গড়ার জন্য শিক্ষা
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৮৯।

শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯০ : শিক্ষা উন্নয়নের বাহন
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৯০।

শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯১ : শিক্ষা ও গণতন্ত্র
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৯১।

শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯২ : নারী শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা : সমস্যা ও সমাধান
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৯২।

শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৮ : যুগোপযোগী শিক্ষা
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৯৯।

শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৮ : জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন প্রতিবেদন
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৯৯।

বাংলাদেশ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট : নিম্ন মাধ্যমিক স্তর
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৭৮।

বাংলাদেশ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট
ঢাকা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৭৮।

ডিগ্রী সমতা বিধান কমিটি : বাংলাদেশের ফাজিল ও কামিল শিক্ষার ডিগ্রী প্রাপ্ত সনদের ডিগ্রী সমতা বিধান
ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ১৯৯৬।

ডিগ্রী সমতা বিধান কমিটির রিপোর্ট : বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও কামিল শিক্ষার ডিগ্রী প্রাপ্ত সনদের ডিগ্রী সমতা বিধান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ১৯৯৬।

বাংলাদেশের স্বাক্ষরতা কার্যক্রম ও শিক্ষোপকরণ : কিছু সুপারিশ–উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন : ১৯৯২
ঢাকা : গণ স্বাক্ষরতা অভিযান, ১৯৯৪।

বাংলাদেশের স্বাক্ষরতা প্রশিক্ষণ : বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ চাহিদা
ম. হাবিবুর রহমান ও এনামুলক হক সম্পাদিত
ঢাকা : গণ স্বাক্ষরতা অভিযান, ১৯৯৪।

এক নজরে বাংলাদেশের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ১৯৮৮
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৯।

প্রাথমিক শিক্ষা তথ্য ১৯৮১
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৭৯।

বাংলাদেশের বেসরকারী কলেজের তথ্য ১৯৮৫
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৭।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তথ্য ও ১৯৮৭
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৭।

অনুমোদিত মাদ্রাসা সমূহের তালিকা : বিভাগ-ঢাকা
ঢাকা : জনশিক্ষা পরিচালনা অধিদপ্তর, ১৯৭৮।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহের তালিকা (মিমিও)
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৩।

বাংলাদেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজসমূহের তথ্য ১৯৮০ সালের জরিপ অনুযায়ী (মিমিও)
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৩।

বাংলাদেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজসমূহের তথ্য (১৯৮২ সালের জরিপ অনুযায়ী (মিমিও)
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৩।

ঢাকা মহানগর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডাইরেক্টরী
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৯।

দ্বি-বার্ষিক রিপোর্ট-১৯৮৬-৮৭ এবং ১৯৮৭-৮৮
কুষ্টিয়া : ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮।

বার্ষিক বিবরণী- ১৯৮৬-৮৭, ১৯৮৭-৮৮
চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮।

বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৫-৯৬
তাজুল ইসলাম সম্পাদিত
সাভার : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

বার্ষিক বিবরণী-১৯৯৬-৯৭
ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭।

বার্ষিক বিবরণী-১৯৯৭-৯৮
ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯।

বাংলাদেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজসমূহের তথ্য ১৯৯২ সালের জরিপ অনুযায়ী (মিমিও)
ঢাকা : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৩।

খ ম আবদুল আউয়াল সম্পাদিত, *বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৯*
ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০০।

বার্ষিক বিবরণী ১৯৭৮-৭৯
ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৮৯-৯০।
রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯০-৯১।
রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৮৯-১৯৯০।
রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।

মাদরাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট ১৯৯৪
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড

Teacher education program's of Bangladesh
Dhaka : Institute of Education and Research, 1976.

Bangladesh educational statistics 1987
Dhaka : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 1987.

Bangladesh educational statistics 1990
Dhaka : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 1991.

Bangladesh educational statistics 1997
Dhaka : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 1998.

Basic statistics of govt. School 1985
Dhaka : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 1986.

Educational statistics (basic information) 1980-84 (mimeo)
Dhaka : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 1984.

Educational statistics of Bangladesh (mimeo)
Dhaka : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 1981.

Educational statistics 1986
Dhaka : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 1986.

Information of government college 1981-83 (mimeo)
Dhaka : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 1985.

Primary education in Bangladesh
Dhaka : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 1990.

Statistical profile of education in Bangladesh
Dhaka : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 1987.

Statistics of cadet colleges in Bangladesh 1984 (mimeo)
Dhaka : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 1985.

Statistics on primary education 1947-83 (mimeo)
Dhaka : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 1984.

Reports of the State of Education in Bengal
Calcutta : 1941, Report no 3, 1838.

Souvenir 2000, Islamic University
Chittagong trust

Dhaka University Institutional Repository

Admission hand Book 1990-2000
Islamic University, Chittagong

Bangladesh Mosque Census 1983
Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics; March 1985.

Bangladesh Educational Statistics 1991
Dhaka : Banbais, March 1992.

The Madrasha Education Ordinance 1978

Statistical Yearbook of Bangladesh 1990
Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of plan Bangladesh, 1990.

Nawab Abdul Latif's Reports on Hoosly Madrasha 1861, Para 13.

Report of East Bengal Education System Reconstruction Committee 1949-1951.

Education Construction Bengal Provincial Committee, 1886.

The World Conference of Muslim Education, Macca 1977.

সিলেবাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বিএ (সম্মান) আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ	: শিক্ষাবর্ষ ১৯৭৩-৭৪, ১০৭৫-৭৬, ১৯৭৯-৮০, ১৯৮৮-৮৯।
বিএ (পাস ও সাবসিডিয়ারী) আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ	: শিক্ষাবর্ষ ১৯৭০-৭১, ১৯৭৩-৭৪, ১৯৮০-৮১, ১৯৮৮-৮৯।
এমএ পূর্বভাগ ও শেষ বর্ষ আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ	: শিক্ষাবর্ষ ১৯৭০-৭১, ১৯৭৫-৭৬, ১৯৭৯-৮০।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

বিএ (সম্মান) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ	: শিক্ষাবর্ষ ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬, ১৯৮৬-৮৭, ১৯৮৮-৮৯।
বিএ (সম্মান) আরবী বিভাগ	: শিক্ষাবর্ষ ১৯৭৩-৭৪, ১৯৭৬-৭৭, ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৬-৮৭।
বিএ (পাস ও সাবসিডিয়ারী) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ	: শিক্ষাবর্ষ ১৯৭০-৭১, ১৯৭৪-৭৫, ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩-৮৪।
বিএ (পাস ও সাবসিডিয়ারী) আরবী বিভাগ	: শিক্ষাবর্ষ ১৯৭-৭১, ১৯৮২-৮৩।
এমএ (পূর্বভাগ) আরবী বিভাগ	: শিক্ষাবর্ষ ১৯৭৪-৭৫, ১৯৭৫-৭৬, ১৯৮৭-৮৮।
এমএ শেষবর্ষ আরবী বিভাগ	: শিক্ষাবর্ষ ১৯৭৫-৭৬, ১৯৮১-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

বিএ (সম্মান) আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ : শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৬-৮৭, ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০।

বিএ (পাস ও সাবসিডিয়ারী) : শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০।

এমএম শেষবর্ষ আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ : শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৭-৮৮, ১৯৮৮-৮৯।

এমএ প্রিলিমিনারী আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ : শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৫-৮৬, ১৯৮৭-৮৮।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

পাঠ্যক্রম : স্নাতক (সম্মান) শ্রেণী আল কুর'আন ওয়া 'উলূমুল কুর'আন : শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৬-১৯৮৯।

স্নাতক (সম্মান) শ্রেণী 'উলূমুত তাওহীদ ওয়া আদ্-দাওয়াহ্ : শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৭-৮৮।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

দাখিল শ্রেণী : শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৪।

আলিম শ্রেণী : শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৪, '৮৭, '৮৯, '৯০।

ফাযিল শ্রেণী : শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৪, '৮৭, '৮৮, '৮৯।

কামিল শ্রেণী : শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৭, '৮৮।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) : শিক্ষাবর্ষ ১৯৭৫-৭৬, '৮৩, '৮৫, '৮৮, '৮৯, '৯০।

উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) : শিক্ষাবর্ষ ১৯৮০, '৮২, '৮৬, '৮৮, '৮৯, '৯০।

পত্র-পত্রিকা

দৈনিক মিল্লাত, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮২।

দৈনিক ইনকিলাব, ১ বৈশাখ ১৪০০।

মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৪।

মাসিক তাকবীর, ১৯৯৮।

মাসিক আল হক, ১ম সংখ্যা, চট্টগ্রাম, জুলাই ১৯৯৭।

মাসিক তরজুমান, জুলাই ১৯৯৮।

মাসিক অগ্রপথিক, ১৩ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৮; সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ১৯৮৮।

মাসিক তরজুমানুল হাদীস, ১০ম সংখ্যা, পাবনা।

মাসিক দারুস সালাম, ৩য় বর্ষ ২য়-৩য় সংখ্যা, আদর্শ শিক্ষা সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০০।

মাসিক মুসলিম ডাইজেস্ট, ডিসেম্বর ১৯৯৯।

মাসিক পৃথিবী, ১০ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, জুন ১৯৯২; ১৪শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৫; ১৭শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৮; ১৯ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০০; ১৪শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, জুন ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক মাদরাসা, ৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, রবিউল আউয়াল ১৪২২ হি.।

শিক্ষা বিচিত্রা, ৯ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, জুন ২০০১।

মাসিক তাসনীম, রাঙ্গুনিয়া আলম শাহ আলীয়া মাদরাসা চট্টগ্রাম, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ২০০০।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ৯ম বর্ষ ১ম খ, জুন ১৯৯১।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৩; ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৬৪; ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭০; ২৫ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৫; ২৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৭; ২৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭; ২৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৮; ২৭ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৮৮; ৩২ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩; ৩৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৪; ৩৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪; ৩৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৬; ৪০ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০০।

সীরাতুন্নবী সা. স্মারক ১৯৮৬।

সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হিজরী, ঢাকা : ইফাবা।

স্মরণিকা ১৯৮৫, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

সমাপনী ১৯৯৮, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা : অতীত ও বর্তমান (১৭৮০-১৯৮০), ঢাকা : মাদরাসা-ই-আলীয়া, ১৯৮১।

তামিরুল মিল্লাত বার্ষিকী ১৯৯৮ ও ২০০১, ঢাকা : তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা।

ইসলামী শিক্ষা সংকলন, ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৮৭।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা, ঢাকা : সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, ১৯৯৭।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় সমাবর্তন স্মরণিকা, ১৯৯৯।

Monthly Dhaka Post, Issue 9, February 2001.

Echo of Islam, Year 9, Serial No 85, Tehran : Islamic Republic of Rran Co-Operation, Journal of Co-operative Sector, 1998-1999.

Journul of the Asiatic Socity of Pakistan, Vol 6, 1963.

Journul of the Asitic Sociey of Bengal, Vol 16, 1847.

Indian Historical Quarterly (IHQ), Vol xxx, Calcata 1945.

Islamic Studies, xxi, Vol 4, Pakistan Islamic Research Institute, 1985.

The Culture, July 1934; Vol 8, 1993.